বিপদ-রহস্য ও বিপদ-মুক্তি

'শ্রী-তোষিণী' নাম্নী বাঙ্গলা টীকা, এবং

অন্বয় ও বাঙ্গলা শব্দার্থ

রসবিবৃতি ও ব্যাখ্যাসহ

শ্রীমদ্ভাগবতের

সম্পাদক

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীসতীশকুমার ভট্টাচার্য্য

২৪ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড,

ভবানীপুর, কলিকাতা।

১৯৩০

[মূল্য ২॥০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

প্রকাশকের নিকট, ৮৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বুক কোম্পানি, ৪।৪এ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
সেন রায় কোম্পানি, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার,
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
২৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

এবং

আলোচিত বিষয়ের তালিকা

পত্রাঙ্ক

লাভ—জীবনের ধ্রুবতারা —দীক্ষায় পরে দশ বৎসর ব্যাপী নির্য্যাতন (ক) ঘোর নির্য্যাতনভোগে 'অধিকার'—(খ) দশ বৎসর ব্যাপী বিপদ ও সাধনা—(গ) বিপদের সহিত সাধনায় সংযোগ—'কে হারে জিনে, উভয়ে সমান'—(ক) শারীরিক যাতনা—(খ) আরও বেশী দৈহিক যাতনা—(গ) দৈহিক যাতনার সঙ্গে মর্য্যাদার হানি। [২২৪

উপরোক্ত আঘাত উপলক্ষে তত্ত্বকথা—(ক) পূর্ণ আঘাতের জন্য সহন শক্তি উৎপাদন—(খ) আঘাতের রকম ফের দ্বারা সহনশক্তি উৎপাদন—(গ) মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতির পাঁচ বৎসর—সবংশে নিপাতের উদ্যোগ—(ক) দৈবশক্তি দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা—(খ) শ্রীমদ্ভাগবতের আগমনের পূর্ব্ব-সূচনা—পুনরায় মস্তকে সম্মানের উষ্ণীষ স্থাপন—পুনরায় সবংশে নিপাতের উদ্যোগ——Hunger and thirst after righteousness, অর্থাৎ 'স্বাধ্যায়' কার্য্যে প্রবৃত্তি—ধনলাভের আশার প্রেরণা ছিল না। [২৩০

নূতন বিপদের জন্য পথ প্রস্তুত করণ—'অথাদ সলিলে' ডুবে মরার অবস্থা—রজোগুণের হ্রাসের সময় মতি বিভ্রমের রহস্য—আধ্যাত্মিক উন্নতির সময়ও মতিভ্রম—(ক) একটানা ভাবে উন্নতি সংসার দেখা যায় না—(খ) মতিবিভ্রমের হেতুবাদ—পিপড়ের পাখা উঠে মরণের জন্য—(ক) গুণ দ্বারা প্রলোভনের উপাদান সৃষ্টি—(খ) পাখা উঠিয়া মরণ দ্বারাও পিপীলিকার মঙ্গল হয়—মতি-বিভ্রম দ্বারা হিতসাধন—(ক) সাধনকালে অবিদ্যা প্রবল থাকার লক্ষণ—প্রথম লক্ষণ—দ্বিতীয় লক্ষণ। [২৪০

ত্রয়োদশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)—তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিপদ উপলক্ষে কয়েকটী তত্ত্বকথা। [২৪১

আলোচিত বিষয়—**I shall send the showers in their season, I shall send showers of blessing**—আশীষ কাহাকে বলে—প্রকৃত 'আশীষ' উপলক্ষে বিকৃত ধারণা—অজস্র আশীষের অমৃতধারা প্রদানের জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা—নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিপদভোগের 'অধিকার' লাভ—(ক) যে সে লোকের এই 'অধিকার' নাই—(খ) কিরূপ অবস্থায় পাপের ফলে তীব্র বিপদ হয়—(গ) ঘোর পাপীদের অধোগতিই হয়, দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র বিপদ হয় না—(ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র বিপদ—(ঙ)

বিপদ-রহস্য ও বিপদ-মুক্তি

প্রথম অধ্যায়

বিপদের কারণ জানিতে আকাঙ্ক্ষা

এই প্রবন্ধের নামটি পড়িলে পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে যে, 'বিপদ' কাহাকে বলে ? অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম অংশে 'বিপদ' ও সম্পদ' এই পদদ্বয়ের প্রচলিত ভাবার্থ কি, এবং কাহাকে যথার্থ বিপদ এবং কাহাকেই বা সম্পদ বলা উচিত,তাহা আলোচিত হইয়াছে। যখন যে বিষয় কামনা করা যায় তাহার প্রাপ্তিতে যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়, অথবা উহা লাভের পর তাহা যদি কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিঘ্ন অথবা কাম্য বস্তুর বিনাশকে বিপদ, এবং ঐ কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিকে সম্পদ বলিয়া জ্ঞান করাই সংসারের নিয়ম। রোগ, শোক বা বৈষয়িক ব্যাপারে বিভ্রাটের আকারে সংসারে প্রায় সকলেরই বিপদ ঘটিয়া থাকে।

বিপদের রহস্য জানিতে আকাঙ্ক্ষা

বহুকাল হইতেই সংসারে বিপদ আছে ; যতকাল সংসারে অবিদ্যা ও কালশক্তির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে ততকাল যাবৎই সংসারে বিপদও চলিয়া আসিতেছে। বিপদ নামক অস্ত্র দ্বারাই কালরূপী শ্রীভগবান সংসারের জীবগণকে শাসন করিতেছেন। এই বিষম অস্ত্রখানি কি উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার শক্তিই বা কি এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে সেই শক্তিকে নিরোধ করা যায়, প্রায় সকলের মনেই এই সকল বিষয় জানিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে আগ্রহ আছে। কেহ বা কেবল জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য জানিতে চান। কিন্তু বিপদের কারণগুলিকে প্রতিরোধ করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ঐ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, এই আশাতেই অনেকে ঐ বিষয়গুলি জানিতে ইচ্ছা করেন।

আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত এবং বাইবেলের অন্তর্ভূত Book of Job নামক গ্রন্থে বিপদের বিষয় এত সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে যে, ঐ পুস্তক খানিকে বিপদ-সংহিতা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু বিপদের কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াও ঐ গ্রন্থে সেই চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় নাই। এখনও অনেক কথার মীমাংসা হয় নাই। 'শ্রীভগবানের ব্যবস্থার কারণ জানিতে আকাঙ্ক্ষা করিও না' ইহাই ঐ গ্রন্থের আলোচনার চরম মীমাংসা। আধুনিক যুক্তিবাদের দিনে মানবের জ্ঞানপিপাসা এই উপদেশের দ্বারা নিবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব মানব তথাপিও বিপদের রহস্য জানিতে চাহেন। Doctrine of Original Sin অর্থাৎ 'অবিদ্যা' [অবিদ্যার নামই 'পাপ'] কি কারণে সৃষ্টি হইল, এই তত্ত্বটী বিপদ-তত্ত্বের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। এই তত্ত্বটীও সংসারের অপর একটী (Unsolved problem) অমীমাংসিত রহস্য-ভাবে বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পুস্তকের প্রণয়ন

লেখক বিপদের সহিত সুপরিচিত। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিপদের সহিত সাহচর্য্য থাকাতে, লেখক বিপদকে অন্তরঙ্গ বন্ধুভাবে দেখিতে বাধ্য হইয়াছেন—লেখক এই সাহচর্য্য হইতে পলায়নের জন্য বহু চেষ্টা করিলেও বিপদ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই; কাজেই দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে সহচর ভাবেই দেখিতে হইয়াছে। যিনি লেখকের সঙ্গ-সুখ এত ভালবাসেন, সেই বন্ধুটীর গাঁই গোত্র প্রভৃতি নির্ণয় করার জন্য গত ১৮ বৎসর যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াও, লেখক কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। একটু অগ্রসর হওয়ার পরেই Dogmaর দুর্ভেদ্য প্রাচীর বরাবরই

চিন্তার গতিরোধ করিয়াছে। গত ৮ বৎসর যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, এবং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতকে বোধগম্য করার জন্য, একটী টীকা প্রণয়ণে নিযুক্ত থাকার সময়, লেখক পুনরায় বিপদ-রহস্য-চিন্তায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মোটের উপর গত ১৮ বৎসর যাবৎ বিপদ লেখককে ছাড়েন নাই, লেখকও তাঁহার তত্ত্ব জানার চেষ্টায় শিথিল-যত্ন হন নাই। উভয়ের মধ্যে বরাবরই ধস্তাধস্তি (wrestling) চলিয়া আসিতেছে। এই ধস্তাধস্তি গত ৮ বৎসর অতি প্রবলভাবে চলার পরে পূর্ব্বের সংশয়গুলির অনেকাংশ এখন দূর হওয়াতে এই পুস্তকখানি লেখা হইল।

প্রবন্ধটী লেখক দ্বারা সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্দের টীকার পরিশিষ্টভাবে ছাপিবার ইচ্ছা ছিল, এবং কতক অংশ ছাপাও হইয়াছিল। কিন্তু লিখিতে লিখিতে অনেক নূতন বিষয় এবং নূতন যুক্তির সংযোগ দ্বারা মূল প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া উঠিল। যখন প্রবন্ধটী লেখা প্রায় সমাপ্ত হইয়াছিল, তখন একজন বন্ধু বলিলেন যে, বিপদ-রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপদ-মুক্তির উপায়সকলের আলোচনা না করিলে প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ রহিবে। তিনি বলিলেন যে, বিপদ হইতে মুক্তির যে সকল উপায়ের কথা শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে, সেই উপায়গুলি কিরূপে আমাদের হিতসাধন করে, এই সঙ্গে তাহারও আলোচনা করিলে, এবং উপায়গুলির শ্রেয়স্করতা প্রতিপাদন করিলে, বইখানি লোকের কাজে লাগিতে পারে। আধুনিক Logic ও Science এর উপর ঐ যুক্তিগুলি স্থাপন করা আবশ্যক, এ কথাও তিনি বলিয়াছিলেন।

বন্ধুবরের কথাগুলি সঙ্গত বোধ হওয়াতে পূর্ব্বে লিখিত কয়েক অধ্যায়ের কোন কোন অংশ আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইল; এবং অনেকগুলি নূতন অধ্যায়ও মূল প্রবন্ধের সহিত সংযুক্ত করিতে হইল। এইভাবে প্রবন্ধের কলেবর এত বাড়িয়া গেল যে, এই সুদীর্ঘ বিষয়টীকে আর ভাগবতের পরিশিষ্টভাবে ছাপা মানায় না। কাজেই বইখানি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইল।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান।

বিপদ-রহস্য উপলক্ষে Book of Job যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র তদপেক্ষা বহুদূর গিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের মীমাংসাগুলিকে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ তত্ত্ব উপলক্ষে যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত,পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা অধুনা অভ্রান্তভাবে প্রতিপাদিত অনেকগুলি মূল বিষয়ের (Fundamental Principles), আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য আছে ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রও বহু বিষয়ে দার্শনিক মীমাংসাগুলির পুষ্টিসাধন করে। এই Comparative study অর্থাৎ তুলনা দ্বারা বিপদের উপলক্ষে অনেক তত্ত্ব কথার সারবত্তা প্রতিপাদিত হয় ; এবং ঐ সকল বিষয়ে চিন্তার জন্যও বহু উপাদান পাওয়া যায়।

গত ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে Biology এবং Pathology শাস্ত্রের গবেষণায় যে উন্নতি হইয়াছে তাহা পরোক্ষভাবে দার্শনিক এবং পৌরাণিক মীমাংসার সাতিশয় পুষ্টিসাধন করে। তাই আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকবর্গের চিত্তাকর্ষণের জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনেক কথা প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

লেখকের বাল্যকালে 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' নামক একটি আজগুবি বস্তু দেশে চলিয়াছিল। সে আজ ৪০ বছরের কথা। 'বিজ্ঞানের' নাম করিয়া ঐ আজগুবি বস্তু যেন প্রবন্ধের মধ্যে প্রবেশ না করে, লেখক তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, তবে অলক্ষিতভাবে ভ্রমে পড়িয়াছেন কি না, তাহা বলা লেখকের সাধ্যাতীত। কাহাকেও শিক্ষা দেওয়া লেখকের অভিপ্রায় নয়, এই সকল বিষয়ে চিন্তার উদ্দীপনা করাই লেখকের অভিপ্রায়।

লেখকের নিবেদন

লেখকের আত্মজীবন বিপদসঙ্কুল হইলেও গত ১৮ বৎসর যাবৎ এই তত্ত্ব অনুসন্ধান উপলক্ষে বিপদের কঙ্কাল রূপের মধ্যেও যে তিনি

শ্রীভগবানের মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্ম-তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন ইহাই লেখকের পক্ষে পরম লাভ; 'অয়ং হি পরমোলাভঃ উত্তমঃশ্লোক দর্শনম্'। বিপদ-রহস্যের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে কোন পাঠক ঐ বিষয় চিন্তা এবং বিপদ-মুক্তির জন্য সাধনা করিতে করিতে, যদি শ্রীভগবানের কৃপায় সেই সৌভাগ্য লাভ করেন, তাহা হইলে লেখক পরম সুখী হইবেন।

'সোজা কথায় বিপদের কারণ ও মুক্তির উপায়' নামক অধ্যায়ে যুক্তি তর্কের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া এই পুস্তকের মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রথম অংশ)

ব্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতি

ব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ

'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই যে তিনটি সংজ্ঞা একত্র করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করা হয়, তাহাদিগকে পারিভাষিক শব্দ বলে। ঐ সংজ্ঞা তিনটি দ্বারা কি বুঝায় তাহা সুবিস্তৃতভাবে দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং ঐ কথা তিনটীর ভারার্থমাত্র এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

দার্শনিকগণ অতি সাবধানে ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। যে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ নামক শক্তিত্রয়ের একত্র সমাবেশকে তাঁহারা ব্রহ্ম বলেন, সেই শক্তিত্রয় ক্রিয়াশীলভাবে থাকার সময় তাহাদের যে বিবিধ রূপান্তর ঘটে সেই রূপান্তরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করার জন্য তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ পারিভাষিক শব্দের (Technical word) ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটী নিম্নে বর্ণিত হইল।

(ক) 'স্বরূপশক্তি' ও 'কালশক্তি'—যে ক্রিয়াশীল শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপভূত তাঁহারনাম 'স্বরূপ-শক্তি'। এই নামটীর আলোচনা পরে করা হইয়াছে। এই শক্তি যখন ভূরাদি তিন ভোগলোকে কার্য্য করেন তখন ইঁহাকে 'কালশক্তি' বলা যায়। ভাগবতে এই শক্তিকে 'ভগবান কালঃ' বলা হইয়াছে ও 'বিষ্ণু' আখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে।

(খ) 'প্রকৃতি'—ব্রহ্মের যে অবস্থা তাঁহার নিজেরেই ক্রিয়াশীল শক্তির সহিত একত্র হইয়া সৃষ্টিতে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের প্রকটন করেন, সেই অবস্থার নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতিকে দুই ভাবে বর্ণনা করা হয় যথা,—

(১) পরা প্রকৃতি—প্রকৃতি যখন আপনার দ্বারা সৃষ্ট জীবগণের চিত্তে ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষ লাভের জন্য প্রেরণা উৎপাদন করেন,ব্রহ্মের সেই অবস্থাকে 'পরা প্রকৃতি' বলে; এবং অন্তরঙ্গা বা অন্তর্মুখী ভাবও বলে।

(২) 'অপরা প্রকৃতি'—প্রকৃতি যখন জীবের চিত্তে অপর অপর বস্তু প্রাপ্তির প্রেরণা উৎপাদন করিয়া জীবের মতিকে ব্রহ্ম হইতে দূরে লইয়া যান,ব্রহ্মের সেই অবস্থাকে 'অপরা' প্রকৃতি বলা যায়। এই অবস্থাকে বহিরঙ্গা বা বহির্মুখী ভাবও বলে।

(গ) 'উপাধি'—ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি বা কাল-শক্তি তাঁহার 'প্রকৃতির' সহিত সংযোগের পরে, প্রকৃতি যখন সেই শক্তির দ্বারা ক্ষুভিতা অর্থাৎ কার্য্যে প্রবৃত্তা হন, এবং ব্রহ্মের শক্তি ও প্রকৃতি উভয়ের সংযোগে প্রকৃতি হইতে যখন স্থূল সূক্ষ্ম কারণ প্রভৃতি বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু সকলকে দর্শনের ভাষায় 'উপাধি' বলিয়া থাকে।

(ঘ) 'পুরুষ'—আমরা সংসারে দেখিতে পাই যে, পুরুষ কোনও স্ত্রীর গর্ভে আপন বীর্য্য স্থাপন করার পরে সেই বীর্য্যের শক্তি এবং স্ত্রীর শক্তি এই উভয় শক্তির সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি প্রকৃতির সহিত মিলিত হওয়ার পরে তাঁহাকে ক্ষুভিতা করিয়া তাঁহার মধ্যে আপন বীর্য্য সঞ্চার করার ফলে ('বীর্য্যমাধ ত্ত

বীর্য্যবান') ব্রহ্ম-শক্তি এবং প্রকৃতির শক্তি এই উভয় বস্তুর সম্মিলনে স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি বস্তু সকল উৎপন্ন হয়। এই সংযোগ এবং উৎপাদন ক্রিয়া অনেকটা নর ও নারীর সংযোগের তুল্য। তাইতেই বোধ হয় যে, এই উপমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, শাস্ত্র প্রকৃতিকে স্ত্রীভাবে বর্ণণা করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তিকে 'পুরুষ' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 'পুরুষই' সকল বস্তুর জীবন।

ব্রহ্ম

ব্রহ্ম—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা যে আধারকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অথচ যে আধার ঐ অবস্থাসকল হইতে পৃথক, তিনিই 'ব্রহ্ম' নামে অখ্যাত হন। ব্রহ্মের বিশেষত্ব এই যে, পুরুষ নামে তিনি স্থূল সূক্ষ্মাদি সর্ব্ব বস্তুর অনু-পরমানুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, অথচ তিনি কোথায়ও আবদ্ধ নাই, তিনি সর্ব্ব বস্তু হইতে পৃথগ্‌ভাবে আছেন। 'অন্বয়াৎ ইতরতঃ অর্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্'।

'ব্রহ্ম' বাক্যটি বেদান্তের শব্দ, ইহা কেবল ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নিরুপাধিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হয়। কেন হয়, তাহা পরে বলা হইতেছে। পাতঞ্জল যাঁহাকে ঈশ্বর বলেন, তিনি সগুণও বটেন এবং নির্গুণও বটেন; সক্রিয়ও বটেন এবং নিষ্ক্রিয়ও বটেন, সোপাধিকও বটেন এবং নিরুপাধিকও বটেন। তাঁহার নিজের এবং ক্রিয়াশক্তি ও গুণ প্রভৃতির অপর অপর নামকরণ হইয়াছে।

'নিষ্ক্রিয়', 'নির্গুণ' ও 'নিরুপাধিক'—ব্রহ্মকে 'নিষ্ক্রিয়' 'নির্গুণ' এবং 'নিরুপাধিক' বলিয়া বর্ণনা করা হয় দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঈশ্বরের, অর্থাৎ ভগবানের, ক্রিয়াশক্তির উৎকর্ষ বা ঐশ্বর্য্য নাই।

পারিভাষিক শব্দ—যে দর্শনশাস্ত্র আমাদের গৌরবের বস্তু তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। ইংরাজিতে যাহাকে accuracy, precision, বলে,

তাহার পরাকাষ্ঠা আমাদের দর্শন শাস্ত্রে লক্ষিত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পৃথক পৃথক নামকরণ করিলে, তত্ত্ব-বিষয় সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবের (aspect) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আলোচনা করিতে সুবিধা হইবে, এবং আলোচনাও যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হইবে, এইজন্য দর্শনশাস্ত্র বিবিধ পারিভাষিক শব্দ (technical terms) সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার (aspect এর) ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। উপরে বলা হইয়াছে যে 'ব্রহ্ম' এই নামটি তাঁহার নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নিরুপাধিক অবস্থার নাম; তাঁহার সগুণ এবং সোপাধিক অবস্থার অপর নামকরণ হইয়াছে।

যে ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাকে 'স্বরূপ-শক্তি' এই স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে; অতএব ব্রহ্ম পদ দ্বারা নিষ্ক্রিয় অবস্থাই বুঝায়। যে 'গুণ', অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-উৎপাদিকা শক্তি, ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাকে 'প্রকৃতি' এই স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মকে 'নির্গুণ' বলা হয়। আর প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি যে বস্তু সকল সৃষ্ট হইয়াছে উহাদেরও স্বতন্ত্র নাম (অর্থাৎ 'উপাধি' এই নামটী) দেওয়া হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম পদ দ্বারা নিরুপাধিক অর্থাৎ নাম-রূপ-বর্জ্জিত অবস্থা বুঝায়

কি জন্য ব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ এবং নিরুপাধিক বলা যায়, তাহা বুঝা গেল। 'ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়', 'আত্মা নিষ্ক্রিয়' এই কথাগুলি পড়িলে আমরা ব্রহ্মের বিরাট শক্তি এবং প্রকৃতির অনন্ত ঐশ্বর্য্য চিন্তা করি, ও তখন আমাদের মনে সন্দেহ হয় এবং 'খটকা' লাগে; তাই বিষয়টী আলোচিত হইল।

'সৎ' 'চিৎ' ও 'আনন্দ'

সৎ এই পদের ভাবার্থ নিত্য। যাঁহার জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয় ও লয় নাই তাঁহাকে 'সৎ' বলা হয়। বিশ্বে কেবল ব্রহ্মই আছেন, তিনিই বহু রূপ ধারণ করিয়া আপন বিশ্ব-মূর্ত্তির প্রকটন করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান বস্তুসকলের ক্ষয় ও লয় হইতেছে দেখিয়া, কেহ প্রশ্ন করিতে

পারেন যে, ঐ সকল বস্তু ব্রহ্মের মূর্ত্তি হইয়াও তাহাদের যখন মৃত্যু ও ক্ষয় হইতেছে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে কেন ক্ষয়শীল বলা হইবে না?

প্রশ্নটীর উত্তর এই যে, আমরা যে সকল বস্তুকে নষ্ট হইতে দেখি তাহারা ব্রহ্মের উপাধি মাত্র। ব্রহ্ম অমূর্ত্তিক, এই উপাধি—সকল তাঁহা হইতে প্রকটিত হয় বলিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মের মূর্ত্তি বলা হয়। ঐ উপাধিসকল ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে মাত্র। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম ঐ সকলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকার সময়েও তাহাদের মধ্যে আবদ্ধভাবে থাকেন না, তখনও ঐ সকল বস্তু হইতে তিনি পৃথগ্-ভাবেই অবস্থিতি করেন 'অন্বয়াৎ ইতরতঃ অর্থেষ্বভিজ্ঞঃ'। অতএব কোন বস্তু বিনষ্ট হওয়ার সময়েও সেই বস্তু হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থিতি করায় স্বয়ং ব্রহ্মের বিনাশ হয় না, সুতরাং তিনি নিত্য।

চিৎ—এই পদটির মুখ্য অর্থ 'চেতনা', অর্থাৎ জীবনী-শক্তি। সেই জন্য ব্রহ্মের অপর একটি নাম 'চৈতন্য'। ব্রহ্মই জীবনস্বরূপ হইয়া বিশ্বের সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অবস্থার নাম 'বাসুদেব এবং 'পুরুষ' ('পুরে' অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুতে শেতে = অবস্থান করেন, যঃ = যিনি, তিনিই 'পুরুষ')। চিৎ এর প্রভাবে জ্ঞান অর্থাৎ সকল বিষয়ের অনুভূতি জন্মায়; এবং এই সংজ্ঞার দ্বারা অনন্ত শক্তিও প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মের 'চিৎ' নামক সত্ত্বার মধ্যে বিশ্বের সকল বস্তুই আছে, সুতরাং কোন্ বস্তু যে নাই, তাহা বলা সুকঠিন। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ আদি যাহা কিছু এই বিশ্বে আছে, ছিল, বা থাকিবে, কিম্বা থাকিতে পারে, তাহা সকলই 'চিৎ' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; সেই জন্য তাহাদিগকে 'চিৎ' এর রূপান্তর বলে। শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বাহ্যিক উৎকর্ষ এবং সর্ব্ববিধ মানসিক উৎকর্ষ—এ সকলই চিৎ সংজ্ঞার অন্তর্গত। এমন কোনও বস্তুর কল্পনাও করিতে পারা যায় না, যাহা চিৎ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত নহে। চৌর্য্য, লাম্পট্য প্রভৃতি

অপকর্ষ সকলও চিৎ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত। এই কথাটী শুনিয়া বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই; বিশ্বে কেবল উৎকর্ষই আছে, যথার্থ অপকর্ষ পদবাচ্য কোন বস্তুই নাই। যাহাকে আমরা অপকর্ষ বলি তাহা কেবল বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবের ফলমাত্র; এবং স্বরূপতঃ তাহা উৎকর্ষের প্রচ্ছন্ন রূপ মাত্র এবং সাধনা দ্বারা ঐ অপকর্ষও উৎকর্ষে পরিণত হয়।

আনন্দ—আনন্দ পদ দ্বারা অনন্ত সুখ অর্থাৎ Infinite Joy or Bliss বুঝায়। ব্রহ্ম সুখস্বরূপ; ঐ সুখ অখণ্ড, অনন্ত, পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন।

এই কথা কয়টীর প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ও সুমধুর অর্থ আছে। (ক) যে সুখকে অংশে অংশে বিভক্ত করা যায় না,যাহা নিয়তই সম্পূর্ণভাবে থাকে, সেই সুখ 'অখণ্ড'। (খ) যে সুখ কখন ভোগ দ্বারা শেষ হয় না, সেই সুখ 'অনন্ত'। (গ) সকল রকম সুখই সম্পূর্ণভাবে যে সুখের মধ্যে নিহিত আছে সেই সুখকে 'পূর্ণ' বলে। (ঘ) 'নিরবচ্ছিন্ন' পদের ভাবার্থ এই যে, অপর সুখের অবচ্ছেদ অর্থাৎ বিরতি আছে, কিন্তু এই সুখের বিরতি নাই, এই সুখ 'একটানা' ভাবে নিয়তই চলে। এইরূপ সুখ কেবল ব্রহ্মেই পাওয়া যায়, এবং সেই সুখই ব্রহ্ম। God is Love, and Love is God.

স্বরূপ শক্তি।

'স্বরূপ' পদের মর্ম্ম—স্ব = আপন + রূপ = মূর্ত্তি, যে শক্তি ব্রহ্মের 'রূপ' অর্থাৎ মূর্ত্তির তুল্য,তাহাই তাঁহার 'স্বরূপ-শক্তি'। ব্রহ্ম ত অমূর্ত্তিক, তথাপি 'রূপের' কথা কেন উঠিল ? কোন বস্তুর রূপ দেখিলে যেমন সেই বস্তুর যথার্থ্য অনুভব করা যায়, এই শক্তি ব্রহ্মের সারভূত বস্তু হওয়াতে ইহা দ্বারা ব্রহ্মের 'যাথার্থ্য', অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি বস্তু তাহা, অনুভব করা যায়; সেইজন্য সেই 'শক্তিকে স্বরূপশক্তি' বলা যায়। 'স্ব' এই পদটী ইঙ্গিত করে যে, সেই শক্তি mere accident নয়,তাহা ব্রহ্মের নিজস্ব বস্তু; অর্থাৎ ব্রহ্ম-সত্তার সার অংশ। উপরে 'চিৎ'

এবং 'আনন্দ' সংজ্ঞা দুইটির ভাবার্থ প্রকাশ-উপলক্ষে যে উৎকর্ষ এবং মাহাত্ম্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির রূপান্তর মাত্র। ঐ উৎকর্ষাদির মধ্যেও অনন্ত energy অর্থাৎ শক্তি quiescent অর্থাৎ সুপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট আছে; সেই সুপ্ত শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তির অন্তর্ভূ্ত।

বিজ্ঞানের গবেষণার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মনিষিগণ প্রাচীন atomic theory অতিক্রম করিয়া এখন Electron প্রভৃতি আরও সূক্ষ্মতর শক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছেন; অর্থাৎ মূলা প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বিজ্ঞানের এই আধুনিক তত্ত্ব দ্বারা ক্রমশঃ প্রতি-পাদিত হইতেছে যে, মূল শক্তির বিকার অর্থাৎ transformation দ্বারা অসংখ্য রূপান্তর ঘটিত হয়। সেই সূক্ষ্মতম মূল শক্তিকে প্রকৃতিই বল বা অপর যে কোন আধুনিক নামই দাও, সেই বস্তুর বিকার হইতে যে কি হয় না তাহা বলাই অসম্ভব। যে জীবনীশক্তি সংসারের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা কেবল শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির রূপান্তর মাত্র—এই কথা বলিলে, সেই বাক্য পূর্ব্বে যতই অশ্রদ্ধার বস্তু থাকুক না কেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের আধুনিক গবেষণার সহিত এই কথা যে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আশা হয় যে, ক্রমশঃ প্রতিপাদিত হইবে যে, mind and matter অর্থাৎ অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুই এক অনন্ত শক্তিরই রূপান্তর-মাত্র। ঐ অনন্ত শক্তিকে 'চিৎ' বল বা অপর যে নামই দাও, ভরসা হয় যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই ক্রমশঃ স্বীকার করিবেন যে, আমাদের বুদ্ধির বিচার-শক্তি, মনের কল্পনা, বাসনা প্রভৃতি ক্রিয়াশক্তি এবং সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী চিৎ নামক Energyর রূপান্তর মাত্র।

Energy অর্থাৎ শক্তি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি করুণ গুণের এবং সৌন্দর্য্যাদি (graces) উৎকর্ষের আকারে

পরিণত হইতে পারে, এই বাক্যটী আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় 'আজগুবি' অর্থাৎ উপহাসের বস্তু নয়। এই বাক্যের যাথার্থ্য এ পর্য্যন্ত প্রতিপাদিত না হইলেও বাক্যটী মূলেই অসম্ভব বলিয়া এখন আর উড়াইয়া দেওয়া চলে না। গবেষণার (Research) সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানই ধর্ম্মের প্রধান সহায় হইবে, এ আশাও করা যায়।

[পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী (Rationalist) সম্প্রদায়ের Huxley প্রভৃতি যাঁহারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব পর্যান্ত স্বীকার করেন না, তাঁহারাও বিশ্বে পরিব্যাপ্ত অনন্ত Energyর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না ; আর এই শক্তির ক্রিয়াও যে অপূর্ব্ব এবং ইহাতে যে অনন্ত intellegence এর পরিচয় পাওয়া যায়, এই কথাও তাঁহারা অস্বীকার করেন না]

পুরুষ ও প্রকৃতি এবং সপ্তলোক সৃষ্টি

পারিভাষিক শব্দ কতকটির আলোচনা উপলক্ষে পুরুষ ও প্রকৃতি পদদ্বয় দ্বারা কি বুঝায় এবং প্রকৃতির কিরূপ অবস্থাকে 'পরা' (অর্থাৎ অন্তরঙ্গা) বলে এবং কিরূপ অবস্থাকে 'অপরা'(অর্থাৎ বহিরঙ্গা) বলে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তী অংশে প্রকৃতির এই উভয়বিধ অবস্থার কার্য্য নানাভাবে এবং পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইবে। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তির সংযোগে সপ্তলোক সৃষ্টি হইয়াছে।

স্বরূপ-শক্তিকে পুরুষ আখ্যা প্রদত্ত হয়, এবং সংসারে ক্রিয়াশীল স্বরূপ-শক্তির নাম 'কালশক্তি'। কালশক্তিই জীবনী-শক্তিরূপে সর্ব্ব-দেহে এবং সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন, তখন তিনি 'বাসুদেব' নামে পরিজ্ঞাত হন। কালশক্তি সংসারের পালন কার্য্যও করিতেছেন। এই পালন-ক্রিয়া উপলক্ষে তাঁহাকে 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত করা হয়। অতএব দেখা গেল যে, ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির (অর্থাৎ ক্রিয়াশীল অবস্থার) বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করার জন্য তাঁহাকে 'কালশক্তি'

'পুরুষ' 'বাসুদেব' এবং 'বিষ্ণু' এই নামগুলি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইঁহারা কেহই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহেন। 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব সংজ্ঞিতং', বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণকে বসুদেব বলে। বসুদেব পদে স্বার্থে ঘঙ্ প্রত্যয় করিয়া বাসুদেব পদ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব যে সত্ত্বগুণ স্বয়ং ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই গুণেরই অপর একটী নাম বাসুদেব।

উচ্চলোক চতুষ্টয়—পরা প্রকৃতি হইতে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই চারি উচ্চ লোকের (region) প্রকটন হইয়াছে। এই চারি লোকই ভোগলোকত্রয়ের উপরে অবস্থিত ও ইঁহাদের সকলের নীচে আছে মহঃ-লোক; তার উপরে যথাক্রমে তপঃ জন এবং সত্যলোক; এবং সকলের উপরে বৈকুণ্ঠ বিরাজমান আছেন। এই লোক চতুষ্টয়ে ব্রহ্মের উৎকর্ষ ক্রমশঃ অধিক পরিমানে প্রকটিত হইয়া বৈকুণ্ঠে যে উৎকর্ষ আছে, তাহা ব্রহ্মের, অর্থাৎ শ্রীহরির, তুল্য।

ভোগলোকত্রয়—অপরা প্রকৃতি হইতে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোকের প্রকাশ হইয়াছে। এই লোকত্রয়ের অধিবাসিগণও 'ভোগ-সুখ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ্য 'বিষয়', অর্থাৎ বস্তু সকল, হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেই আনন্দ প্রাপ্তি কামনা করেন। সেই জন্য এই লোকত্রয়ের নাম হইয়াছে 'ভোগলোক' এবং ভোগায়তন দেহ দ্বারা উপভোগ্য বস্তু সকলকে 'বিষয়' বলে।

উভয়লোকে সুখ কামনার বৈশিষ্ট্য

সপ্তলোকের অধিবাসিগণই সুখ কামনা করেন; কিন্তু ঐ কামনার মধ্যে সারভূত পার্থক্য (fundamental difference) এই যে, উচ্চ-লোকের অধিবাসিগণ যে সুখ কামনা করেন তাহা বিশুদ্ধ এবং ভোগ-লোকবাসী দিগের দ্বারা কাম্য সুখ অবিশুদ্ধ।

(ক) বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ সুখ—ব্রহ্ম সুখস্বরূপ, ঐ সুখে দুঃখের লেশমাত্র নাই, উহা অখণ্ড, অনন্ত, পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন। [এই সকল

পদের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়ে দেওয়া হইবে]। ব্রহ্ম স্বয়ং বিশুদ্ধ, 'শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ', অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ-ভূত সুখকে 'বিশুদ্ধ' সুখ এবং যে সুখ স্বরূপভূত নয় তাহাকে অবিশুদ্ধ সুখ বলে। ব্রহ্মের স্বরূপভূত সুখ কাহাকে বলে, সেই কথাটি বিশদ করা যাক্। যে জ্ঞান এবং আনন্দ ব্রহ্ম সত্তার সার, সেই দুই বস্তু চিত্তবৃত্তিতে স্ফুরিত হইলে যে সুখ অনুভব করা যায়, সেই সুখকেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত সুখ বলে; ইহাকে ব্রহ্মদর্শনের সুখও বলে। উচ্চলোক চতুষ্টয়ের অধিবাসিগণ ব্রহ্মদর্শন লাভ করাতে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদ উপভোগ করিতেছেন, এই সুখের কাছে ভোগসুখের তুলনাই হয় না, অতএব তাঁহারা সেই উচ্চ সুখকে কামনা করেন; তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ কামনা করেন না।

ভোগলোকত্রয়ের অধিবাসিগণ ব্রহ্মদর্শন লাভ করেন নাই; সুতরাং ঐ সুখ কত শ্রেষ্ঠ তাহাও জানেন না; এবং উহা কামনাও করেন না। তাঁহারা যে সুখকে কামনা করেন, তাহা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ হইতে লভ্য সুখ। ঐ সুখও ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নয়, উহা ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপের বিকার অর্থাৎ রূপান্তরিত অবস্থা।

সেই বিশুদ্ধ সুখ এবং তাহার বিকার—ভোগসুখের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বিশুদ্ধ সুখ 'পূর্ণ', অর্থাৎ তাহা লব্ধ হইলে একাধারে সকল সুখই পাওয়া যায়, এবং তখন অপর কোন সুখের বাসনাই থাকে না। কিন্তু বিষয়-ভোগের সুখ পূর্ণ ত নয়ই, বরঞ্চ ইহা ভোগের সময়েও তৃপ্তি হয় না, এবং ভোগ-কালে কাম, লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি জন্মিয়া মনঃপীড়া হয়।

ঐ উভয়বিধ লোকের কাম্যবস্তু হইতে উৎপন্ন সুখের মধ্যে এই পার্থক্য থাকতে ভোগলোকত্রয়ে 'আর্ত্তি' অর্থাৎ ক্লেশ এবং জন্ম, জরা ও মৃত্যু আছে, কিন্তু উচ্চলোক চতুষ্টয়ে কেবল অধিক হইতে অধিকতর আনন্দই আছে। 'ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুঃ নার্ত্তি নচোদ্বেগ

ঋতে কুতশ্চিৎ। যচ্চিত্ততোদঃ কৃপয়ানিদং বিদাং দুরন্ত দুঃখ প্রভবানু-দর্শনাৎ ॥

'সংস্কার' ও 'কর্ম্ম'—ভূরাদি লোকত্রয়ের অধিবাসিগণ যে ভোগ সুখ কামনা করেন, সেই কামনাকে 'ভোগবাসনা' বলে। ভোগবাসনা হইতে বিবিধ প্রবৃত্তি জন্মায়, তাহাদিগকে সংস্কার বলে। সংস্কার সকলের অপর নাম 'কর্ম্ম'। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে tendency বা propensity বলে 'কর্ম্ম' সকলে প্রায় তদনুরূপ সংস্কার-সকলের প্রেরণা আছে, এবং তাহাদের আকর্ষণী শক্তি যেন কোন দুশ্ছেদ্য রজ্জুর দুর্ভেদ্য বন্ধন দ্বারা ভোগ লোকত্রয়ের অধিবাসিগণকে ভোগ সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই লোকত্রয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

সংসার ও সংসার বন্ধন

উচ্চলোকে কিরূপ সুখ পাওয়া যায়, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, কারণ সেই সুখ কেবল ব্রহ্মদর্শন হইতেই লভ্য, এবং সেই সুখের জন্যই আমরা অনেকেই সাধনা করি না। ভোগসুখ লাভ করাই আমরা নিজ নিজ জীবনের পরম পুরুষার্থ মনে করি, অতএব মতি ভোগ-বাসনায় ব্যাপৃত থাকে, এবং আমাদের মনে উচ্চলোকে গমন করার বাসনাও হয় না। পূর্ব্ব সঞ্চিত বিবিধ কর্ম্ম অর্থাৎ বাসনা যখন প্রবল হয় তখন 'প্রারব্ধ' অর্থাৎ সেই প্রবল সংস্কার সমষ্টির বশে জীবগণ কখন ভূর্লোকে, কখন বা ভূবঃ এবং কখন স্বঃ লোকে ভিন্ন ভিন্ন যোনীতে জন্মগ্রহণ করেন। যত কাল 'কর্ম্ম' সকল সম্পুর্ণ বিনষ্ট না হয়, জীবগণ ততকাল এই তিন লোকেই আবদ্ধ থাকেন। এই জন্য এই লোক-ত্রয়কে 'সংসার' বলে (সং=সম্যক অর্থাৎ 'মসগুল' ভাবে অর্থাৎ চির-দিনের জন্য+সৃ=গমন করা অর্থাৎ থাকা) যে আকর্ষণী-শক্তির প্রভাবে জীবগণ ভোগলোক হইতে উচ্চলোকে গমন করিতে পারে না, সেই আকর্ষণী শক্তিকে 'সংসার-বন্ধন' বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—(দ্বিতীয় অংশ)

জীব এবং জীবের ক্রমোন্নতি (Evolution)

মানবদেহের নশ্বর ও অনশ্বর অংশ।

আমরা যখন কাহাকেও 'রাম' এই নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করি, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিটির স্থূল দেহকেই আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। ঐ লোকটি 'মরিয়া' যাওয়ার পরে তাহার স্থূল দেহ ক্রমে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। অতএব দেখিলাম যে মানবের স্থূল দেহ নশ্বর।

রাম যখন 'মরিয়া' যায় নাই, তখন তাহার হস্তপদাদি স্থূল ইন্দ্রিয় সকল কার্য্যক্ষম ছিল; কিন্তু 'মরণের' পরে আর ঐ কার্য্যক্ষমতা থাকে না। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যক্ষমতা থাকে, সেই অবস্থাকে আমরা 'জীবন' নাম দিয়া থাকি; এবং ঐ ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিলোপের অবস্থাকে আমরা 'মরণ' বলি। [কথাগুলি মোটামুটি ভাবে বলা হইল]

(ক) নশ্বর ধর্ম্মাবলম্বী বস্তু—রামের স্থূল দেহ নশ্বর। দেহে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের যে সূক্ষ্ম শক্তি আছে তাহা 'জীবন' সঞ্চারের, অর্থাৎ বাসুদেব দেহে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গেই সঙ্গে, প্রকাশ পায় এবং বাসুদেব অর্থাৎ 'জীবন' যখন দেহকে পরিত্যাগ করেন তখন ঐ শক্তিও দেহকে পরিত্যাগ করে। যখন স্থূল দেহ বিনষ্ট হওয়ার ব্যবস্থা হয়, তখন দেহের ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্ম শক্তিরও অপগম হয়। অতএব দেহের স্থূল অংশ এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তি এই সকল বস্তুই নশ্বর ধর্ম্মাবলম্বী।

(খ) নশ্বর নয় কিন্তু অনশ্বরও নয় এরূপ অংশ—আমাদের জীবদ্দশায় দেহে অপর একটী বস্তু থাকে যাহা নশ্বর নয় কিন্তু অনশ্বরও নয়। এই বস্তুটীর নাম 'লিঙ্গ-শরীর'। ভাগবত বলেন যে এই বস্তুটী 'অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণ বৃংহিতম্ অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ' (ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৩ অধ্যায় ৩২ শ্লোক) অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীর 'অতঃ'

=স্থূল দেহ হইতে 'পরং' = পৃথক্; অর্থাৎ মন,বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সমষ্টিযুক্ত ও করচরণাদি স্থূল ইন্দ্রিয় সমন্বিত যে দেহকে আমরা 'আমি' 'আমার শরীর' ইত্যাদি বলি, লিঙ্গদেহ ঐ শরীর হইতে পৃথক্ বস্তু।

কেহ কি লিঙ্গদেহ দেখিয়াছেন ? উত্তরে ভাগবত বলেন যে, না কেহ দেখেন নাই ; কারণ লিঙ্গদেহ 'অব্যক্ত' অর্থাৎ চক্ষু অথবা অপর কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই লিঙ্গদেহকে অনুভব করা যায় না। কেন ? কারণ এই যে, 'অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ'—লিঙ্গদেহ 'অদৃষ্ট' এবং 'অশ্রুত' বস্তুর ভাবযুক্ত (ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় হয়) সেই জন্য ইহা অব্যক্ত। লিঙ্গদেহ যাহাদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছে সেই উপকরণ-সকলকে কেহ কখন দেখেন নাই, অথবা তাহাদের বিবরণও কেহ শ্রবণ করেন নাই ; অতএব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই দেহকে অনুভব কিম্বা কল্পনা করা যায় না।

লিঙ্গদেহ 'গুণবৃংহিতং' ; বৃংহিতং পদে বৃণ্ হ্ ধাতুর অর্থ 'সমৃদ্ধি-যুক্ত'। কিরূপ সমৃদ্ধি? সত্ত্বগুণের যে প্রকাশশক্তি, রজোগুণের যে ক্রিয়াশক্তি ও বাসনা উৎপাদিকা শক্তি এবং তমোগুণের যে আবরক-শক্তি আছে ঐ বিবিধ শক্তিযুক্ত-সংস্কার সকলই গুণত্রয়ের সমৃদ্ধি-স্থানীয়। অতএব 'গুণবৃংহিতম্' পদের ভাবার্থ এই যে, গুণত্রয়-সৃষ্ট বহুবিধ সংস্কার লিঙ্গদেহে অবস্থান করে। স্বামীপাদ বলেন যে, বৃংহিত পদের অর্থ রচিত। অতএব 'গুণবৃংহিতং' পদের ভাবার্থ এই যে, গুণত্রয়সৃষ্ট বিবিধ সংস্কার সমষ্টি দ্বারা লিঙ্গদেহ রচিত হইয়াছে ; এবং সেই সংস্কার সকলের মধ্যে গুণের স্ব স্ব ধর্ম্মও বর্ত্তমান আছে।

ঐ সংস্কার সকলের মধ্যে রাজসিক ভোগবাসনার সংস্কারই সংখ্যায় বেশী ; এবং তাহারা শক্তিতেও প্রবল ; তাই কখন কখন লিঙ্গদেহকে 'বাসনাময় দেহ' এই আখ্যা প্রদান করা হয়। লিঙ্গদেহস্থ কোন কোন সংস্কারে সত্ত্বগুণের প্রকাশশক্তিও থাকে। সেই সংস্কার সকলকে শুভ 'কর্ম্ম' বলা হয় ; এবং কতকগুলি সংস্কারে রজোগুণের ক্রিয়াশক্তি এবং

৩

কত্তকে তমোগুণের আবরক বা মোহিকা শক্তিও আছে। রাজসিক ও তামসিক সংস্কারকে 'অশুভ কর্ম্ম' বলে। মোট কথা এই যে, 'কর্ম্ম' অর্থাৎ সংস্কার নামক উপকরণ দ্বারা লিঙ্গদেহ গঠিত হইয়াছে।

দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সুখের উপভোগ হয়। সেই সুখের বাসনা যখন সংস্কারভাবে পরিণত হয়, তখন সেই সংস্কারে অমুক অমুক যোনীর দেহের অমুক অমুক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লভ্য ভোগ-সুখ চাই, এই প্রকার কামনা থাকে। [ভিন্ন ভিন্ন যোনীর দেহ দ্বারা ভোগ্য সুখের বাসনা সংস্কারের মধ্যে থাকাতে ঐ সংস্কার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জন্ম এবং যোনী-নির্দ্ধারণ হয়। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে] 'লিঙ্গ' পদের অর্থ চিহ্ন; অতএব লিঙ্গ পদের সহিত দেহ পদের যোগ দ্বারা সূচিত হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন যোনীর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ দ্বারা উপভোগ্য সুখের বাসনা লিঙ্গদেহে নিহিত থাকে। 'লিঙ্গদেহ' এই নামটী দ্বারা প্রাক্তন-সংস্কার-সমষ্টি বুঝায়।

লিঙ্গদেহ যদিও 'গুণবৃংহিতং' তা'হলেও সেই গুণসকল 'অব্যূঢ়' অবস্থায় থাকে। 'ব্যূঢ়' পদটী বহ ধাতু হইতে উৎপন্ন; এই ধাতুর অর্থ বিস্তৃত হওয়া, অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হওয়া। আমাদের স্থূল দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল গুণত্রয় (অর্থাৎ ত্রিগুণযুক্ত অহঙ্কার তত্ত্ব) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোন গুণ যতদিন পুষ্টিলাভ না করে, ততদিন তাহা হইতে করচরণাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইতে পারে না। কোন গুণের অপক্ক অর্থাৎ immature অবস্থাকে অব্যূঢ় অবস্থা বলে। গুণত্রয় যখন পুষ্টি-লাভ করিয়া করচরণাদি নির্ম্মাণে সমর্থ হয়, সেই অবস্থাকে 'ব্যূঢ়' অবস্থা বলে। অব্যূঢ় অবস্থাতেও গুণত্রয়ের যাহা স্বধর্ম্ম তাহা সবই বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ যে প্রকাশ-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং আবরক-শক্তি গুণের ধর্ম্ম, সেই শক্তিসকল অব্যূঢ় অবস্থায়ও থাকে। এই শক্তির প্রভাবে অব্যূঢ় গুণসকলের মধ্যেও বিষয়-ভোগসুখের অনুভব-সামর্থ্য, ভোগবাসনা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চবায়ুর কার্য্য এবং মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য থাকে।

অতএব ভাগবতের টীকায় 'অব্যূঢ় গুণবৃংহিতং' পদটীর ভাবার্থ প্রকাশ উপলক্ষে আচার্য্যগণ বলেন যে, গুণত্রয় 'অব্যূঢ়' ভাবে থাকাতে লিঙ্গ-দেহে করচরণাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রকাশিত হয় নাই বটে; কিন্তু ঐ দেহে ভোগসুখ অনুভব করার শক্তি আছে, এবং ভোগ-বাসনাও আছে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব দ্বারা লিঙ্গদেহ রচিত হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল যে, কর্ম্ম অর্থাৎ সংস্কার সকল লিঙ্গদেহে অবস্থান করে। এই সকল সংস্কার অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব যত কাল অবিদ্যার বিনাশ না হয় তত কাল সংস্কার সকলও বিনষ্ট হয় না। জীব ততকালই 'কর্ম্মক্ষয়ের' জন্য, অর্থাৎ সংস্কারের প্রেরণায়, সংসারে নানাযোনীতে ভ্রমণ করিতে থাকে, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে কর্ম্ম সকল আপনিই বিনষ্ট হয়। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'। কর্ম্মনাশের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গদেহও অপগত হয়, কারণ কেবল কর্ম্মের সমষ্টিকেই লিঙ্গদেহ বলে।

অতএব 'কর্ম্ম' অর্থাৎ সংস্কার সকলের বিনাশের পরে এই দেহের কোন অংশই আর অবশিষ্ট থাকে না। [যদি বল যে, জ্ঞান দ্বারা কেন কর্ম্মের বিনাশ হয় ? ঐ প্রশ্নের উত্তর এই যে,কর্ম্ম অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাসনাময় ও আবরক শক্তিযুক্ত কর্ম্ম সকল অবিদ্যা-সৃষ্ট দেহাত্মভাবের উপরই স্থাপিত হইয়া আছে। অতএব মূলভিত্তি ভগ্ন হইলে তাহার উপরি স্থাপিত অট্টালিকা যেমন পড়িয়া যায়, কর্ম্মের মূলভিত্তি অবিদ্যার অবশেষে কর্ম্মরাশিও তেমনি বিনষ্ট হয়]।

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে,(১) যেহেতু জীবের স্থূল দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গদেহ বিনষ্ট হয় না, অতএব লিঙ্গদেহ নশ্বর নয় (২) যেহেতু অবিদ্যার অপগমের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গদেহও অপগত হয়, অতএব লিঙ্গদেহ অনশ্বরও নয় [সপ্তম অধ্যায়ে সংস্কারের উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য]।

(গ) মানব-দেহের অনশ্বর অংশ—যাহা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ

অর্থাৎ যাহা যথার্থতঃ 'জীব'-পদবাচ্য এবং যে বাসুদেব জীবের সহিত 'জীবন' রূপে বর্ত্তমান আছেন, সেই 'জীব' ও 'জীবন' উভয়েই অনশ্বর; অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অনশ্বর।

এই ভাবটীকে অপর কথায় প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, 'আমি' এবং আমার প্রাণসখা শ্রীহরি, উভয়েই অনশ্বর। আমরা উভয়ে অভেদভাবে সম্বন্ধ—তিনিই আমি এবং আমিই তিনি। [যখন এই জ্ঞান হয়, তখন এই সংসারই উচ্চলোক সদৃশ হয়, এবং তখন বিশুদ্ধ জ্ঞান আপন পূর্ণ প্রভা লাভ করাতে এই সংসারই উচ্চলোকে পরিণত হয়]

জীব ও ব্রহ্ম।

'জীব' কাহাকে বলে?—ইংরেজী অভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট Soul কথাটির দ্বারা যে অনশ্বর বস্তু বুঝায়, 'জীব' তাহাই বটে; অধিকন্তু জীব কথাটির মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস আছে, 'অপরেয়া মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং, জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'। অর্থাৎ যে পরা প্রকৃতি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীরূপা হইয়া অনন্ত বিভূতির প্রকটন করিতেছেন, তিনি স্বয়ংই 'জীব' হইয়া তোমার ও আমার দেহে অধিষ্ঠিত আছেন।

মনে যেন থাকে যে উপরে উদ্ধৃত গীতার শ্লোক বলিতেছেন না যে পরা প্রকৃতির অংশ জীব হইয়াছেন। ঐ শ্লোক বলেন যে, তিনি স্বয়ং (অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণ প্রেম এবং পূর্ণ ঐশ্বর্য্য সহ) জীব নামে আমাদের দেহে আছেন। যদি বল যে, প্রকৃতি ত একটী মাত্র বস্তু, কিন্তু জীবের সংখ্যা কোটি কোটি; অতএব একটী বস্তুর পক্ষে কিরূপে পূর্ণ ঐশ্বর্য্য সহ কোটি কোটি জীব-দেহে অবস্থান করা সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে বলি যে, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, তাঁহার পক্ষে কোটি কোটি ভাব প্রকটন করা কি কঠিন ব্যাপার?

ভগবানের শক্তি অপেক্ষা প্রকৃতির শক্তি অল্প নয়; এবং উভয়ই এক। সুতরাং অসাধ্য-সাধন যদি ভগবানের পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহা

হইলে প্রকৃতির পক্ষেও তাহা সম্ভব। জীবের সহিত স্বয়ং ব্রহ্ম বাসুদেব নামে নিয়ত আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, সুতরাং আমাদের উৎকর্ষ যে কত মহান্,তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

জীবের, ইন্দ্রিয়, এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্য

জীবের স্থূল দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। অহঙ্কার-তত্ত্ব 'অপরা' প্রকৃতিরই রূপান্তর। অপরার গুণত্রয় এবং তাহা হইতে জাত 'সংস্কার' সকল, কালশক্তির (অর্থাৎ স্বরূপ-শক্তির) শক্তিবলে শক্তিমান হইয়া, মন এবং বুদ্ধি নামক চিত্তবৃত্তি-দ্বয় দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করেন।

চিত্ত, চিত্তবৃত্তি এবং ভোগকার্য্য

'চিত্ত' পদে ব্রহ্ম বুঝায়। 'চিৎ' পদে ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিয়া 'চিত্ত' পদ হইয়াছে। যাহা 'চিৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মের ভাব (=রূপান্তর) তাহাই 'চিত্ত'। 'জীব' (অর্থাৎ পরা প্রকৃতি) 'চিৎ'এর অর্থাৎ ব্রহ্মেরই অবস্থান্তর, অতএব চিত্ত পদ দ্বারা 'জীব' বুঝায়। জীবের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যকরী ইন্দ্রিয়গণকে 'চিত্তবৃত্তি' বলে। ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তাহারা অপরা প্রকৃতির রূপান্তর, এবং ভোগের সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। অতএব যখন 'মাত্রাস্পর্ষাঃ' হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শ হয়, তখন তত্ত্বতঃ ইন্দ্রিয়ের মূলীভূতা প্রকৃতির সহিত ভোগ্যবস্তুতে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের মিলন হয়। অতএব পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলনই ভোগ কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব।

তমোগুণের আবরক-শক্তি দ্বারা আমাদের জ্ঞান নিরুদ্ধ হওয়াতে দেহের উপর 'অহং' ভাব জন্মায়; তাই এই মোহ বশতঃ আমরা 'আত্মস্বরূপ', অর্থাৎ জীবের প্রকৃত স্বরূপ,যে দেহাতিরিক্ত এই তত্ত্বটী অনুভব করিতে পারি না। (ক) আমরা নিজে (অর্থাৎ জীব স্বয়ং) যে

পরা প্রকৃতি এবং (খ) ভোগ্য বস্তুতে যে ব্রহ্ম স্বয়ং অধিষ্ঠিত আছেন, (গ) তাঁহারই শক্তি যে ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করিতেছে, (ঘ) ভোগানন্দ যে আনন্দময়ের আনন্দ স্বরূপ, এই সকল তত্ত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। এই সকল বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

সৃষ্টিতে বিরাট ক্রমোন্নতি, অর্থাৎ Evolution শক্তির ক্রিয়া।

সপ্তলোকের অধিবাসিগণের মনোবৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এক বিরাট ক্রমোন্নতি-শক্তির ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। মহঃ প্রভৃতি উচ্চ লোক চতুষ্টয়ে অধিবাসিগণের বৃত্তি সকল অন্তরঙ্গা (অর্থাৎ পরা প্রকৃতি) দ্বারা সৃষ্ট হওয়াতে সেই শক্তি আপন প্রেরণা দ্বারা তাঁহাদিগের চিত্তকে ব্রহ্মের দিকে লইতে চান। অন্তরঙ্গা পদটীর ব্যুৎপত্তি এই—অন্তঃ = ভিতরে অর্থাৎ অন্তরে অধিষ্ঠিত 'পুরুষের' দিকে + অন্‌গ্‌ = গমন করা। যে শক্তি মতিকে অন্তঃ অর্থাৎ আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের দিকে লইয়া যান, তাঁহাকে অন্তরঙ্গা এবং যাহা মতিকে বহিঃ = বাহিরে, ব্রহ্ম হইতে দূরে অর্থাৎ ভোগের দিকে লইয়া যায় সেই শক্তির নাম বহিরঙ্গা। অতএব উচ্চলোক চতুষ্টয়ের অধিবাসিগণ অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষ লাভের বাসনা করেন; এবং সেই জন্য সাধনাও করেন। এবং ভোগলোক-বাসিগণ ভোগসুখ লাভের বাসনা এবং সেইজন্যই কার্য্য করেন।

উচ্চ লোকচতুষ্টয়ের কুত্রাপি কামলোভাদির মালিন্য নাই, সর্ব্বত্র ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই আছে। কেহ হয় ত বলিলেন যে, যদি চারি উচ্চলোকেই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই আছে তাহলে এক 'লোক' (region) সৃষ্টি করিলেই ত চলিত, চারি লোক কেন সৃষ্ট হইয়াছে; আর সাধনারই বা প্রয়োজন কি ?

এই প্রশ্নটীর উত্তর এই যে, দুই খণ্ড বিশুদ্ধ সুবর্ণের মধ্যে এক

খণ্ড যদি মার্জ্জিত এবং অপর খণ্ড যদি অমার্জ্জিত থাকে, তাহলে উভয় খণ্ড একই ভাবে বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য দেখা যায়।

উপরিস্থিত ভিন্ন ভিন্ন লোকে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের তারতম্য আছে বলিয়া, সেই তারতম্য অনুসারে চারি-লোকবিভাগ হইয়াছে। সাধনা দ্বারা উৎকর্ষ-বৃদ্ধি হয়, আনন্দও বাড়িতে থাকে; এই জন্য ঐ লোক-চতুষ্টয়ের অধিবাসিগণ সাধনা করেন। শুকদেব 'হরেগুর্ণাক্ষিপ্ত-মতিঃ' হইয়াছিলেন। শ্রীহরির গুণের এমনই মহিমা যে তাহা মতিকে তাঁহার দিকে টানিতে থাকে; এবং যত কাছে যাওয়া যায়, ততই আরও কাছে যাইতে ইচ্ছা করে; এবং এই গতির আর অন্ত হয় না। তাইতে উচ্চলোক চতুষ্টয় অতিক্রম করার পরে উচ্চতম বৈকুণ্ঠে উন্নীত হইয়াও সাধনার অন্ত হয় না। শ্রীহরির গুণের অন্ত নাই, সুতরাং সাধনা দ্বারা কেহ তাঁহার উৎকর্ষের অন্ত লাভ করেন না। বৈকুণ্ঠে গিয়াও সাধকগণ নব নব উৎকর্ষ এবং নব নব আনন্দের আস্বাদ পান।

'অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ,
থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে, ফুরাইয়ে যেতে,
তোমারে জানিতে কে চাহিত আর॥

এই উৎকর্ষের ক্রমিক আধিক্য অনুসারে উপরিস্থ লোক সকল চারি নামে বিভক্ত হইয়াছে; এবং সাধনা দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তির যেমন উন্নতি হয়, তিনি আপন উৎকর্ষের অনুযায়ী লোকে উন্নীত হন। এই চারি লোকের উৎকর্ষকে অতিক্রম করিয়া উপরে যে বৈকুণ্ঠ আছেন, তথায় ভক্তগণের উৎকর্ষ স্বয়ং শ্রীহরির অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎকর্ষের তুল্য।

পরিণামে উন্নতির জন্য মানবাদির পতন— 'বহিরঙ্গা' পদটীর ব্যুৎপত্তি উপরে দেওয়া হইয়াছে। বহিরঙ্গা শক্তির, অর্থাৎ অবিদ্যার, প্রভাবে সংসারী জীবের মতি ভগবানের স্বরূপভূত সুখ না চাহিয়া বিষয় ভোগের সুখই চায়; এবং সেই সুখের দিকেই

ছোটে ; তাইতে তাহারা ক্রমশঃ ব্রহ্ম হইতে দূরেই বিক্ষিপ্ত হয়। প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হয় যে, সাধনা দ্বারা উচ্চলোকের অধিবাসিগণের পক্ষে যেমন ক্রমিক উন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে, বহিরঙ্গার মোহিকা শক্তির প্রভাবে সংসারের অধিবাসিগণের জন্য ব্যবস্থা তাহার বিপরীত, —অর্থাৎ তাহাদের ক্রমিক অবনতিরই ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মত যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা বলিতে পারা যায় না—কিন্তু তথাপিও এই মত ভ্রান্ত।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, There is a soul of goodness in things Evil ; সংসারে সেই কথাটীর যাথার্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারে যে ব্যবস্থা আছে, তাহার বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্ব এই যে, 'গড় গড়িয়ে' অধোগমনের সময় জীবের চিত্তবৃত্তিতে নানাবিধ অসুখ এবং অশান্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। যে সুখ-লাভের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা কাতর হওয়াতে জীবের অধোগতি হয়, পতনের অধস্তম স্তরে নামিয়াও জীব কুত্রাপি সেই কাম্য সুখ পান না,—বরঞ্চ দেখিতে পান যে, তাঁহার অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে বাঞ্ছিত সুখও ক্রমশঃ দূরে পিছাইয়া যায়, কখনই তাহা আয়ত্তাধীন হয় না। সুখ লাভ করা দূরে থাকুক অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে আশা আকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্যের তাড়নায় কেবল জীবের দুঃখই বাড়িতে থাকে।

এই ভাবে দুঃখ পাইতে পাইতে, কোন কোন জীবের পক্ষে এমন একটি অবস্থা আসে, যে সময়ে বহিরঙ্গার দোকানে (Stall এ) লভ্য বিষয়-সুখ আর তাঁহার কাছে পূর্ব্ববৎ ভাল লাগে না। মন তৎপূর্ব্বে কখন কদাচিৎ অন্তরঙ্গার দোকানে যে বিশুদ্ধ সুখের আস্বাদ পাইয়াছিল, সেই সুখের মধুর স্মৃতি তখন জীবের বুদ্ধিতে উদিত হয় ; এবং জীবের আধুনিক যন্ত্রণার সহিত উপমায় সেই সুখ অধিকতর মধুর বলিয়াই বোধ হয়। তখন সেই শ্রেষ্ঠ সুখলাভের জন্যই আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। বাইবেলে Parable of Prodigal son নামক আখ্যানে, মানবের চিত্তবৃত্তিতে এইরূপ পরিবর্ত্তন হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভক্তির রূপান্তর

যখন এই ভাবে রুচির পরিবর্ত্তন হয়, চিত্তবৃত্তির সেই অবস্থার নাম সাধনার অবস্থা। সেই সময়ে মন এবং বুদ্ধির উপরিস্থিত বহিরঙ্গার, অর্থাৎ অবিদ্যার, আবরণের নীচে অলক্ষিত ভাবে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে থাকে। সাধনা করিতে করিতে মানবের চিত্তে বিশুদ্ধ সুখের প্রতি রুচি জন্মিয়া সেই সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাসনাও ক্ষীণ হইতে থাকে। শ্রীভগবানই বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপ, অতএব যখন কাহারও মনে বিশুদ্ধ সুখের প্রতি রুচির উদয় হয়, তখন ভগবানের প্রতি ভক্তি-সঞ্চার হওয়ারই পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ বিশুদ্ধ সুখই ভগবানের অংশ এবং তাহাতে রুচি বস্তুতঃ ভগবানের প্রতিই রুচি।

বিশুদ্ধ সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সাধকের চিত্ত-বৃত্তিতে ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্যও প্রবল হইতে থাকে, এবং অবশেষে বহিরঙ্গার আবরণ ভেদ করিয়া, অর্থাৎ ভোগবাসনা প্রভৃতিকে পরাভূত করিয়া, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভক্তি জীবের চিত্ত-বৃত্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করে।

অবনতি উন্নতির সোপান

এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরেও সাধনা করিতে করিতে যাঁহারা ব্রহ্মদর্শন লাভ করেন, সেই সিদ্ধ পুরুষগণ সংসার অতিক্রম করিয়া উচ্চলোকে গমন করেন। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ অবিদ্যার উপশম, ব্যতীত চরমে উচ্চলোকে গমন করিবার যোগ্যতা লব্ধ হয় না। সংসারে জন্মমৃত্যু-প্রবাহে পতিত অবস্থায় নানা যোনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে জীব আপন চিত্তকে বিশুদ্ধ করার সুযোগ পায়। ইহাই হইল Doctrine of perfection through suffering নামক তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। অতএব মোট কথা এই যে, সংসারে জীবের অবনতিও যাহাতে উন্নতির সোপানে পরিণত হয়, শ্রীভগবান্ সেজন্যও সুচারু ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায় (প্রথম অংশ)

প্রকৃতির বিরাট ভাব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ের কতকটা আলোচনা করা হইয়াছে। সৎ, চিৎ, ও আনন্দ-সংজ্ঞক শক্তিত্রয় যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহাদের সমষ্টিকে 'ব্রহ্ম' এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নিরুপাধিক। এই সংজ্ঞা-ত্রয়ের ক্রিয়াশীল অবস্থাকে 'স্বরূপ-শক্তি' বলা যায়। এবং ব্রহ্মের যে অবস্থা ক্রিয়াশীল শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় বিশ্বের 'রূপ', অর্থাৎ মূর্ত্তি, প্রকটন করিয়াছেন, সেই অবস্থার নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি এবং ব্রহ্ম পৃথক নহেন ; সেইজন্য বিশ্বকে ভগবানের 'স্থূলরূপ' বলে। যাঁহার নিরুপাধিক অবস্থার নাম হইয়াছে 'ব্রহ্ম' তাঁহারই ঐশ্বর্য্যময় অবস্থার নাম হইয়াছে 'ভগবান'

অতএব দেখা গেল যে, একই ব্রহ্মের অবস্থাভেদে চারিটি নাম ব্যবহার করা হয়—তাঁহার নির্গুণ এবং নাম-রূপ-বর্জ্জিত অবস্থার নাম 'ব্রহ্ম', ঐশ্বর্য্যময় অবস্থার নাম 'ভগবান', ও ক্রিয়াশীল অবস্থার নাম 'স্বরূপ-শক্তি', এবং সৃষ্টিতে যে অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখা যায়, সেই ঐশ্বর্য্যের আধারভূত অবস্থার নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি বা স্বরূপ-শক্তি, ব্রহ্ম অথবা ভগবান হইতে পৃথক নন, তাঁহারা চারই এক,এবং একই চার। প্রকৃতি ও স্বরূপশক্তি উভয়েই বিরাট ও অনন্ত।

গুণত্রয়ের প্রকৃত অবস্থা।

কোনও বস্তুর স্বরূপ প্রকাশক লক্ষণকে তাহার 'গুণ' বলে। 'সত্ত্ব' গুণ বলিলে ব্রহ্মের ভাবজ্ঞাপক লক্ষণ বুঝায় ; সৎ = ব্রহ্ম + ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয়—যে বস্তু ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন তাহাই 'সত্ত্ব' পদবাচ্য। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপে, অর্থাৎ প্রকৃতিতে বা স্বরূপশক্তিতে, যে অনন্ত শক্তি, অসীম উৎকর্ষ এবং অপার ঐশ্বর্য্য বিরাজমান থাকিতে দেখা

যায় তাহা সকলই সত্ত্বগুণে নিহিত আছে। সুতরাং সত্ত্বগুণের প্রভাবে জীব ব্রহ্মের তুল্য বিভূতি সম্পন্ন হয়।

মিশ্র-সত্ত্ব।

উপরে যে অবস্থা বর্ণিত হইল তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা। 'বিশুদ্ধ' পদ দ্বারা দুঃখের এবং কামলোভাদির লেশ রহিত অবস্থা বুঝায়। যাহা চিন্ময় এবং আনন্দময় ব্রহ্ম-স্বরূপের অঙ্গ, তাহাই 'বিশুদ্ধ'। 'অপরা' প্রকৃতিতে যে সত্ত্বগুণ আছেন তাঁহাকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপ অর্থাৎ চিৎ ও আনন্দ যখন আবরক বিক্ষেপ দ্বারা রূপান্তরিত হন, তখন 'পরা' প্রকৃতি 'অপরা' এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। অতএব অপরা প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান কিম্বা আনন্দ নাই—আবরক শক্তি দ্বারা সেই বিশুদ্ধির হ্রাস হইয়াছে। 'সত্ত্বঞ্চ মিশ্রঞ্চ', অপরা প্রকৃতি উপলক্ষে ব্যবহৃত ভাগবতের এই পদদ্বয় হইতে দেখা যায় যে, অপরা প্রকৃতিতে যে সত্ত্বগুণ আছে তাহা মিশ্রসত্ত্ব। কিন্তু এই আবরণযুক্ত অবস্থায়ও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রকাশশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং উৎকর্ষ সমধিক পরিমাণে মিশ্রসত্ত্বের মধ্যে নিহিত থাকে। আবরক শক্তি দ্বারা জীবের জ্ঞান আচ্ছন্ন এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা বুদ্ধি ভগবান হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, জীবের চিত্তে 'অহঙ্কার' অর্থাৎ 'দেহাত্মভাব' জন্মায়। এই ভ্রম উৎপাদনকে অবিদ্যার কার্য্য বলে।

রজোগুণ।

রজঃ পদ দ্বারা ধূলি অর্থাৎ মালিন্য বুঝায়। কোনও উজ্জ্বল বস্তুর উপরে ধূলি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার প্রভা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং কোনও সুন্দর বস্তুতে ধূলি লাগিলে তাহারও সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয়। যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত অধিক পরিমাণে তামসিক আবরক বিক্ষেপ-শক্তির সংযোগ হইয়া তাহার 'প্রভা', অর্থাৎ প্রকাশ-শক্তির, এবং

'সৌন্দর্য্যের', অর্থাৎ উৎকর্ষের হ্রাস হয়, তখন সত্ত্বগুণের যে অবস্থান্তর হয় তাহার নাম রজোগুণ।

অধিক পরিমাণে আবরক শক্তির সংযোগ না হওয়াতে মিশ্রসত্ত্বেও জ্ঞান সমধিক পরিমাণে খর্ব্ব হয় না। কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত্ব যখন রজোগুণে পরিণত হয়, তখন তাহার সহিত অধিক পরিমাণে আবরক.বিক্ষেপ-শক্তির সংযোগ হওয়াতে রজোগুণে মিশ্রসত্ত্ব অপেক্ষা অল্প মাত্রায় জ্ঞান থাকে এবং ক্রিয়াশক্তির ও উৎকর্ষের হ্রাসও দেখা যায়; বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য দ্বারা প্রকাশ ও ক্রিয়া শক্তি উভয়ই লক্ষ্যচ্যুত হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন লোকের মতি শ্রীভগবানকে ছাড়িয়া দেহকেই অহং ভাবিয়া যে তথায় অবস্থান করে, এই অবস্থা আবরক-শক্তি দ্বারা জ্ঞানের আচ্ছাদন এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা মতি লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার ফল। অর্থাৎ দেহাত্মভাব হইল কেবল আবরকও বিক্ষেপ শক্তির যুগপৎ কার্য্যের ফল। বিক্ষেপ বশতঃ রাজসিক প্রকৃতির জীবগণের বাসনা শ্রীভগবানকে ছাড়িয়া বিষয়াদির দিকে ছোটে, এবং ঐ সকল বস্তুলাভের জন্য তাহাদের ক্রিয়াশক্তিও ব্যবহৃত হয়। এইজন্য রজোগুণ দ্বারা ভোগবাসনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তমোগুণ।

তমোগুণ—তমঃ পদের অর্থ অন্ধকার। এই পদ ইঙ্গিত করে যে, তমোগুণ দ্বারা সত্ত্বগুণের প্রকাশ-শক্তি এবং উৎকর্ষের প্রভা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রিয়া-শক্তিও নিরুদ্ধ হয়।

তিন গুণ একেরই রূপান্তর।

গুণত্রয়ের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে, বিশ্বে কেবল এক মাত্র 'গুণ', অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞাপক লক্ষণ, আছেন—তাঁহার নাম 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব'। তিনিই ব্রহ্ম, 'বিশুদ্ধ-সত্ত্বং তব ধাম শান্তং, তপোময়ং ধ্বস্ত-রজস্তমস্কং'। এই বিশুদ্ধ বস্তুটির সহিত অল্প পরিমানে আবরক-বিক্ষেপ শক্তির যোগ হইয়া ইঁহার যে রূপান্তর হইয়াছে তাহার নাম

মিশ্রসত্ত্ব, এবং অধিক ও অত্যধিক পরিমাণে আবরক-বিক্ষেপের যোগ দ্বারা যে দুই রূপান্তর হইয়াছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে রজো এবং তমোগুণ। লক্ষণভেদে যদিও গুণের এই তিন নামকরণ হইয়াছে, তাহলেও গুণত্রয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই; অর্থাৎ তিন গুণই এক বস্তুর রূপান্তর মাত্র। সেই বস্তুটীই ব্রহ্ম, তিনিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব।

সংসারের corner stone অর্থাৎ মূলভিত্তি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিকার (অর্থাৎ রূপান্তর) দ্বারা সংসার অর্থাৎ ভূরাদি লোকত্রয় সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি যে সকল নিরানন্দ-কর বস্তু দেখা যায়, তাহারা সকলেই একটি মাত্র বস্তুর উপর অবস্থান করে। সেই বস্তুটি যদি দূর করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, কোন প্রাসাদের নিম্নে স্থিত মূলভিত্তির পাথরখানি সরাইলে তাহার উপরিস্থিত বৃহৎ অট্টালিকা যেমন ভূমিসাৎ হয়, ঐ একটী বস্তু দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সকল নিরানন্দও বিনষ্ট হয়; এবং তখন আর সংসারে 'সংসারত্ব', অর্থাৎ চিরকালের জন্য জীবকে এখানে আবদ্ধ রাখার শক্তি, থাকে না; তখন এই যাতনাময় সংসারই আনন্দের আগার হয়। সেই বস্তুটি কি? সেই বস্তুটির নাম 'অহঙ্কার'।

'অহঙ্কার' তত্ত্ব।

পরা-প্রকৃতির সত্ত্বগুণের মধ্যে যে বিশুদ্ধ জ্ঞান (অর্থাৎ 'চিৎ') থাকে তাহা যখন আবরক বিক্ষেপ শক্তি যুক্ত হয়, তখন 'অহঙ্কার' অর্থাৎ আমিত্ব ভাব উৎপন্ন হয়।

(ক) দেহাত্মভাবের উৎপত্তি—কিরূপে 'আমিত্ব' ভাব জন্মায় সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা আবশ্যক। পরা প্রকৃতি 'জীব' নামে সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন; এবং স্বয়ং ব্রহ্ম, 'পুরুষ' অর্থাৎ বাসুদেব নামে, জীবন হইয়া 'জীবের' সান্নিধ্যে নিয়ত থাকেন। 'জীব' এবং 'জীবন' (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম) অভিন্ন ও নিত্য-

সম্বন্ধ। যখন আমাদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞান (অর্থাৎ 'চিৎ'এর বিশুদ্ধ স্বরূপ) প্রবল থাকে, তখনই আমরা উপরোক্ত আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব—অর্থাৎ 'আমি কে', 'ব্রহ্ম কিরূপ', 'ব্রহ্মের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আছে', তাহা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু আবরক শক্তি যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানকে নিবদ্ধ করে, তখন ঐ সকল তত্ত্বের অনুভূতি লাভ করিতে আমরা অক্ষম হই; এবং 'বিক্ষেপ' শক্তির প্রভাবে বুদ্ধি, শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া, দেহের উপর স্থাপিত হওয়াতে আমরা দেহকেই 'অহং', অর্থাৎ দেহই আমার যথার্থ স্বরূপ, ইহা মনে করি। এই ভ্রমাত্মক আত্মস্বরূপ জ্ঞানের নামই 'অহঙ্কার'। অহঙ্কার, হইতেই 'দেহাত্মভাব' এবং কাম লোভ প্রভৃতি জন্মায়।

(খ) 'অস্মিতা'—এই আমিত্ব ভাবের দার্শনিক নাম 'অস্মিতা'; এই অভিমানের, অর্থাৎ দৃঢ় ধারণার, বশে 'আমি স্বতন্ত্র বস্তু, এবং সেই বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন', যে দেহ হইতে বিষয় ভোগের সময় সুখ হয় সেই 'দেহই আমি' অর্থাৎ দেহই আমার যথার্থ স্বরূপ ইত্যাদি ধারণা জন্মায় ও তাহা মন এবং বুদ্ধির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। মানব তখন ভোগসুখের বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয়, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়। কাম লোভাদি যে সকল বস্তু 'রিপু' নামে পরিচিত, তাহারা সকলেই ঐ এক 'আমিত্ব' অর্থাৎ দেহাত্মভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

[এই আমিত্ব জ্ঞান (অর্থাৎ অহঙ্কার) বস্তুতঃ 'লিঙ্গদেহেই' অবস্থান করে; কিন্তু সেই দেহ ত অব্যক্ত, এবং জীব যখন যে স্থূল বা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে, 'লিঙ্গদেহ' সেই দেহের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে থাকে; জীব প্রাক্তন সংস্কারের প্রভাবে সেই স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের উপরই 'আমিত্ব' ভাব স্থাপন করে; এবং মৃত্যুর পরে লিঙ্গদেহের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমিত্ব' ভাবও জীবকে অনুসরণ করে।]

ভোগকালে 'জ্ঞানীর' মন ও বুদ্ধির অবস্থা

মহঃ প্রভৃতি উচ্চলোকবাসিগণ যখন বিবিধ সুখের উপকরণ ভোগ করেন, তখন ঐ কার্য্যের কোন অংশেই তাঁহারা ঐ অহঙ্কার অর্থাৎ

দেহাশ্রিত 'আমি' নামক পদার্থটিকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সকল বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভা দ্বারা উদ্ভাসিত থাকাতে তাঁহারা তখন অনুভব করেন যে—

(১) ব্রহ্মের পরাশক্তি, অর্থাৎ পরা-প্রকৃতি, 'জীব' নামে তাঁহাদিগের দেহে অবস্থান কারভেছেন।

(২) তাঁহারা আপন আপন দেহের ইন্দ্রিয় নিচয়ে সেই পরাশক্তির বিকার দর্শন করেন, অর্থাৎ পরাশক্তিই 'অপরা' নামে রূপান্তরিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদির আকার ধারণ করিয়াছেন, ইহাই অনুভব করেন।

(৩) এবং ভোগ কার্য্যের সময়ও তাঁহারা অনুভব করেন যে,ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করিতেছেন।

(৪) এবং তাঁহারা আরও অনুভব করেন যে, পরাশক্তিই রূপান্তরিত হইয়া ভোগের বস্তু সকলের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; এবং তাঁহারা ভোগ্য-বস্তু সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত 'পুরুষ' নামধেয় ব্রহ্মকেই দেখিতে পান।

(৫) ভোগের সময় যে সুখ অর্থাৎ আনন্দ হয়, সেই সুখেও তাঁহারা ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ আনন্দই দর্শন করেন।

গীতার একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে এই ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে। শ্লোকটি সুবিদিত হইলেও উদ্ধৃত করা হইল :—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মনাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা ॥"

দণ্ডিগণ আহারের প্রারম্ভে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

সংক্ষেপতঃ, যাঁহাদের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তাঁহারা বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রহ্মের মূর্ত্তিই দর্শন করেন, এবং নিজের ও অপরের কার্য্যে ব্রহ্মের শক্তির ক্রিয়াই দেখেন। ব্রহ্ম হইতে পৃথক, এরূপ কোন বস্তু, অথবা ব্রহ্মের শক্তি হইতে স্বতন্ত্র, এরূপ কোন শক্তিই তাঁহারা সংসারে দেখিতে পান না! তাঁহারা আপনাদিগকে পরা প্রকৃতিভাবে দেখেন, এবং বাসুদেব তাঁহাদের সান্নিধ্যে জীবনস্বরূপ হইয়া অবস্থিত আছেন ইহা নিয়ত অনুভব করিয়া, তাঁহার সহিত সখ্য,

দাস্য প্রভৃতি ভাবের মিলন দ্বারা প্রীতিলাভ করেন। এই সকল মহাত্মাদিগের জ্ঞান বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে বলিয়া এই প্রতীতি জন্মায়।

ভোগকালে অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির মন ও বুদ্ধির অবস্থা

আবরক শক্তির কার্য্যের প্রভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিরোধ হয়, সুতরাং জ্ঞানীর মনে পরাশক্তির সম্বন্ধে যে প্রতীতি জন্মায়, অবিদ্যাচ্ছন্ন মানবের মনে সেই প্রতীতি জন্মায় না। তাহার বদলে অহঙ্কার অর্থাৎ দেহের উপরে 'আমিত্ব' ভাব জন্মায়। ব্রহ্মই যে বিশ্বমূর্ত্তি ধরিয়া আছেন,আমার দেহ যে তাঁহার স্বরূপভূতা প্রকৃতিরই রূপান্তর (দার্শনিক নাম 'বিকার') এবং স্বয়ং ব্রহ্মই যে আমার দেহে জীবন স্বরূপ হইয়া আছেন, আমার দেহস্থিত 'জীব' (অর্থাৎ যাহা যথার্থ 'আমি' সেই বস্তুটি) যে ব্রহ্মেরই পরা প্রকৃতি মাত্র—মোট কথা, ব্রহ্ম হইতে আমার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, আমার দেহাদি কোন স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় অথবা কোন স্বতন্ত্র কার্য্য নাই, 'আমিও তিনি এবং তিনিই আমি', —আমরা জ্ঞানের অভাব বশতঃ এই নিগূঢ় তত্ত্বটীকে অনুভব করিতে অক্ষম হই। এই অজ্ঞান, অর্থাৎ অবিদ্যার প্রভাবে আমাদের অভিমান (অর্থাৎ দৃঢ় ধারণা) হয় যে, 'আমি' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র বস্তু আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সংস্কারের রূপে এই ধারণা লিঙ্গশরীরে অবস্থান করে; এবং জীব যখন যে স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করে সেই দেহের উপরই আমিত্ব ভাবকে আরোপ করে। অর্থাৎ জীব ভাবে যে, এই দেহই আমি—ইহার নামই দেহাত্মভাব। জীব এই মোহের প্রভাবে আরও ভাবে যে,'আমি' এই দেহের শক্তির দ্বারা বিবিধ কর্ম্ম করিতেছি, [এই ধারণার নাম 'অহংকর্ত্তৃ'-ভাব]।

এই 'অহঙ্কার' অর্থাৎ 'অহং' ভাবের মোহ হইতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ভেদভাব এবং একীভাব

অহঙ্কার হইতে যখন 'আমিত্ব' ভাব জন্মায়, সেই সঙ্গে আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (independent existence) আছে এই প্রতীতিই হয়। এই প্রতীতিকে, অর্থাৎ দৃঢ় ধারণাকে, দর্শনের ভাষায় 'অভিমান' বলা যায়; এবং এই অভিমানের সঙ্গে যে স্বাতন্ত্র্য ভাব, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু এই ধারণা, থাকে—সেই ধারণাকে 'ভেদভাব' বলে। উচ্চ-লোকবাসিগণের চিত্তে এইরূপ ভেদভাব নাই। তাঁহারা নিয়ত অনুভব করেন যে, পরাপ্রকৃতিই 'জীব' নামে তাঁহাদের দেহে অধিষ্ঠিতা আছেন। প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সুতরাং তাঁহারাও আপনা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ভাবেই দেখেন। এই অভিন্ন ভাবের নাম একীভাব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই একীভাবের প্রভাবে ভক্তগণ দাস্য, সখ্যাদি আকারে ব্রহ্মের উপাসনা করেন; এবং তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের মাধুর্য্য-রসাস্বাদ করিতে কোন বিঘ্নই হয় না।

চিত্তবৃত্তির উপর গুণের কার্য্য।

ইন্দ্রিয় বৃত্তির পরিচালন—মানবের মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল কিরূপে গুণত্রয় দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা নিম্নে সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতির রূপান্তর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুণত্রয় বিশুদ্ধ 'সত্ত্ব' গুণের, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির, রূপান্তর। স্বরূপ-শক্তির সহিত প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং ঐ শক্তি নিয়তই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। অতএব প্রকৃতির রূপান্তর ইন্দ্রিয়গণ যে, প্রকৃতির পরিচালক স্বরূপশক্তির প্রেরণা অনুসারে, কার্য্য (respond) করিবে ইহাতে কোন বৈচিত্র্যই নাই। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপশক্তিই গুণত্রয় নামে অভিহিত হইয়া ইন্দ্রিয়-গণকে পরিচালিত করিতেছেন।

৫

ভোগবাসনা তত্ত্ব

আমাদের মন হইতেই সকল কামনার উদয় হয়। জীবের সকল ইন্দ্রিয়ই অপরা প্রকৃতির 'অহঙ্কার তত্ত্ব' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং অপরা প্রকৃতি বিকার অর্থাৎ রূপান্তরিত হইয়া মন-রূপে থাকেন, এবং আমরা যে বস্তুকে বাসনা করি তাহাতে 'পুরুষ' অর্থাৎ বাসুদেব (= ব্রহ্ম) অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃতি প্রেমের বন্ধন দ্বারা পুরুষের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ। এই প্রেম ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপের বিকার,—তাই প্রকৃতিকে আনন্দময়ী বলা হয়, এবং ঐ প্রেমই প্রকৃতিকে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করে।

আমাদের মনে যখন কোন বস্তু লাভের বাসনার উদয় হয়, সেই বাসনাটীর বিশ্লেষণ (analysis) করিলে দেখা যায় যে, প্রেমের প্রেরণা দ্বারা মন-রূপা প্রকৃতি ঐ সময়ে কাম্য বস্তুতে অধিষ্ঠিত বাসুদেবের সহিত মিলিত হইতে চান। প্রেমের প্রভাবেই প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করেন। বাসনা কেবল ঐ আকর্ষণী শক্তির ফল অর্থাৎ রূপান্তর মাত্র।

প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতে উদ্ভূত আকর্ষণী শক্তিই ভোগবাসনার মূল কারণ।

'কৃষ্ণ-তৃপ্তি' ও আত্মতৃপ্তি

কাম্য বস্তুতে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা অনুভব করিয়া জীব যখন তাঁহার সহিত মিলন কামনা করেন, তখন ভোগবাসনা অতি পবিত্র বস্তু হয়। আমাদের আহার বিহার এবং দৈনন্দিন সকল কার্য্যেই এই মিলন-সুখলাভ সম্ভবপর হয়। এইপ্রকার বাসনা দ্বারা 'কৃষ্ণ-তৃপ্তি' হয়—কারণ শ্রীকৃষ্ণ 'আত্মারামঃ, পূর্ণকামঃ, নিজলাভেন নিত্যদা'। এই শ্রেণীর ভোগ-বাসনার নাম প্রেম।

আর যখন কেবল দৈহিক কোন ইন্দ্রিয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষার

তৃপ্তির জন্য কেহ কোন কাম্য বস্তুকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তখন ঐ বাসনার দ্বারা 'আত্ম-তৃপ্তি', অর্থাৎ কেবল দেহাত্মভাবেরই তর্পণ হয়। এই বাসনার নাম 'কাম'। লোভ, লাম্পট্য প্রভৃতি হেয় বাসনাসকল 'কাম' পদবাচ্য।

সকল বস্তুরই প্রতি কেন বাসনা হয় না?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে সকল বস্তুরই প্রতি আমাদের বাসনা কেন হয় না? কেবল বস্তু বিশেষের প্রতি বাসনা কেন হয়? প্রশ্নটির উত্তর এই,—যে বস্তু পূর্ব্বে দেহের কোন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসার সময় মন সুখ অনুভব করিয়াছে, সেই সুখের স্মৃতি 'সংস্কার' নামক প্রেরণা শক্তি দ্বারা পুনরায় ঐ সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করে। তাই সেই বস্তুটীকেই পুনরায় লাভের জন্য বাসনা হয়।

যে বস্তু হইতে মন পূর্ব্বে কোন সুখ অনুভব করে নাই, তাহা পাওয়ার জন্যও আকাঙ্ক্ষা হয় না। যখন আমরা কোন সুখ বা দুঃখ অনুভব করি, তখন ঐ সুখ পুনরায় পাওয়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, অথবা ঐ দুঃখ বর্জ্জনের জন্য যে প্রবৃত্তি হয়; সেই আকাঙ্ক্ষা বা বিতৃষ্ণায় প্রেরণা শক্তি থাকে। ঐ প্রেরণা শক্তির নাম 'সংস্কার'। যে বস্তু উপলক্ষে আমাদের অন্তরে ঐরূপ কোন সংস্কার নাই, তাহা ভোগের জন্য বাসনা বা তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা হয় না।

প্রকৃতিও পুরুষের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি

পূর্ব্বে অনুভূত সুখ তত্ত্বতঃ ব্রহ্মের স্বরূপভূত সুখের বিকার। অতএব কোন বস্তুকে প্রাপ্তির কামনা করার সময় প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়ার প্রভাবে মানবের মন কাম্য বস্তুটির মধ্যে অবস্থিত সুখস্বরূপ ব্রহ্মকেই আবার চায়। যদিও সকল সুখই সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মের অংশ, তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জীবের চিত্তবৃত্তির অবস্থাভেদে সেই সুখ কখনও বিশুদ্ধ, কখনও বা অবিশুদ্ধ ভাবে প্রকটিত হয়। কোন যোগী সমাধির দশায় থাকার সময়ে তাঁহার

চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখী হওয়াতে ব্রহ্মের সহিত সারূপ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থা বিশুদ্ধ, অতএব ঐ চিত্তবৃত্তিতে সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মের অংশ বিশুদ্ধ সুখের আকারে প্রকটিত হয়। কোন মাতাল বা লম্পটের সুখও সুখ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু নয়, তবে তাহা অবিশুদ্ধ। অপরা প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট চিত্তবৃত্তি বহির্মুখী অবস্থায় অবিশুদ্ধ ভাবে থাকে, ঐ অবস্থায় তাহাতে যে সুখেব স্ফুরণ হয়, তাহা ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সুখস্বরূপের প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ অবিশুদ্ধ ভাব।

Laws of associationএর কার্য্য—যখন আমরা দেখি যে, অপর লোকে কোন বস্তু উপভোগ করিয়া সুখলাভ করিতেছে, তখন Laws of associationএর কার্য্য দ্বারা আমাদের মনেও ঐ সুখলাভের বাসনার উদ্দীপনা হয়। তখন পূর্ব্বে অনুভূত ঐরূপ সুখের স্মৃতি জাগরিত হইয়া প্রাক্তন সংস্কারকে (অর্থাৎ কর্ম্মকে) অন্তরে সমুদিত করে, এবং ঐ সংস্কার দ্বারা বাসনার উদ্দীপনা হয়। অপরিচিত নর-নারীর মধ্যেও যে রূপের বা অঙ্গ সৌষ্ঠবের আকর্ষণী শক্তি দেখা যায়, তাহা Laws of associationএর সংযোগে প্রাক্তন সংস্কারের ক্রিয়ার ফল।

বিদ্বেষ তত্ত্ব

ব্রহ্ম ত সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থান করিতেছেন, তবুও কোন কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসিলে কেন সুখের বদলে ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং ঐ বস্তুর প্রতি বিদ্বেষই বা কেন হয়? ভাবান্তরের কারণ এই যে, ব্রহ্ম যখন কোন বস্তু উপলক্ষে আপন সুখ-স্বরূপের প্রকটন করেন, তখন তাহার ভোগে আনন্দ এবং তাহা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়; যখন তিনি আপন সুখ-স্বরূপকে আচ্ছন্ন করেন, তখন ঐ বস্তুর ভোগে ঔদাসীন্য (অর্থাৎ সুখও নয় দুঃখও নয়, এই ভাব) হয়। কিন্তু যখন তিনি আপন সুখ-স্বরূপকে প্রত্যাহৃত করেন, তখন ক্লেশ, এবং ঐ ক্লেশ

হইতে বিদ্বেষ, জন্মায় ; এই দুঃখ তত্ত্বতঃ বিরহেরই দুঃখ। এই তত্ত্বটী 'কর্ম্ম' তত্ত্বের সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

'সমজ্ঞান'

যাঁহাদের বিশুদ্ধ জ্ঞান আছে, তাঁহারা সর্ব্ব বস্তুতেই ব্রহ্মের বিভূতি দর্শন করেন ; অতএব কোন বস্তুকেই ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া মনে করেন না ; এবং তাঁহাদের মনে আসক্তি (অর্থাৎ মমত্ব বুদ্ধি) বা বিদ্বেষ ভাবও উপস্থিত হয় না। জ্ঞানের এই অবস্থার নাম 'সমজ্ঞান'। তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মের সুখ-স্বরূপের নিরোধ সম্ভবপর নহে। এইজন্যই তাঁহারা চিনি ও চিরতা এই উভয় বস্তুর উপরেই সমজ্ঞান করেন। এই বাক্য হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি চিরতা খাওয়ার সময় তিক্ত রসের আস্বাদ পান না।

তাঁহারাও আমাদের মতই ভিন্ন ভিন্ন রসের আস্বাদ পান। কিন্তু সকল রসই ব্রহ্মের বিভূতি, এবং ব্রহ্ম আপন লীলা সাধনের জন্য নিজ বিভূতির মধ্যে এই রস-বৈষম্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই তত্ত্বটী অনুভব করাতে রসের বৈষম্য অর্থাৎ contrast দ্বারা তাঁহাদের চিত্তবিকার, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হইতে উৎপন্ন বিশুদ্ধ আনন্দের হ্রাস, হয় না। মধুর রসের মধ্যে তাঁহারা যে আনন্দময় ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তিক্ত রসেও তাঁহাকেই দেখেন, অতএব তাঁহাদের চিত্তের কোন বিকার হয় না। বিকারের অভাবই সমজ্ঞানের সার অংশ। চিত্তবৃত্তির এই সমত্বভাব হইতে শ্রীভগবানের স্বরূপ অনুভূত হয় ; এবং ঐ ভাব তাঁহাতেই চিত্ত ন্যস্ত থাকার লক্ষণ—'সমত্বমারাধন মচ্যুতস্য' ; গীতাও বলেন 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ'।

তৃতীয় অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

জীবের দেহ ও কার্য্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ

শ্রীমদ্ভাগবতে যে সৃষ্টি তত্ত্বের বিবরণ আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, সংসার-সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবানের ইচ্ছার প্রেরণায় কালশক্তি (অর্থাৎ স্বরূপশক্তি) ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে আপন শক্তির সঞ্চার করাতে প্রকৃতি ক্ষোভিতা (active) হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে সত্বপ্রধান 'মহত্তত্ত্বের' প্রকটন করিলেন। বিভুর ইচ্ছার প্রেরণায় কাল-শক্তির-ক্রিয়া প্রভাবে মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত 'অহঙ্কার'-তত্ত্বের প্রকটন হইল। এই 'অহঙ্কার'-তত্ত্বের তমোপ্রধান অংশ হইতে 'অহঙ্কার' অর্থাৎ জীবের অন্তরে 'আমিত্ব' ভাব এবং পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বাহির হইল। অহঙ্কার তত্ত্বের রাজসিক অংশ হইতে জীবগণের ইন্দ্রিয় সকল এবং 'বুদ্ধি' নামক বৃত্তির প্রকটন হইল ; এবং অহঙ্কারের সাত্বিক অংশ হইতে জীবের মন, এবং 'বুদ্ধির' বিজ্ঞান-শক্তি এবং ইন্দ্রয়াধিপতি দেবগণ নির্গত হইলেন।

এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, জীব-দেহের সকল উপকরণ এবং সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্মের 'প্রকৃতি' এবং স্বরূপশক্তি নামক অবস্থাদ্বয় হইতে প্রকটিত হইয়াছে। এই দুই অবস্থা কাহাকে বলে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল বস্তুর নির্গমন যে ভগবানের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল এই কথাটী ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

দেহাদির উপকরণ এবং ভোগের ইন্দ্রিয়

মহত্তত্ব প্রকৃতিরই বিকার, এবং অহঙ্কারতত্ত্বও তাহাই। ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতি বস্তুতঃ 'পরা' প্রকৃতির নামান্তর এবং অপরার গুণত্রয়ও যে পরা প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্বগুণের সহিত আবরক বিক্ষেপের সংযোগের ফল মাত্র, এই সকল বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব মোটের

উপর দাঁড়াইল এই যে, ব্রহ্মই নিজের বিশুদ্ধ সত্ত্বায় ভিন্ন ভিন্ন পরিমানে আবরক বিক্ষেপের সংযোগ করিয়া অপরা প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রকটন করিয়াছেন ; এবং ঐ গুণত্রয়ের সংযোগে—

(ক) ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, এবং তাহা হইতে জীবদেহ এবং ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে,

(খ) ভোগের ইন্দ্রিয় নিচয়ও গুণ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে,

(গ) এবং সত্ত্ব গুণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক দেবগণের সৃষ্টি হইয়াছে,

(ঘ) সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মন এবং বুদ্ধি নামক যে বৃত্তিদ্বয় আছেন, তাঁহাদের উৎপত্তিও ব্রহ্মের গুণ হইতে হইয়াছে।

অতএব দেখা গেল যে, যে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র তিনিই বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে সংসারের স্থূল বস্তু সকলের এবং সূক্ষ্ম বস্তু সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা (review) হইতে দেখিতে পাই যে, সংসারের স্থূল সূক্ষ্ম স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তুই গুণত্রয় হইতে পৃথক নয়। প্রকৃতির গুণত্রয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণেরই বিকার, অতএব সংসার সত্ত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মেরই বিকার।

গুণত্রয়ের মধ্যে কার্য্যকরী প্রেরণাশক্তি শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইতেই আসিয়াছিল, ভাগবতে পুনঃ পুনঃ কথিত, এই সার কথাটী যেন নিয়ত মনে থাকে। বিভূর সৃষ্টিলীলার আলোচনা করিলে, 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম', 'বিশ্ব ব্রহ্মময়', বিশ্ব 'শ্রীভগবানের স্থূল-রূপ', এই সকল মহাবাক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবের দেহ এবং ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি

জীবের দেহের উপকরণ সকল ত সৃষ্ট হইল, এখন ঐ উপকরণের সংযোগ দ্বারা কিরূপে দেহের সৃষ্টি হইল ? যে ব্রহ্মা সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হন, ভাগবত বলেন যে, তিনি ছিলেন কেবল রজোগুণের অবতার

মাত্র। সংসারে প্রয়োজনীয় বহুবিধ স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপকরণ সৃষ্টি হওয়ার পরে তাহাদের মধ্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেহের জন্য আবশ্যকীয় উপকরণ গুলি বাছিয়া লইয়া, যে শক্তি দ্বারা নির্ব্বাচিত উপকরণের সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভোগ্য বস্তুও নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই বিরাট শক্তিই শ্রীভগবানের রজোগুণ নামক ক্রিয়াশক্তি। ব্রহ্মা ঐ গুণের অবতার ; তাই তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হন।

দেহে কার্য্যকরী শক্তি প্রদান

দেহ নির্ম্মাণের পরে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের এমন কোন স্বতন্ত্র শক্তি ছিল না, যাহার প্রভাবে তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কেবল শ্রীভগবানের নিকট হইতে পরিচালন করার শক্তি পাইলেই তাঁহাদের পক্ষে কার্য্যক্ষম হওয়া সম্ভবপর ছিল। সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মের শক্তি সঞ্চারের জন্য দেবগণ cenduit pipe এর তুল্য ছিলেন।

অতএব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জীব সৃষ্টির পরে, যখন স্বয়ং শ্রীভগবান (অর্থাৎ বাসুদেব) 'জীবন'-রূপে, এবং তাঁহার সহিত নিত্য-সম্বন্ধা পরা প্রকৃতি 'জীব'-রূপে সর্ব্ব বস্তুতে অর্থাৎ বিশ্বের অণু পরমাণুতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে জীবনী-শক্তির সঞ্চার করেন, তখন তাহারা সকলে কার্য্যক্ষম হওয়ার জন্য শক্তি লাভ করে।

পরা প্রকৃতির নিকট হইতে জীবনীশক্তি লাভ করাতেই জগৎ বর্ত্তমান থাকে। তাই গীতা বলেন যে, এই শক্তিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'। কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে বাসুদেবই যদি জীবন হইলেন, তবে পরা প্রকৃতি জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, এই কথা কেন বলা হয়। এই আপত্তির উত্তর এই যে, বাসুদেব এবং পরা প্রকৃতি অভিন্ন, এবং উভয়ে একই ব্রহ্মের অবস্থান্তর মাত্র অতএব স্বয়ং ব্রহ্মের শক্তিকে বাসুদেবের শক্তি বা পরা প্রকৃতির শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিলে একই বস্তু বুঝায়।

অতএব আনবাদি জীবের মুক্তিতে কেবল গুণের লীলাই চলিতেছে

উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, সংসারে কেবল গুণত্রয়ের লীলাই চলিতেছে। গুণত্রয় দ্বারা আমাদের দেহ নির্ম্মাণ হইয়াছে। ভোগ্য বস্তু সকলও গুণত্রয়ের বিকার মাত্র। ভোগক্ষম ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের পরিচালক দেবগণও গুণত্রয়ের বিকার; সর্ব্বোপরি পরিচালক মন এবং বুদ্ধি নামক বৃত্তিদ্বয়ও গুণত্রয়েরই বিকার। সপ্তম অধ্যায়ে দেখান হইবে যে, যে সংস্কার অর্থাৎ 'কর্ম্ম' দ্বারা জীবের যোনী, আয়ুঃ এবং ভোগকালের নির্দ্ধারণ হইতেছে। যে সংস্কার-প্রভাবে জীবের জন্ম, মৃত্যু এবং সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা হইতেছে, সেই সংস্কার সকলও কেবল গুণের নামান্তর মাত্র। গুণের প্রভাবে জীবের মতি-ভ্রমাদি হইয়া, বিপদ এবং তৎসৃষ্ট-নির্য্যাতন দ্বারা মতি যাহাতে সাধনমার্গে যায়, সংসারে সে ব্যবস্থাও আছে। মোট কথা এই যে, সংসারে যে দিকে তাকাও তথায় কেবল গুণের লীলাই দেখিবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবদেহ-সৃষ্টি কেবল এই লীলা-সংসাধনের পৃথক পৃথক পর্য্যায় মাত্র।

'গুণ' ব্রহ্মের নামান্তর, অতএব সংসারে ব্রহ্মের লীলাই চলিতেছে।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, 'গুণ' কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞাপক লক্ষণ মাত্র। বস্তুতঃ বিশ্বে কেবল ব্রহ্মই আছেন। তাঁহাকেই বিশুদ্ধ 'সত্ত্ব' গুণ, এই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, 'সত্ত্বং যৎ ব্রহ্মদর্শনং'। ব্রহ্মের ইচ্ছায় সত্ত্বগুণই, আবরক বিক্ষেপের সংযোগ দ্বারা, সংসার-লীলা সাধনের জন্য তিন গুণ হইয়াছেন। <u>অতএব সৃষ্টিতে আমরা গুণত্রয়ের যে লীলা দেখিতে পাই তাহা বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই লীলা</u>।

চতুর্থ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

বিশাল আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি

আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী নামক শক্তিদ্বয়

আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষা প্রয়োগ করিয়া 'পরা' প্রকৃতি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তিকে Centripetal এবং 'অপরা' অর্থাৎ বহিরঙ্গা প্রকৃতিকে Centrifugal শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই উভয় শক্তির আধার হইয়া পরমব্রহ্ম যেন তাহাদের centre, অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে, অধিষ্ঠিত আছেন। অন্তরঙ্গা প্রকৃতি হইতে উচ্চ লোকচতুষ্টয় নিঃসৃত হইয়াছে, এবং ঐ শক্তির স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম দ্বারা উচ্চলোকের অধিবাসিগণ ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। [এই আকর্ষণ লীলায় ব্রহ্মের স্বরূপভূত উৎকর্ষ এবং মাধুর্য্যের প্রকটন দ্বারা তাঁহার 'আত্মা-রাম' নামটির সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে]। বহিরঙ্গা হইতে 'সংসার' অর্থাৎ ভূরাদি লোকত্রয় নিঃসৃত হইয়াছে, এবং এই শক্তির স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম দ্বারা এই লোকত্রয়ের অধিবাসিগণ ভোগসুখের দিকে, অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ ব্রহ্ম হইতে দূরে, বিক্ষিপ্ত হইতেছেন।

বহিরঙ্গার সহিত শুভশক্তির সংঘর্ষণ

সংসারে বহিরঙ্গার সহিত নিয়তই ব্রহ্মের শুভশক্তির সংঘর্ষণ চলিতেছে; এই সংঘর্ষণকেই আমরা বিপদ বলি। বহিরঙ্গার ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াও, জীব এই সংঘর্ষণ দ্বারা সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন; এবং সেই সাধনা-প্রসূত শুভ শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত জীবই পুনরায় তাঁহার সন্নিকটে আসিতেছেন। সংক্ষেপতঃ, যাহাতে বহিরঙ্গা শক্তি অন্তরঙ্গায় পরিণত হয়, (অর্থাৎ যাহাতে বিকর্ষণী শক্তি হইতেই চরমে আকর্ষণী শক্তি জন্মায়) সেজন্য সংসারে সুচারু ব্যবস্থা রহিয়াছে। সৃষ্টিলীলা পর্য্যালোচনা করিলে এই বিচিত্র ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

'আকর্ষণ' ও 'বিকর্ষণ' বাক্যদ্বয়ের অর্থ

ব্রহ্ম অরূপী ও চিদাত্মক। সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন সংজ্ঞা দ্বারা যে শক্তিত্রয় বুঝায়, তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। যখন আমরা 'সান্নিধ্যে' ও 'দূরে' এই কথা দুইটির ব্যবহার করি, তখন relativity অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাব প্রকাশ পায়, অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক ভাবযুক্ত (stationary) কোনও স্থূল বস্তুর তুলনায় নিকটে বা দূরে থাকাই বুঝায়। যে ব্রহ্ম চিদাত্মক এবং যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার পক্ষে আবার 'নিকট' বা 'দূর' কি ? অতএব আকর্ষণ ও বিকর্ষণ পদদ্বয় দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়, তাহা একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করা আবশ্যক।

ব্রহ্ম চিদাত্মক এবং সর্ব্বব্যাপী, অতএব কোন স্থূল বস্তুর ন্যায় তাঁহার নিকটে যাওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। তবে 'নিকটে' যাওয়া বাক্যের ভাবার্থ কি ? ভাবার্থ এই যে, চিত্তে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশক, জ্ঞান এবং উৎকর্ষাদির প্রকটন হইলে চিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছে, এই অবস্থা প্রকাশিত হয়। চিত্তবৃত্তিতে যত অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং উৎকর্ষাদির প্রকটন হয়, চিত্ত ততই ব্রহ্মের সান্নিধ্যে গিয়াছে, ইহাই বুঝায়। কাহারও চিত্তে ঐ জ্ঞান এবং উৎকর্ষাদি যত কমিতে থাকে তিনি ব্রহ্ম হইতে তত দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, ইহাই বুঝায়।

'সত্ত্বং যৎ ব্রহ্ম দর্শনং' সত্ত্ব গুণই ব্রহ্ম ; এবং যখন কাহারও চিত্তে সত্ত্ব গুণ সাতিশয় প্রবল হয়, তখন তাঁহার ব্রহ্ম-দর্শন লাভ হইয়াছে বলে। অতএব যখন আমরা বলি যে, 'অন্তরঙ্গার আকর্ষণ শক্তি আছে' তখন ঐ বাক্যটির দ্বারা এই বুঝায় যে, অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আমাদের চিত্তে সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হয়। বহিরঙ্গার দ্বারা সত্ত্বগুণের ক্ষয় হইয়া রজো এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হয় ; এইজন্য বহিরঙ্গার 'বিকর্ষণ' শক্তি আছে, ইহাই বলা হয়।

বহির্জগতে ক্রিয়াশীল অপর অপর শক্তির যেমন হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তিদ্বয়েরও সেইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়, অতএব

সত্ত্বগুণ যে সর্ব্বদা এক ভাবে থাকে তাহা নয়, ইহারও ন্যূনাধিক্য হয়।

'আকর্ষণ' শক্তির ফল।

'Kingdom of God and His righteousness' লাভ করাই খৃষ্ট ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। এই বাক্যটীর দ্বারা কেবল সত্ত্বগুণের উৎকর্ষই প্রকীর্ত্তিত হইতেছে; কারণ সত্ত্ব-গুণই ব্রহ্ম, এবং God পদটী ব্রহ্মেরই নামান্তর। যিশু দ্বারা নির্দ্ধারিত যে আদর্শটী উপরে বর্ণিত হইল তাহা এবং ব্রহ্মদর্শন-লাভ একই বস্তু—বর্ণনায় ভাষান্তর ব্যবহার হইয়াছে মাত্র। যাঁহার চিত্তে সত্ত্বগুণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই যথার্থতঃ Kingdom of God, অর্থাৎ ভগবানের তুল্য উৎকর্ষ, লাভ করিতে সমর্থ হন। এই 'Kingdom' আমাদের অন্তরেই নিয়ত রহিয়াছে। যে শুদ্ধসত্ত্ব বাসুদেব আমাদের অন্তরে নিয়ত আছেন, তিনিই ঐ ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি। অনুশীলন করিলেই তিনি আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন; তাই বাইবেল বলেন যে, 'Lo the Kingdom of God is within you'। শ্রীভগবানের তুল্য উৎকর্ষ, অর্থাৎ ব্রহ্ম-দর্শন, লাভ করিলেই মানব আপন জীবনের পরম পুরুষার্থ লাভ করেন।

উচ্চ লোক চতুষ্টয়ে এই উৎকর্ষ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সহিত তুল্য প্রভান্বিত হইয়াছে। ঐ লোক-চতুষ্টয়ে এবং বৈকুণ্ঠের মধ্যে কুত্রাপিও সত্ত্বগুণে মালিন্যের (অর্থাৎ 'বিকর্ষণ' শক্তি হইতে সঞ্জাত লোভাদির) লেশমাত্র নাই। সর্ব্বত্র কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই আছে।

<u>স্বভাবগত প্রেরণা</u>—সত্ত্বগুণে নিহিত যে স্বভাবগত প্রেরণা-শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে এই লোকচতুষ্টয়ের অধিবাসিগণের চিত্তে সাধন-প্রবৃত্তি আপনিই বাড়িতে থাকে। ধ্যান, ধারণা এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি উপায় অবলম্বন দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়।

<u>সাধনা</u>—সত্ত্বের পুষ্টিসাধক কোন উপায় অবলম্বন করাকে 'সাধনা'

করা বলে। উচ্চ লোকবাসিগণ সাধনা করিয়া আনন্দ পান, এবং আনন্দ পাওয়ার জন্যই সাধনা করেন। সুতরাং সাধন এবং আনন্দ এই উভয় বস্তুই কার্য্য-কারণ তুল্য হওয়াতে পরস্পরের উদ্দীপনা হয়।

বিকর্ষণ প্রভাবে পশুত্ব এবং জড়ত্ব

বিকর্ষণ শক্তি চিত্তকে ব্রহ্ম হইতে যত দূরে বিক্ষিপ্ত করে, ততই সাত্ত্বিক উৎকর্ষের হ্রাস হয়, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উৎকর্ষের খর্ব্বতা তমোগুণের বৃদ্ধির ফল; ইহা হইতে সত্ত্বগুণের এবং ক্রমশঃ রজোগুণেরও খর্ব্বতা হইয়া ক্রমশঃ মানবের গতি পশুত্বের দিকে, এবং পশুত্ব হইতে জড়ত্বের দিকে পরিচালিত হয়। এই শক্তির প্রভাবে দেবগণেরও অধোগতি হয়। নহুষের ইন্দ্রত্ব হইতে পতনে যে গর্ব্বের এবং অহল্যার উপাখ্যানে ইন্দ্রের আচরণে যে ভোগবাসনার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিকর্ষণ শক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল।

যুগ চতুষ্টয় এবং প্রলয়-তত্ত্ব।

ভাগবত বলেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান সংসারের উপর সত্ত্ব-গুণের আবরণ স্থাপন করেন, ‘ব্যদধাৎ স্বসত্ত্বম’। ঐ সাত্ত্বিক আবরণের প্রভাবে সত্য-যুগ আরম্ভ হয়। প্রকৃতির যে ‘অপরা’ অর্থাৎ বহিরঙ্গা ভাব দ্বারা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, নূতন কল্পে সত্যযুগের প্রাদুর্ভাব হইলেও সেই শক্তি বিনষ্ট হয় না, তাহার কার্য্য বরাবরই চলে, তবে প্রবল সত্ত্বগুণ দ্বারা বহিরঙ্গার রজো এবং তমোগুণ অভিভূত হওয়াতে, কল্পারম্ভের পরে কিছুকাল ঐ গুণদ্বয়ের ক্রিয়ার ফল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না; তথাপি তাহাদের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ সত্ত্বগুণের শক্তির হ্রাস হইতে থাকে।

পূর্ব্ব কল্পের অবসানে যে ‘কর্ম্ম’ (অর্থাৎ বাসনাময় লিঙ্গদেহ) লইয়া জীব প্রকৃতিতে লীন ছিল, সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই লিঙ্গদেহ জীবকে অনুসরণ করে; এবং নূতন কল্পের প্রারম্ভে ভগবান সংসারে সত্ত্বগুণের পুষ্টিসাধন করিলেও, জীবের লিঙ্গদেহে অবস্থিত প্রাক্তন সংস্কার সকল

সাত্ত্বিক আবরণের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতে থাকে, ও ক্রমশঃ যাহাতে সত্ত্বগুণ অভিভূত হইয়া জীবের বৃত্তি সকলের উপর রাজসিক ও তামসিক সংস্কারের প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তাহারা সেইজন্যই চেষ্টা করে।

যুগ-পরিবর্ত্তন

সত্যযুগেও জীবের বৃত্তি সকলের উপর প্রাক্তন-সংস্কারের রাজসিক এবং তামসিক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ ভগবান প্রদত্ত সত্ত্ব গুণের শক্তির হ্রাস হইতে থাকে, কারণ পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য কার্য্য করাই গুণত্রয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সত্ত্বের শক্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রজো এবং তমোগুণের বহির্ম্মুখী শক্তি প্রবল হওয়াতে সংস্কারের গতি অধিকতর অধোগামী হয়।

যখন সত্ত্বগুণের হ্রাসের মাত্রা এতই প্রবল এবং বহুবিস্তৃত হয় যে, তদ্দ্বারা সংসারের সাধারণ অবস্থার (general character) অবনতি হইয়াছে, ইহাই দেখা যায়, সেই অবনত অবস্থার প্রথম স্তরের নাম ত্রেতাযুগ।

এইখানেই অবনতির গতি রোধ হয় না। জড়বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, কোন বস্তু inclined planeএর (ঢালু যায়গার) উপর দিয়া পতনের সময়, ঐ পতনের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে। বোধ হয় এই নিয়মের তুল্যভাবে বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য দ্বারা সংসারের অবনতির বেগের বৃদ্ধিই হয়। এইরূপে পূর্ব্ব কল্প হইতে আগত এবং নূতন কল্পে সৃষ্ট সংস্কারের যুগপৎ কার্য্য দ্বারা সংসারে সত্ত্বগুণের আরও ক্ষয় হইতে হইতে ক্রমশঃ দ্বাপর এবং কলিযুগের আবির্ভাব হয়।

ক্রম-বর্দ্ধনশীল অবনতির (progressive degeneration) নির্দ্ধারিত সীমা (degree) অনুসারে, এক এক যুগের পৃথক পৃথক নামকরণ হইয়াছে; অর্থাৎ যখন সত্ত্বগুণের এক পাদের, (= এক চতুর্থাংশ) ক্ষয় হয়, সেই অবস্থার নাম ত্রেতা যুগ; দুই পাদ ক্ষয়ের পরে দ্বাপরের, এবং তিন পাদ ক্ষয়ের পরে কলিযুগের আরম্ভ হয়।

প্রলয়

অবনতি যখন শেষ স্তরে অর্থাৎ কলিযুগে উপস্থিত হয়, তখনও বিকর্ষণ শক্তির কার্য্য বন্ধ হয় না। কলির প্রারম্ভে সত্ত্বগুণের যে এক চতুর্থাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, বিকর্ষণ শক্তির কার্য্য দ্বারা ক্রমশঃ ঐ অংশেরও ক্ষয় হইতে থাকে। এই ক্ষয় হইতে হইতে সত্ত্বগুণ যখন না থাকার তুল্য হইয়া উঠে তখন 'কাল'-রূপী শ্রীভগবান সংসারকে বিনষ্ট করেন। এই বিনাশের নাম 'প্রলয়'।

সংসারে দেখা যায় যে, দেহ স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইলে 'মৃত্যু' দ্বারা ঐ দেহের বিনাশ অর্থাৎ dissolution হয়, মৃত্যুরও অপর একটী নাম 'প্রলয়'। সত্ত্বগুণের স্বল্পতা বশতঃ সংসার যখন বিভূর লীলা সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তখন সংসারেরও 'মৃত্যু' অর্থাৎ বিনাশ হয়। ঐ অবস্থায় dissolution দ্বারা সংসারের উপাদান সকল প্রকৃতিতে লীন হয়; এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির নামই প্রলয়।

প্রলয়ের নিশা

শাস্ত্র বলেন যে, প্রলয়ের নিশায় জীবগণ প্রকৃতিতে লীন হইয়া সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই সুপ্ত অবস্থারও শুভ ফল আছে। প্রলয়ের প্রারম্ভে সংসারে তমো গুণের প্রাধান্য থাকিলেও সত্ত্বগুণ তখনও বিনষ্ট হয় না। কঠিন ত্বক দ্বারা সমাচ্ছন্ন বীজের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি লীনভাবে অবস্থান করে, প্রলয়কালে জীবের চিত্ত-বৃত্তির উপর তমোগুণের আবরক বিক্ষেপ শক্তির আচ্ছাদনের নীচে সত্ত্বগুণের শক্তি অবস্থান করে।

গুণ অবিনাশী—যদি বল যে, প্রলয়-কালে যখন তমোগুণ প্রবল হয়, তখন সত্ত্বগুণ কি বিনষ্ট হয় না? উত্তরে বলি যে, না—সত্ত্বগুণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় না। গীতা বলেন যে, গুণত্রয় পরস্পরকে 'অভিভূত' অর্থাৎ শক্তিহীন করে মাত্র, তাহাদের কেহ কাহাকেও বিনষ্ট করে না। বিশ্বে কেবল একটী গুণই অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ মাত্র আছেন; তাঁহার সহিত সংযুক্ত আবরক বিক্ষেপ শক্তির ন্যূনাধিক্য

অনুসারে গুণের যে ত্রিবিধ রূপান্তর হয়, তাহাদেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। অতএব এস্থলে বিনাশের কথাই উঠিতে পারে না।

সত্ত্বগুণ স্বয়ং ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তের চিত্তে যে সত্ত্বগুণ আছে, কোন হীনতম পশুর চিত্তেও তাহাই আছে; তবে তখন তমোগুণ (অর্থাৎ আবরক শক্তি) সত্ত্বকে সমাবৃত করিয়া থাকাতে,ঐ জীবের গতি হইয়াছে পশুযোনীতে; এবং যাঁহার চিত্তে মোটেই তমোগুণের সংযোগ নাই, ও সাধনা প্রভাবে যাঁহার চিত্তস্থ সত্ত্বগুণ স্বয়ং শ্রীহরির তুল্য সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সেই জীবের গতি হইয়াছে বৈকুণ্ঠে। অতএব সত্ত্বগুণের সহিত তমোগুণের সংযোগের ন্যূনাধিক্য অনুসারে যোনীবিভাগ এবং বাসস্থানের তারতম্য হয়। সংসারে জীবের চিত্তে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের মাত্রারও অসংখ্য ন্যূনাধিক্য দেখা যায়, তদনুসারে নানা যোনীতে জীবের গতি হয়।

পুনঃ পুনঃ শস্য উৎপাদনের পরে ভূমি যখন ক্ষীণবল (exhausted) হয়, তখন ঐ অনুর্ব্বর ভূমিকে যদি কয়েক বৎসর পতিত রাখা যায়, তাহলে সেই বিশ্রামের সময় ভূমির অন্তর্নিহিত উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ বাহির হয়, এবং সেই শক্তির প্রভাবে ঐ অনুর্ব্বর ভূমি পুনরায় প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। প্রলয়ের নিশার সময় চিত্তবৃত্তির অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণ পুনরায় প্রবল হওয়াতে, জীবগণ নূতন কল্পে পুনরায় ঐ গুণের প্রেরণায় স্ব স্ব কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

প্রলয়ের নিশায় জীবগণ সুপ্ত অবস্থায় থাকাতে, তখন আবরক বিক্ষেপ শক্তির ক্রিয়া নিরুদ্ধ থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ তখনও সুপ্ত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন না—কারণ ব্রহ্ম 'অতন্দ্রিত' অর্থাৎ তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তি কখন 'তন্দ্রা' অর্থাৎ নিদ্রা (=আলস্য) দ্বারা অভিভূত হয় না। বৈকুণ্ঠ ও উচ্চলোক তখন বজায় থাকে, তথায় সত্ত্বগুণ কার্য্য করে। যে বৈকুণ্ঠ সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি তাহা কখন বিনষ্ট হন না 'ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ' অতএব সত্ত্ব গুণ কখন নিষ্ক্রিয় হন না।

প্রলয়ের নিশায় আবরক বিক্ষেপ শক্তি সুপ্ত, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি রহিত হইয়া জড়বৎ, অবস্থায় থাকাতে, ক্রিয়াশীল সত্ত্বগুণের গতিরোধ করিতে তখন অপর আর কোন শক্তিরই কার্য্য চলে না। এই সুযোগে জীবের অন্তরস্থ সত্ত্বগুণ সুপ্তভাবাপন্ন (অর্থাৎ ক্ষীণবল) তমোগুণকে ক্রমশঃ অভিভূত করিতে থাকে। সুপ্ত হইলেও তমোগুণকে অভিভূত করিতে ব্রহ্মার 'দিবা' পরিমাণ সময়, অর্থাৎ যুগ চতুষ্টয়ের তুল্য সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়। তাই এই সময়কে প্রলয়ের 'নিশা' বলে। এই সময়ের অবসানে সত্ত্বগুণ শক্তিমান হইয়া যখন পুনরায় আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তখনই নূতন সৃষ্টির সুযোগ আগত হয়।

তখনও হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে তমোগুণের প্রাবল্য থাকাতে, সত্য-যুগ আরম্ভ হওয়া উপলক্ষে বিঘ্ন থাকে। শ্রীভগবান বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া তমোগুণের সেই প্রাবল্য দূর করেন; তাহার পর সত্য যুগের প্রবর্ত্তন হয়। ভাগবত বলেন যে, ভগবান বরাহাবতারে সংসারের উপর আপন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 'ব্যদধাৎ স্ব-সত্ত্বম্'। স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক শক্তির সঞ্চার হওয়ার পরে, সত্যযুগ আরম্ভ হওয়া উপলক্ষে আর কোন বিঘ্ন থাকে না।

যুগ চতুষ্টয়ের গূঢ়তত্ত্ব

যুগচতুষ্টয়ের গূঢ়তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে শ্রীভগবানের বিচিত্র ব্যবস্থা দেখা যায়। কোন্ আদি-কল্পে তিনি আবরক বিক্ষেপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। যখনই সৃষ্টি করুন না কেন, আবরক বিক্ষেপশক্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া প্রতি কল্পের শেষে, অর্থাৎ কলির অবসানে, যে সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিবে, ইহাই হইল সৃষ্টির নিয়ম।

উপমার ভাষা ব্যবহার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, প্রলয়ের আরম্ভে সংসারের উপরে থাকে তমোগুণের আবরণ ও তাহার নীচে থাকে সত্ত্বগুণ। প্রলয়ের নিশায় সত্ত্বগুণ যখন ক্রমশঃ প্রবল হয়, তখন তাহা তমোগুণের আবরণকে (অর্থাৎ অভিভবকারী শক্তিকে) অতিক্রম

করিয়া সংসারের উপর পুনরায় আপন আধিপত্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে। এইরূপে সত্ত্বগুণের শক্তি প্রবল হইলে নূতন সৃষ্টির সুযোগ এবং তাহা উপলক্ষ্যে বরাহাবতার হয়। অতএব বরাহাবতারের পরে নূতন কল্পে সত্যযুগের প্রারম্ভে, সংসারের উপরে থাকে সত্ত্ব গুণের আবরণ এবং ভিতরে থাকে আবরক বিক্ষেপ শক্তি। অর্থাৎ তখনও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করার জন্য তমোগুণ অতি ক্ষীণ ভাবে কার্য্য করিতে থাকে। তাহার পর কালের গতিতে যুগ-পরিবর্ত্তন সময়ে আবরক বিক্ষেপ শক্তি, অর্থাৎ তমোগুণ, ক্রমশঃ প্রবল হইয়া সত্ত্বকে আচ্ছন্ন করে। এই পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠায় এই ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপে গুণত্রয়ের আপন আপন স্বভাবগত (automatic) ক্রিয়া দ্বারাই যুগ-প্রবর্ত্তন হইতেছে, এবং প্রলয়ের নিশায় সত্ত্বগুণের স্ফুরণের জন্য সুযোগ উৎপাদন করিয়া ও বরাহাবতারে সংসারে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সংস্থাপন করিয়া, শ্রীভগবান জীবের পক্ষে মোক্ষ লাভের জন্য বিশেষ সুযোগ উৎপাদন করেন। ইহাই যুগচতুষ্ঠয়ের গূঢ়তত্ত্ব।

বিষের মধ্যেও অমৃত

বিকর্ষণী শক্তি যে সকল ভোগ-বাসনা উৎপাদন করে তাহা পুরণ করিতে গিয়া জীব কথনই সুখ পায় না, বরঞ্চ বাসনা হইতে জাত কাম লোভ প্রভৃতি উপসর্গের যাতনায় অস্থিরই হয়, এবং এই যাতনার সহিত অপর বহুবিধ বিপদের পীড়নে ব্যাকুল হইয়া, কাহার কাহারও মতি সাধনমার্গে আগমন করে। যদি ভোগ বাসনা হইতে যাতনার বদলে মানবের নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং তৃপ্তি হইত, তাহা হইলে মানব ভোগেই বিভোর হইয়া থাকিত।

বাসনায় অতৃপ্তি এবং কামলোভাদির যন্ত্রণা ও তাহার উপর বিপদের পীড়ন, এই সকল বস্তুই মানবের মতিকে সাধনমার্গে আনয়ন করে। অতএব ঐ অতৃপ্তি প্রভৃতি বস্তুকে বিষের মধ্যে ঔষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

বিজ্ঞানের Law of molecular Attraction ও Repulsionএর অনুযায়ী ব্যবস্থা।

অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং জড়-বিজ্ঞানের (Physics) উপমা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং তাহার পরে দেখান হইয়াছে যে, প্রকৃতি-নাম্নী অনন্ত শক্তি সংসারের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। ঐ শক্তি যখন জীবের চিত্তবৃত্তিকে ব্রহ্মের সান্নিধ্যে আকর্ষণ করেন তখন তাঁহার নাম হয় অন্তরঙ্গা বা পরা প্রকৃতি; এবং যখন ঐ শক্তি আমাদের বৃত্তিকে ব্রহ্ম হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করেন, তখন তাঁহার নাম হয় বহিরঙ্গা বা অপরা প্রকৃতি। ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি নাম্নী কেবল একটী বস্তুই আছেন; তাঁহার ক্রিয়ার পার্থক্য অনুসারে তাঁহাকে 'পরা' ও 'অপরা' এই দুইটী নাম দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতির ক্রিয়ার যে দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাদের একটীর ধর্ম্ম হইল আকর্ষণ (Attraction) এবং অপরটীর ধর্ম্ম হইল বিকর্ষণ (Repulsion)। Physics অর্থাৎ জড়বিজ্ঞান শাস্ত্র বলেন যে, আমাদের বহির্জ্জগতেও নিয়ত molecular Attraction এবং Repulsion শক্তি দ্বয়ের কার্য্য চলিতেছে। এই দুই শক্তি আদি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, কিম্বা একই শক্তি আপন ক্রিয়ার objectiveএর (অর্থাৎ লক্ষ্যের) পার্থক্য অনুসারে এই দুই রূপ ধারণ করিয়াছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ঐ বিষয় সুনিশ্চিত ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে কি না, লেখক তাহা অবগত নহেন। তবে একই বস্তুতে এবং একই সময়ে ঐ উভয়বিধ শক্তির ক্রিয়া চলিতে দেখা যায়।

শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর প্রাপ্তি

বহির্জ্জগতে molecular Attraction নামক আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে জলের ক্ষুদ্রতম অংশ (molecules) সকল পরস্পরকে আকর্ষণ করাতে জল তরল রূপ ধারণ করিয়া আছে। যখন অগ্নি বা বিদ্যুতের

শক্তি দ্বারা এই আকর্ষণী শক্তির হ্রাস ও বিকর্ষণীর বৃদ্ধি হয়, তখন জলের ক্ষুদ্রতম অণু সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া vapour অর্থাৎ বাষ্পে পরিণত হয়। অর্থাৎ জলের এই দুই অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই যে, নব শক্তির সংযোগ হইলে জলবিন্দুর মধ্যে ক্রিয়া-শীল আকর্ষণী শক্তি খর্ব্ব, কিম্বা বিকর্ষণীতে পরিণত, হইয়া জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করে। জলে যদি আরও অধিক পরিমাণে অগ্নি বা বিদ্যুতের বিকর্ষণী শক্তির সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে বাষ্পের ক্ষুদ্রতম অংশ সকল পরস্পর হইতে আরও প্রবল ভাবে বিচ্ছিন্ন হইতে চায়। এবং এই প্রবল বিকর্ষণ শক্তির দ্বারা রেলগাড়ী জাহাজ প্রভৃতি পরিচালিত হয়।

কেবল যে নবশক্তির সংযোগ হইলে বহির্জগতে আকর্ষণী শক্তি খর্ব্ব, (কিম্বা বিকর্ষণীতে পরিণত) হয় তাহাই নয়, অপর এক রকম শক্তি প্রভাবেও বিকর্ষণীকে খর্ব্ব (কিম্বা আকর্ষণীতে পরিণত) হইতে দেখা যায়। শেষোক্ত বাক্যের দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, শৈত্য শক্তি (অর্থাৎ আকর্ষণী শক্তি) সংযোগে জলীয় বাষ্পের (steam) মধ্যে বিকর্ষণী শক্তি আকর্ষণীতে পরিণত হয়, এবং ঐ শক্তি দ্বারা বাষ্প পুনরায় জলের, ও সেই জল আবার বরফের রূপ ধারণ করে।

বহিরঙ্গা শক্তির সহিত Repulsion শক্তির উপমা

যে বহিরঙ্গা শক্তি সংসারে কার্য্য করিতেছে তাহার সহিত বহি-র্জগতের Repulsion শক্তির উপমা দেওয়া যাইতে পারে। 'অন্বয়াৎ ইতরতঃ অর্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌', ব্রহ্ম সকল বস্তুর অনু-পরমাণুতে অধিষ্ঠিত আছেন। অতএব এক বিন্দু জলীয় বাষ্প যখন অপর বাষ্প বিন্দু হইতে দূরে যাইতে চায়, তখন সেই কার্য্য এবং মানবের মনে ব্রহ্ম হইতে দূরে যাওয়ার প্রবৃত্তি, এই উভয় কার্য্যকে সমভাবাপন্ন বলা যাইতে পারে। যে শক্তির ক্রিয়া প্রভাবে জল বাষ্পরূপে পরিণত

হইয়া বাষ্পের একটী অণু অপর সকল অণু হইতে দূরে যাইতে চায়, সেই Repulsion শক্তির সহিত বহিরঙ্গার বিক্ষেপ শক্তির উপমা দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

মানসিক ক্ষেত্রে বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার সহিত Repulsion শক্তির উপমা সঙ্গত কি না, তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিচার করা যাক্। ধনাকাঙ্ক্ষার কথাই ধর। যখন মনে এই আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর হয়, তখন মানবের মতি ধনকে চাহিলেও একেবারে যে ভগবানকে ভুলিয়া যায়, তাহা নয়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যত বাড়িতে থাকে, মন তত ধনের দিকে ধাবিত হয় এবং ততই ভগবান হইতে দূরে যায়। যেমন steamএ তাপ সংযোগ করিলে বাষ্পের অণু সকলের মধ্যে Repulsion অর্থাৎ দূরে গমন শক্তি অধিকতর প্রবল হয়, আকাঙ্ক্ষা নামক বহিরঙ্গা শক্তির সংযোগে মতিও তত প্রবলভাবে ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। অতএব Rrpulsion এবং বহিরঙ্গার কার্য্য একই শ্রেণীভুক্ত।

অন্তরঙ্গার সহিত Attraction শক্তির উপমা

Attraction শক্তির ক্রিয়া Repulsionএর ক্রিয়ার বিপরীত। এই শক্তি বস্তুর অণু পরমাণু সকলকে ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে, এবং সেই আকর্ষণ প্রভাবে কেবল যে ক্ষুদ্র একটী solid mass অর্থাৎ 'দলা' প্রস্তুত হয় তাহাই নয়, ক্ষুদ্র বস্তু সকলও পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া সুবৃহৎ mass সৃষ্টি করে।

বহির্জগতের Attraction শক্তির কার্য্যের ন্যায় অন্তর্জগতেও অন্তরঙ্গার কার্য্য চলিতেছে। শ্রীভগবানের উৎকর্ষ এবং মাধুর্য্যাদি যতই অনুভব করা যায়, মতি ততই 'হরের্গুণাক্ষিপ্ত' হইয়া শ্রীহরির দিকেই ধাবিত হয়। এবং Attraction শক্তির প্রভাবে লৌহ প্রস্তর প্রভৃতির অণু পরমাণু সকল যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকে, অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মানবের মতিও সেইরূপ সুদৃঢ়ভাবে ভগবানের শ্রীচরণে নিবদ্ধ থাকে। তখন আধি ব্যাধি প্রভৃতির আঘাতেও ঐ মতি শ্রীভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না।

অন্তরঙ্গা শক্তি দুর্ব্বল থাকার সময় অন্তর্জ্জগতে যেরূপ তাহা অভিভূত হয়, Attraction শক্তি দুর্ব্বল হইলে বহির্জগতেও সেইরূপ ফল দেখা যায়। জল মাখন তৈল প্রভৃতি বস্তুতে Attraction শক্তি দুর্ব্বল ভাবে থাকে ; তাই অল্প আঘাতে ঐ সকল বস্তু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়। যাহাদের মনে জ্ঞান ও ভক্তি নাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তি প্রবল নয়, তাহারা বিপদের অল্প আঘাতেই ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

অন্তঃ ও বহির্জগতে বিপরীত শক্তি চতুষ্টয়ের কার্য্য

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে অন্তর্জগৎ তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র। বহির্জগতে ক্রিয়াশীল যে molecular Attraction এবং Repulsion নামক শক্তি-দ্বয় দৃষ্ট হয়, তাহাদের কার্য্যের সহিত প্রথমোক্ত শক্তিদ্বয়ের এতই সাদৃশ্য দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত এবং শেষোক্ত শক্তিদ্বয় যে পরস্পরের রূপান্তর মাত্র, ইহাই বোধ হয়।

বহিরঙ্গার প্রভাবে জীবের মতি ব্রহ্ম হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইলেও ঐ মতির সহিত অন্তরঙ্গার এমন বন্ধন অলক্ষ্যভাবে থাকে যে, বিভ্রাটাদি দ্বারা যতই বিধ্বস্ত হউন না কেন,জীবের মতি কিছুতেই ভগ-বানকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে পারে না। যাঁহারা atheist অর্থাৎ নাস্তিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেও moral lawর নিকট মস্তক অবনত করেন। যাঁহাদের কাছে কেবল ভোগসুখই আপন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাদেরও মনের গভীরতম স্তরে সন্তানস্নেহ প্রভৃতি কোন না কোন মধুর বস্তু লুকায়িত থাকিতে দেখা যায়। সংসারে প্রায় সকল লোকের হৃদয়েই এইরূপ কোন না কোন কোমল বস্তু, 'soft spot', থাকে।

ঐ সকল লোক 'ভগবান' 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কোন শাস্ত্রীয়, (অর্থাৎ সনাতন theological), নাম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া যে, তাঁহারা

ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তির সীমার সম্পূর্ণ বাহিরে গিয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, যে moral law স্নেহ, দয়া প্রভৃতি কোন প্রকার মধুর বা করুণ রসাত্মক উৎকর্ষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের চিত্তের উপর ন্যূনাধিক আধিপত্য প্রকাশ করে, সেই 'law' নামক শক্তি অন্তরঙ্গারই রূপমাত্র। 'নাম নামিনো রভেদাৎ', অর্থাৎ কোন নাম এবং সেই নাম দ্বারা অভিব্যক্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নাই। আমরা যাঁহাকে ভগবান বলি, তিনিই moral law প্রভৃতি বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া ঐ নাস্তিকগণের এবং দুরাচারিগণের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাই বলি যে, অন্তর্জগতে বিভূর সংসার লীলা সম্পাদনের জন্য সর্ব্বজীবের চিত্তবৃত্তিতে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা নামক শক্তিদ্বয় একই সময়ে কার্য্য করে।

বহির্জগতের গতির পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, একই সময়ে এবং একই বস্তুর উপর Molecular Attraction এবং Repulsion নামক উভয় শক্তির কার্য্যই চলিতেছে। সৌরজগতের Solar Systemএর অন্তর্ভূত, অর্থাৎ গ্রহচক্রের মধ্যে অবস্থিত, গ্রহ এবং নক্ষত্রাদির সংস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই বাক্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বে যদি কেবল Repulsion শক্তিই থাকিত, তাহা হইলে গ্রহ নক্ষত্রাদি ঐ শক্তি দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে, সেই বিকর্ষণ শক্তির জোরে অনন্ত আকাশের infinite spaceএর কোথায় গিয়া যে পড়িত তাহার খোজই থাকিত না। Attraction এবং Repulsion শক্তি যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে, এবং এক শক্তি অপর শক্তির কার্য্যের প্রতিরোধ করে বলিয়াই, গ্রহ এবং নক্ষত্রাদি সৌর-চক্রের সীমার মধ্যে থাকে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের জন্য যে স্থান নির্দ্ধারিত আছে তাহাতে আবদ্ধ থাকে এবং ঐ স্থান হইতে বিচ্যুত হয় না।

Repulsion শক্তি না থাকিয়া সংসারে কেবল যদি Attraction

আকর্ষণ শক্তিই থাকিত, তাহা হইলে গ্রহ নক্ষত্রাদি এবং অপর সকল বস্তু পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া এক বিরাট স্তূপের সৃষ্টি হইত।

অতএব দেখা গেল যে, দুই শক্তি না থাকিয়া কেবল একটী মাত্র শক্তি থাকিলে সৃষ্টিতে বিভ্রাটই ঘটিত। ঐ বিপরীত শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া প্রভাবে অধুনা জগতের গতিতে যে শৃঙ্খলা (harmony) উৎপন্ন হইয়াছে, যে শৃঙ্খলার বিরাট মূর্ত্তিই যেন শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের প্রতিকৃতি, যাহা দেখিয়া মানবের মতি-সম্ভ্রমে শ্রীভগবানের পাদমূলে গমন করে, যদি ঐ দুই বিপরীত শক্তি একই সময়ে ক্রিয়াশীল ভাবে না থাকিত, তাহলে বহির্জগতে ঐ শৃঙ্খলা থাকিত না, এবং তাহা হইলে বিভূর সৃষ্টি লীলার ব্যতিক্রম হইত বলিয়াই বোধ হয়।

বিপরীত শক্তি দ্বয়ের শুভ-ফল

অন্তর্জগতেও অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা নামক বিপরীত শক্তিদ্বয় থাকাতে হিতসাধনই হইয়াছে।

অন্তর্জগতে যদি কেবল বহিরঙ্গাই থাকিত তাহা হইলে জীব ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিন্নাভ্রের ন্যায় বিনষ্ট হইত। 'উভয়বিভ্রষ্ট ছিন্নাভ্র ইব নশ্যতি', অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা ভগবান যখন পতিত জীবকে উদ্ধার করেন, তখন তাঁহার কারুণ্য দর্শন করিয়া ভাবুকের মন মুগ্ধ হয়, সংসারে যদি পাপের সঙ্গে পাপনাশের শক্তিও না থাকিত, তাহলে জীবের পক্ষে ঐ আনন্দ উপভোগের সুযোগ ঘটিত না।

বহিরঙ্গা শক্তি মোটেই না থাকিয়া সংসারে যদি কেবল অন্তরঙ্গাই থাকিত, তাহলে সকলেই ব্রহ্মের তুল্য হইত; উৎকৃষ্ট হইলেও এই অবস্থা যে সম্পূর্ণ নিখুঁত বস্তু, তাহা বলা যাইতে পারে না। একই রকমের অবস্থা দ্বারা রসপুষ্টি হয় না; বৈচিত্র্য দ্বারাই রসের উৎকর্ষের প্রকটন হয়, অর্থাৎ বৈচিত্র্য (diversity) থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন রসের মধ্যে পরস্পরের সহিত তুলনা সম্ভবপর হয়; এবং এই তুলনা দ্বারা মধুর রসের উৎকর্ষ ভালরূপে অনুভব করিতে পারা যায়। এইজন্য সংসারে পঞ্চ-রসের সৃষ্টি হইয়াছে।

সুখ-পুষ্টি—কেবল রস-পুষ্টির কথাই বলি কেন, বিপরীত শক্তি থাকাতে মানবের সুখেরও পুষ্টি হয়। বহিরঙ্গার দুঃখ অনুভব করাতে মানব সুস্পষ্টভাবে অন্তরঙ্গার সুখের উৎকর্ষ অনুভব করার সামর্থ্য লাভ করে। যাঁহারা পূর্ব্বে অভাব অনাটনের কষ্ট অনুভব করিয়াছেন, সচ্ছল অবস্থার সুখ যে কত মধুর তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। যাঁহারা জন্মাবধি 'বড় লোকের ছেলে' হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে সুস্বাদু খাদ্য পেয় এবং অপর অনেক দুর্লভ বস্তু 'stale', অর্থাৎ বাসী জিনিসের ন্যায় বিস্বাদ, বোধ হওয়াতে, তাঁহারা ঐ সকল বস্তুর পূর্ণ মাধুর্য্যের আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতায় বঞ্চিত হন।

কিন্তু যাঁহারা আত্মশক্তি প্রভাবে দারিদ্র্য-দশা হইতে সচ্ছল অবস্থায় উঠিয়াছেন, তাঁহারা ভোগের উপকরণের মধ্যে যে মধুর রস নামক ভগবদ্বিভূতি দর্শন করেন, বড়লোকের সন্তানের পক্ষে ঐ বিভূতি দর্শন করার সৌভাগ্য অনেক স্থলেই হয় না। এই ক্ষেত্রে সাংসারিক সচ্ছলতায় diversity অর্থাৎ বৈচিত্র্য থাকাতে রসপুষ্টি হইল, এই কথাই বলিতে হইবে। অতএব শ্রীভগবানের 'ঐশ্বর্য্যের' সুস্পষ্ট অনুভূতি লাভের সুযোগ উৎপাদনের জন্য অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তির যুগপৎ কার্য্যেরই প্রয়োজন।

'জ্ঞানের' স্ফুরণ—যে 'জ্ঞান' স্বয়ং ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহার উপলক্ষেও বলি যে, আলোক এবং আঁধারের পরস্পর তুলনা দ্বারাই আলোকের উৎকর্ষ অনুভূত হয়। সংসারে যদি বহিরঙ্গার অন্ধকার ভেদ করিয়া অন্তরঙ্গার সমুজ্জ্বল প্রভার প্রকটন না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ জ্ঞান যে কত সমুজ্জ্বল, জীব তাহার উপলব্ধি করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইত। 'সান্দ্রাম্বুদাভ' শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে থাকাতে 'হেমবরণী' শ্রীরাধার কান্তির উৎকর্ষ যেরূপ সুমধুর হয়, বহিরঙ্গার সহিত উপমায় অন্তরঙ্গা (অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান) তেমনি সমুজ্জ্বল এবং সুমধুর ভাব ধারণ করে।

বহির্জগতে molecular Attraction ও Repulsion শক্তিদ্বয় দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, অন্তর্জগতে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা দ্বারাও তাহার অনুরূপ কার্য্যই হইতেছে।

মীমাংসা

অন্তর্ এবং বহির্জগতের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, শ্রীভগবান নিজের বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বিপরীত ভাবে ক্রিয়াশীল করিয়া অন্তর্জগতের লীলা সম্পাদনের জন্য 'অন্তরঙ্গা' এবং 'বহিরঙ্গা' নামে, এবং বহির্জগতের জন্য molecular Attraetion এবং Repulsion নামে ঐ শক্তির প্রকটন দ্বারা, আপনার সংসার লীলার রসপুষ্টি সম্পাদন করিতেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই শক্তি-চতুষ্টয়ের ক্রিয়ায় বৈপরীত্য থাকিলেও, চরমে তাহাদের দ্বারা জীবের হিতসাধনই হইতেছে।

যে বহির্জগৎ জীবের লীলাক্ষেত্র তাহাতে Attraction এবং Repulsion শক্তিদ্বয় আছে বলিয়াই ঐ জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে ; পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, সংসারে কেবল Repulsion শক্তি মাত্র থাকিলে জগৎ ছিন্ন ভিন্ন হইত ; এবং যদি কেবল Attraction শক্তিই থাকিত তাহা হইলে জগৎ এক বিরাট স্তূপে পরিণত হইত। সৃষ্টিতে এখন যে সুমধুর harmony দেখা যায়, উভয় শক্তি ব্যতীত তাহা থাকিত না। অতএব এই শক্তিদ্বয়কে সৃষ্টি লীলার প্রধান সহায়ই বলিতে হইবে।

এই পুস্তকের নানা স্থানে বলা হইয়াছে যে, বহিরঙ্গা দ্বারা অন্তরঙ্গার পুষ্টি সম্পাদিত হইতেছে, এবং বহিরঙ্গা যাহাতে অন্তরঙ্গায় পরিণত হয়, তাহারও সুচারু ব্যবস্থা সৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

যে জগৎ ভগবানের 'স্থূলরূপ' বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা ব্যতীত সৃষ্টি লীলা সুচারুভাবে সম্পাদিত হইতে পারিত না। যে শক্তিদ্বয় দ্বারা 'সংসারের' সংরক্ষণ হইতেছে, এবং অন্তর্জগতে যে শক্তিদ্বয় দ্বারা সুখের এবং রসের পুষ্টি হইতেছে, ঐ শক্তি চতুষ্টয় ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ রূপ বলিয়াই অনুমিত হয়, এবং তাহারা বিভূর সৃষ্টি লীলার মুখ্য অঙ্গ।

পঞ্চম অধ্যায় (প্রথম অংশ)

মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ

পরম পুরুষার্থ পদের অর্থ

পূর্ব্বে নানা স্থানে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের জীবনীশক্তি বাসুদেব নামে সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে 'পুরুষ' (পুরে = সর্ব্ব বস্তুতে + শেতে = অবস্থান করেন + যঃ = যিনি, তিনি 'পুরুষ') আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে 'পুরুষার্থ' পদের ব্যুৎপত্তির আলোচনা করা যাক্।

পদটীর ধাত্বর্থ—যে বস্তু পুরুষের অর্থ = প্রয়োজন, তাহাই 'পুরুষার্থ' পদবাচ্য। বাসুদেব 'আত্মারামঃ পূর্ণকামঃ নিজ লাভেন নিত্যদা', অর্থাৎ যে 'চিৎ' এবং 'আনন্দ' নামক বস্তুদ্বয় বাসুদেবের 'আত্মা' = স্বরূপভূত বস্তু, তাহাতেই তিনি 'রমতে' = আনন্দিত হন, এবং 'নিজলাভেন' = যে চিদানন্দ তাঁহার 'নিজ' = 'নিজস্ব' অর্থাৎ স্বরূপভূত বস্তু, তাহার 'লাভেন' অর্থাৎ ঐ 'চিৎ' এবং 'আনন্দ' নামক বস্তুদ্বয় পাইলে, তিনি 'পূর্ণকামঃ' হন, তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হয়।

অতএব কাহারও চিত্তে বিশুদ্ধ ভাবে চিদানন্দের প্রকটন হইলে বাসুদেব যেন নিজেই ঐ বস্তুদ্বয় পাইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া পরিতৃপ্ত হন। বাসুদেব ত স্বয়ংই 'চিদানন্দ' স্বরূপ, তিনি আবার ঐ দুই বস্তু কিরূপে পাইবেন ? প্রশ্নটীর উত্তর এই যে, বাসুদেব সর্ব্বদেহে অবস্থান করেন, সুতরাং কেহ যখন কোন বস্তু লাভ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে বাসুদেবই ঐ বস্তু লাভ করেন। অতএব কাহারও চিত্তে চিদানন্দের স্ফুরণ হওয়া বাসুদেবের দ্বারা নিজস্ব বস্তু লাভের তুল্য। সেইজন্য ঐ চিদানন্দ লাভ দ্বারা তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হয়।

চলিত অর্থ—যে বস্তুকে লাভ করা কাহারও জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, চলিত ভাষায় তাহাকেই পরম পুরুষার্থ

বলে। ঐ শ্রেষ্ঠতম বস্তুটী কি? অর্থাৎ মানব নানা বস্তু কামনা করিলেও কোন্ বস্তুটী তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম? অর্থাৎ কোন্ বস্তু লাভ করিলে তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হওয়াতে তাঁহার মনে আর কোন উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য কামনা থাকে না, তাহাই নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

সকল ভোগ বাসনার মধ্যেই সুখের কামনা থাকে

মানব যে কোন ভোগের বস্তুকে কামনা করুন না কেন, ঐ সকল বস্তুতেই সুখ লাভের বাসনা অন্তর্নিহিতভাবে থাকে; অর্থাৎ অমুক বস্তুর লাভ হইলে আমি সুখ পাইব, এই আশার বশেই মানব সেই বস্তুকে পাইতে চায়। ঐ সকল ভোগবাসনায় যে সুখের কামনা করা যায় তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ্য সুখ।

অতএব দেখা গেল যে, সুখের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের ভোগবাসনার কারণ, এবং সুখলাভ করাই সর্ব্ববিধ বাসনার চরম লক্ষ্য।

কেন মানবের মনে প্রবলভাবে সুখের কামনা দেখা যায়? তৃতীয় অধ্যায়ে ভোগবাসনা তত্ত্ব বিচার করার সময়ে এই বিষয়টীর আলোচনা উপলক্ষে বলা হইয়াছে যে, মানবের মনরূপা প্রকৃতি ভোগ্য বস্তুতে অধিষ্ঠিত সুখস্বরূপ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইতে চান, এই মিলনের আকাঙ্ক্ষাই ভোগবাসনার কারণ। এবং মনরূপা প্রকৃতি ও পুরুষের, অর্থাৎ সুখ স্বরূপ বাসুদেবের, মধ্যে যে নিত্য এবং দুর্ভেদ্য প্রেমের বন্ধন আছে, সেই বন্ধনের আকর্ষণী শক্তি হইতেই জীবের মনে ভোগ্য বস্তু লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মায়।

সকল ভোগবাসনার মধ্যেই সুখকামনা দেখা যায়; এবং মানব যখন কোন ভোগসুখ কামনা করেন, তখন ভোগসুখের যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়াও, তিনি ঐ প্রচ্ছন্ন সুখের আকারে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ সুখকেই চান।

কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারাই এই তত্ত্ব অনুভব করা যায় ; কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে ঐ জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, তখন মানবের মন এবং বুদ্ধি 'ভেদমোহ' (৩২-৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, অতএব মানব নিজে কি বস্তু, এবং তিনি যে সুখের কামনা করিতেছেন সেই সুখই বা কি বস্তু, মোহান্ধ মানব তাহা অনুভব করিতে পারেন না।

যাহা 'জীবের' যথার্থ স্বরূপ তাহা যে 'পরা', প্রকৃতি, এবং বাসুদেব যে সকল ভোগ্য বস্তুতেই অধিষ্ঠিত আছেন, ভোগসুখ যে বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপ বাসুদেবের প্রচ্ছন্ন বেশ—জ্ঞানের নিরোধ হওয়াতে মানব এই সকল গূঢ় তত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে (বিশেষতঃ ৩০-৩৭ পৃষ্ঠায়) যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে, এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, পুনরায় এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইল না।

সুখ কামনা করিয়াও মানব কি সুখ পায় ?

কাম্য বস্তুটী লাভ করার পূর্ব্বে মানবের কি অবস্থা হয় তাহাই প্রথমে দেখা যাক্। কাম্য বস্তু লাভের পূর্ব্বে নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এবং তাহা হইতে মানব বহু কষ্ট এবং বহু যাতনা ভোগ করে। মনে কর যে, সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাম্য বস্তুটী পাওয়া গেল, তথনও কি ভোগকালে সুখ থাকে ?

(ক) ভোগসুখের বিনাশ—লব্ধ বস্তুটী ভোগের সময়ও কালরূপী শ্রীভগবান, তাঁহার গুণত্রয় এবং সংস্কার দ্বারা ভোগকামীর মনে এমন কতক গুলি নূতন বাসনার উদয় করেন যে, কি প্রকারে ঐ নূতন বস্তু সকল লব্ধ হইবে, মানব সেই চেষ্টাতেই ব্যাকুল হয়। এই নূতন বাসনা ভোগকামী মানবের চিত্তকে এত চঞ্চল করে যে, লব্ধ বস্তুটী ভোগ করিয়া তিনি প্রায়ই সুখ পান না।

(খ) আকাঙ্ক্ষার পীড়ন—উপরন্তু ঐ বাসনার অনুসরণ করিতে করিতে তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনা দ্বারা অনেক স্থলেই দারুণ অশান্তি জন্মায়।

এত যাতনা ভোগ করিয়াও তিনি যদি ঐ নূতন বস্তুটী পাইতেন, তাহা হইলেও বা কতকটা সুখ তাঁহার ভাগ্যে জুটিত, কিন্তু ইহাতেও বিঘ্ন হয়—বহু চেষ্টা করিয়াও অনেক সময়েই নূতন বস্তুটী পাওয়া যায় না ; বরঞ্চ পূর্ব্বে লব্ধ বস্তুটীও ঐ চেষ্টায় বিনষ্ট হয়। দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাগুলি বিশদ করা যাক্।

(১) অশান্তি—ঘোড়দৌড়ে কেহ কেহ অল্প টাকায় বাজী (small bet) জিঁতিয়া কিছু টাকা পাইলে কিম্বা ছোট রকম 'ফটকা' নামক Speculation করিয়া কিছু টাকা পাইলে, অনেকেরই মনে 'আরও টাকা চাই' এই বাসনা এত প্রবল হয় যে, পূর্ব্বে প্রাপ্ত ধন দ্বারা আর তাঁহাদের মনে সুখ হয় না। বরঞ্চ কিছু ধনলাভ হওয়ার ফলে আরও অধিক ধন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া তাঁহাদের মনে এত অশান্তির উৎপাদন করে যে, দৈন্য দশায়ও ধনের অভাব বশতঃ তাঁহাদের তত অশান্তি হয় নাই।

আকাঙ্ক্ষা চিত্তকে এতই বিক্ষোভিত করে যে, যিনি কখন দশটী টাকর মুখ এক সঙ্গে দেখেন নাই, তিনি যদি বিনা আয়াসে, অর্থাৎ Speculation প্রভৃতি উপায়ে, দশ হাজার টাকাও পান তাহলে সুখ [অথবা ঐ ধনদাতা ভগবানের প্রতি আন্তরিক ভক্তি] হওয়া ত দূরের কথা, কিসে আরও অধিক টাকা পাইব এই চিন্তা হইতেই তিনি পূর্ব্বের দারিদ্র্য-দশা অপেক্ষা অধিক অশান্তি ভোগ করেন। ইহাকেই ইংরাজী ভাষায় penalty of prosperity বলে।

(২) ধনক্ষয়—এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়, তাঁহারা পূর্ব্ব-লব্ধ ধন দ্বারা পুনরায় ঘোড়দৌড়ের বাজীতে বা 'ফটকার খেলায়' আরও বেশী পরিমাণে 'কাজ' করিয়া প্রচুর ধনার্জ্জনের চেষ্টা করেন। নূতন 'কাজ'

করার সময় পূর্ব্ব-লব্ধ বিত্তকে পুনরায় লোকসানের ঝোঁকের (risk) মধ্যে ফেলিয়াই সকলে নিরস্ত হন না, কেহ কেহ ঋণ দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়াও ঐ কাজে লাগান। তখন তাঁহারা লাভের স্বপ্নে এতই বিভোর থাকেন যে, তাঁহাদের ঘোড়া যদি না জিঁতে কিম্বা ফটকার বাজার যদি বিপরীত ভাবে চলে, তাহলে যে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, এই চিন্তা আর তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। আশা এতই বুদ্ধি বিপর্য্যয় উৎপাদন করে যে, আমি নিশ্চয় জিঁতিব এই ধারণা যেন 'নিশ্চয়াত্মিকা' বুদ্ধির রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের মনে একাধিপত্য স্থাপন করে।

কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আকাঙ্ক্ষার এই উন্মাদতার ফলে অনেকে দারুণ শাস্তি ভোগও করেন। ঘোড়দৌড়ের বাজিতে 'হার' হয়, 'ফটকা'র বাজারও তাঁহাদের আশার বিপরীত ভাবে চলে। এই সকল ঘটনা মোটেই বিচিত্র নয়—কারণ আকাঙ্ক্ষা রাজসিক বস্তু, ইহা প্রবল হইলে বুদ্ধির সাত্ত্বিক বিচার-শক্তির হ্রাস হয়; অতএব রজোগুণ ঐ সকল লোকের মতিভ্রম উৎপাদন করিয়া কার্য্যগুলি 'উলটা' ভাবেই করায়। এই মতিভ্রমের ফল দাঁড়ায় এই যে, ঐ সকল লোকের পূর্ব্ব লব্ধ ধন ত নষ্ট হয়ই, তাহা ছাড়া ঋণ শোধ করিতে অনেকের ঘরের টাকাও বাহির হইয়া যায়।

(৩) সুখের বদলে দুঃখ—অতএব এই সকল লোকের ভাগ্যে সুখের বদলে দারুণ দুঃখই হয়। তাই ভাগবত বলেন যে,—

> যমযমর্থমুপাদত্তে দুঃখেন সুখহেতবে।
> তং তং ধুনোতি ভগবান্, পুমান শোচিতি যৎকৃতে ॥

উপরে প্রবল কামনা হইতে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ মানসিক দুঃখের কথা বলা হইল। প্রবল ভোগবাসনা হইতে কখন কখন আধিদৈবিক বিপদ অর্থাৎ প্রিয় বস্তু অথবা প্রিয় ব্যক্তির বিনাশও ঘটে, এবং মানব তাহা হইতে শোক পায়।

(খ) ভোগশক্তির অভাবে অশান্তি—যাঁহাদের এইপ্রকার কোন্

বিঘ্ন হয় না, তাঁহারাও যে অনাবিল সুখ পান, তাহাও নয়। অপর এক ভাবে তাঁহাদেরও অশান্তি জন্মায়।

মানব-দেহের ভোগ-ক্ষমতা অসীম নহে, উহা সসীম, অর্থাৎ কতক পরিমাণ সুখ ভোগ করার পরে দেহের ইন্দ্রিয়গণ ভোগকার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তখন আপন গৃহে ভোগের বস্তু রহিয়াছে কিন্তু নিজের ভোগ ক্ষমতা না থাকাতে ঐ উপাদেয় বস্তু সকল অভুক্ত ভাবে পড়িয়া আছে, ইহা দেখিয়া ভোগকামীর মনে সুখের বদলে কেবল দুঃখই হয়।

আহার এবং মৈথুন শক্তি হ্রাস হওয়ার পরে ভোগরত মানবের এইপ্রকার দুরবস্থা হয়ত অনেকেই দেখিয়াছেন। জরা যখন ভোগকামীর দেহকে আক্রমণ করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে অপটু করে, তখন নিজগৃহের সকল ভোগের বস্তুই সেই বৃদ্ধের পক্ষে যাতনার উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। এই যাতনা দ্বারাও ভগবান ভোগরত মানবকে নূতন ভাবে শাস্তি দেন।

(গ) অতৃপ্তি—এই সকল অশান্তি ছাড়াও ভোগকালে অপর এক শ্রেণীর বাসনার উদয় হইয়া যে অতৃপ্তি জন্মায় তাহা হইতেও সুখে বিঘ্ন হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভোগ্যবস্তুর অন্বেষণের সময় অপর অপর বহু বাসনার উদয় হইয়া মানবকে অস্থির করে। ভোগের সময়েও,'অমুকের ইহা অপেক্ষাও ভাল জিনিস আছে, আমারও তাহাই চাই,' আমার 'অমুক অমুক বস্তু চাই', 'এই বস্তু পেয়েছি বটে কিন্তু আরও বেশী চাই', 'ইদমস্তি ইদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনং'; ইত্যাদি ইত্যাদি আকারে মনে বহু বাসনার উদয় হওয়াতে, লব্ধ বস্তুকে ভোগ করিয়াও বেশী সুখ হয় না, এবং তৃপ্তি, অর্থাৎ ভোগবাসনার সম্পূর্ণ উপশম, কিছুতেই হয় না।

তাই দেখা যায় যে, মানব ভোগসুখের কামনা করেন বটে কিন্তু কাম্য বস্তু পাইয়াও তাঁহার সুখ হয় না, বরঞ্চ সুখ এবং দুঃখের হিসাব নিকাশ করিলে মানব দেখিতে পান যে, সুখ অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ

অনেক বেশী হইয়া দাঁড়ায়। তথাপি অবিদ্যার এবং সংস্কারের প্রতাপ এতই প্রবল যে, মানব সুখকে ছাড়িয়া দুঃখকেই বরণ করে।

(ঘ) দুঃখের প্রতিকারেই সুখের জ্ঞান—ভোগ সুখের আকাঙ্ক্ষা মানবকে এতই মোহিত করে যে, দুঃখ ভোগের সময়েও তিনি ভাবেন যে যদি আমি কেবল এই দুঃখটীকে কোনরূপে দূর করিতে পারি তাহলে পরে নিরবচ্ছিন্ন সুখই পাইব। সংসারে যে একটী দুঃখের অবসান হইতে না হইতেই অপর একটী দুঃখ উপস্থিত হয়, মানব এই কথা জানিয়াও কার্য্যকালে তাহা ভুলিয়া যান। সুখের বাসনার মাদকতা এই স্মৃতিবিভ্রম উৎপাদন করে। অতএব সেই ভাবী সুখের আশায় উপস্থিত দুঃখের প্রতীকার কার্য্যই মানবের কাছে 'সুখ' হইয়া দাঁড়ায়। মানবের এই দুর্দ্দশাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলেন যে,—

'কুর্ব্বন্ দুঃখ প্রতীকারং সুখবৎ মন্যতে গৃহী'।

মোটের উপর সংসারী মানবের বরাতে কাম্য সুখ ঘটিলেও তাহা 'ছিটে ফোটা' পরিমাণে আসে। কিন্তু স্তূপাকার আশার মোহেই তিনি 'মসগুল' হইয়া থাকেন।

ভোগ দ্বারা কেন বাসনার নিবৃত্তি হয় না, কেন অতৃপ্তি হয়

পূর্ব্বে ৬৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, যখন আমরা কোন ভোগ-সুখ পাওয়ার জন্য বাসনা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে যে সুখ ব্রহ্মের স্বরূপভূত, তাহারই লাভের জন্য কামনা করি—কারণ সুখ-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন ভাবে সংসারের সকল বস্তুর মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁহার আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে মনরূপা প্রকৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চান; বাসনা ঐ আকর্ষণেরই নামান্তর অথবা ফল। ব্রহ্মের সুখস্বরূপ বিশ্বের সকল বস্তুতেই আছেন; অতএব আমাদের বাসনা কখনও একটী মাত্র বস্তুতে আবদ্ধ না থাকিয়া নানা বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। কারণ নানা বস্তু হইতেই ব্রহ্মের আকর্ষণী শক্তি বাহির হইয়া মনরূপা প্রকৃতিকে নিজের নিজের দিকে টানে।

কেন সকল বস্তুর প্রতিই বাসনা না হইয়া বস্তু বিশেষের উপর আবদ্ধ থাকে, এবং কতক বস্তুর প্রতি বিদ্বেষই বা কেন হয়, তাহা ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। অতএব একটী বাসনা পূরণের সুযোগ হইতে না হইতে, অপর অপর বহু বস্তু লাভের জন্য বহু বাসনার উদয় হয় ; এবং তাহারা প্রবল হইলে তৃপ্তির বদলে মনে অতৃপ্তিই জন্মায়। অতএব ভোগবাসনায় অতৃপ্তি আমাদের চিত্ত বৃত্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

কিরূপ সুখ পাইলে মানবের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়

(ক) যে সুখ 'অখণ্ড' অর্থাৎ যে সুখকে অংশে অংশে ভাগ করিয়া, এখন এইটুকু ভোগ করিলাম, পরে অপর অমুক অংশ ভোগ করিব —এরূপ ভাবা যায় না, অতএব যে সুখকে একই সময়ে এবং সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা সম্ভবপর হয়,

(খ) এবং যে সুখ 'অনন্ত' অর্থাৎ যে সুখের 'অন্ত' (=শেষ) নাই, অতএব ভোগের দ্বারা যাহার অবসান হয় না, সুতরাং চিরদিনই 'অফুরন্ত' ভাবে থাকে,

'অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে পাইতে কে চাহিত আর' ॥

(গ) এবং যে সুখ 'পূর্ণ', অর্থাৎ বিশ্বে যে কোন রকম সুখ থাকিতে পারে সেই সকল রকম সুখই অখণ্ডিত ভাবে যে সুখের মধ্যে অবস্থান করে; সুতরাং ঐ একমাত্র সুখ লাভ করিলেই তাহাতে সকল প্রকার সুখের আস্বাদ পাওয়া যায়,

(ঘ) এবং যে সুখ 'নিরবচ্ছিন্ন' অর্থাৎ যে সুখে অবচ্ছেদ=বিরাম নাই,সুতরাং যে সুখ অবিরাম গতিতে, অর্থাৎ 'একটানা' ভাবে, বরাবরই ভোগ করা যায়, সুতরাং কখনই অভাব বোধ হয় না।

এই প্রকার কোন সুখ যদি থাকে, এবং যদি সেই সুখ পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানবের মনে যে সুখের বাসনা আছে তাহার যথার্থ

তৃপ্তি হইতে পারে। কারণ ঐ সুখ 'পূর্ণ' হওয়াতে সেই এক সুখ হইতে মানব সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুর সুখের আস্বাদ লাভ করেন। ঐ সুখ অখণ্ড হওয়াতে একপ্রকার সুখ ভোগ করায় অপর প্রকার সুখের বাসনার উদয় হইয়া আনন্দের ব্যাঘাত করে না এবং উহা 'নিরবচ্ছিন্ন' হওয়াতে আধি ব্যাধি প্রভৃতি কোন প্রকার ত্রিতাপ, অথবা দৈহিক শক্তিহীনতা, কিম্বা অপর কোন কারণ দ্বারা ঐ সুখের বিঘ্ন হয় না; এবং ঐ সুখ 'অনন্ত' হওয়াতে অপর অপর সুখের ন্যায় ভোগ দ্বারা ঐ সুখ ফুরাইয়া যায় না, সুতরাং সুখের অভাবে নৈরাশ্য হয় না।

মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ

উপরে যে সুখ বর্ণিত হইল তাহাকে ব্রহ্মের সুখ-স্বরূপ বলে; অর্থাৎ এই সুখই স্বয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে 'সুখ-স্বরূপ' বলার ভাবার্থ এই যে, উপরে বর্ণিত সুখই তাঁহার স্ব = নিজের + রূপ = মূর্ত্তি। ব্রহ্ম অরূপ, কিন্তু তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ও সুখ-স্বরূপ; অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং বিমল সুখ তাঁহার রূপের তুল্য। ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কুত্রাপি এই সুখ পাওয়া যায় না। অতএব দর্শন শাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিয়া বলা যায় যে, কেবল 'ব্রহ্ম-দর্শন' লব্ধ হইলেই এই অনন্ত সুখ পাওয়া যায়।

অতএব মীমাংসায় এই দাঁড়াইল যে, অখণ্ড, অনন্ত, পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করাই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ; কেবল 'ব্রহ্মদর্শন' লাভ হইলেই ঐ পুরুষার্থ লব্ধ হয়।

'ব্রহ্মদর্শন' পদ দ্বারা কি বুঝায় তাহাও সংক্ষেপে বলা যাক্—এই পদ দ্বারা চিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের স্বরূপভূত 'চিৎ' এবং 'আনন্দের' স্ফুরণ বুঝায়। তখন বুদ্ধি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভা দ্বারা উদ্ভাষিত এবং মন সেই বিমল আনন্দের সুধা দ্বারা প্লাবিত হয়। ব্রহ্ম অরূপ, তাঁহাকে কোন স্থূল বস্তুর ন্যায় 'দর্শন' করা যায় না; তবে কোন বস্তু চোখে দেখিলে তাহা সম্বন্ধে যেমন সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়, এই অবস্থা লাভ করিলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেইরূপ সুস্পষ্ট জ্ঞান লব্ধ হয়।

পঞ্চম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

লোকে কেন 'পরম পুরুষার্থ' চায় না

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও কেন মানবের বিষয়াসক্তি যায় না

ধর্ম্মতত্ত্বের সার জানা নাই বলিয়া যে সংসারে মানবের দারুণ দুর্দ্দশা হয় তাহা নয়। যাহা ধর্ম্ম-তত্ত্বের সার কথা, তাহা অনেকেই পড়িয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রীয় উপদেশ অন্তরে প্রবেশ না করিয়া যদি কেবল পাঠকের স্মৃতিতেই অবস্থান করে, তাহা হইলে ঐ উপদেশ দ্বারা পাঠকের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালিত হয় না; কিম্বা তাঁহার আচরণের গতিও নির্দ্ধারিত হয় না।

বুদ্ধিই আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করে। ঐ বৃত্তি সংস্কারের অধীন, অর্থাৎ অবিদ্যার গুণত্রয় হইতে যে সংস্কার সকল সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের দ্বারা মানবের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালিত হয়। সংস্কারের শক্তি অত্যন্ত প্রবল, এবং শাস্ত্র হইতে শক্তি সংগ্রহ করিলে সংস্কারের শক্তিকে অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়। অতএব পাঠের সময় যদি আমাদের মতি শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে শাস্ত্রের বাক্যের মধ্যে যে সত্ত্বগুণ নিহিত থাকে তাহা পাঠকের বুদ্ধির মধ্যে আপন শক্তিকে সঞ্চারিত করে; এবং এই ভাবেই শাস্ত্র হইতে শক্তি সংগ্রহীত হয়।

যদি শাস্ত্রের আদর্শের অনুসরণ করিয়া আপন আপন চরিত্রকে গঠন করিতে আকাঙ্ক্ষা না করি, যদি কেবল পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা অথবা বিচারে নৈপুণ্য লাভ করাই শাস্ত্র-পাঠ বা শ্রবণের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের চরিত্রগঠনের জন্য, অথবা সংস্কারের শক্তিকে প্রতি-রোধের জন্য, আমাদের বুদ্ধির মধ্যে শাস্ত্র হইতে নবীন শক্তি প্রবেশ করে না, শাস্ত্রের বাক্যও আমাদের বুদ্ধিতে স্থান পায় না। কেবল যুক্তি তর্কের সময় ঐ সকল কথা আমাদের স্মৃতিতে উদয় হয়, এবং

ঐ কার্য্যের অবসানে পদ্মপত্রের উপর পতিত জলের ন্যায় ঐ সকল বাক্য বুদ্ধির বিবেক শক্তির সহিত নির্লিপ্ত থাকে।

ভগবান কল্পতরু, তাঁহার কাছে যে যাহা চায় তাহাকে তিনি তাহাই দেন। আমরা যখন পাণ্ডিত্যের চাকচিক্যে (glitter) অথবা তর্কনৈপুণ্যের তড়িৎপ্রভা (flash) কামনায়, শাস্ত্র পাঠ করি তখন তাহা লাভের জন্য বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু যখন স্বয়ং ভগবানের আদর্শের অনুযায়ী চরিত্র গঠনের জন্য শাস্ত্র পাঠ করি, তখন আমরা যে জ্ঞান ও উৎকর্ষের প্রভা কামনা করি, সেই শোভা শারদাকাশের পূর্ণচন্দ্রে নাই, অথবা স্বর্গেও নাই, 'ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতা-মুপর্য্যধঃ'। ভগবান আমাদিগকে ঐ 'অমর্ত্ত্যদুর্লভ' বস্তুও দান করেন।

কিন্তু বিনা যাতনায় সেই দান গ্রহণের যোগ্যতা জন্মায় না— তজ্জন্য প্রায় সকলেরই, শাস্ত্র অধ্যয়নাদি সাধনার সঙ্গে সঙ্গে, বিপদের দারুণ যাতনা সহ্য করিতে হয়। ঐ বিপদ-তত্ত্বই এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি যে সকল বস্তু দ্বারা শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়, তাহা সকল অপেক্ষা ঘোর বিপদই শ্রেষ্ঠতম ভাষ্য, কারণ বিপদ মহত্তম গুরুর ন্যায় শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থের যথার্থ অনুভূতি উৎপাদন এবং চিত্তে বদ্ধমূল করাইয়া ক্রমশঃ বিষয়াশক্তির উপশম করায়।

যিনি শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া আপন চরিত্র গঠনের আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন,তাঁহার ঐ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যে সকল যোগাযোগ আবশ্যক হয়, ভগবান নিজেই তাহার ব্যবস্থা করেন। এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া মাত্র তাহার পুরণ হয় না; পূরণের পূর্ব্বে অর্থবোধে বিঘ্ন ছাড়াও কাহার কাহারও রোগ শোকাদির আকারে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়; (সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সকল আপন আপন গুণের দ্বারা পাঠকের বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া থাকাতে, শাস্ত্রের অর্থ বা ভাব বোধে বিঘ্ন এবং অপর অপর বিঘ্নও জন্মায়।

লোকে কেন আপন অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকে

যিনি যখন যে যোনিতে জন্মান, অথবা যখন যে অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অনেকের মনে সেই অবস্থার প্রতিই সন্তোষ থাকে। বোধ হয় যে, বিষ্ঠা-ভোজী নরকের কীটও মনে করে যে, সে বেশ সুখেই আছে, 'নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়া বিমোহিতঃ'। তমোগুণ হইতেই এই 'সন্তোষ' জন্মায়। তামসিক মোহের প্রভাবে চিত্তের জড়তা, অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্যতা, এবং নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট ভাব জন্মায়।

মোহের বশে লোকে তখন আপন আপন আলস্যকে অলীক সন্তোষের আবরণ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আত্ম প্রবঞ্চনা করে। যাহা প্রকৃত সন্তোষ তাহা আর তখন চিত্তে থাকে না বলিলেও চলে। প্রকৃত সন্তোষ সাত্ত্বিক বস্তু, উহাতে আনন্দ এবং ক্রিয়াশক্তি থাকে। ঐ সকল তামসিক মানবের মন পশুভাবাপন্ন অবস্থায় থাকে; অর্থাৎ তাহাতে আনন্দ কিম্বা কর্ম্মপটুতা থাকে না, তাহারা যে অবস্থাকে সন্তোষ বলে উহা কেবল জড়তার বিভোরতার অপর নাম।

Divine Discontent

সত্ত্বগুণ হইতে যে 'যদৃচ্ছালাভের' সন্তোষ জন্মায়, তাহাতে যে আনন্দ থাকে উহা সুখ স্বরূপের অংশ, এবং তাহাতে যে কর্ম্মপটুতা থাকে তাহা সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তির প্রকটন।

যে রাজসিক ভাব, আত্মশক্তি অর্থাৎ ambition দ্বারা, আপন সাংসারিক ব্যাপারে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিয়া, লোকের মনে আপন অবস্থার প্রতি অসন্তোষ উৎপাদন করে, সেই অসন্তোষ উপরোক্ত তামসিক সন্তোষের অবস্থা অপেক্ষা বরঞ্চ ভাল। অসন্তোষের সময় রজোগুণ প্রবল হয় বটে কিন্তু সাধনা দ্বারা উহা সত্ত্বগুণে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কাহারও মনে রজোগুণ প্রবল হইলে তাঁহার সংশোধন অসাধ্য হয় না।

কিন্তু কাহারও চিত্তে যদি তমোগুণ প্রবল হইয়া জড়তা উৎপাদন করে, তাহলে তাঁহাকে সাত্ত্বিক অবস্থায় উন্নত করা সুদূর-পরাহত

ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। রাজসিক অসন্তোষকে সংশোধনের জন্য মানবের পুনঃ পুনঃ বিপদ হয়, এবং তখন কেহ কেহ ধনে প্রাণে মারা যাওয়ার অবস্থায় পতিত হন। কেবল একবার নয়, কেহ কেহ বারম্বার এই অবস্থায় বিনিক্ষিপ্ত হন। এই প্রকার বিপদ হওয়াও অল্প সৌভাগ্য নয়। পুনঃ পুনঃ বিপদের তাড়নায় ঐ অসন্তুষ্ট মানবের মতি সাধনমার্গে গমন করে, এবং ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে রজোগুণের উপশম হইয়া সত্ত্বগুণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে; তখন অসন্তোষ দূর হইয়া 'যদৃচ্ছালাভে' সন্তোষ ও সেই সঙ্গে আত্মোন্নতি হয়। অতএব রাজসিক অসন্তোষকে 'Divine' বলা অসঙ্গত নয়—শ্রীভগবানই এই অসন্তোষের আকারে আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া চরমে মঙ্গল সাধন করেন।

যে বিপদ দ্বারা অসন্তোষ সন্তোষে পরিণত হয়, তাহা ভোগ করিবার অধিকারী হওয়া সময় সাপেক্ষ। তাহার পূর্ব্বে ন্যূনাধিক বিপদ দ্বারা মানব ঐ অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। রাজসিক অসন্তোষ সাত্ত্বিক সন্তোষের সোপান। অতএব ইহা তামসিক 'সন্তোষ' নামক জড়তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু।

মীমাংসা

অতএব যখন কেহ অখণ্ড, অনন্ত, পূর্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ না চাহিয়া নিজে যখন যে অবস্থায় থাকেন তাইতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তখন দেখা উচিত যে, তাঁহার ঐ অবস্থা অবিদ্যার মোহের প্রভাবে জন্মিয়াছে, অথবা উহা যথার্থ বৈরাগ্য। অবিদ্যাও অনেক সময় সত্ত্বগুণের রূপ ধরিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করে।

আমরা কখন কখন তামসিক মোহের বশে আপন আপন আলস্যকে সাত্ত্বিক সন্তোষের লক্ষণ মনে করি, এবং এই ভ্রান্ত ধারণাটীকে সাদরেই পোষণ করি।

ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

মানবের মোহ, এবং মোহের ফল

কিরূপে মোহের উৎপত্তি হয়

'মন' ও 'বুদ্ধির' কার্য্য—আমাদের 'মন' এবং 'বুদ্ধি' নামক বৃত্তিদ্বয় দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল পরিচালিত হয়। মন সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক; অর্থাৎ মনে নানাবিধ বাসনার উদয় হয়। বুদ্ধির বিচার-শক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং 'বিজ্ঞান' শক্তিও আছে। 'বিজ্ঞান' পদ দ্বারা বিশিষ্ট (perfect) জ্ঞান অর্থাৎ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অবধারণ করার সময়ে অভ্রান্ত ভাব বুঝায়।

বুদ্ধিতে যে ক্রিয়াশক্তি আছে তাহা 'অহঙ্কার' তত্ত্বের রাজসিক অংশ হইতে, এবং যে 'বিজ্ঞান' শক্তি আছে, তাহা ঐ তত্ত্বের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধি যে প্রেরণা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করে, তাহা রজোগুণ হইতে, এবং যে বিবেক দ্বারা ভাল-মন্দ বিচার করে, সেই শক্তি সত্ত্বগুণ হইতে জন্মায়।

যাঁহার বুদ্ধিতে 'বিজ্ঞান' শক্তি অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকে, তিনি বিচার শক্তি প্রয়োগের সময় ব্রহ্মের চিদাভাষের (light of knowldge) দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে, কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য অবধারণা করার সময় পথভ্রষ্ট হন না।

<u>সংস্কারের প্রতাপ</u>—এই পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে সংস্কার সকলের কার্য্য আলোচনা উপলক্ষে বলা হইয়াছে যে, গুণত্রয় হইতে অসংখ্য সংস্কার জন্মিয়া বুদ্ধির উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে; এবং ঐ সংস্কার সকলের বলবত্তা অনুসারে বুদ্ধির বিচারশক্তি পরিচালিত হয়। সংস্কারের মধ্যে বাসনা থাকে, অতএব যে সংস্কার সমষ্টি লিঙ্গদেহ নামে অভিহিত হয়, সেই দেহকে 'বাসনাময়' দেহও বলা যায়।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণই সংস্কার-রূপে লিঙ্গদেহে

অবস্থান করে। যখন কোন সাত্ত্বিক সংস্কার প্রবল হয়, তখন তাহা দ্বারা বুদ্ধির 'বিজ্ঞান' শক্তি পুষ্ট হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি তখন আর কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য অবধারণে ভ্রমে পড়ে না। কিন্তু কোন রাজসিক বা তামসিক সংস্কার প্রবল হইলে, তাহা বিজ্ঞান-শক্তির মূলীভূত সত্ত্বগুণকে অভিভূত করে, অতএব কোন্ কার্য্য ভাল এবং কোন্ কার্য্য মন্দ, তাহা বিচার করার সময় বুদ্ধি তখন ভ্রমে পতিত হয়।

মোহের উৎপত্তি—পরস্পরকে অভিভূত করাই গুণত্রয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই কারণেই বিপরীত গুণযুক্ত সংস্কার সকল পরস্পরকে অভিভূত করে। যখন কোন রাজসিক বা তামসিক সংস্কার অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন তাহা দ্বারা বুদ্ধির বিবেক শক্তি সম্পূর্ণ অভিভূত হওয়াতে বুদ্ধি হিতাহিত বিচার করিতে অক্ষম হয়, এবং ঐ সংস্কার বুদ্ধিকে যে দিকে চালায় বুদ্ধি সেই দিকেই চলে, বুদ্ধির এই অক্ষম অবস্থাকে মোহের অবস্থা বলে।

'মোহান্ধকার'—এই অবস্থায় বুদ্ধির উপর জ্ঞানের আলোক না পড়াতে বুদ্ধির ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থার নাম 'মোহান্ধকার'।

মোহের দার্শনিক ব্যাখ্যা।

'বৃত্তিসারূপ্য মিতরত্র', এই পাতঞ্জল সূত্র হইতে মোহের কারণ অবগত হওয়া যায়। আমাদের মানসিক বৃত্তি যখন যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, দর্পণ-তুল্য স্বচ্ছ চিত্তে তখন তাহাই প্রতিভাত হয়; এবং যখন আমাদের চিত্তবৃত্তি প্রগাঢ় ভাবে কোন বস্তুতে নিবদ্ধ হয়, তখন তাহার রূপ গুণ প্রভৃতি অতি সুস্পষ্ট (vivid) ভাবে চিত্ত রূপ দর্পণে প্রতিফলিত হওয়াতে, চিত্ত তাহার সহিত সমানরূপতা প্রাপ্ত হয়; এবং অপর কোন বিষয়ের ছবিই আর তখন প্রতিফলিত হয় না। কৃষ্ণবিরহে ক্রমশঃ তদাত্ম্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া গোপীগণ 'নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ। এই অবস্থাকে চলিত কথায় 'আত্মহারা' ভাব বলে। প্রেমের 'বিভোরতা' এই নিয়মের বশেই উৎপন্ন হয়, এবং সমাধির

১০

অবস্থাও এই নিয়মের ফল। যখন কোন সংস্কার অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন তাহা নিজের প্রেরণা দ্বারা বুদ্ধিকে ঐ সংস্কারেই আবদ্ধ রাখে; এবং বুদ্ধি ঐ সংস্কারের সহিত সমানরূপতা প্রাপ্ত হওয়াতে, 'বৃত্তিসারূপ্য' নিয়মের প্রভাবে, বুদ্ধির অপর অপর কার্য্য তখন স্থগিত হয়, সুতরাং বুদ্ধি তখন হিতাহিত বিচার করিতে অক্ষম হয়।

মোহের বশে মানবের দিশাহারা ভাব

বুদ্ধির এই অবস্থা হইলে প্রবল সংস্কারের প্রতিপোষক যুক্তিই বুদ্ধিতে উদয় হয়। ঐ সংস্কারের বিরোধী কোন বিষয়ই মন বা বুদ্ধিতে স্থান পায় না। হয়ত ঐ প্রকার কোন সংস্কারের দাস হওয়াতে ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে বিপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু মোহের এতই প্রভাব যে, সেই বিপদের স্মৃতিও ঐ ব্যক্তির বুদ্ধি হইতে বিলুপ্ত হয়। স্মৃতিশক্তি বুদ্ধির বিচার-শক্তির অঙ্গ মাত্র, অতএব বিচার-শক্তি খর্ব্ব হইলে স্মৃতিশক্তিরও হ্রাস হয়।

এইরূপ স্মৃতি-বিভ্রম এবং মতি-বিভ্রমের বহু দৃষ্টান্তই দেখা যায়। কেবল বিড়ালই যে মার খাওয়ার পরেও পুনরায় মাছ খেতে আসে তাহাই নয়। মোহান্ধ মানুষও সময়ে সময়ে বিড়ালের অপেক্ষাও অধম হয়।

<u>রাজসিক মোহ</u>—যখন কাহারও মনে রাজসিক বাসনার একাধিপত্য হয়, তখন ধনাকাঙ্ক্ষা অথবা 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাব (অর্থাৎ 'আমি প্রবল কর্ম্মী', 'আমার শক্তি অদম্য', 'আমি অভ্রান্ত'—এইরূপ ধারণা) এতই প্রবল হয় যে, ঐ লোকটীর মনে পূর্ব্ব বিপদের স্মৃতির উদয় হইলেও তিনি সেই বিপদকে অগ্রাহ্য বা উপহাস করেন। তিনি তখন ঐ বিপদের অগ্নিকে অমৃতের সাগর মনে করিয়া পুনরায় সেই আগুণে ঝাঁপ দেন। এইপ্রকার রাজসিক মোহের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংসারে দেখা যায়। কামিনী কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষার মোহে মানব দিশাহারা হয়।

তামসিক মোহ—যখন কাহারও চিত্ত বৃত্তিতে তমোগুণের কোন সংস্কারের আধিপত্য হয়, তখন আলস্য, ভয়ব্যাকুলতা প্রভৃতি জড়ত্ব ভাবই চিত্তে প্রবল হয়। হয়ত ইহার পূর্ব্বেও ঐ ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিতে নিরুদ্যম এবং নিরুৎসাহভাব প্রবল হওয়াতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তমোগুণের প্রভাবে তাঁহার স্মৃতিবিভ্রম হওয়াতে ঐ সকল অনিষ্টের কথাও তাঁহার মনে আর উদয় হয় না। কাহারও কাহারও মনে উদয় হইলেও, মোহের প্রভাবে তিনি পুনরায় জড়ত্ব ভাবকেই সাদরে আলিঙ্গন করেন।

তামসিক মোহের বশে জড়ত্ব ভাব এতই প্রবল হয় যে, দেখা গিয়াছে, আপন সর্ব্বনাশ হওয়ার সময়েও কেহ কেহ dumb driven cattle এর ন্যায় নিরুদ্যম অবস্থায় থাকেন, আত্মরক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করেন না। এই নিশ্চলতা তামসিক বস্তু; সাত্ত্বিক স্থৈর্য্যেও নিশ্চলতা থাকে; In quietness and confidence shall be thy strength, 'স্থৈর্য্য' এইরূপ নিশ্চলতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্ বস্তু। সাত্ত্বিক স্থৈর্য্য-গুণ একনিষ্ঠ ভাবে ভগবানের উপর নির্ভরতা হইতে জন্মায়; কিন্তু এই জড়ত্ব ভাবে ভগবন্নির্ভরতার লেশ মাত্র নাই; ইহাতে কেবল বুদ্ধির torpor (অর্থাৎ জড়তা) থাকে।

গুণভেদে মানবের কার্য্যেরও পৃথগ্ রূপ

(ক) সত্ত্বগুণের বিভোরতা—সাত্ত্বিক সংস্কার সকল প্রবল হইয়া যখন বাসনা, প্রবৃত্তি, প্রভৃতি উৎপাদন করে, তখন রাজসিক বা তামসিক ভাবদ্বয় যত কম পরিমাণে সত্ত্বগুণের সহিত সংসৃষ্ট থাকে, বুদ্ধির 'বিজ্ঞান' শক্তি ততই প্রবল হয়। 'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে'—ঐ অবস্থায় গীতায় উক্ত ভাব সকল প্রবল হয়।

বিভোরতার বৈশিষ্ট্য—সত্ত্বগুণ হইতেও একপ্রকার মানসিক বিভোরতা জন্মায়। এই অবস্থাকে 'মোহ' বল, বা অপর যে কোন

মধুর নামই দাও না কেন, তখনও রাজসিক বা তামসিক মোহের ন্যায়ই ব্যাপৃতভাব (absorption) থাকে। কাম্য বস্তু লাভে যে বাধা বিঘ্ন হইতে পারে, এই চিন্তাও তখন মানবের মনে স্থান পায় না। গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণই প্রবল হউক না কেন, তাহা যখন মনের বিভোর অবস্থা উৎপাদন করে, তখন মানবের চিত্তে সমাধির দশার তুল্য তন্ময়তা ও তদাত্মতা ভাব জন্মায়।

সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়াই সাত্ত্বিক বিভোর ভাব হইতে মানবের উন্নতি হয়। রজো ও তমোগুণ নিকৃষ্ট বস্তু, তাই তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট বিভোরতা অর্থাৎ 'মোহ' হইতে মানবের অবনতিই হয়।

প্রকৃষ্ট রাজসিক কর্ম্মী

(খ) প্রবল সত্ত্বগুণ সংযুক্ত রজোগুণের মোহ—চিত্তে যখন রজোগুণের সহিত সত্ত্বগুণও প্রবলভাবে থাকে, তখন ক্রিয়াশক্তি এবং 'অহংকর্ত্তৃ'-ভাব প্রবল হয়, এবং মানব তখন বিপদকে বিপদ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না।

লেখক দেখিয়াছেন যে, মৃত্যুভয়ও এই শ্রেণীর কর্ম্মীকে বিচলিত করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি হয়ত পূর্ব্বে ঐরূপ কোন রাজসিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় কার্য্য করিয়া পুনঃ পুনঃ বিপন্ন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, রজোগুণের মোহ অনেক সময়েই ঐ বিপদের স্মৃতির বিলোপ করিয়া সেই ব্যক্তিকে পুনরায় সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। বিপৎকালে কখন কখন মনে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইলেও পূর্ব্ব যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া তিনি অভীষ্ট কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না। আপন শক্তিবলে পুনরায় আপনাকে সমুন্নত করিবেন, এই ধারণাই তাঁহার মনে আধিপত্য করিতে থাকে।

মোহের সময় মানসিক অবস্থা

তাঁহার উৎসাহ উদ্যম এবং কার্য্যের ফল যে আশার অনুযায়ী শুভভাবে না হইয়া বিপরীতও হইতে পারে, যদি বিপরীত হয় তাহলে

আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে, এই চিন্তা তাঁহার মনে অনেক সময়েই উদয় হয় না, উদয় হইলেও তাঁহাকে ব্যাকুল করে না, অথবা মনে বেশীক্ষণও থাকে না। আমি 'বড় বুদ্ধিমান', আমি 'অভ্রান্ত', আমি 'বিরাট কর্ম্মী'—তখন আত্মাভিমান এই সকল রূপ ধারণ করিয়া মনে রাজত্ব করে। অতএব, তাঁহাদের যে ভ্রম হইতে পারে, অভাবনীয় ঘটনা উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদের সকল চেষ্টাকেই যে বিফল করিতে পারে,—তখন এই প্রকার চিন্তা তাঁহাদের মন বা বুদ্ধিতে স্থান পায় না। আত্মাভিমান-জাত মোহ এই উন্মাদ ভাবের কারণ। [এই চিত্র বাস্তব ঘটনা দৃষ্টে অঙ্কিত,ইহাতে মোটেই অত্যুক্তি নাই]। আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান প্রবল থাকাতে এই শ্রেণীর মানবগণ কাম্যবস্তু লাভের জন্য অপরের খোসামোদ করেন না অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন কার্য্যও করেন না।

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা খুবই কম, কারণ কাহারও মনে তমোগুণের মাত্রা অত্যল্প না হইলে এবং সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণও প্রবল মাত্রায় না থাকিলে, ঐ প্রকার আচরণ করা যায় না।

নিকৃষ্ট রাজসিক কর্ম্মী

(গ) প্রবল তমোগুণযুক্ত রাজসিক কর্ম্মী—যাঁহারা রাজসিক কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহাদের অনেকের চিত্তবৃত্তিতেই রজোগুণের সহিত সমধিক পরিমাণে তমোগুণ সংমিশ্রিত হইয়া থাকে। এই সকল মানবের কতকটা কর্ম্মকুশলতা থাকে বটে, কিন্তু তমোগুণের প্রভাবে সেই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে ভয়ই প্রভৃতিও থাকে। সিদ্ধি-লাভে বিঘ্ন হইলে, তাঁহাদের উৎসাহের বৃদ্ধি না হইয়া, ভয়ই জন্মায়। তাঁহাদের মনে পরিশ্রম কাতরতা যে মোটেই থাকে না, তাহাও নয়। এই ভাব তমোগুণেরই ফল।

ফল প্রাপ্তিতে বাধা পাওয়ার পরে তাঁহারা 'ফিকির ফন্দি' মিথ্যা শঠতা প্রভৃতি আচরণ দ্বারা কার্য্যে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করেন।

স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের তোষামোদ এবং নানাপ্রকারে হীনতা স্বীকার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না।

মোট কথা এই যে, চিত্তবৃত্তিতে বেশী পরিমাণে তমোগুণ না থাকিলে লোকে রজোগুণের প্রভাবে উৎসাহবান ও প্রবল কর্ম্মী হন, কিন্তু তমোগুণের আধিক্য থাকিলে কর্ম্মপটুতা কমিয়া যায় এবং প্রতারণাবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

ডাকাইতদিগের মনের অবস্থা

প্রবল রজোগুণের সহিত যখন প্রবল মাত্রায় তমোগুণ মিশ্রিত থাকে তখন কেহ কেহ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের উপর বলপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ঐ সময়ে যাহাদের মনে রজোগুণের আধিক্য থাকে, তাহারা তমোগুণের প্রভাবে বরঞ্চ বল প্রয়োগ করে, কিন্তু শঠতা বা প্রবঞ্চনা করিতে এবং অপরের খোসামোদ করিয়া স্বার্থসাধন করিতে চায় না। তাহারা তমোগুণের প্রভাবে দুষ্কার্য্য করে বটে, কিন্তু তখনও যেন রাজসিক আত্ম-মর্য্যাদার (heroic ভাবের) হানি না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখে। ডাকাইতগণ এই শ্রেণীভুক্ত।

প্রকৃষ্ট রজোগুণের বৈশিষ্ট্য

মোটের উপর যে প্রবল সত্ত্বগুণযুক্ত রাজসিক কর্ম্মী সম্প্রদায়ের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হইল তাঁহারাই অপর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহাদের মনে তমোগুণের মাত্রা খুবই কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে নির্ভীকতা, আত্ম-মর্য্যাদা এবং তাহার সঙ্গে বিপুল কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন, তাহাতে অহঙ্কারের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের 'আবছায়া' দেখা যায়।

বিপদের শুভফল—বিপদের ফলের আলোচনার সময় ক্রমশঃ দেখান হইবে যে, মানবের উন্নতি-সম্পাদনের জন্য বিপদ ঘোরতর রূপ ধারণ করিয়া নির্য্যাতন দ্বারা মানবকে নবজীবন প্রদান করে। ঐ করালরূপের প্রকটন দ্বারা এই শ্রেণীর রাজসিক কর্ম্মিগণকে বিধ্বস্ত

করিয়া বিপদ তাঁহাদিগকে সাধনমার্গে আনয়ন করে; এবং তাহার পরেও বিপদ পুনঃ পুনঃ আপন সংহাররূপ প্রকটন করাতে ঐ কর্ম্মিগণ সাধনমার্গ হইতে বিচ্যুত না হইয়া, প্রগাঢ়ভাবে সাধনাই করিতে থাকেন। অতএব বিপদ দ্বারা তাঁহারা সাধনমার্গে আনীত এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হন।

সংসারে 'সাবধান' মানবের চিত্র

The 'wise and prudent' নামক এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের মনে রজোগুণ প্রবল ভাবেই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তমোগুণও শক্তিমান। তাঁহারা প্রথমে উদ্যম উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন, কিন্তু যদি তখনও বার বার বিপন্ন হন, কিম্বা তাঁহাদের দ্বারা কৃত কার্য্য-সকল নিস্ফল হয়, তাহলে তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া রজোগুণের হ্রাস হয়। এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরে আর তাঁহাদের মনে পূর্ব্বের মত উৎসাহ দেখা যায় না। দেহের পীড়া হইলে মরণের ভয়ে, এবং বৈষয়িক কার্য্যে অল্প বিভ্রাট হইলেও অর্থনাশ কিম্বা সর্ব্বনাশের ভয়ে তাঁহারা ব্যাকুল হন।

বিপদের যে সর্ব্বসংহারক রূপ, প্রকৃষ্ট রাজসিক কর্ম্মীদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া, প্রবল ভাবে কার্য্যের জন্য তাঁহাদের চিত্তে শক্তি সঞ্চার করে—সেই সর্ব্বগ্রাসী করালরূপ দেখিলে এই সকল মানব হয়ত ভয়ে অর্দ্ধমৃত হন। তাইতে এই শ্রেণীর মানবের পক্ষে মৃদু 'চিকিৎসার' প্রয়োজন হয়—অর্থাৎ তাঁহাদের কার্য্যে কতকটা সিদ্ধি এবং কতকটা বিপদ হয়। এই ভাবে জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী 'চিকিৎসা' চলিতে চলিতে যদি ইঁহাদের কাহারও মনে তমোগুণ কম হইয়া প্রকৃষ্ট রাজসিক ভাব প্রবল হয়, তখন তাঁহার পক্ষে প্রচণ্ড বিপদের ব্যবস্থা হয়। মোট কথা, প্রচণ্ড বিপদ ব্যতীত মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র।

তীব্র বিপদ ভোগের শক্তি থাকাও সৌভাগ্য

তাই বলি যে, যে কোন লোকেরই যে ধীরভাবে প্রচণ্ড বিপদ ভোগ করি অধিকার আছে তাহা নয়; ইহাও সৌভাগ্য সাপেক্ষ বিশুর.

শিষ্যগণ স্বয়ং যিশু দ্বারা দীক্ষিত হওয়ার পরে প্রচণ্ড বিপদ ভোগের 'অধিকার' লাভ করিয়াছিলেন। যিশু যে 'সংসারী' মানবগণকে 'wise and prudent' আখ্যা প্রদান করিয়া কতকটা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'সাবধান' অর্থাৎ হুঁসিয়ার লোক; অর্থাৎ তমোগুণ-যুক্ত রাজসিক সম্প্রদায়ের মানব। তাঁহাদের মনে রাজসিক এবং তামসিক ভাবই প্রবল রূপে থাকে।

জনসাধারণের চিত্র

যে রাজসিক কর্ম্মীদিগের মনে তমোগুণ প্রবল, তাঁহারা রজোগুণের বশে প্রথমে কতক পরিমাণ উৎসাহ উদ্যমের সহিত কাজ করেন, কিন্তু তমোগুণের আধিক্য বশতঃ পরিশ্রম করা তাঁহাদের কাছে ভাল লাগে না; বরঞ্চ মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনা জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি যে সকল উপায় দ্বারা অল্প আয়াসে কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে, সেই সকল উপায়ই তাঁহাদের কাছে প্রিয় হয়। তমোগুণ দ্বারা তাঁহাদের মনে উচ্চভাব সকল বিনষ্ট হওয়াতে, তাঁহারা ঐ সকল হেয় উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না। যদি তাঁহাদের মনে সত্ত্বগুণ প্রবল থাকিত তাহলে এইরূপ আচরণে তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করিতেন। সংসারে এই প্রকার তামসিক ভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা বেশী। এই শ্রেণীর লোকে কেহ বা ধর্ম্ম-ধ্বজীর কেহ বা সমাজ-হিতৈষীর কেহ বা দেশ-সেবার মুখোস পরিয়া নানাপ্রকার দুরাচার করে।

তামসিক কর্ম্মী

মানবগণের মধ্যে রজোগুণ কিছু বেশী পরিমাণে থাকাতে তাহারা তির্য্যক স্থাবরাদি অপেক্ষা কিছু অধিকতর ক্রিয়াশীল, কিন্তু তথাপি জনসাধারণের মধ্যে তমোগুণের শক্তি অল্প নয়; তাইতেই তাহারা অলস এবং বিপদে ভীত হয়। বহু মানবেরই মনে রজোগুণের পরিমাণ তির্য্যকাদি অপেক্ষা অতি অল্প মাত্রায় বেশী থাকাতে তাঁহারা স্থাবর বা তির্য্যক যোনিতে না জন্মিয়া মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মানবত্ব ও পশুত্বের মধ্যে পার্থক্য

মোট কথা এই যে, মানবত্ব এবং পশুত্বের মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই, কেবল গুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ যোনীভেদ হইয়াছে।

নিরুদ্যম মানব কি সত্যই নির্লোভী?

অনেকেই আপন 'সংসার চলার' জন্য আবশ্যকীয় অর্থ উপার্জ্জন করিলেই আর পরিশ্রম করিতে চান না। তাঁহাদের মনে রজোগুণ প্রবল নয়, সুতরাং তাঁহাদের কামনাও প্রবল নয়। কামনা প্রবল নয় দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইঁহাদের সকলের মনে ভোগ-বাসনার সংস্কারের স্তূপ বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহারা উচ্চস্তরের কর্ম্মীদিগের ন্যায় নির্লোভ হইয়াছেন।

তাঁহাদের অনেকেই নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত রাজসিক কর্ম্মীদিগেরই তুল্য; তবে তমোগুণ দ্বারা তখন অভিভূত হওয়াতে সেই রাজসিক সংস্কার সকল সুপ্ত অবস্থায় থাকে মাত্র। এইজন্যই তাঁহাদের কামনা তখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

কিন্তু যখন কোন ঘটনার যোগাযোগ দ্বারা তাঁহাদের চিত্তে রজোগুণ প্রবল হয়, তখনি সেই সুপ্ত সংস্কার সকলের মধ্য হইতে কতক সংস্কার প্রবোধিত হইয়া তাঁহাদের আচরণের রূপান্তর উৎপাদন করে। পূর্ব্বে যিনি 'সন্তুষ্ট' ছিলেন, তিনি তখন আর অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকেন না। দৈন্য-দশায় যিনি 'নির্লোভ' ছিলেন, তিনি কিছু ধনলাভ করার পরে, ধনই তাঁহার নিকট উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়ায়।

পশুদের মধ্যেও বহু রাজসিক সংস্কার সুপ্ত ভাবে থাকে, তাহারা নরযোনিতে আসার পরে ঐ সংস্কার জাগরিত হয়।

সাত্ত্বিক এবং তামসিক 'সন্তোষ' চিনিবার উপায়

প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ প্রবল হইলেও লোকের মনে ভোগ-বাসনার স্বল্পতা দেখা যায়; এবং যাহা লব্ধ হইল তাইতেই তাঁহাদের সন্তোষ হয়। এই সন্তোষকে 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তোষ' বলে। সত্ত্বগুণ হইতে যে সন্তোষ

জন্মায় তাহা কিরূপে চিনিব? পশুগণও ত অল্পলাভে সন্তুষ্ট হয়, তাহাদের সন্তোষ যে প্রকৃত 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তোষ' নয়, তাহাই বা কিরূপে জানিব?

(ক) সাত্ত্বিক সন্তোষের আনুসঙ্গিক গুণ

প্রশ্নটীর উত্তর এই যে, যখন কাহারও মনে যথার্থ সত্ত্বগুণ প্রবল হয় তখন তাঁহার আচরণে কর্ম্মপটুতা, উৎসাহ, বীর্য্য, তেজ, ধৃতি এবং অপর অপর দৈবী সম্পদ থাকে। পশুগণ অল্পে সন্তুষ্ট হইলেও তাহাদের আচরণে (কিম্বা জনসাধারণের মধ্যে যাঁহারা অল্পে সন্তোষের ভাব দেখান, তাঁহাদেরও অনেকের আচরণে) যে এই সকল দৈবী-ভাবের লক্ষণ দেখা যায় না, এই কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(খ) সত্ত্বগুণ ব্যতীত প্রকৃত 'সন্তোষ' হয় না

পশুগণের এবং এই সকল মানবের অপর অপর আচরণ হইতে সুস্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় যে, তাহাদের মনে সত্ত্বগুণ প্রবল নয়। যাহাদের মনে সত্ত্বগুণ প্রবলভাবে নাই তাহাদের আচরণে যে সন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা তামসিক বস্তু, তাহা যে 'যদৃচ্ছালাভ-সন্তোষ' নয় সে বিষয়ে কোন সংশয়ই হইতে পারে না।

মানবগণের মধ্যে যে নিরুদ্যম দেখা যায়, তাহাও যদৃচ্ছা-লাভ সন্তোষ হইতে উৎপন্ন নয়; ইহাও তমোগুণসৃষ্ট জড়তারই ফল।

অদৃষ্টবাদ অর্থাৎ Fatalism.

'ভগবান যাহা করেন তাই হবে', এই কথাটী অনেকের মুখেই শ্রুত হয়। এই কথা বলার সময় যাঁহারা বাস্তবিকই ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকেন, তাঁহাদের মুখে এই কথা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দেয়। মুখে 'ভগবান কর্ত্তা' বলিলেই ঐ কথায় প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখান হয় না, যাঁহার চিত্তে ঐ বাক্যের উপর প্রকৃত শ্রদ্ধা আছে, তিনি নিজেকে কোন কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া ভাবেন না। এই প্রকার শ্রদ্ধা সংসারে অতি বিরল।

(ক) মুখের কথার বিপরীত ভাবে আচরণ

ভগবানই সব করেন, এই কথা বলার সময় সংসারের অনেক লোকেই আপন আপন আচরণে ভগবানের কর্ত্তৃত্বের উপর আস্থার পরিচয় দেন না, তাঁহারা নিজের কর্ত্তৃত্বই দেখান; এবং সংসারের অপর অপর কার্য্য যে কোন শক্তি বিশেষের প্রভাবের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে এবং সেই শক্তিই বা কাহার,—এই সকল তত্ত্ব বিষয়ে অনেকে অজ্ঞ হইলেও ঐ সকল বিষয় জানিতে আকাঙ্ক্ষাও দেখা যায় না।

(খ) ভণ্ডতা এবং মিথ্যাচার

স্বীকার করি যে, বহু পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইলে কেহ ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব উপলক্ষে তত্ত্বকথা প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু যখন লোকে মুখের কথায় 'অদৃষ্টের' কর্ত্তৃত্বের বা ফলদাতৃত্বের দোহাই দেন, কিন্তু কার্য্যকালে আপন কর্ত্তৃত্বই দেখান, এবং ভগবানের কথা শ্রবণেও বিমুখ হন তখন তাঁহাদের আচরণই তাঁহাদের মুখের কথার বিপরীত হয়। ঐ আচরণই প্রকাশ করে যে তাঁহারা যখন ভগবানের নাম করেন, তখন কেবল জ্ঞানের পরিচ্ছদ পরাইয়া আপন আপন তামসিক ভাবকে গোপনের চেষ্টা করেন।

বেশী অধঃপতন

যিনি অন্তরের পুর্ণ বিশ্বাসে 'ভগবান যাহা করেন' এই বাক্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন, তাঁহার পদ-রজঃ মস্তকে ধারণের যোগ্য। কিন্তু 'অদৃষ্টবাদের' এই তামসিক অভিনয় দ্বারা কেবল তমোগুণই অধিকতর পুষ্ট হওয়াতে লোকের আরও বেশী অধঃপতন হয়।

জ্ঞানলাভ করিয়াও পুনরায় মোহের আশঙ্কা থাকে।

সংসারে যিনি যতই ভক্ত বা যতই জ্ঞানী হউন না কেন, কিন্তু যখন ভগবান তাঁহার চক্ষু হইতে আপন জ্ঞানময় স্বরূপের প্রভা নিরোধ

করেন, তখন জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সমস্তই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিরোহিত হয়, তখন দেখা যায় যে, সেই জ্ঞানীই উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিতেছেন 'এই আছে আর এখনই নাই'।

যিনি মোহিনী-রূপ দ্বারা মহাযোগী মহেশ্বরকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মাকেও মোহান্ধ করিয়া যিনি তাঁহা দ্বারা গোবৎস হরণ করাইয়াছিলেন, যিনি ইন্দ্রের মনে রাজসিক মোহের দর্প উৎপাদন করাইয়া, পরে নিজে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া সেই দর্পকে চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে মানব কোন ছার!

(ক) যাতনাই এই তত্ত্বটীকে অন্তরে প্রবেশ করায়

বিবিধ দৈবীসম্পদযুক্ত হইয়াও, সংসারে মায়ার ঘোরে বহু যাতনা ভোগ করিতে করিতে King David বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা শ্রীভগবানের কৃপাসাপেক্ষ, এবং তিনি যতদিন কৃপা করেন কেবল ততদিনই সেই জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, এবং তাঁহার ইচ্ছামাত্র মানবের বুদ্ধি পুনরায় অজ্ঞানের অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয়।

(খ) King Davidএর অন্তরের উচ্ছাস

প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরে পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানতার মোহ হওয়াতে, সেই মোহের কার্য্য হইতে ভীষণ যাতনা ভোগ করার সময় যখন প্রাণের গভীরতম স্তর বিক্ষোভিত হইয়াছিল, তখন মানবের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া King David বলিয়াছিলেন 'Thou hidest thy face and we are troubled'। অর্থাৎ প্রভো আপনি নিজের জ্ঞানালোক নিরোধ করিলেই আমরা বিপন্ন হই। সংসারে কেবল যে ধনসম্পদ প্রভৃতিই ক্ষণস্থায়ী তাহাই নয়; আধ্যাত্মিক সম্পদ আরও বেশী ক্ষণস্থায়ী; সেইজন্য ঐ বস্তুটীকে রক্ষা করার জন্য নিয়ত সতর্ক থাকিতে হয়।

অসহায় মানবের রক্ষার উপায়

'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং', মায়ার প্রতাপ হইতে নিজেকে রক্ষা করার

জন্য মানবের কেবল একটী মাত্র আশ্রয় স্থান আছে, ঐ স্থলে প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রতাপ নাই, তথায় 'অহঙ্কার-তত্বের' শক্তি নাই, 'মহত্তত্বও' সেই 'পূর্ণ পুরুষের' নিকট শক্তিহীন ; এবং যে প্রকৃতির শক্তি অসীম ও অনন্ত, সেই প্রকৃতদেবীও বিলজ্জমানা হইয়া ঐ স্থানের অধিকারীর, কিম্বা তাঁহার চরণাশ্রিত মানবের, সম্মুখীনা হইতে পারেন না। 'অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াদেবীং অপাশ্রয়াং

অসহায় মানবের হিতের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ঐ স্থানটী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

'সারঙ্গানাং পদাম্বুজং'

শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে যে ভক্ত ঐ পদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন,প্রভু তাঁহার মস্তকে আপন 'হস্ত-সম্পদ' স্থাপন করেন, এবং তখন ঐ আশ্রিত ভক্তের আর কোন ভয়ই থাকে না। তাই অক্রুরের মুখ হইতে নিঃসৃত ভক্তির উচ্ছাসপূর্ণ ভাষায় বলি যে—

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ শিরস্যধাস্যৎ নিজহস্তসম্পদম্
দত্তাভয়ং কালভূজঙ্গরংহসা প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃনাং
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধ।

ষষ্ঠ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

ধনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল মোহের উপাদান

নর-নারী, যুবক-যুবতী, বালক-বৃদ্ধ, সকলেই মুগ্ধ হয়

কোন শিশুর হাতে একটী পয়সা দিলে সে পয়সাটীকে আপন 'মুঠোর' মধ্যে রাখে। অশীতি বর্ষের অধিক বয়স্ক কোন কোন বৃদ্ধ, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি, উত্তরাধিকারিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে কি নষ্ট হইবে, এই চিন্তায় মরণকালেও ব্যাকুল হন। অনেক পাঠকই ধনের মোহের নানাবিধ বীভৎস মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; সুতরাং আর অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

মোক্ষকামী ধনী ব্যক্তির সহিত যিশুর আলাপ

জনৈক ধনী ব্যক্তির মনে মোক্ষ কামনার সঞ্চার হওয়াতে তিনি শিষ্য হওয়ার জন্য যখন যিশুর নিকট প্রস্তাব করেন, যিশু তখন তাঁহাকে বলিলেন যে, বাপু! তুমি আগে তোমার ধন-কড়িগুলি দরিদ্রকে দান কর, তার পরে আমি তোমাকে শিষ্য করিব। এই কথা শুনিয়া সেই লোকটীর মন হইতে মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা দূর হইল। তিনি ধনের প্রতি মমত্ব ভাব ছাড়িতে না পারিয়া ধনকেই ভগবান অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিলেন। আমরাও যখন ধনের জন্য দুষ্কার্য্য করি তখন আমাদের আচরণও কি ঐ লোকটীর মতই হয় না? যখন ধনের আকাঙ্ক্ষায় আমরা সাধন ভজন ত্যাগ করি, তখন আমরাও কি ধনকে ভগবান অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করি না?

যিশুর বাক্য, 'ধন-কণ্টক'

এই ঘটনাটীকে লক্ষ্য করিয়া যিশু বলিয়াছিলেন যে, 'ধনী কখনও মোক্ষ লাভ করিতে পারে না'। ধন থাকুক বা না থাকুক, আমাদের প্রায় সকলের মনেই ত ধনাকাঙ্ক্ষা থাকে; অতএব ঐ কথা কয়টী

শুনিয়া পাছে আমরা সকলেও মোক্ষলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া আরও অধঃপাতে যাই, তাই ঐ সঙ্গে যিশু একটু আশার কথাও বলিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'but with God all things are possible' অর্থাৎ ধনীর পক্ষে মোক্ষ লাভ করা অসম্ভব হইলেও ভগবৎকৃপা প্রভাবে এই অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হইতে পারে।

যিশুর বাক্যের গভীর ভাব

এই কথা কয়টীর সুগভীর ভাবার্থ আছে। তাহাদের মর্ম্ম এই যে, মানব আপন শক্তি বলে ধনের মোহিকা শক্তি অতিক্রম করিতে পারে না বটে, কিন্তু ভগবানের কৃপা হইলে এই অসাধ্যও সাধন করিতে পারে। এই অল্প কএকটী বাক্য দ্বারা যিশু তিনটী অমূল্য তত্ত্বকথা বলিলেন—

(ক) প্রথমেই বলিলেন যে ধন 'মোক্ষ' অর্থাৎ শ্রেয়ো লাভে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

(খ) সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করিলেন যে, মানব আপন ক্ষমতা দ্বারা ধনের মোহিকাশক্তিকে সংযত করিতে পারে না।

(গ) তার পরে অতি সুস্পষ্ট ভাবে বলিলেন যে, ভগবান সকল অসাধ্যই সাধন করিতে পারেন; সুতরাং তিনি ধনকামনাকেও সংযত করিতে পারেন। অতএব হে দুর্ব্বল মানব! তুমি ভগবানের শরণাগত হও, তাঁহার শক্তির প্রভাবে তুমি ধনাকাঙ্ক্ষাকে সংযত করিতে পারিবে। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত অপর কি উপায় আছে?

মোহের দৃষ্টান্ত

যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক, দেশসেবক, অথবা জনসাধারণের নেতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহার কাহারও মৃত্যুর পরে যখন আমরা খবরের কাগজে দেখি যে, উত্তরাধিকারিগণের ভোগের জন্য

তাঁহারা কেহ কেহ লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তখন ধনের বিরাট মোহিনীশক্তির পরিচয় পাই। তাঁহাদের মত মনীষিগণও ধনের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই,

(ক) নিরন্নকে অন্নদানে কিম্বা আতুরের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা উপলক্ষে অর্জ্জিত অর্থকে ব্যয় করিতে না পারিয়া সেই ধনকে সঞ্চয় করিয়াছিলেন;

(খ) এবং মৃত্যুকালেও ধনের উপর আসক্তি (অর্থাৎ মমত্বভাব) ত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া তখনও ধনকে সৎকার্য্যে দান করিতে পারেন নাই। আসক্তি এতই প্রবল যে, তখন সংসারের সকল বস্তু হইতেই বিচ্ছেদ আসন্ন, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিয়াও আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন নাই।

'প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ' বস্তু

যে স্বদেশকে তাঁহারা 'জননী' বলিতেন, যে ধর্ম্ম তাঁহাদের কাছে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল, যে নরকে তাঁহারা 'নারায়ণ' বলিতেন, ঐ সকল প্রিয় বস্তু অপেক্ষাও টাকা অধিকতর প্রিয় হইয়াছিল বলিয়াই মরণ কালেও তাঁহারা টাকার 'মায়া' ছাড়িতে পারেন নাই।

পাঠক নিজে যেন সাবধান হন

এইজন্য সেই মহাপ্রাণ মানবগণের স্মৃতিতে দোষারোপ না করিয়া, আমাদের নিজে নিজে সাবধান হওয়াই উচিত। পাঠক, সাবধান! অপরের সমালোচনা করিতে গিয়া নিজে যেন আত্মাভিমান অথবা পর-নিন্দা দোষ দ্বারা কলুষিত না হও। মনে রেখো যে, অমন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মানবগণ, ধর্ম্ম প্রচার বা দেশসেবা রূপ সৎকার্য্যে নিরত থাকিয়াও, যে মোহিকা শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, তোমার আমার মত দুর্মেধা এবং ক্ষীণশক্তি ও ভোগরত মানবের সাধ্যও নাই যে, ভগবৎ সাহায্য ব্যতীত সেই শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিব।

Matthew left all and followed the Lord

যিশু যখন Matthewকে নিজের শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন, তখন তিনি ভাবী শিষ্যের মনে শক্তি-সঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়াই ম্যাথু, গুরুর আহ্বান-বাক্য শ্রবণ মাত্র আপন বিপুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, 'Matthew left all and followed the Lord'। তাই বলি যে, অপরের কার্য্যের সমালোচনা না করিয়া, নিজের দুর্ব্বলতাকে নিয়ত স্মরণ রাখিবে, এবং যাহাতে ধনের মোহিকা-শক্তি দ্বারা নিজে অভিভূত না হও, সে জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইবে।

সংসারে অন্নবস্ত্রের অভাবের ফল

একেই ত সংসারে মোহের উপাদানের অভাব নাই, তাহার উপর যদি জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা থাকিত, তাহলে মানব হয়ত আরও অধঃপাতে যাইত। সংসারে যে অন্নবস্ত্রের অভাব প্রায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছে, তাহা দ্বারা মোটের উপর মানবের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল পাঠক আপনিই নির্দ্ধারণ করুন। এই উপলক্ষে 'ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মবিত্তমঃ' সুদামা একটী বড় জ্ঞানের কথাই বলিয়াছিলেন—

অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্নমাং স্মরেৎ
ইতি কারুণিকো নূনং ভূরি মে ধনমাদদৎ।

এই কথাগুলি ত নূতন নয়, তবে আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই জ্ঞানের কথা আমাদের অন্তরে স্থান পায় না। যখন কাহারও মুখ হইতে আমরা এই কথাগুলি শুনি, তখন ইহার মর্ম্ম আমাদের অন্তরে প্রবেশ না করিয়া, পদ্মপত্রের উপর পতিত জলের ন্যায় গড়াইয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায় (তৃতীয় অংশ

মানবের জীবন সঙ্গীত

Save me from my friend

'নেতি নেতি' এই উচ্চ জ্ঞানের বাক্য বলিয়া কেহ কেহ এই জগৎকে এবং জীবনকে তুচ্ছ বস্তু-ভাবে দেখিতে বলেন বটে, কিন্তু ঐ কথা দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হয়। 'নেতি নেতি' বাক্যের সহিত লেখকের কোন বিবাদ নাই। সুদীর্ঘ সাধনার পরে যদি কাহারও চিত্তে ঐ বাক্যের গূঢ় ভাব গ্রহণ করার সামর্থ্য জন্মায়, তাহলে তিনি মহা সৌভাগ্যবান। যাঁহারা 'নেতি' 'নেতি' বাক্য মুখে আওড়াইয়া সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দেন, তাঁহারাও নিজে আপন দেহ এবং গেহাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন।

ঐ বাক্যের গূঢ় ভাব গ্রহণ না করিয়া সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চলে না। যখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রথমে চলে, তখন ইংরাজের বেশ ভূষা এবং আহার ও উচ্ছৃঙ্খলতার অনুকরণই চলিয়াছিল। ইংরাজের বিপুল উদ্যম, অদম্য উৎসাহ এবং অক্লিষ্ট কর্ম্মনিষ্ঠার অনুকরণে, যে আত্ম-সংযম ও দৈহিক সহিষ্ণুতার আবশ্যক তাহাতে আরামের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং কেহ ঐ সকল বিষয়ের অনুকরণ করিত না।

প্রগাঢ় ভাবে দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান, অর্থাৎ তত্ত্ব সকলের 'অনুভূতি' লাভ করিতে হইলে, সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনার সঙ্গে কঠোর তপস্যা করারও প্রয়োজন হয়। কারণ তপস্যা দ্বারা সংযম না জন্মিলে তত্ত্ব সকল অন্তরে স্ফুরিত হইয়া (অনু = অন্তরে + ভূ = হওয়া) যথার্থ 'অনুভূতি' জন্মায় না। এই কষ্ট-সাধ্য কার্য্য অনেকেই করিতে চান না। যখন ঐ সকল অনুষ্ঠান দ্বারা কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে অধিকারী

হয়, তখন কোন্ বস্তু 'তৎ' এবং কোন্ বস্তু 'অতৎ', অর্থাৎ কোন্ বস্তু নিত্য এবং কি অনিত্য, তিনি তাহা বিচার করিতে সামর্থ্য লাভ করেন। তার পর 'নেতি নেতি' বিচার করিয়া যদি কেহ সংসারকে মায়া-সৃষ্ট বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহার পক্ষেই সে কার্য্য মানায়।

পূর্ব্ব হইতে সাধনা দ্বারা চিত্তবৃত্তি মার্জ্জিত না হইলে, 'বাস্তব' এবং 'অবাস্তব' এই দুই ভাবের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, তাহা কেহ অনুভব করিতে পারেন না। সংসার 'মায়া মাত্র' অতএব তুচ্ছ বস্তু, ঐ কথা শুনিয়া কেহ কেহ হুজুকের বশে সংসারকে অবহেলা করেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু, অর্থাৎ যে ব্রহ্ম 'মায়া' নহেন, তাঁহাকে ত লাভের জন্য চেষ্টা করেন না!

সে চেষ্টা না করার কারণ এই যে, ঐ প্রকার চেষ্টায় কঠোর তপস্যা এবং সংযম আবশ্যক। উহা ভিন্ন 'মায়াতীত' ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। ঐ প্রকার সাধনার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, লোকের সে শক্তি নাই এবং প্রবৃত্তিও নাই। অতএব ব্রহ্ম-সাধনার জন্য অনধিকারী অবস্থায় থাকার সময়ে এই সকল কথা শুনিয়া, লোকে কেবল ঝোঁকের বশেই কার্য্য করে। তখন তাহাদের মনে স্ব স্ব সাংসারিক কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা জন্মায় মাত্র কিন্তু প্রকৃত উন্নতি হয় না।

'তাঁতিকুল' এবং 'বৈষ্ণবকুল'—উভয়কুলই নষ্ট

ইংরাজ জাতীর culture, এবং তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি গ্রহণ না করিয়া কেবল তাঁহাদের ন্যায় পোষাক পরিলে এবং পানাহার করিলেই কেহ ইংরাজের তুল্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। ইংরাজের হাব ভাব অনুকরণকারীর অবস্থা তখন 'উভয়বিভ্রষ্ট' হয়—তাঁদের স্বদেশবাসী তাঁহাদিগকে 'সমাজভ্রষ্ট' অতএব 'পর' ভাবেন; এবং ইংরাজও তাঁহাদিগকে নিজের দলে গ্রহণ করেন না। গ্রাম্য কথায় বলে, তাঁহাদের তাঁতিকুল এবং বৈষ্ণবকুল দুইটিই যায়।

দার্শনিক গূঢ় তত্ত্ব সকলকে অন্তরের মধ্যে স্ফুরিত করিতে না পারিয়া, মুখে কেবল 'নেতি নেতি' বাক্য বলিলে, নিত্য এবং অনিত্য

বস্তুর মধ্যে যে ভেদ আছে, সেই বিষয়ে প্রকৃত 'জ্ঞান' হয় না, তখন কেবল মতি-বিভ্রমই হয়। সেই সঙ্গে সাংসারিক কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা, আলস্য, নিরুৎসাহিতা প্রভৃতি তামসিক ভাব সকল প্রবল হইয়া লোকের অধঃপতন হয়। লোকে কেবল নিজেই অধঃপতিত হইয়া নিরস্ত হয় না, প্রকাশ্যভাবে আপন দোষের সমর্থন করার সময়ে অপর অনেককে অধঃপাতিত করিয়া তাহাদেরও সর্ব্বনাশ করে। তাই বলি 'Save me from my friends', এই প্রকার 'জ্ঞানী' উপদেশদাতা অপেক্ষা 'অজ্ঞান'ও ভাল, কারণ তাহা হইতে লোকের অত অধঃপতন হয় না।

এই প্রকার অধঃপতনের দৃষ্টান্ত বাহির করার জন্য পাঠককে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। রাজসিক ভাবের বিকার হইতে পাশ্চাত্য মহাদেশে materialism এর একচ্ছত্র প্রভাব বাড়িতেছে বটে, তাহলেও রাজসিক ভাব ক্রমে সাত্ত্বিকে পরিণত হওয়ার আশা আছে। কিন্তু তামসিক ভাবকে পরিবর্ত্তন করা অধিকতর দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যন্তরে তামসিক ভাবের পুষ্টি হইয়া আলস্য, নিরুদ্যম এবং দারিদ্র্যেরই বৃদ্ধি হইতেছে।

The Psalm of Life

বহুদিন পূর্ব্বে Longfellow যে **Psalm of Lige** কীর্ত্তন করিয়া আমেরিকা মহাদেশকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীতের ধ্বনি ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অনেক দেশকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে লেখক যে জীবন-সঙ্গীতের ধ্বনি শুনিতে পান, তাহা অপেক্ষা Longfellowর সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ নয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বে Oxford প্রভৃতি স্থানে, **Muscular Christianity** নামে, যে কর্ম্মনিষ্ঠা-মূলক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল সেই সমুন্নত এবং শ্রেয়স্কর আদর্শও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের জীবন সঙ্গীত

গত ৮ বৎসর শ্রীমদ্ভাগবত চর্চ্চাতে ব্রতী থাকিয়া লেখক ভাগবতের অভিপ্রায় যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে লেখকের ধারণা এই যে, ভাগবতের মতে 'সংসার' জীবের পক্ষে place of probation ; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাধন-মন্দির মাত্র। যাহাকে 'আদর্শ জীবন' বলা যায়, সেইরূপ জীবনের মধ্যে আলস্যের নামগন্ধও নাই ; 'মুক্তসঙ্গোঽনহং বাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিত' ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, ইহাই হইল জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

গীতার এই মহাবাক্যের সম্প্রসায়ণ করিয়া ভাগবত বলেন যে, সকলেই আপন আপন মতি শ্রীভগবানের পাদমূলে স্থাপন করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন কর ; এবং যাঁহার জন্য যে ব্যবস্থা আবশ্যক হইবে তাহা শ্রীভগবানই করিবেন। যিশুও বাইবেলে এই আদর্শই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

অবিদ্যা এবং অবিদ্যা হইতে সৃষ্ট সংস্কারসকল মানবের মতিকে ভগবানের পাদমূল হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করে। অবিদ্যার এই প্রতাপ নিরোধের জন্য যে যে ভাবে সাধনা করা আবশ্যক, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং যে মানব সৎপথে যাইতে চান, তাঁহাকে ঐ প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শনের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত শুকমুখ হইতে সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 'কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরানার্কোঽধুনোদিতঃ।

সন্মার্গে উন্নত হওয়ার পরে মানব যাহাতে তথায় অবস্থান করিতে পারেন, ভাগবত সে বিষয়েও বলসঞ্চার করেন।

দুর্ব্বলের হিতৈষী বন্ধু

প্রগাঢ় জ্ঞান এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রেও মতের অনেক পার্থক্য দেখা যায়, 'বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতায়া বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং'। যাহাতে অল্পায়ুঃ, মন্দবুদ্ধি, মন্দভাগ্য এবং রোগশোকাদি দ্বারা উপদ্রুত মানব এই

শাস্ত্রীয় মতভেদ দেখিয়া পথহারা না হন, সেই জন্যই শুকদেব সকল মতের এবং সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করার পরে, যাহা আমাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট সাধনোপায় হইবে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহারই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জীবনের পরম পুরুষার্থ লব্ধ হইবে, শুকদেব সেই সাধনমার্গই প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং যে আদর্শের অনুসরণ করিলে, ইহলোকে বিমল সুখ এবং দেহান্তে প্রকৃষ্ট শ্রেয়ঃ লব্ধ হইবে, শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সেই আদর্শকেও প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই জন্যই বলি যে, শ্রীমদ্ভাগবতে যে জীবন-সঙ্গীত শ্রুত হয় তাহা প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় আদর্শেরই অনুকূল। কারণ, যে আদর্শের অনুসরণ করিলে ব্রহ্মদর্শন লব্ধ হয় তাহা নিত্যই নূতন। বাসী দৈনিক সংবাদ পত্রের ন্যায় ব্রহ্ম কখন পুরাতন হইয়া অকেজো (obsolete) হন না। শুকদেব ব্রহ্মের স্বরূপভূত ঐ আদর্শ সকল তাঁহার 'অমৃত-দ্রব-সংযুত' ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা হইতে নব নব উৎকর্ষ এবং মাধুর্য্য স্ফুরিত হইয়া পাঠকের তৃপ্তিসাধন করে।

মনীষিগণের অক্লিষ্ট উদ্যমের ফলে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দিন দিন বহির্জগতের বিবিধ ঘটনাবলীর রহস্য উদ্ভেদ করিতেছেন। ঐ সুগভীর গবেষণার আলোকে অন্তর্জগতের ঘটনা সকল আলোচনা করাতে ক্রমশঃ আমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানের সম্প্রসারণ হইতেছে।

আমাদের ঋষিগণ যে কত দূরদর্শী ছিলেন, আমরা বিজ্ঞান হইতে তাহারও পরিচয় পাইতেছি।

লেখকের বাল্যকালে, অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ঋষিগণকে যে ভাবে দেখিতেন, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সম্ভ্রম করেন। Biology এবং Pathology প্রভৃতি শাস্ত্রের আধুনিক আবিষ্কার সকল আলোচনা করিলে, আমাদের মস্তক ঐ প্রাচীন ঋষিগণের পাদমূলে স্বতঃই অবনত হয়। তাই আবার বলি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রকৃষ্ট (true) ধর্ম্মের বিরোধী নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবতে মুখরিত 'জীবন-সঙ্গীতের' গৌরব এবং মাধুর্য্যের পুষ্টিসাধন হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায় (প্রথম অংশ)

সংস্কার-তত্ত্ব ও সংস্কারের প্রবল শক্তি

বিশ্ব শ্রীভগবানের স্থূল-রূপ

এই পুস্তকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শ্রীভগবান আপন বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণের শক্তির সহিত আবরক বিক্ষেপ-শক্তির সংযোগ দ্বারা ঐ গুণকেই 'অপরা' প্রকৃতির গুণত্রয়ে পরিণত করেন; এবং সেই গুণত্রয় ও কাল-শক্তির, অর্থাৎ ভগবানের 'স্বরূপ-শক্তির', সংযোগ দ্বারা ভূরাদি লোকত্রয়ের (অর্থাৎ 'সংসারের') এবং সংসারে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি যে সকল বস্তু আছে, তাহাদের সকলেরই সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারই চিদাত্মা (অর্থাৎ জীবনী শক্তি) বাসুদেব নাম ধারণ করিয়া সংসারের স্থূল সূক্ষ্মাদি সকল বস্তুতে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। এই ভাবে জীবন-সঞ্চার হওয়াতেই সকল জীব ও সকল বস্তুর কার্য্যক্ষমতা জন্মে। যতদিন বাসুদেব সকল বস্তুতে অধিষ্ঠিত থাকেন, কেবল ততকাল যাবৎ তাহারা সজীব থাকে। যে 'পরা' প্রকৃতি ব্রহ্মের, অর্থাৎ বাসুদেবের সহিত অভেদ ভাবে সম্বদ্ধ, তিনিই 'জীব' নামে সর্ব্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিত আছেন।

স্বয়ং বাসুদেব এবং পরা প্রকৃতি যেরূপ পরস্পর হইতে অভেদ্য, তাঁহাদের উভয়ের শক্তিও সেইরূপ নিত্যসম্বদ্ধ। অতএব তাঁহারা উভয়ে যখন সংসার হইতে আপন শক্তির প্রত্যাহার করেন তখনই 'প্রলয়' হয়; অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়। যখন তাঁহারা কোন জীবের স্থূল দেহ হইতে তিরোহিত হন, তখনই আমরা বলি যে ঐ ব্যক্তি মরিয়াছে—তাঁহাদের জীবনী শক্তির উপশম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যে গুণত্রয় ঐ জীবের দেহকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গুণত্রয়ও শক্তিহীন হন, অতএব সেই দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। পরা প্রকৃতির এই শক্তি আছে বলিয়াই গীতা বলেন যে, তিনি 'জীবভূতা' হইয়াছেন; অর্থাৎ তিনি 'জীব' এই নামে 'ভূতা' = ভূলোকে

অবতীর্ণা হইয়াছেন; এবং তিনি জগৎকে 'ধার্য্যতে' – ধারণ করিয়া আছেন, 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ'।

'বাসুদেব' এই পদটী দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বুঝায়, 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব সংজ্ঞিতং'। বসুদেব পদে স্বার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া বাসুদেব পদ উৎপন্ন হইয়াছে। 'বাসুদেব' এবং 'প্রকৃতি' এই পদদ্বয়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তাঁহারা পরস্পর হইতে পৃথক্, অথবা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র। এই পদ দ্বয় দ্বারা কেবল ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাই বুঝায়। (৮ ও ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যময় শ্রীহরি এবং লক্ষ্মী দেবীর যে যুগল রূপ প্রকট ভাবে আছেন তাহাই অপ্রকট ভাবে সর্ব্ব বস্তুতে রহিয়াছেন। যাঁহার জ্ঞান-চক্ষু অবিদ্যার আবরণ দ্বারা আচ্ছন্ন নয়, তাঁহার কাছে আর ঐ যুগলরূপ অপ্রকট থাকেন না। তিনি তখন ব্যষ্টিভাবে বিশ্বের সকল বস্তুতেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রূপ দর্শন করেন, এবং বিশ্বে সমষ্টিভাবেও ঐ রূপ দেখিতে পান। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ করার পরেই শুকদেব এই রূপের চিন্তন কার্য্যকেই প্রকৃষ্ট সাধনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

'স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েৎ ধিয়া'।

পুনশ্চ—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত।

[লেখকের নিবেদন—সংস্কার-তত্ত্বের প্রবন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। প্রুফ দেখিতে দেখিতে এই দোষ লেখকের চোখে পড়িয়াছিল। সংস্কার সকলের মধ্যে পাঠক ভগবানের গুণের খেলা দেখিতে পাইবেন, সৃষ্টিতত্ত্বেও অপর একভাবে গুণের খেলা দেখুন। লেখক এইজন্য উপরের কথাগুলি সব উঠাইয়া দিলেন না। কতক কতক অংশ উঠাইয়া দিয়া বর্ণনাটী ছোট করিলেন মাত্র]

'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'

গুণত্রয় দ্বারা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং গুণত্রয় দ্বারাই সংসারের রক্ষণ, পরিচালন এবং সংহার হইতেছে। সৃষ্টি তত্ত্বের সহিত ভগবান কর্তৃক সংসার পরিচালন তত্ত্বের আলোচনা করিলে আমরা কেবল 'গুণের', অর্থাৎ ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সত্ত্বের, লীলাই দেখিতে পাই। সেইজন্য বিশ্ব ভগবানের 'স্থূলরূপ' বলিয়া বর্ণিত হয়। গুণ হইতে স্বতন্ত্র কোন শক্তি, কিম্বা গুণের সহিত সংসৃষ্ট নয় এরূপ কোন কার্য্যই, সংসারে দেখা যায় না।

'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম', 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি', অনেকে যৌবনে গীতা পাঠ আরম্ভ করার সময় হইতেই এই সকল মহাবাক্য পাঠ করিয়া আসিতেছেন; এবং কথাগুলি অনেকের মুখেই শোনা যায়। এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে যে অমৃতের উৎস আছে, তাহার রসাস্বাদন যিনি করিতে চান, তিনি আপন মতিকে ভগবানের পাদমূলে স্থাপন করিয়া, যদি প্রগাঢ়ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং সংস্কার-তত্ত্ব চিন্তা করেন, তখন প্রভুর অপূর্ব্ব লীলা-কৌশল দর্শন করিয়া ঐ তত্ত্বদ্বয় হইতেই অমৃত রসের আস্বাদ পাইবেন।

সংসারে সমষ্টিভাবে ত গুণত্রয়ের লীলা চলিতেছে, যদি ব্যষ্টিভাবে মানব-জীবনের আলোচনা করা যায়, তাহলে সেখানেও কেবল গুণের লীলাই দেখা যায়। মানবের (ক) দেহ গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট, মানব যখন দৈনন্দিন কার্য্য করে, (খ) তখন মন এবং বুদ্ধি নামক বৃত্তিদ্বয় মানব-দেহের ইন্দ্রিয় সকলকে পরিচালিত করে। এই উভয় বৃত্তিও কেবল গুণ দ্বারাই সৃষ্ট। মনে সত্ত্ব গুণের এবং বুদ্ধিতে ক্রিয়াশীল রজোগুণের প্রাধান্য আছে। এই বৃত্তিদ্বয় কেবল গুণ দ্বারাই যে সৃষ্ট তাহাই নয়, যে (গ) প্রেরণা-শক্তি তাহাদিগকে পরিচালিত করে তাহাও গুণত্রয় হইতেই উৎপন্ন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গুণত্রয় 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' অর্থাৎ বাসুদেবেরই রূপান্তর, এখন দেখিতেছি যে ঐ গুণত্রয়ই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং

সংহার করিতেছে ; এবং তাহারাই তোমার ও আমার দেহের স্থূল এবং সূক্ষ্ম সকল অংশেরই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছে। অতএব 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই মহাবাক্যের পরিচয় কি নিয়তই আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রদত্ত হইতেছে না ? আমাদের জ্ঞান-চক্ষু অন্ধ, তাই প্রভুর এই অপূর্ব্ব মধুর লীলা আমরা দেখিতে পাই না।

'সংস্কার' কাহাকে বলে

গুণত্রয় সংস্কার নাম ধারণ করিয়া মানব এবং অপর অপর জীবের বৃত্তি সকলের পরিচালন করে। 'সংস্কার' পদের উল্লেখ দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, গুণ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুর বিষয় বলা হইতেছে। 'প্রবৃত্তি' 'বাসনা' ইত্যাদি নামে পরিচিত হইয়া গুণের যে প্রেরণা শক্তি (Stimulus) জীবের চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করে, ঐ প্রেরণা-শক্তির নামই 'সংস্কার'।

যাহা সং = সম্যক্ (অর্থাৎ প্রবল ভাবে) + কৃ = কার্য্য করে, তাহার নাম সংস্কার'। প্রবল ক্রিয়াশক্তি আছে বলিয়াই বোধ হয় গুণত্রয়ের এই নামান্তর হইয়াছে। 'সংস্কার' পদটী গুণেরই নামান্তর, এই পদ দ্বারা গুণ হইতে পৃথক্ কোন বস্তু বুঝায় না।

(ক) গুণে এবং সংস্কারে কিরূপে প্রেরণা শক্তি জন্মায়

সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তি অপর অপর গুণেও অবস্থান করে, ঐ ক্রিয়াশক্তি হইতে গুণ এবং সংস্কার উভয় বস্তুতেই প্রেরণা জন্মায়।

সংস্কার দ্বারা বিভুর সৃষ্টিলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পাদন

(ক) সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পাদন

'বহু স্যাম' অর্থাৎ 'আমি বহু হইব'—বেদ বলেন যে, এই অভি-প্রায়ে ব্রহ্ম সৃষ্টি লীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের তুল্য উৎকর্ষযুক্ত বহু মূর্ত্তির প্রকটন যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই বিভুর সৃষ্টিলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। কেহ বলিবেন যে, আপন অমোঘ

ইচ্ছার প্রভাবে, সৃষ্টির আদি হইতেই ত ব্রহ্ম নিজের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত বহু মূর্ত্তির প্রকটন করিতে পারিতেন, তাহলে নিকৃষ্ট জীব সৃষ্টি করার কেন প্রয়োজনই থাকিত না। এই বাক্যের উত্তরে বলি যে, ভগবান কেন নিকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কারণ তিনিই বলিতে পারেন। তাঁহার এই কার্য্যের 'কইফিয়ত' দেওয়া মানবের সাধ্যাতীত।

ভগবানের কার্য্যের কইফিয়ত দিতে অসমর্থ হইলেও, শতবার বলিব যে, নিকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি না হইলে, অর্থাৎ বহিরঙ্গা শক্তির সৃষ্টির না হইলে, সংসারে রসপুষ্টি হইত না; বৈচিত্র্য থাকাতেই রসপুষ্টি হয়; (৫৬ পৃষ্ঠা); তিক্ত রস দ্বারা মধুর রসের, এবং আলোক দ্বারা অন্ধকারের উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়। সৃষ্টির সকল জীবই যদি গোড়া থেকেই ভগবানের তুল্য হইত, তাহলে বৈচিত্র্য দ্বারা যে উৎকর্ষের বৃদ্ধি হয় তাহা থাকিত না কেবল dead level of uniformity থাকিত।

পূর্ব্বে ৫৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, সংসারে বর্ত্তমান বৈচিত্র্য দ্বারা সুখপুষ্টি এবং রসপুষ্টি ও জ্ঞানের স্ফুরণ হইতেছে। অতএব বোধ হয় যে, সংসারের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার জন্যই ভগবান অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত বহিরঙ্গা শক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্থাৎ জীবকে অবনত করার পরে বিরাট Evolution অর্থাৎ ক্রমোন্নতি শক্তির কার্য্য দ্বারা জীবকে উচ্চ পদবীতে উন্নীত করিতেছেন (৪র্থ অধ্যায় ও ২৪ পৃষ্ঠা; সপ্তলোক এই ক্রমোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর (১৩-১৪ ও ২২-২৩ পৃষ্ঠা)। জীবের দ্বারা এইরূপে ক্রমিক উন্নতি লাভের জন্য, সংস্কার সকল সাহায্য করে।

(খ) লিঙ্গশরীরের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে 'লিঙ্গশরীরের' বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সংস্কার সকলেরই সমষ্টি মাত্র (১৭-১৯ পৃষ্ঠা)। সংস্কার সকলের মধ্যে নানাবিধ ভোগের বাসনা থাকে, জীব নানা যোনিতে ভ্রমণের সময় কোন অঙ্গ দ্বারা সুখভোগ করার সময়ে যখন কোন বাসনা জন্মায়,

ঐ বাসনার সহিতও সেই অঙ্গের সংস্রব থাকে। জীব মানব যোনিতে থাকার সময় তাঁহার চিত্তে যে যে বস্তু আহার, কিম্বা যে যে প্রকার নর বা নারীর সহিত মৈথুন-সুখ ভোগ করার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই প্রবৃত্তি তির্য্যক-যোনির খাদ্য এবং জিহ্বা বা উপস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা পূর্ণ হয় না, জীব যদি পুনরায় মানব যোনিতে জন্মায় তাহা হইলেই ঐ বাসনার পুরণ হওয়া সম্ভবপর হয়। অতএব জীব যে যে যোনিতে ভ্রমণের সময় বাসনাময় সংস্কার সকল উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ বাসনা পুরণের জন্য সেই সেই যোনির অঙ্গ অর্থাৎ 'লিঙ্গ' (distinctive mark) প্রয়োজন হয়। এই কারণে ঐ বাসনার সমষ্টিকে 'লিঙ্গ-দেহ' বলা হয়। (১৮ পৃষ্ঠা) সংস্কার সকল গুণেরই বিকার অতএব লিঙ্গদেহকে 'গুণময় দেহ' বলে এবং 'বাসনাময় দেহ'ও বলিয়া থাকে।

(গ) সংস্কার জীবকে সংসারে আবদ্ধ রাখিয়াও মোক্ষপথ উন্মুক্ত করে

জীব নানা সময়ে যে স্থূলদেহ ধারণ করে, তাহা মরণের পরে বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু জীবের এই বাসনাময় দেহ বিনষ্ট হয় না। ইহা জীবকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে অনুসরণ করে, অর্থাৎ জীব স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্ব 'পরা' প্রকৃতি হইলেও, কেবল যে কোন স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করার সময়েই (অর্থাৎ 'জন্ম' কালেই) গুণের সহিত জীবের সংস্রব থাকে তাহা নয়, মৃত্যুর পরেও গুণত্রয় তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে না, লিঙ্গদেহ ঐ সঙ্গের নিদর্শন।

ব্রহ্ম স্বয়ং শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ; অতএব যাহা তাঁহার ঐ বিশুদ্ধ স্বরূপের অংশ কেবল তাহাই বিশুদ্ধ, যাঁহারা এই বিশুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা উচ্চ লোক চতুষ্টয়ে গমন করিতে সমর্থ হন না। কারণ ঐ লোক চতুষ্টয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতেই প্রকটিত হইয়াছে। অতএব যতকাল কাহারও চিত্তবৃত্তিতে কোন প্রকার ভোগবাসনা অথবা বহিরঙ্গা প্রকৃতির অপর কোন সংস্কার থাকে, তিনি সেই অবিশুদ্ধ বস্তু লইয়া উচ্চলোকে গমনে অধিকারী হন না।

সংস্কার সকল আদিতে উন্নতির অন্তরায় হইলেও চরমে উন্নতির সহায় হয়। ক্রমশঃ বিপদের উৎপত্তি এবং ক্রিয়া আলোচনার মধ্যে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের চিত্তে সংস্কার নামে অভিহিত যে সকল বাসনা সঞ্চিত ভাবে থাকে, তাহাদের প্রেরণা শক্তি আছে বলিয়াই আমাদের উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কার সকলের (ক) প্রেরণার কার্য্য দ্বারাই জীবের বিপদ হয়, (খ) বিপদের যাতনা হইতেই সাধন-প্রবৃত্তি জন্মায়। (গ) ঐ যাতনা ও সাধনার যুগপৎ কার্য্য দ্বারা জীব 'ব্রহ্মদর্শন' লাভের সুযোগ পায় এবং (ঘ) যে অনন্ত সুখ জীবনের পরম পুরুষার্থ, ঐ যাতনা এবং সাধনা দ্বারা জীব তাহাও লাভ করে।

'বহু স্যাম'—এই মহাবাক্য দ্বারা,জীবের চিত্তবৃত্তিতে 'ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষের প্রকটন করাই, যে সৃষ্টিলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহা উপরে বলা হইয়াছে। 'ব্রহ্মদর্শন' লাভ করিলে জীবের চিত্তে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, জীব তখন উচ্চলোকে গমন করিয়া সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমনের সুযোগ লাভ করেন। অতএব বলিতে হইবে যে সংস্কার সকল ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষ প্রকটনের পরম সহায় হওয়াতে তাহাদের দ্বারা বিভূর সৃষ্টিলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে।

Milestone of Progres

জীব কোন দেহ ধারণের সময় তাঁহার যতটুকু উন্নতি বা অবনতি হউক না কেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হউন বা তাহা হইতে দূরেই যান, জীবের তদানীন্তন মানসিক অবস্থা, মৃত্যুকালে স্থূলদেহের সহিত বিনষ্ট না হইয়া, লিঙ্গ-দেহে সঞ্চিত থাকে। কারণ লিঙ্গদেহে:প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু দশ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব আছে,—১৯ পৃষ্ঠা।

এক জন্ম ত্যাগ করিয়া অপর জন্মে নূতন কলেবর ধারণের সময়ে উন্নতির জন্য নূতন ভিত্তিস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্ব জন্মে

স্থাপিত ভিত্তির উপর গাঁথনি হয়, অর্থাৎ সেই পূর্ব্ব জন্মে লব্ধ অবস্থা হইতে পুনরায় জীবের গতি আরম্ভ হয়। অতএব এক এক জন্ম যেন আমাদের সংসার যাত্রায় milestone অর্থাৎ (গতি নির্দ্দেশক-চিহ্নের) তুল্য। এই ভাবে সৃষ্টিলীলায় ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত হইতেছে।

যে সংস্কার 'রিপু' ছিল তাহাই মিত্র হয়

সংস্কারের বশে যে সকল যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা সাধনার সুযোগ জন্মায়। যখন কোন সাত্ত্বিক সংস্কার রাজসিক বা তামসিক সংস্কার দ্বারা অভিভূত হয় তখনও সেই সাত্ত্বিক সংস্কার বিনষ্ট হয় না। তাহার শক্তি কেবল ক্ষীণভাবে থাকে, এবং পারিপার্শ্বিক কোন শুভ ঘটনার সংযোগ হইলে ঐ ক্ষীণশক্তি পুষ্ট হওয়াতে, সেই সংস্কার জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

কিন্তু যখন কোন রাজসিক বা তামসিক সংস্কারের আবরক বিক্ষেপ ভাব দূর হয় তখন ঐ সংস্কারই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া সত্ত্বগুণকে পরিপুষ্ট করে, অর্থাৎ যাহা 'রিপু' ছিল তাহাই মিত্র হয়। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে' এই বাক্যে 'ভস্মসাৎ' পদের দ্বারা, আবরক বিক্ষেপ ভাবের বিনাশ করিয়া, বিশুদ্ধ 'জ্ঞানে' (অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবে) পরিণত করা বুঝায়।

এইরূপে ক্রমশঃ 'ভেদ-ভাবের' অপগম হইয়া,(৩৩ পৃষ্ঠা) 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই 'একীভাবের' প্রকটন হওয়াতে সংস্কার দ্বারা বিভুর লীলার সাহায্যই হইতেছে।

সংস্কার দ্বারা জ্ঞান ভক্তি ও আনন্দের স্ফূরণ

সংস্কার সকল সঞ্চিত থাকাতে জীবের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। গীতা বলেন যে, 'সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে', অর্থাৎ সকল 'কর্ম্ম' (=সংস্কার) অবশেষে জ্ঞানেই পরিণত হয়। কিরূপে পরিণত হয় তাহা পূর্ব্বে ১০০ পৃষ্ঠায় এবং অপর নানা স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আশার বাণীতে 'জ্ঞান' পদের পরিবর্ত্তে 'ভক্তি' পদটী ব্যবহার করিলেও চলিত; কারণ 'চিৎ' এবং 'আনন্দ' যেরূপ

অভিন্ন, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভক্তিও তেমনি অভিন্ন বস্তু ; অর্থাৎ তাহারা উভয়ে এক বস্তুকেই বুঝায়, এবং কর্ম্ম হইতে যেমন জ্ঞানের পুষ্টি সাধন হয় তেমনি ভক্তির প্রকটনও হয়। 'Love of God in the beginning of wisdom', বাইবেলের এই প্রসিদ্ধ কথাটী হইতেও দেখা যায় যে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও জন্মায়।

(ক) জ্ঞান দ্বারা ভক্তি সঞ্চারের চিত্র

দরিদ্র ভক্ত যখন একটি মাত্র তুলসী পত্র শ্রীহরির চরণে অর্পণ করেন তখন তিনি ভাবেন যে, যদি রাজা-রাজড়ার ন্যায় বহু উপকরণ দিয়া প্রভুর চরণসেবা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বড় সুখ হইত। যাঁহাদের বিশুদ্ধ জ্ঞান হইয়াছে তাঁহাদের মনে এরূপ আপশোষ হয় না ; কেন হয় না তাহা পাঠক নিম্নে দেখিতে পাইবেন। সে যাহা হউক, যে ভক্তির মধ্যে শ্রীহরিকে নিবেদনের জন্য বহু সম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেই বাসনাটীও মূল্যবান বস্তু।

ঐ ভক্তি যখন বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়, সেই সঙ্গে ঐ ভক্তের মনে বিশুদ্ধ জ্ঞানও জাগরিত হয়। তখন ঐ দরিদ্র ভক্ত শ্রীহরির চরণে স্থাপিত তুলসী পত্রের মধ্যে শ্রীভগবানের যে মূর্ত্তি এবং যে বিভূতি দেখিতে পান, কোন রাজা রাজড়া দ্বারা শ্রীহরির পাদমূলে স্থাপিত বহুমূল্য উপকরণ সম্ভারের মধ্যে শ্রীহরির ঐ মূর্ত্তি ও বিভূতি ছাড়া অপর কিছুই দেখা যায় না। ক্রমশঃ যখন তাঁহার মনে জ্ঞানের সম্প্রসারণ হয়, তিনি তখন এই বিশ্বে সমষ্টি ভাবে কেবল ব্রহ্মের বিরাট ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিই যে দর্শন করেন তাহাই নয়, ভাল এবং মন্দ, ছোট ও বড়, সকল বস্তুর মধ্যেও তিনি ব্যষ্টি ভাবেও ভগবানের মূর্ত্তিই দর্শন করেন। তখন বহু উপহার দ্বারা প্রভুর পূজা করিতে পারিলাম না ভাবিয়া আর দারিদ্র্য-জনিত দুঃখ থাকে না, এবং পূর্ব্বে যে মনঃক্ষোভ হইয়াছিল তাহাও আর থাকে না।

(খ) জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সম্প্রসারণ

এই অবস্থায় উন্নত হওয়ার পরে সেই দরিদ্র ভক্ত নিখিল বিশ্বকে

বিভূর পাদমূলে সমর্পণ করিয়া আনন্দ সাগরে লীন হইয়া যান। যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময় বিবিধ মন্ত্র বা ক্রিয়া দ্বারা নানা দ্রব্য আরাধ্য দেবতার নিকট অর্পিত হয়। যখন কাহারও চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তাহার পর নিখিল বিশ্বকে তাঁহার পাদমূলে অর্পণ, অর্থাৎ 'সম্প্রদান', করার জন্য কোন মন্ত্রপাঠ বা কোন অনুষ্ঠানেরই প্রয়োজন হয় না। কারণ তখন বিশ্বে যে শ্রীহরির মূর্ত্তি প্রতিভাত হয়, ভক্তের দেহেও সেই মূর্ত্তি বিম্বিত হয়, তখন "দেবানাং গুণলিঙ্গানাং আনুশ্রবিক কর্ম্মনাং সত্ত্ব' ঐ ভক্তের চিত্তের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়া অবস্থান করেন। তখন দাতা, দেয় ও গৃহীতা এই তিন বস্তুর মধ্যে কোন ভেদই থাকে না।

তখন কোথায় বা থাকেন শ্রীহরি! কোথায় বা থাকেন সাধক নিজে!! তখন সংসারে থাকে কেবল আনন্দময়ের আনন্দের প্রবাহ এবং ঐ প্রবাহের মধ্যে সাধক এবং শ্রীহরি উভয়েই লীন হইয়া যান। 'আনন্দসংপ্লবে লীনঃ নাপশ্যমুভয়ম্ মুনে' ভাগবতের সুমধুর ভাষায় ভক্তি এবং জ্ঞানের এই মধুর মিলনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বাক্যের গভীর ভাব

আমরা পূজা ব্রত বা যাগযজ্ঞাদি সমাপন করিয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' এই যে কথাটী বলি, তাহার মধ্যে যে গভীর ভাব আছে তাহা উপলব্ধি করা ত দূরের কথা অনেকে চিন্তাও করেন না।

হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই আমার দ্বারা এই কার্য্য করাইলে, আমি তোমারই বিভূতি, এই কার্য্য তোমার শক্তি দ্বারাই সম্পন্ন হইল, এই দ্রব্যসম্ভার যাহা আমি সমর্পণ করিলাম তাহা তোমারই বিভূতি, যজ্ঞীয় মন্ত্র তোমারই বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি, কারণ তুমি 'মন্ত্রমূর্ত্তিরমূর্ত্তিকঃ', অতএব এই যজ্ঞকার্য্য তোমারই লীলা (৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণার্পণমস্তু বাক্য দ্বারা এই ভাবের উদ্দীপন হওয়াই উচিত সংস্কার দ্বারা এই প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভক্তির পুষ্টি সম্পাদিত হয়।

সংস্কার দ্বারা বিভূর ঐশ্বর্য্যের প্রকটন

বহু সংস্কারের প্রভাবে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে জীব যখন সিদ্ধির অবস্থায় উপনীত হন, তখন এক একটী সংস্কারের মধ্যে তিনি বিভূর ঐশ্বর্য্যই (glory) দর্শন করেন। জ্ঞাননেত্রের উন্মীলনের পরে তিনি কোন গুণেই আর বহির্ম্মুখী ভাব দেখেন না; অর্থাৎ কোন গুণই তখন ভগবান হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। তখন সকল গুণই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে নিমজ্জিত হয়।

বহির্ম্মুখী, অর্থাৎ 'ভেদ'ভাবের, অপগম হইলে ভক্ত অনুভব করেন যে,বিশ্বের স্থুল মূর্ত্তিতে যেমন স্থূলভাবে শ্রীভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়াছে, জীবের চিত্তে স্থিত অসংখ্য সংস্কারের মধ্যেও বিভূর অপর ঐশ্বর্য্য সকল সুক্ষ্মরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। ভেদভাবের অপগম হইয়া এই একীভাবের অনুভূতি লাভ করাকেই, ভাষান্তর ব্যবহার করিয়া 'সমর্পণ' করা বলে।

অতএব যখন আমরা বলি যে, স্থুল বিশ্বকে শ্রীভগবানের পাদমূলে সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারসকলও তথায় 'অর্পিত' হয়, তখন ঐ বাক্য দ্বারা কেবল ইহাই বুঝায় যে, যে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে ব্রহ্ম বলা যায়, সেই সত্ত্বগুণই স্থূল বিশ্ব এবং সূক্ষ্ম সংস্কার রূপ ধারণ করিয়া আছেন।

সংস্কারের হ্রাস বৃদ্ধি এবং ত্রিবিধ অবস্থা

যে সত্ত্বগুণ রূপান্তরিত হইয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ে পরিণত হইয়াছে, সত্ত্বের সেই ক্রিয়াশক্তি সকল গুণেই আছে। ঐ শক্তির প্রভাবে অপর অপর গুণকে অভিভূত করিয়া নিজে প্রবল হওয়ার জন্য উদ্যম করাই গুণত্রয়ের প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব সত্ত্বগুণ রজঃ এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া নিজে প্রবল হইতে চায়, এবং রজো ও তমোগুণও যথাক্রমে অপর অপর গুণকে অভিভূত করিয়া নিজে প্রবল হইতে চায়। তাই গীতা বলেন,—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা

যে গুণ যখন যে সংস্কাররূপে পরিণত হয়, ঐ সংস্কারের মধ্যে সেই গুণের ধর্ম্মও থাকে। অতএব কোন সংস্কার প্রবল হইলে তাহাতে নিহিত গুণের শক্তিও প্রবল হইয়া কার্য্য করে। সংস্কারের এই প্রবল ভাবে ক্রিয়াশীল অবস্থাকে দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় 'উদার' (উৎ+আ+ঋ=গমন করা) অবস্থা বলে; যদি কোন সংস্কারের কার্য্যকরী শক্তি কখন প্রবল, কখন বা দুর্ব্বল হয়, সেই অবস্থাকে 'বিচ্ছিন্ন' অবস্থা, এবং যখন কোন সংস্কারের শক্তি কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, সেই দুর্ব্বল ভাবকে সংস্কারের 'সুপ্ত' অবস্থা বলে।

গুণত্রয়ের ন্যায় সংস্কার সকল স্ব স্ব প্রতিকূল সংস্কারকে অভিভূত করার চেষ্টা করে। বহির্জগতে যেরূপ কোন শক্তিতে action অর্থাৎ ক্রিয়াশীল ভাবের পরে re-action, অর্থাৎ অবসাদ জন্মায়, সেই নিয়মের বশে গুণত্রয়ের মধ্যেও শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে; এবং এইরূপে তাহাদের 'উদার', 'বিচ্ছিন্ন' এবং 'সুপ্ত' এই তিন প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়।

যখন কোন সংস্কার প্রবল হয়, তখন সেই সংস্কারের সমধর্ম্মাবলম্বী গুণের শক্তি ঐ সংস্কারের সহিত সংযুক্ত হইয়া সেই সংস্কারের বলাধান করে। অতএব মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে, স্বধর্ম্মযুক্ত সংস্কারের সহিত সম্মিলিত হইয়া গুণত্রয় নিয়তই পরস্পরকে অভিভূত করার চেষ্টা করিতেছে। কখনও কোন সংস্কারের শক্তির হ্রাস এবং কখনও বা ঐ শক্তির বৃদ্ধি হওয়াতে, ঐ সংস্কার কখনও বা 'উদার' কখন 'বিচ্ছিন্ন' এবং কখন বা 'সুপ্ত' অবস্থায় উপনীত হয়। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা থাকাতে, গুণত্রয়ের মধ্যে action এবং re-action এর প্রভাবে বিভূর সৃষ্টি লীলার বহুকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

সংস্কারের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা শক্তি

এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির কার্য্যের আলোচনা উপলক্ষে বিভূর সৃষ্টিলীলার গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করার পর

৫৮ পৃষ্ঠায় এই উপলক্ষে কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে। 'বহু স্যাম' অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত বহু মূর্ত্তির প্রকটন করাই বিভূর সৃষ্টিলীলার মুখ্য অভিপ্রায়। ঐ অভিপ্রায় সম্পাদন উপলক্ষে সাহায্য করার জন্যই সংস্কারের সৃষ্টি হইতেছে। অতএব সৃষ্টির 'উদ্দেশ্য' কি তাহা জানা গেল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সংস্কার দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য সম্পাদনে কিরূপে সাহায্য হয়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, সংসারে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত আবরক বিক্ষেপের সংযোগ হওয়াতে বিশুদ্ধ সত্ত্ব অপরা প্রকৃতির গুণত্রয়রূপে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহাতে ঐ গুণত্রয় পুনরায় বিশুদ্ধ সত্ত্বে পরিণত হয় সংসারে তাহার ব্যবস্থাও আছে।

পরে দেখান হইবে যে, গুণত্রয়কে সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরিণত করার জন্য বিপদই প্রধান উপায়। গুণত্রয়ের প্রেরণা-শক্তি 'সংস্কার' নাম ধারণ করিয়া আমাদের চিত্তে অবস্থান করাতে, 'সংস্কার' সকলের মধ্যে সংঘর্ষণ দ্বারা বিপদের উৎপত্তি হয়।

সংসারের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের উপায় ত বর্ণিত হইল; এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংস্কারের মধ্যে প্রেরণা-শক্তি কিরূপে থাকে? প্রশ্নটীর উত্তর এই যে,গুণত্রয় ও সংস্কার একই বস্তু। গুণত্রয়ে যে ক্রিয়াশক্তি আছে, তাহাই প্রেরণা-শক্তি নামে পরিচিত হয়। ঐ শক্তি অতি প্রবল ভাবে কার্য্য করে, সেইজন্যই উহাকে 'সংস্কার' এই নামটী দেওয়া হইয়াছে। (৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্ম অবিনাশী, গুণত্রয় 'বিশুদ্ধ সত্ত্বের' অর্থাৎ ব্রহ্মের নামান্তর, সুতরাং গুণ এবং গুণের নামান্তর 'সংস্কার' সকলও অবিনাশী; এবং স্বভাবতঃই সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তি-প্রভাবে তাহারা ক্রিয়াশীল হয়। অতএব গুণের উৎপত্তিই সংস্কারের উৎপত্তির কারণ। ব্রহ্মের ইচ্ছাতে, গুণত্রয় এবং তাহাদের নামান্তর সংস্কার, এই উভয় বস্তুরই উৎপত্তি হইয়াছে।

অতএব (ক) সংসার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি (খ) ঐ উদ্দেশ্য কিরূপে

সম্পাদিত হয় (গ) এবং গুণে ও সংস্কারে যে যে প্রেরণা-শক্তি আছে, তাহারা কিরূপে আসিল ; (ঘ) এবং সংস্কারের উৎপত্তিই বা কিরূপে হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হইল।

সংস্কার দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ

গুণের শক্তি দ্বারা দেহের উপাদান সকল সৃষ্টির পর দেহের ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। সংস্কার গুণেরই নামান্তর ; অতএব তাহাদের দ্বারা যে দেহ নির্ম্মাণ হওয়া সম্ভব, এই কথায় আপত্তি হইতে পারে না।

যখন কোন গুণে বা সংস্কারে এরূপ শক্তি থাকে যে, ঐ শক্তি দ্বারা সেই সংস্কারের সহিত সংসৃষ্ট দেহ (অর্থাৎ যে যোনির যে অঙ্গ দ্বারা ঐ সংস্কার-নিহিত প্রবৃত্তির পুরণ হইবে, সেই প্রকার দেহ) নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ঐ গুণ বা সংস্কারকে 'ব্যূঢ়'-ভাবাপন্ন বলা যায়। যখন কোন গুণ বা সংস্কারে তত অধিক শক্তি থাকে না, অর্থাৎ যখন ঐ গুণ বা সংস্কার তাহাতে নিহিত বাসনা পূরণের উপযোগী দেহ নির্ম্মাণে অক্ষম হয়, তখন ঐ সংস্কার বা গুণকে 'অব্যূঢ়' বলে। লিঙ্গদেহে অসংখ্য সংস্কার বর্ত্তমান থাকে ; তাহাদের মধ্যে বহু সংস্কারই অব্যূঢ় ভাবেই থাকে। কেবল কতকগুলি সংস্কার 'ব্যূঢ়' ভাবে থাকে ; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত প্রবল তাহাদের দ্বারাই যোনি নির্দ্ধারণ হওয়ার পর দেহও নির্ম্মিত হয়। এই বিষয় নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

ব্যূঢ়ভাবাপন্ন সংস্কার সকলের মধ্যে যে যোনির উপযোগী সংস্কারের শক্তির সমষ্টি অপর অপর যোনির উপযোগী ব্যূঢ় সংস্কারের শক্তি-সমষ্টি অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হয়, সেই প্রবল সংস্কার সমষ্টি দ্বারা জীবের যোনি-নির্দ্ধারণ হয়। ঐ সকল সংস্কারে যে বাসনা আছে তাহার সহিত যে যোনির অঙ্গের সংস্রব আছে (১০৩ পৃষ্ঠা) সেই যোনির সেই সেই অঙ্গ ব্যতীত সেই বাসনা সকলের পুরণ হইবে না।

অতএব সংস্কার সকল ঐ যোনির উপযোগী দেহই নির্ম্মাণ করে (১১১-১২ পৃষ্ঠায় 'প্রারব্ধ' এবং 'যোনি নির্দ্ধারণ' মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

(ক) দেহের কার্য্যক্ষমতা, আয়ুঃ এবং স্বাস্থ্য

যে ব্যূঢ় ভাবাপন্ন সংস্কার সকল দ্বারা জীবের দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহাদের গুণের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া জীব কার্য্য করিয়া থাকে। কোন যোনি-বিশেষে জন্মগ্রহণের পরেও অপর অপর যোনিতে পুরণের সংস্কারও জীবের লিঙ্গদেহে অবস্থান করে; এবং তাহারা 'প্রারব্ধের' এই (পদটীর অর্থ ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) সংস্কার সকলকে অভিভূত করার জন্য কার্য্য করিতে থাকে।

এই ভিন্ন ধর্ম্মী এবং প্রতিকূল সংস্কার সকল যতদিন দেহনির্ম্মাণ-কারী সংস্কার সকলকে অভিভূত করিতে না পারে, তত দিন দেহ প্রারব্ধস্থ প্রবল সংস্কার সকলের অনুযায়ী ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম থাকে; এই সময়ের নাম 'আয়ুঃ'; এবং যতদিন প্রারব্ধ-স্থিত সংস্কার-সকলের শক্তি অব্যাহত থাকে, ততদিন তাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত দেহ প্রারব্ধের অনুযায়ী কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থ থাকে। দেহের এই অবস্থাকে আমরা 'স্বাস্থ্যের' অবস্থা বলি। যখন প্রতিকূল সংস্কার সকলের শক্তির প্রভাবে 'প্রারব্ধের' সংস্কার সকল কিয়ৎ পরিমাণে অভিভূত হওয়াতে দেহের কার্য্যক্ষমতার হ্রাস হয়, দেহের ঐ অপটু অবস্থাকে আমরা 'রোগ' বলি।

যখন ঐ সকল প্রতিকূল সংস্কার দ্বারা 'প্রারব্ধ'-স্থিত দেহ-নির্ম্মাণকারী সংস্কার সকল সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়, তখন দেহের সংরক্ষণকারী 'প্রারব্ধস্থ' সংস্কার সকলের শক্তি বিনষ্ট হওয়াতে রক্ষণ-শক্তির অভাবে দেহ বিনষ্ট হয়। এই অবস্থার নামই 'মৃত্যু'।

অনুকূল ও প্রতিকূল সংস্কারের আপেক্ষিক শক্তির ফল

উপরের বর্ণনা হইতে দেখিলাম যে, এক শ্রেণীর (set) সংস্কারের

শক্তি প্রবল হওয়াতে সেই সংস্কার সকল যোনি নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার অনুযায়ী দেহ নির্ম্মাণ করে; কিন্তু জন্মের সময় হইতেই ঐ সকল প্রবল সংস্কারের (অর্থাৎ 'প্রারব্ধের') প্রতিকূল সংস্কার ঐ দেহকে নষ্ট করিয়া যাহাতে তাহাদের নিজের যোগ্য দেহ সৃষ্ট হয় সেইজন্য কার্য্য করিতে থাকে। তাহারা যতদিন ঐ দেহকে নষ্ট করিতে না পারে ততদিনই জীবের আয়ু থাকে; যতদিন দেহকে অপটু করিতে না পারে ততদিনই 'কার্য্যক্ষমতা' থাকে; এবং অপটু করিলেই রোগ এবং প্রারব্ধের সংস্কারকে অভিভূত করিলে মৃত্যু হয়। অতএব সংস্কারের (অর্থাৎ গুণের) হস্তে আমরা ক্রীড়ার পুতুল হইয়া আছি।

বাসনা পুরণের জন্য জীব ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। বাসনার সহিত 'যোনির' কি সংস্রব আছে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জীবের লিঙ্গদেহে অবস্থিত সংস্কারে কোন সুখ বাসনাই abstract ভাবে (অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়াদির সহিত অসংসৃষ্ট ভাবে) থাকে না। আমি অমুক যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অমুক ইন্দ্রিয় দ্বারা অমুক অমুক পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে অবস্থান করিয়া যেন এই সুখভোগ করিতে পারি—বাসনা এই প্রকার concrete ভাবে লিঙ্গদেহে অবস্থান করে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুখবাসনা এই প্রকার concretr ভাবে থাকার কারণ কি? ঐ প্রশ্নের উত্তর এই যে, 'সুখ-স্বরূপের' অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুভূতি লব্ধ না হইলে, abstract ভাবে কোন সুখকেই অনুভব অথবা কল্পনাও করার সামর্থ্য থাকে না। যে বস্তু, অর্থাৎ যে abstrace সুখ, আমরা কল্পনাই করিতে পারি না, তাহা বাসনা আকারে থাকাও অসম্ভব।

সুখ বাসনায় concrete ভাব

সংস্কারে এই concrete ভাব থাকাতে, যে যে যোনিতে থাকার সময় ঐ সকল বাসনার সঞ্চার হইয়াছিল, উহা পুরণের জন্য, সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

সংস্কারের শক্তি উপলক্ষে পতঞ্জলির মত

পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদের ত্রয়োদশ সূত্রে বলিয়াছেন যে, 'সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ'। প্রথমে সূত্রটীর অর্থ কি, তাহাই দেখা যাক। 'মূল' পদের অর্থ শিকড়। শিকড় হইতে গাছ জন্মায়, গুণত্রয় এবং তৎসৃষ্ট সংস্কার হইতে 'অবিদ্যা','অস্মিতা', 'রাগ','দ্বেষ', এবং 'অভিনিবেশ' নামক পঞ্চ ক্লেশ উৎপন্ন হয়, অতএব সংস্কার সকল যেন ঐ ক্লেশের 'মূলের' অর্থাৎ উৎপাদক শিকড়ের তুল্য। 'সতি মূলে' অর্থাৎ সংস্কার চিত্তবৃত্তিতে থাকিলে, 'তদ্বিপাকঃ' তাহাদের 'বিপাক' (বি = বিশেষ রূপ, + পাক = পক্কতা অর্থাৎ maturity) = তাহাদের সম্পূর্ণ পক্ক অবস্থাকে, অর্থাৎ তাহাদের পরিণত দশাকে, জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগ বলে।

সংস্কারের শক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে প্রবল হয়, তখন সেই শক্তি দ্বারা জীবের 'জাতি' = যোনি, 'আয়ুঃ' = কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করার পরে তথায় যত সময় অবস্থান করিবে, সেই কালের পরিমাণ, এবং 'ভোগঃ' = সংস্কার-পূরণের সময় আনন্দ বা দুঃখের পরিমাণ, এই তিন বস্তু নির্দ্ধারিত হয়। কিরূপে যোনি-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি হয়, তাহাই ক্রমশঃ আলোচিত হইতেছে।

'প্রারব্ধ'

মৃত্যুর পরে জীবের লিঙ্গদেহে যে সকল ব্যূঢ়ভাবাপন্ন (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে পুরণের যোগ্য হওয়াতে সেই সেই যোনির উপযোগী কর-চরণাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ) সংস্কার থাকে, ঐ সংস্কার সকলের মধ্যে যে যোনির অনুকুল সংস্কার-সমষ্টির শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়, সেই সকল সংস্কার পুরণের জন্য, অর্থাৎ সেই প্রবল সংস্কারের অনুযায়ীভাবে কার্য্য করিয়া তৎসংসৃষ্ট বাসনা পুরণ করার জন্য, জীব তদুপযোগী দেহকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে। এই প্রবল সংস্কার সমষ্টিকে 'প্রারব্ধ' বলে।

মানব সংস্কারের হস্তে ক্রীড়ার পুতুল

যদি বল যে, সংস্কার যদি ব্যূঢ়ভাবাপন্ন হয়, তাহাতে কি আসে যায়? তাহা পুরণের আবশ্যকই বা কি? এই আপত্তির উত্তরে বলি যে, সংস্কার গুণের নামান্তর মাত্র, প্রকৃতির গুণত্রয় সত্ত্বগুণেরই বিকার। অতএব সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তি ব্যূঢ় সংস্কার সকলের মধ্যে থাকে। সংস্কার সকল যখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে না তখন ঐ ক্রিয়াশক্তি প্রেরণা-আকারে কার্য্য করিতে থাকে। অতএব সংস্কারের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবেই তাহাদিগকে পূরণ করার আবশ্যক হয়, অর্থাৎ পুরণের জন্য উদ্দীপনা শক্তি (stimulus) সংস্কার হইতেই উত্থিত হয়। এবং যতক্ষণ কোন প্রতিকূল শক্তির আবাহন দ্বারা মানব সেই শক্তি-বলে শক্তিমান না হয়, ততক্ষণ মানবের সাধ্য কি যে, সংস্কারের শক্তিকে নিরোধ করে; 'কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিস্যস্যবশোঽপি তৎ'।

সংস্কার দ্বারা যোনি নির্দ্ধারণ

সংস্কারের মধ্যে যাহারা 'ব্যূঢ়'-ভাবাপন্ন, তাহাতেই দেহ (অর্থাৎ যে যোনির যে ইন্দ্রিয় দ্বারা সংস্কার-নিহিত ভোগ সুখকে তৃপ্ত করা হইতে পারে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়) নির্ম্মাণের শক্তি থাকে (১৭—১৯ পৃষ্ঠা)। প্রতিকূল সংস্কারের কার্য্য এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা দ্বারা সংস্কারের শক্তির হ্রাস এবং বৃদ্ধিও হয়। অতএব কতকগুলি সংস্কার, যাহা ভূমিষ্ট হওয়ার সময়ে অব্যূঢ় ছিল, তাহারা জীবদ্দশায় প্রবল হইয়া 'ব্যূঢ়' ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং কতকগুলি 'ব্যূঢ়' সংস্কার দুর্ব্বল হইয়া 'অব্যূঢ়'-ভাবাপন্ন হয়।

মৃত্যুর পরে জীবের লিঙ্গদেহে যে সকল ব্যূঢ়ভাবযুক্ত সংস্কার থাকে, তাহারা সকলে যে একই যোনিতে লভ্য সুখকে উপলক্ষ্য করে, তাহা নয়।

অনাদি কাল হইতে জীব নানাযোনিতে ভ্রমণের সময় ঐ সংস্কার সকল উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহারা নানাযোনিতে লভ্য

সুখকে কামনা করে। জীবের মৃত্যুর পরে তাহার লিঙ্গদেহে যে সকল সংস্কার ব্যূঢ়ভাবাপন্ন অবস্থায় থাকে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত কতক-গুলি প্রবৃত্তি হয়ত নরযোনিতে, কতক বা দেবযোনিতে, এবং কতক বা হয়ত শূকর-যোনিতে পুরণের যোগ্য। জীব পুনরায় ঐ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ না করিলে সেই সেই বাসনার পূরণ হইতে পারে না। নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে যে যোনিতে পুরণের যোগ্য সংস্কার-সমষ্টির শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, জীব পুনরায় সেই যোনিতেই জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই বলা হয় যে, সংস্কার দ্বারা জীবের যোনি নির্দ্ধারণ হয়।

কোন্ যোনির যোগ্য সংস্কার প্রবল, তাহা নির্দ্ধারণের উপায়

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পরস্পরের সহিত প্রতিকুল সংস্কার সকলের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর শক্তি যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, ইহা কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? গণিত শাস্ত্রের বিচার প্রথা অবলম্বন করিয়া বিষয়টী আলোচনা করা যাক্।

মনে কর যে, কোন জীবের মৃত্যুর পরে তাহার লিঙ্গদেহে যে সকল সংস্কার আছে, তন্মধ্যে 'ক' এই সাঙ্কেতিক (symbolical) অক্ষর দ্বারা দেব-যোনিতে পুরণের যোগ্য, 'খ' অক্ষর দ্বারা নর-যোনিতে পুরণের যোগ্য সংস্কারের শক্তিকে, এবং 'গ' এই সাঙ্কেতিক অক্ষরটী দ্বারা শূকর যোনিতে পুরণের যোগ্য সংস্কারের শক্তিকে প্রকাশ করা গেল। ঐ জীব কোন্ যোনিতে আবার জন্ম গ্রহণ করিবে তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

(ক) যদি 'ক'এর শক্তি 'খ' ও 'গ'এর সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হয়, অর্থাৎ ('ক'—['খ'+'গ']) 'ক' হইতে 'খ' ও 'গ'এর সমষ্টি বাদ দিলে যদি কোন positive number (ফাজিল অঙ্ক নয়, জমার অঙ্ক) অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেই জীব দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে।

(খ) যদি 'খ'এর শক্তি 'ক'+'গ'এর শক্তির সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে ঐ জীবের জন্ম নরযোনিতে হইবে।

(গ) যদি 'গ'এর শক্তি 'ক'+'খ'এর শক্তির সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে ঐ জীবের জন্ম শূকরযোনিতে হইবে।

উপরের দৃষ্টান্ত তিনটীতে যথাক্রমে দেবযোনিতে,নরযোনিতে এবং শূকরযোনিতে পুরণের যোগ্য সংস্কারের শক্তি অপর সকল সংস্কারের শক্তির সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হওয়াতে ঐ প্রবল সংস্কার অনুসারে যোনির নির্দ্ধারণ হওয়ার কথা বলা হইল। কিন্তু কখনও কখনও বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট সংস্কারের শক্তি প্রায় সমান সমান ভাবে থাকাতে কোনও শ্রেণীর সংস্কারের শক্তিরই আধিক্য দেখা যায় না। ঐরূপ স্থলে কি হইবে তাহাই বিচার করা যাক্।

'আকাশস্থো নিরালম্ব বায়ু-ভুতো নিরাশ্রয়ঃ'

মনে কর যে, উপরোক্ত দৃষ্টান্তে 'ক' 'খ' এবং 'গ' এই অক্ষর ত্রয়ের দ্বারা প্রকাশিত শক্তির পরিমাণ এরূপভাবে আছে যে, একটী অক্ষর হইতে অপর অক্ষরদ্বয়ের সমষ্টিকে বাদ দিলে, হয় শূন্য অথবা কোন ফাজিল অঙ্ক, (negative value) অবশিষ্ট থাকে।

মনে কর যে, 'ক'এর পরিমাণ ১, 'খ'এর পরিমাণ ২ এবং 'গ'এর পরিমাণ ৩। এস্থলে 'ক' হইতে 'খ' ও 'গ'এর সমষ্টিকে বাদ দিলে (ক—(খ+গ) অর্থাৎ ১—[২+৩]) কেবল—৪, অর্থাৎ ফাজিল অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে। এবং 'খ' হইতে 'ক' ও 'গ'এর সমষ্টি বাদ দিলে ['খ'—(ক+গ) অর্থাৎ ২—(১+৪)] ফাজিল অঙ্ক—৩ অবশিষ্ট থাকে এবং 'গ' হইতে 'ক' ও 'খ'এর সমষ্টি বাদ দিলে [গ—(ক+খ) অর্থাৎ ৩—(১+২)] কোন অঙ্কই অবশিষ্ট থাকে না।

এস্থলে দেবযোনি বা নরযোনির জন্য কোন positive value অবশিষ্ট নাই, সুতরাং ঐ যোনিদ্বয়ের কোন যোনিতেই মৃত জীবের জন্ম হইতে পারে না। 'গ'এর (অর্থাৎ শূকরযোনিতে পুরণের যোগ্য

সংস্কারের) পরিমাণ ৩ না হইয়া যদি ৪ হইত, তাহলে 'গ' হইতে 'ক'এবং 'খ' এর সমষ্টি বাদ দিলে ['গ'—('ক'+'খ') অর্থাৎ ৪—(১+২)] অবশিষ্ট থাকিত ১, অর্থাৎ positive value অবশিষ্ট থাকিত। এই অবস্থায়, ঐ জীব শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিত।

কিন্তু উপরে নির্দ্ধারিত গণনায় 'গ'এর value যদি ৩ ধরা যায়, তাহলে কোন positive valueই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঐ জীব শূকরযোনিতেও জন্ম গ্রহণে অক্ষম হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ তখন ঐ জীবের স্থূল বা সুক্ষ্ম কোন প্রকার দেহই থাকে না।

(ক) নিরাশ্রয় অবস্থায় জীবের দুর্গতি

এই নিরাশ্রয় অবস্থায় জীবের অশেষ দুর্গতি হয়। পূর্ব্বে (৪৮ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে যে, প্রলয় ভিন্ন অপর সকল সময়েই গুণত্রয় কার্য্য করিতে থাকে, মৃত্যুর পরেও জীবের লিঙ্গদেহে বাসনার ক্রিয়া বন্ধ থাকে না। অতএব কোন জীব অশরীরী অবস্থায় থাকার সময়েও ভোগবাসনা সকল তাহার লিঙ্গদেহে স্থিত মন এবং বুদ্ধির উপর আপন আপন প্রেরণা শক্তির প্রয়োগ করে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি (১৯ পৃষ্ঠা) যে, জীবের লিঙ্গদেহে মন, বুদ্ধি, এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় থাকে। অশরীরী অবস্থাতেও জীবের চিত্তবৃত্তিতে বাসনার ক্রিয়া অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে, কিন্তু তখন ঐ মৃত ব্যক্তির, স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকারের অবয়বই না থাকাতে, তাহার কোন বাসনাই পূর্ণ হইতে পারে না। অতৃপ্ত বাসনার যন্ত্রণায় জীব তখন অশেষ কষ্ট পায়।

এই যাতনাময় অশরীরী অবস্থাই কি 'নরক'? কপিলদেব আপন মাতা দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন,

> ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে
> যা যাতনা সা নারক্যা ইহৈব উপলক্ষিতা।

(খ) অশরীরী অবস্থা হইতে শরীরী অবস্থায় আগমন

এই দুর্গতির দশাতেও সংস্কার সকল স্বধর্ম্মবশে পরস্পরকে অভিভূত করার চেষ্টা করে, এই সংঘর্ষ-জনিত চিত্তবিক্ষোভের সময় কতক সুপ্ত সংস্কার প্রবোধিত এবং কতক ক্রিয়াশীল সংস্কার বিধ্বস্ত হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সংস্কারের আপেক্ষিক শক্তির ন্যূনাধিক্য হয়।

এই ভাবে সংস্কারের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির ফলে কোন জীব যদি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, তখন তাহার লিঙ্গদেহে কোন এক শ্রেণীর ব্যূঢ় সংস্কারের মোট শক্তি অপর অপর অপর শ্রেণীর সংস্কারের মোট শক্তিকে অতিক্রম করে, তখন সেই জীব অশরীরী অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, যে যোনিতে পুরণের যোগ্য সংস্কার প্রবল হইয়াছে সেই যোনির দেহ ধারণ করেন।

জন্ম ও মৃত্যু এবং আয়ুষ্কাল

(ক) জন্ম

মৃত্যুর পরে জীবের লিঙ্গদেহে 'প্রারব্ধ' পদবাচ্য (১১১ পৃষ্ঠা) যে সকল ব্যূঢ় সংস্কার থাকে, তাহাদের শক্তি দ্বারা ঐ সকল সংস্কারের অনুকূল দেহ নির্ম্মিত হয়। জীবের দ্বারা ঐ দেহে অধিষ্ঠান কার্য্যকে 'জন্ম' বলে।

জন্মগ্রহণের পরে প্রারব্ধের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শ্রেণীর সংস্কারই জীবের চিত্তবৃত্তিতে কার্য্য করিতে থাকে। জীবদ্দশায় বহু পারিপার্শ্বিক ঘটনার যোগাযোগ দ্বারা কতক সুপ্ত সংস্কার প্রবোধিত হইয়া ক্রিয়াশীল, এবং তাহাদের কেহ কেহ ব্যূঢ় ভাবাপন্নও হয়, এবং কতক ব্যূঢ় সংস্কারও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। অতএব মানবাদির জীবদ্দশায় সংস্কার সকলের শক্তিতে নানাবিধ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।

(খ) মৃত্যু ও দেহের লয় (dissolution)

যখন অপর অপর সংস্কারের শক্তি প্রারব্ধের সংস্কারের শক্তি অপেক্ষা প্রবল হইয়া প্রারব্ধের সংস্কার সকলকে অভিভূত করে,

দেহ সৃষ্টির পরে গুণত্রয়ের যে আপেক্ষিক শক্তি (relative strength) দ্বারা সেই দেহ সংরক্ষিত হইতেছিল, সেই সংরক্ষক শক্তিও তখন অভিভূত হয়। যে সকল সংস্কার পুরণের জন্য দেহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, অভিভব বশতঃ তাহারা মৃতপ্রায় হওয়াতে, তাহাদের জন্য কোন কার্য্য সম্পাদন করারই প্রয়োজন থাকে না। অতএব যে দেহ ঐ সকল সংস্কার পুরণের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, ভাগবতের ভাষায় তাহা তখন 'গতস্বার্থ' ভাব, অর্থাৎ প্রয়োজন (utility) শূন্য অবস্থা, প্রাপ্ত হয়— গত হইয়াছে স্বস্ব = নিজের + অর্থ = প্রয়োজন যাহার।

দেহের জীবন স্বরূপ বাসুদেবও তখন ঐ 'অকেজো' দেহকে পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধা 'পরা প্রকৃতি', অর্থাৎ জীবও, বাসুদেবের সঙ্গে সঙ্গে, ঐ দেহকে ত্যাগ করেন। দেহের এই অবস্থার নাম 'মৃত্যু'। বাসুদেব দেহকে ত্যাগ করার পরে সংরক্ষণকারী গুণের কার্য্য আপনিই নিরুদ্ধ হয়। অতএব সংরক্ষণ শক্তি অভাবে মৃত্যুর পরে দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। গুণের কার্য্যের নিরোধই দেহের পঞ্চভূতে লয়, অর্থাৎ dissolution, হওয়ার কারণ।

(গ) আয়ুষ্কাল

দেহ সৃষ্টির পরে প্রারব্ধে স্থিত সংস্কারের শক্তিকে প্রতিকূল শক্তি দ্বারা অভিভূত করিতে যত সময় লাগে, সেই সময়কে আয়ুষ্কাল বলে। গুণ ও সংস্কার সকল স্বাভাবিক (normal) ভাবে কার্য্য করিতে করিতে প্রারব্ধের সংস্কার সকলকে অভিভূত করার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে; সম্পুর্ণ ভাবে অভিভবের জন্য যত সময় লাগা সম্ভব, সেই পরিমাণ সময়ই জোতিষ শাস্ত্রে আয়ুষ্কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

জন্ম ও মৃত্যু পরস্পরের কারণ ও ফল

যে সংস্কার সকল প্রবল হইয়া পূর্ব্বের জীবদ্দশায় প্রারব্ধকে অভিভূত করাতে তখন মৃত্যু হইয়াছিল, ঐ সকল সংস্কার (অথবা অপর সংস্কার) যখন ব্যূঢ় ভাবাপন্ন হয়, তখন জীবের নূতন জন্ম হয়। অতএব মৃত্যুই নূতন যোনিতে জন্মের কারণ।

অকাল-মৃত্যু ও অল্পায়ুঃ হওয়ার কারণ

কেহ কেহ অল্পায়ুঃ হয়, কাহারও অকাল-মৃত্যু, কাহারও বা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যু হয়; লতা এবং কীট পতঙ্গাদির আয়ুঃ অতি অল্প। আয়ুস্কাল উপলক্ষে মন্তব্য হইতে এই সকল বিষয়ের কারণ সহজে অনুমিত হইবে।

প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কার সকল যখন প্রারব্ধের সহিত প্রায় সমশক্তিমান হয়, তখন প্রারব্ধে যে অত্যল্প মাত্রায় অতিরিক্ত শক্তি অবশিষ্ট থাকাতে জীব যোনি বিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, প্রতিকূল সংস্কারের প্রভাব দ্বারা সেই অত্যল্প শক্তিও অল্প সময়ের পরেই শেষ হইয়া যায়, তখন জীবের মৃত্যু হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই প্রারব্ধের সংস্কারের শক্তির অবসান হওয়াতে, কতক জীব জন্মের পরেই মরিয়া যায়।

যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের প্রারব্ধে স্থিত অতিরিক্ত শক্তির পরিমাণ অল্প হওয়াতে, প্রতিকূল সংস্কার সকল অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ আধিক্যের বিলোপ করে, তখন দেহকে সংরক্ষণ করার জন্য কোন শক্তি না থাকাতে দেহ বিনষ্ট হয়। এই জন্য কতক মানব এবং অপর অপর জীবত অল্পায়ুঃ হয়। ১০৭ পৃষ্ঠায় 'আয়ুস্কাল' মন্তব্যে এই বিষয়ের উপলক্ষে আলোচনা করা হইয়াছে।

লতা ও কীট পতঙ্গাদির প্রারব্ধে যে সকল সংস্কার প্রবল ভাবে থাকে তাহা প্রতিকূল সংস্কার দ্বারা শীঘ্র অভিভূত হওয়াতে লতা ও কীটাদির আয়ুঃর পরিমাণ অত্যল্প, তাই তাহারা শীঘ্র মরিয়া যায়।

অকাল-মৃত্যু ও আসন্ন-মৃত্যুর নিরোধ

প্রারব্ধে স্থিত সংস্কারের শক্তি কমিলেই আয়ুর স্বল্পতা হয়। জীবদ্দশায় আমাদের প্রবল আচরণ দ্বারা কখন আয়ুঃর বৃদ্ধি কখনও বা আয়ুঃর হ্রাস হয়। জীবের আচরণ হইতে প্রারব্ধের সংস্কারের উৎপত্তি হয়। উহা কখন প্রারব্ধের অনুকূল এবং কখন বা প্রতিকূল

হয়। যদি প্রারব্ধের প্রতিকূল কোন নূতন সংস্কার অত্যধিক মাত্রায়, অর্থাৎ abnormal ভাবে বলবান হয়, তাহা হইলে ঐ সংস্কার দ্বারা প্রারব্ধের শক্তির খর্ব্বতা হওয়াতে, আয়ুঃর হ্রাস হয়। যদি ঐ প্রতিকূল সংস্কার দ্বারা প্রারব্ধের শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হয়, তাহা হইলে মৃত্যু আসন্ন হয়।

(ক) প্রায়শ্চিত্তাদির ফল

ঐ সময়ে যদি কেহ আপন চিত্তের মধ্যে এমন কোন প্রবল শক্তির সঞ্চার করিতে পারেন, যাহা প্রারব্ধের সংস্কারের অনুকূল হইবে, তাহা হইলে ঐ সংস্কার দ্বারা অকাল মৃত্যু এবং আসন্ন মৃত্যু উভয়েরই নিবারণ হয়। কখন কখন দেখা যায় যে, প্রায়শ্চিত্ত, দান এবং অপর কোন কোন সদনুনুষ্ঠান করিয়া রোগী আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

কিরূপে রক্ষা হয়? এই সকল দৈব-অনুষ্ঠানের সময় রোগীর মনে বাঁচিবার বাসনা তীব্র ভাবাপন্ন হয়। যেন আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি—এই বাসনা লইয়া কাহারও চিত্ত যখন সুদৃঢ়ভাবে ভগবানের পাদমূলে নিবদ্ধ হয়, তখন 'বৃত্তিসারূপ্য' এই নিয়মের ক্রিয়া প্রভাবে তাঁহাদের বাসনা নামক সংস্কারের মধ্যে কালরূপী ভগবানের শক্তির সঞ্চার হয়। এই নব শক্তি প্রারব্ধের অনুকূল; এই নূতন সংস্কারের শক্তি দ্বারা প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কার সকল পরাভূত হওয়াতে আসন্ন মৃত্যুর নিরোধ হয়। তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ এই পাতঞ্জল সূত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রারব্ধের অনুকূল শক্তির জন্য তীব্র ভাবে সাধনা করিলে, ঐ সাধনায় সত্বরই ফললাভ হয়।

(খ) প্রবল সৎকার্য্যের বা দুষ্কার্য্যের আশু ফল

আরও দেখা যায় যে, অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈঃ ইহৈব-ফলমশ্নুতে। কেহ কেহ অত্যন্ত দুরাচার করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেহ বা প্রবল সাধনা প্রভাবে ঘোর বিপদকেও যেন আপন

আদেশে নিরোধ করেন। 'Be still' এই আদেশ বাণী মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়া মাত্র সংসার সাগরের তুফান থামিয়া যায়, এবং উত্তাল তরঙ্গ সকলও অবিলম্বে স্থির, ধীর ভাব ধারণ করে।

তবে মনে রাখা উচিত যে, ঐ কার্য্য 'অত্যুৎকট' না হইলে উহার ফল 'হাতে হাতে' ফলে না। যখন কার্য্যের শক্তি লিঙ্গদেহের অপর সকল প্রতিকূল শক্তিকেই অতিক্রম করে, তখনই কার্য্যের ফল 'হাতে হাতে' ফলে।

মৃত্যুকেও নিরোধ করার শক্তি

উচ্চযোনিতে অবস্থানে সময়ও অতি প্রবল সদাচার দ্বারা আসন্ন মৃত্যুর নিবারণ হইয়া আয়ুর বৃদ্ধি হইতে পারে। তবে ঐ শক্তি প্রারব্ধের প্রতিকূল অপর সকল সংস্কারের শক্তিকে অতিক্রম না করিলে সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ হয় না। মোট কথা এই যে, প্রবল সাধনা দ্বারা মানব মৃত্যুকেও নিরোধ করিতে পারে। যিশু এবং অপর অপর মহাত্মারা কাহার কাহারও মৃত্যু নিবারণ এবং মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। প্রকৃত শ্রদ্ধা (Faith) এবং ভক্তি জন্মিলে মানবের অসাধ্য কিছুই থাকে না।

একজনের শক্তি দ্বারা অপরের হিত বা অহিত সাধন

উপরে সংস্কারের যে সকল কার্য্য বর্ণিত হইল সেই সংস্কার সকল জীবের নিজেরই চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করিয়া শুভ বা অশুভ ফল উৎপাদন করে। কখন কখন এক জীবের চিত্তে গুণের এবং সংস্কারের শক্তি প্রভাবে অপর জীবের হিত বা অহিত জন্মায়। একজনের আশীর্ব্বাদ দ্বারা অপরের মঙ্গল কিম্বা অভিসম্পাত দ্বারা অমঙ্গল হয়।

এই তত্ত্ব সংস্কার তত্ত্বের সহিত মুখ্যভাবে প্রাসঙ্গিক না হইলেও অপর একভাবে প্রাসঙ্গিকও বটে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মঙ্গল বা অমঙ্গল

হয়, তাঁহার নিজের সংস্কার দ্বারা এই সকল ঘটনা উৎপন্ন না হইলেও, অপর যাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাঁহার চিত্তে গুণের বা সংস্কারের শক্তি কত প্রবল হইতে পারে, তাহার পরিচয় এই সকল ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। অতএব প্রাসঙ্গিক হউক বা নাই হউক, এই বিষয়টীর আলোচনায় বোধ হয় পাঠকের আপত্তি হইবে না।

কিরূপে একজনের শক্তি দ্বারা অপরের মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়? **বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র**, এই পাতঞ্জল সূত্র হইতে এই বিষয়ের রহস্য অনুভূত হয়। এই পুস্তকের নানা স্থানে দেখান হইয়াছে যে, গুণ-ত্রয়ের প্রভাবেই সংসারের সকল কার্য্য হইতেছে। প্রতি জীবদেহে যে গুণত্রয় এবং সংস্কার কার্য্য করে, তাহারা 'বিশুদ্ধ সত্ত্বের' অর্থাৎ শ্রীভগবানের কালশক্তি বা স্বরূপ-শক্তিরই রূপান্তর। ঐ শক্তি কখনও বা বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তিতে শুভ কার্য্য করিতেছেন, এবং কখন বা ঐ শক্তির বিকার রজো বা তমোগুণের রূপ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছেন।

যখন কেহ সাধনা দ্বারা 'আত্মহারা' অবস্থায় উপনীত হইয়া আপনাকে উপরোক্ত শুভশক্তির সহিত একীভাবাপন্ন করেন, তখন তিনি ঐ শুভ শক্তির বলে বলীয়ান্ হন, কিন্তু তখন আর তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তখন তাঁহার ইচ্ছা স্বয়ং শ্রীভগবানের ইচ্ছার তুল্য অমোঘ হয়; এবং ভগবানের 'যোগমায়া'শক্তি তাঁহার আজ্ঞাধীনা হন! এই উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত উঠিতে না পারিয়াও, কেহ যদি এই অবস্থার কতকটা সান্নিধ্যেও যাইতে পারেন, তিনিও ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্রীভগবানের যোগমায়ার অমোঘ শক্তি লাভ করেন। কর্দ্দম ঋষি কিরূপ যোগমায়ার সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত আছে।

কেহ যখন পিশাচ-সাধনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন, তখন যে রাজ-সিক ও তামসিক শক্তি পিশাচযোনিতে থাকে, ঐ সাধকগণ সেই শক্তির সহিত একীভাবাপন্ন হইয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে ঐ শক্তি লাভ করেন।

আশীষের শক্তি

সাধুগণের চিত্ত নিয়ত শ্রীভগবানে নিবদ্ধ থাকে, অতএব তাঁহাদের মুখনিঃসৃত আশীর্ব্বচন শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির বলে বলীয়ান্ হয়। অতএব তাঁহাদের মুখের আশীর্ব্বচন, অথবা মনের শুভাকাঙ্ক্ষা, দ্বারা আমাদের সকল পাপেরই ক্ষয় হয়।

"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যো শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ"

আশীষের শক্তি, বিশুদ্ধ সংস্কার (অর্থাৎ সত্ত্বগুণ) আকারে আমাদের চিত্তে প্রবেশ করিয়া, আমাদের রাজসিক ও তামসিক সংস্কার হইতে আবরক শক্তিকে দূর করে। সাধুর শক্তির ন্যায় প্রবল শক্তি শাস্ত্রের মধ্যেও নিহিত আছে। যখন কেহ প্রগাঢ় যত্নের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত এবং গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন, তখন ঐ সকল শাস্ত্র হইতেও সাধকের চিত্তে প্রবল শক্তির সঞ্চার হওয়াতে তাঁহার চিত্তশুদ্ধির সুযোগ হয়।

অপর এক প্রকারের আশীষও আমাদের পক্ষে হিতকর হয়। আমাদের দ্বারা কৃত কোন উপকার দ্বারা, কিম্বা অপর কোন কারণে, সাধারণ বা নীচ প্রকৃতির লোকও কখন কখন এতই বিক্ষোভিত হন যে, ঐ উদ্দীপনার অবস্থায়, 'অমুকের মঙ্গল হউক', এই চিন্তা ভিন্ন অপর কোন চিন্তাই তাঁহাদের মনে থাকে না। এই আত্মহারা ভাবের সময়ে তাঁহাদের মনের অবস্থা প্রায় সমাধির দশার তুল্য হয়।

'বৃত্তিসারূপ্য' এই নিয়মের কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত তখন চিন্তিত বিষয়ের সহিত সমানরূপতা প্রাপ্ত হয়। যদিও আমাদের মনে এই অবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ থাকে না, তথাপি যতক্ষণ স্থায়ী হয়, ততক্ষণই ইহাতে বিপুল শক্তি থাকে। এইরূপ মানসিক অবস্থায়, যদি কেহ অপর কাহারও মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার ঐ কামনা ভগবৎ-শক্তি-বলে শক্তিমান হইয়া হিতসাধন দ্বারা অভীষ্ট পুরণ করে।

মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাত

ভগবৎশক্তির প্রভাবে সাধুগণের অভিসম্পাত কিরূপ কার্য্য করে,

তাহা উপরের মন্তব্য হইতেই সহজে অনুমিত হইবে। আমাদের দ্বারা কৃত কোন কার্য্য দ্বারা অনিষ্ট হওয়াতে একজন ইতর লোকও যদি মর্ম্মান্তিক ভাবে বিক্ষোভিত হইয়া আমাদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করে, তখন তাহাদের মতি রাজসিক বা তামসিক ভাবের সহিত একীভাবাপন্ন হওয়াতে, ঐ অভিসম্পাত রজো বা তমোগুণের শক্তিবলে আমাদের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

ইহাতেও ভগবানের বিচিত্র ব্যবস্থা এই যে, বিক্ষোভ প্রভাবে মন হইতে 'অহং', অর্থাৎ স্বার্থ জ্ঞান, বিলুপ্ত-প্রায় না হইলে, কেহ রজো বা তমোগুণের সহিত একীভাবাপন্ন হইতে পারে না এবং অনিষ্ট করার শক্তিও পায় না। এই জন্য অনেকের অভিসম্পাত মর্ম্মান্তিক হইলেও, তখন মনে স্বার্থপরতার সংমিশ্রণ থাকাতে তাহা দ্বারা অনিষ্ট হয় না।

দেবস্থানাদিতে 'ধন্না' দেওয়ার শুভফল

'ধন্নার' সময় যদি প্রার্থনাকারীর মনে **Faith** (অর্থাৎ ভগবান আমার প্রার্থনা পুরণ করিতে সমর্থ, এই অটল বিশ্বাস) থাকে, তাহলে তাঁহার চিত্ত যখন প্রগাঢ় ভাবে ভগবানের মঙ্গলময়ী শক্তির সহিত নিবদ্ধ হয়, তখন ঐ শক্তি দ্বারাই 'প্রত্যাদেশ' হয়, এবং ঐ শক্তি রোগীর দেহেও প্রবেশ করিয়া গুণসাম্য স্থাপন করাতে রোগের নাশও হয়।

বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে ধন্নার সময়েও ঐ মঙ্গলময়ী শক্তির প্রভাবে এমন কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগ হয় যে, তাহাদের দ্বারা ঐ কার্য্যেও সকল বিভ্রাট অপগত হইয়া সিদ্ধিলাভ হয়। গুণের দ্বারা সংসারের সকল কার্য্য হইতেছে; গুণত্রয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণেরই বিকার; অতএব ভগবানের সত্ত্বগুণের পক্ষে, সিদ্ধিপ্রদ ঘটনা সকলের যোগাযোগ উৎপাদন করিয়া বৈষয়িক ব্যাপারেও ফলপ্রদান করা কোন মতে দুঃসাধ্য নয়।

সাবিত্রীর পুণ্যবলে সত্যবানের জীবন-প্রাপ্তি

সাবিত্রী স্বভাবতঃই বিশেষরূপে দৈবীসম্পদ-সম্পন্না ছিলেন; তিনি যখন কামনা করিয়াছিলেন যে, স্বামী মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দীর্ঘায়ুঃ

লাভ করুন, তখন তাঁহার মনে আত্মহারা ভাবই প্রবল ছিল; অর্থাৎ মনের বিভোর অবস্থায় তিনি আপনার অস্তিত্বকেও বিস্মৃতা হইয়াছিলেন।

বিভোরতা দ্বারাই তাঁহার মতি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সহিত একীভাবাপন্ন হইয়াছিল; অতএব 'স্বরূপ-শক্তিই' সত্যবানের পুনর্জীবন লাভের মুল কারণ।

কাহারও মনে একনিষ্ঠ ভাব থাকিলেও কার্য্যকালে ভগবান নানা বিঘ্ন দ্বারা ঐ ভাবকে আরও দৃঢ়তর করেন। নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতির পক্ষে সিদ্ধির পূর্ব্বে অনেক বাধা বিঘ্নই হইয়াছিল। সত্যবানকে পুনর্জীবিত করার পূর্ব্বে যম-রাজের বিবিধ আপত্তি বিঘ্নেরই দৃষ্টান্ত। ঐ বাধা দ্বারা সাবিত্রীর পাতিব্রত্য সুদৃঢ় হইয়াছিল।

যিশুর স্বাভাবিক তন্ময়তাই তাঁহাকে শ্রীভগবানের 'যোগমায়া' শক্তি প্রদান করিয়াছিল। এই জন্য তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আশীর্ব্বচন নিঃসৃত হওয়া মাত্র বহু মুমূর্ষু রোগী নূতন স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে; '**Be thou whole and the man was made whole**'.

বাক্‌সত্যভাব

যাঁহাদের মতি একনিষ্ঠভাবে শ্রীভগবানের পাদমূলে অবস্থান করে তাঁহাদের বাক্যের মধ্যে ভগবৎশক্তির সঞ্চার হইতে থাকে। অতএব তাঁহারা 'বাকসত্য' হন, অর্থাৎ তাঁহারা বাক্য দ্বারা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ভগবানের যোগমায়া শক্তি অবিলম্বে সেই ইচ্ছার পুরণ করেন।

অপরের দেহ হইতে রোগকে আপন দেহে গ্রহণ

লেখকের জনৈক নিকট আত্মীয়ের কয়েকটী সন্তানের অতি মন্দ আকারের বসন্ত রোগ হইয়াছিল। সেই আত্মীয়ের সহধর্ম্মিনীর চিত্তে তাঁহার গুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সন্তানদিগের এই জীবনসংশয় অবস্থায় ঐ মহিলা ব্যাকুল চিত্তে আপন গুরুদেবকেই

অসহায়ের সহায় ভাবিয়া সন্তানদিগের রোগমুক্তির জন্য তাঁহার শরণাপন্না হন। গুরুদেব শিষ্যাকে বলিলেন 'যা, তোর ছেলেরা ভাল হ'য়ে গেল, এখন বাড়ী ফিরে যা'। ঐ মহিলা নবদ্বীপে গুরুর আশ্রম হইতে নিজের আবাস কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, বস্তুতঃই কএক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার সন্তানদিগের রোগ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে; এবং তার দুই একদিন পরেই ছেলেরা যখন প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন ঐ মহিলা গুরুদেবকে সেই শুভ সংবাদ দিতে নবদ্বীপ গিয়া দেখেন যে, গুরুদেবের সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত বাহির হইয়াছে। এইটী ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

কাহার কাহারও মনে হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কিরূপে একের রোগ অপরের দেহে গিয়াছিল ? প্রশ্নকারিগণ যেন একটী কথা মনে রাখেন, আমাদের সকলের দেহই সত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানেরই মূর্ত্তি ; তাই তাঁহাকে 'বিশ্বমূর্ত্তি' বলে। তাঁহার স্বরূপ-শক্তিই সর্ব্বদেহে কার্য্য করিতেছেন ; অতএব কেহ যখন নিজের মতিকে বিশুদ্ধ ভগবৎ-স্বরূপের সহিত একীভাবাপন্ন করেন, তখন যে 'যোগমায়া' নাম্নী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ত ভগবানের অভিপ্রায় পূরণ হয়, ঐ শক্তির সহিত ঐ সাধকের ইচ্ছা শক্তির ভেদ থাকে না। কারণ যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবানের স্বরূপ, আমাদের মন ও বুদ্ধি ঐ সত্ত্বেরই বিকার মাত্র। অতএব বিশুদ্ধা যোগমায়া শক্তি প্রভাবে অপরের রোগ নিজে গ্রহণ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য অপরকে দেওয়া অসম্ভব নয়। কেবল নিজের মতিকে ভগবৎশক্তির সহিত একীভাবাপন্ন করাই দুঃসাধ্য।

অপরকে নিজের রূপ-যৌবন প্রদান

যযাতির উপাখ্যান একটা 'আজগুবি' গল্প নয়। অপরের রোগ গ্রহণ কার্য্য বিষয়ক মন্তব্যে এই বিষয়ের তত্ত্বকথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা দেহের বন্ধন (limitations of the flesh) অতিক্রম করিয়া, আপন মতিকে ভগবানের পাদমূলে স্থাপন করিতে পারিয়া-

ছেন, তাঁহারা ভগবানের অমোঘ শক্তিবলে নিজের রূপ-যৌবন অপরকে প্রদান করিয়া, অপরের বার্দ্ধক্য নিজে গ্রহণ করিতে পারেন। কেবল দেহের বন্ধনকে অতিক্রম করাই সুকঠিন।

যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আয়ুর খর্ব্বতা

যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বগুণের হ্রাস এবং রজো ও তমো গুণের পুষ্টি হইতেছে,এই কারণে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট সংস্কার সকলের সংখ্যা এবং শক্তি উভয়ই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ১১৩-১৭ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে যে, বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট সংস্কারের শক্তির যোগ ও বিয়োগ দ্বারা যোনি এবং আয়ুস্কাল নির্দ্ধারিত হয়। ১১৩-১৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যদি 'ক' (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের পরিমাণ) কমিতে থাকে, এবং 'খ' ও 'গ' (অর্থাৎ রজোঃ এবং তমোগুণের পরিমাণ) বাড়িতে থাকে, তাহালে পাটীগণিতের নিয়ম অনুসারে আয়ুস্কাল নির্দ্দেশক অবশিষ্ট অঙ্ক যে কম হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

সংস্কার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধিতে বিঘ্ন

পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়ে মোহের উৎপত্তি এবং কার্য্য উপলক্ষে বলা হইয়াছে যে রজোঃ ও তমোগুণ দ্বারা মতিবিভ্রম এবং স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া মোহ হয় এবং মোহ হইতে কার্য্যহানি হয়।

সংস্কার সকলের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল তাহা direct (মুখ্য) ভাবে নিজের প্রতিকূল সংস্কারকে অভিভূত করাতে ঐ সংস্কারের ক্রিয়াশীলতা বিনষ্ট হয়। যদি সেই প্রতিকূল সংস্কারের উপরেই কার্য্য-সিদ্ধি নির্ভর করে, তাহলে সিদ্ধিতে বিঘ্ন হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সংস্কারের দ্বারা রোগের উৎপত্তি,

দেহ গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে। গুণত্রয়ের মধ্যে যখন harmony (অর্থাৎ সাম্যের অবস্থা) থাকে, সেই অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে; এবং ঐ সাম্যের ব্যতিক্রমকে রোগ বলে। 'সাম্য' কি বস্তু তাহাই প্রথমে দেখা যাক্। প্রারব্ধে স্থিত সংস্কার সকলকে পুরণের

জন্য দেহ নির্ম্মিত হয়। গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণে যে পরিমাণ শক্তি থাকিলে, দেহ প্রারব্ধের অনুযায়ী ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে গুণের সেই আপেক্ষিক শক্তিকে (relative strength) 'সাম্যের' অবস্থা বলে। প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কার প্রবল হইয়া যখন উপরোক্ত গুণসাম্যের ব্যতিক্রম করে, তখন দেহ অপটু হওয়াতে প্রারব্ধের অনুযায়ী ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। অতএব সংস্কার হইতে রোগের উৎপত্তি হয়।

সংস্কার দ্বারা বিকলাঙ্গ

সংস্কার গুণেরই নামান্তর ; প্রারব্ধের বূঢ় সংস্কার যখন দেহের বিবিধ অঙ্গ নির্ম্মাণ করে, তখন যদি ঐ দেহের অঙ্গবিশেষ নির্ম্মাণ উপলক্ষে শক্তিমান, এরূপ কোন প্রতিকূল সংস্কার অতিশয় প্রবল থাকে, তাহলে প্রারব্ধের সংস্কার দ্বারা ঐ অঙ্গ নির্ম্মাণের সময় ঐ প্রতিকূল সংস্কার সেই কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা উৎপাদন করে। প্রারব্ধের সংস্কার যদি এই প্রতিবন্ধককে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে না পারে, তাহলে প্রতিবন্ধকের ফলে সেই অঙ্গ দোষযুক্ত হয়। যে অঙ্গ উপলক্ষে বাধা সৃষ্ট হইয়াছিল, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতেই সেই অঙ্গ বিকল হয়। এই কারণেই কেহ কেহ জন্মকাল হইতেই অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি দোষযুক্ত হয়।

চিররুগ্ন অবস্থা

উপরে অঙ্গবিশেষ উপলক্ষে প্রবলভাবে প্রতিকূল সংস্কারের কথা বলা হইল। কোন সংস্কার অঙ্গবিশেষের সম্বন্ধে প্রতিকূল না হইলেও যদি প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কার সকলের মোট শক্তি সাধারণভাবে প্রারব্ধের প্রতিকূলাচরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহলে যোনি নির্দ্ধারণের সময় প্রারব্ধের মোট শক্তি অধিক থাকাতে যোনি-বিশেষের যোগ্য দেহ নির্ম্মাণ হয় বটে, কিন্তু গুণত্রয়ের শক্তিতে যে harmony, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা, দৈহিক স্বাস্থ্যের উপাদান, গুণত্রয়ে সেই সাম্যাবস্থা থাকে

না। অর্থাৎ দেহনির্ম্মাণকারী সংস্কার সকলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণের যে যে পরিমাণ শক্তি থাকিলে তাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত দেহ প্রারব্ধের সম্পূর্ণ অনুকূল ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, সেই পরিমাণ আপেক্ষিক শক্তি থাকে না।

তখন দেহ থাকে বটে, কিন্তু 'গুণসাম্যের' অভাবে ঐ দেহে স্বাস্থ্য কিম্বা কর্ম্মপটুতা থাকে না। দেহ তখন উভয় সঙ্কটের মধ্যে থাকে—যদি প্রারব্ধের অনুযায়ী ভাবে কার্য্য করিতে যায়, তাহলে প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কার সকল আক্রমণ করিয়া দেহকে রোগাক্লিষ্ট করে। প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কার সকল দেহ দ্বারা নিজের মত কার্য্য করাইতে চায়, কিন্তু ঐরূপ কার্য্য করার উপাদান দেহে থাকে না, এবং ঐরূপ কার্য্য করিলেও হয়ত প্রারব্ধ নিজেই রোগের আকারে দেহকে আক্রমণ করিত।

প্রতিকূল সংস্কার তখন ঐ অক্ষম দেহকে কেবল পীড়নই করে। দুর্ব্বল মনিবের অধীনে চাকরি করার সময়, তাঁহার প্রতিপক্ষের নিকট প্রায় নিয়ত লাথি ঝাঁটা খাইয়া, ভৃত্যের যে দুরবস্থা হয়, দেহেরও সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়।

প্রতিকূল সংস্কারের প্রবল শক্তি জন্মকাল হইতেই দেহকে রুগ্ন করে। ঐ চিররুগ্ন দেহ লইয়া, প্রারব্ধের অনুকূল ও প্রতিকূল সংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে করিতে জীবের কি দুরবস্থা হয়, বাস্তব-জীবন হইতে তাহার একখানি চিত্র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অঙ্কিত হইয়াছে। নরকে কি ইহা অপেক্ষাও ঘোরতর যাতনাভোগ করিতে হয়?

St Paulএর রোগ

St Paul, যিশুর ধর্ম্মপ্রচার করার ব্রত গ্রহণের পূর্ব্বে, বড় দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচার ব্রত গ্রহণের পরে, তাঁহার দেহে একটী বহু-কষ্টকর রোগ (বোধ হয়, শূল রোগ) প্রকাশ পাইল। সত্ত্বগুণের কার্য্য সাধনের জন্য দেহকে অপটু করার

জন্য বোধ হয় রাজসিক সংস্কারই গুণসাম্য নষ্ট করিয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়াছিল।

St Paul যখন যিশুর নিকট রোগ-মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি যদি শিষ্যকে আপন শুদ্ধসত্ত্বের কণামাত্র প্রদান করিতেন, তাহলে Paulএর চিত্তে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইয়া পুনরায় গুণসাম্য স্থাপিত হইত; এবং রোগও উপশান্ত হইত। কিন্তু এই ভাবে রোগের উপশম না করিয়া যিশু শিষ্যকে বলিয়াছিলেন 'my grace is sufficient unto thee'; অর্থাৎ যে সত্ত্বগুণ আমি তোমাকে দিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। এই বাক্য দ্বারা যিশু ইঙ্গিত করিলেন যে, সাধনা দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টিসাধন কর, তাহা হইলেই রজোগুণ অভিভূত হইবে, এবং রোগ আপনিই বিনষ্ট হইবে। 'ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীহরিও প্রহ্লাদকে ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।

(ক) **St Paul**এর রোগ উপলক্ষে তত্ত্বকথা

Paulএর দেহ যে প্রারব্ধ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে রজোগুণের প্রাধান্য ছিল; এবং ঐ প্রারব্ধের অনুযায়ি-ভাবে কার্য্য করিতে হইলে সত্ত্বগুণের শক্তি এই পরিমাণে এবং রজোগুণের শক্তি এই পরিমাণে থাকিবে ইহাই জন্মকাল হইতে নির্দ্ধারিত ছিল। যতকাল ঐ নির্দ্ধারিত মাত্রায় গুণের শক্তি থাকে, তাহাই গুণসাম্যের সময়।

কিন্তু Paul প্রচার ব্রত গ্রহণ করাতে সত্ত্ব গুণের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বৃদ্ধি দ্বারা সত্ত্ব এবং রজো গুণের আপেক্ষিক শক্তির পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত মাত্রার ব্যতিক্রম হইয়াছিল। ইহাকেই বলে গুণসাম্যের হ্রাস। এই হ্রাস দ্বারাই তাঁহার যাতনার উপাদান সৃষ্ট হইয়াছিল। তার পর সত্ত্বগুণ যখন দেহ দ্বারা নিজের মত কার্য্য (অর্থাৎ প্রচার কার্য্য) করাইতে চাহিতেছিল, তখন রজোগুণ ঐ কার্য্যে বাধা দিত, কিম্বা রজোগুণ যখন স্বেচ্ছামত দেহকে পরিচালন করিতে চাহিত, তখন সত্ত্ব তাহাতে বাধা দিত। এই সংঘর্ষণেরই ফল হইল রোগ; এবং গুণসাম্য ব্যতিক্রমের ফল হইল রোগজন্য যাতনা।

সাধুগণের রোগ

সাধুগণের চিত্তে সত্ত্বগুণ প্রবল হইলেও তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে 'সংসার-মুক্ত' হন নাই, এই কথাটী যেন স্মরণে থাকে। অতএব তাঁহাদের চিত্তেও যে কিয়ৎপরিমাণে রজঃ এবং তমোগুণ থাকে, এই অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নয়। ঐ গুণদ্বয় রোগের আকারে আত্ম-শক্তি প্রকাশ করিয়া সাধুদিগের শুভকার্য্যে বাধা দিতে চায়, এবং ঐ বাধা দ্বারা সাধুগণ তীব্র ভাবে সাধনা করাতে তাঁহাদের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। অতএব এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অবিদ্যাই অবিদ্যা-নাশের উপায় হয়। রোগ হওয়াতে সাধুগণ বুঝিতে পারেন যে, তখনও তাঁহাদের চিত্তে কালুষ্য আছে, অতএব আরও তীব্রভাবে সাধনা করা আবশ্যক।

জরা এবং অকাল বার্দ্ধক্য

গুণের শক্তি দ্বারা দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরিচালনও হইতেছে। ঐ শক্তি যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি দেহের পুষ্টি হইয়া কৌমার ও যৌবন উপস্থিত হয়। বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট সংস্কারের সংঘর্ষণে দেহের গুণসাম্য বিনষ্ট হইলে যে, রোগ হয়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। তেমন সুস্পষ্ট ভাবে গুণসাম্য বিনষ্ট না হইয়াও, যখন প্রারব্ধে স্থিত সংস্কার সকলের সাধারণ শক্তি খর্ব্ব হয়, তখন কোন রোগ না হইয়াও দেহের পূর্ণ ক্ষমতার হ্রাস হয়; দেহের ক্ষমতার এই খর্ব্ব অবস্থাকেই জরা বলে।

প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কারের শক্তির দ্বারা অনুকূল সংস্কার সমষ্টির শক্তির হ্রাসই জরার কারণ। ক্রমিক হ্রাস হইতে হইতে যখন ন্যূনতা সুস্পষ্ট হইয়া স্থায়ী হয়, সেই অবস্থাকেই 'জরা' বলে; আরও অধিক হ্রাস হইলেই লোকে শয্যাশায়ী হয়। তার পর সম্পূর্ণ হ্রাস উপস্থিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়।

উপরোক্ত বিপরীত্ত সংস্কার সকলের মধ্যে সংঘর্ষণ যদি অত্যন্ত প্রবল ভাবে চলিতে থাকে, তাহলে normal সময় (অর্থাৎ খর্ব্ব হইতে সাধারণতঃ যত সময় লাগে তাহা) পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রারব্ধস্থ সংস্কারের শক্তি খর্ব্ব হইয়া দেহের কর্ম্ম-পটুতা বিনষ্ট হয়। ইংরাজি ভাষায় এই অবস্থাকে exhaustion of natural powers বলে।

প্রারব্ধের প্রতিকূল বা অনুকূল সংস্কার সকলের মধ্যে যখন কোন সংস্কার এরূপ শক্তিমান হয় যে, তদানীন্তন দেহ দ্বারা ঐ সংস্কারের প্রবল বাসনার পুরণ হওয়া সম্ভবপর নহে,তখন ঐরূপ সংস্কারের কার্য্য দ্বারা দেহের ক্ষয় হইয়া অকালবার্দ্ধক্য জন্মায়। ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে ক্ষুধা যেমন দেহকে ক্ষয় করে, প্রবল বাসনার পূরণের জন্য ব্যবস্থা না হইলে, তাহাও দেহকে ক্ষয় করিয়া মৃত্যুকে আসন্ন করে।

দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত বিষয়টী আরও বিশদ হইতে পারে। নরযোনিতে থাকার সময়, সাধনা-প্রভাবে হয়ত কোন অনুকূল ঘটনার সংযোগ হওয়াতে, আয়ুস্কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই কেহ কেহ এত অধিক উৎকর্ষ লাভ করেন যে, কোন উচ্চ যোনিতে বা উচ্চলোকে গমন না করিলে সেই উৎকর্ষের অনুযায়ি-ভাবে সাধনা করা সম্ভবপর হয় না। এই ব্যক্তির আয়ুস্কাল পূর্ণ না হইলেও, সেই উৎকর্ষের শক্তির প্রভাবে তিনি নরদেহ ত্যাগ করিয়া উচ্চযোনিতে বা উচ্চলোকে গমন করেন।

এইজন্য হয়ত কাহার কাহারও অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেহকে ক্ষয় করিয়া মৃত্যুকে আসন্ন করে।

অত্যধিক পরিমাণে মৈথুন কার্য্য করিতে করিতে, কাহার কাহারও মনে ঐ সুখের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হয় যে, নরদেহের ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ লালসা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব, তাহা তৃপ্তির জন্য হয়ত পশুদেহের অঙ্গের এবং শক্তিরও প্রয়োজন হয়। এস্থলে নরদেহের শক্তি-হ্রাস হইয়া অকাল বার্দ্ধক্য প্রকাশের অনুকূল অবস্থা জন্মায়।

কাহারও বহুদুরাচারেও বিপদ হয় না, কাহারও বা অল্পতেই বিপদ হয় কেন?

সংসারে দেখা যায় যে, কতক লোক দুর্ব্বলের পীড়ন, নারীর নির্য্যাতন, শঠতা বা বলপ্রয়োগ দ্বারা পরের বিত্তহরণ, মদ্যপান, বেশ্যাসঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ দুরাচার করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কাহার কাহার দিনগুলি বেশ আরামেই কাটিতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গও হয় না, সেই দুস্কার্য্যও ধরা পড়ে না; এবং মনস্তাপও হয় না। আবার দেখা যায় যে, কেহ কেহ যদি অতি অল্প পরিমাণেও দুরাচার করেন, অমনি কোন না কোন রোগ বা অপর বিভ্রাট আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

এই বৈষম্যের কারণ কি? যে কালরূপী শ্রীভগবান এই জগৎকে শাসন করিতেছেন, তিনি এক শ্রেণী মানবের দুরাচার দেখিয়াও যেন 'নাকে তেল দিয়া' নিদ্রিত থাকেন; এবং অপর শ্রেণীর দুরাচারের শাস্তি দেওয়ার জন্য যেন অতন্দ্রিত হইয়া 'ওৎ পেতে'ই বা কেন থাকেন?

ভগবানের কোনরূপ শৈথিল্যও নাই; এবং পক্ষপাতিত্বও নাই। 'ন মে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ' ভগবান কাহাকে শাস্তিও দেন না কিম্বা পুরস্কারও দেন না। 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ', বিপরীত গুণযুক্ত সংস্কারের স্বাভাবিক কার্য্য-প্রভাবে মানবের সুখ দুঃখ হইতেছে। আমরা মোহের বশে এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া ভগবানের উপরেই দোষারোপ করি। 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'।

সংসারে যাঁহাদের দিনগুলি আরামে কাটে, তাঁহারা যখন রাজসিক বা তামসিক সংস্কারের বশে দুস্কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের মনে কোন সাত্ত্বিক সংস্কার কার্য্যক্ষম না থাকাতে, সংস্কার সকলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় না। তাই তাঁহাদের বিপদ বা চিত্তবিক্ষোভ হয় না, এবং দিনগুলিও আরামেই কাটে। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে সাত্ত্বিক সংস্কার বলবান, তাঁহারা অল্প দুস্কার্য্য করিলেই সংস্কার সকলের মধ্যে সাত্ত্বিক

সংস্কার রাজসিকে (বা তামসিককে) অভিভূত করিতে চায়। তাহা হইতেই বিপদ এবং তৎসৃষ্ট চিত্তবিক্ষোভের যাতনা উপস্থিত হয়।

শুভ সংস্কারের (অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকারের) automatic (স্বাভাবিক) কার্য্য প্রভাবেই বিপদ উপস্থিত হইয়া মানবকে উন্নতির সুযোগ প্রদান করে। যাঁহাদের বিপদ হয়, তাঁহারাই উন্নতির সুযোগ পান; এবং যাঁহাদের দিন আরামে কাটে তাঁহারা ঐ সুযোগ পান না। দুরাচার করিয়া যাঁহাদের দিনগুলি বেশ আরামে কাটে তাঁহারা যেন না ভাবেন যে, তাঁহারা 'ভাগ্যবান', বলিয়াই 'বাজীমাৎ' করিলেন।

ভয়ঙ্কর পরিণাম

ঐ সকল লোকের চিত্তে সত্ত্বগুণের অভাব আছে বলিয়াই বিপদ হইল না বটে, কিন্তু তাহার চরম ফল ভয়ঙ্কর। ইহ জন্মেই তাঁহাদের চিত্তে রাজসিক ও তামসিক সংস্কার অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে; এবং মৃত্যুর পর কর্ম্মক্ষয়ের জন্য হয়ত কাহারও গতি হয় তির্য্যক বা পিশাচ যোনিতে, কাহারও বা অসুর যোনিতে; (১১২-১৩ পৃষ্ঠা যোনি নির্দ্ধারণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এই প্রকার নীচগতিও চরমে এই সকল লোকের পক্ষে মঙ্গলকর। সুতরাং রাজসিক ও তামসিক সংস্কার যাহাদিগকে অধঃপাতে দেয়, সেই অধঃপতন দ্বারাও চরমে সুফল হয়।

ভগবানকে পুঁছে ফেলা চলে না

কেহ হয়ত বলিবেন যে বেশ, যদি 'সংস্কার' অর্থাৎ গুণই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ, তাহলে ভগবানকে ত একেবারে পুঁছে ফেলিলেই চলে?

এই কথার উত্তরে বলি যে, 'ভগবান' এই নামটীকে গ্রহণ কর বা অগ্রাহ্য কর, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কিন্তু ঐ নাম দ্বারা যাহা বুঝায় (what the name stands for) সেই বস্তু গুলিকে ত পুঁছে ফেলা চলে না। নাম ও নামীয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ভগবানের অঙ্গীভূত বস্তুগুলিকে পুঁছে ফেলিলে আমরা absolute negationএ উপস্থিত

হই ; এই negation যে কি বস্তু, তাহা কল্পনারও অতীত। যদি বল যে 'ভগবান' পদ দ্বারা কি বুঝায়? উত্তরে বলি যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ এবং তাহার বিকার দ্বারা সৃষ্ট সকল বস্তুই 'ভগ'=ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভূত ; অতএব নিখিল বিশ্বই 'ভগবান', 'ইদন্তু বিশ্বং ভগবানিবেতরঃ'।

(ক) পুঁছে ফেলিতে গিয়া জয়পতাকা তোলা

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে France যখন ভগবানকে সম্পূর্ণ ভাবেই পুঁছে ফেলিয়া 'সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার' ধ্বজাকে উড়াইয়াছিলেন, তখন কি প্রকারান্তরে ভগবানের জয়পতাকাই উত্থাপিত হয় নাই? তাঁহারা যে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার উপাসনা করিতেন, তাহাদের বিশুদ্ধ রূপ যে 'সত্ত্বগুণেরই' অঙ্গ, এবং ঐ সত্ত্বগুণ ভগবানেরই নামান্তর মাত্র। ভগবান অরূপ, বিশুদ্ধ সত্ত্ব তাঁহার স্বরূপ। অতএব সত্ত্বগুণ এবং ভগবান; পৃথক পৃথক বস্তু নয়। প্রকৃতির গুণত্রয় ঐ বিশুদ্ধ স্বত্বেরই বিকার ; সুতরাং তাহারা এবং তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট কোন বস্তুই ভগবান ছাড়া নয়।

বস্তুতঃ যে গুণ বা সংস্কার দ্বারা আমাদের সুঃখ ও দুখ উৎপন্ন হয়, তাহা সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানেরই রূপ। কেহ বা 'শান্ত' রূপ কেহ বা 'ইতর' অর্থাৎ লীলার্থ শান্তরূপের প্রচ্ছন্নভাব—'অশান্ত' রূপ। জীবগণের মধ্যেও কেহ শান্তরূপ কেহ অশান্ত রূপ।

আস্তিকই বল, আর নাস্তিকই বল, সকলের দেহ এবং চিত্তবৃত্তি গুণত্রয় দ্বারা, অর্থাৎ যে সত্ত্বগুণ ভগবানের স্বরূপ তাহারই বিকার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং 'গুণ' নামে আখ্যাত ভগবান আমাদের হাড়ে মজ্জায় আছেন। মুখে 'ভগবান' নামটী ছাড়িলেও যে বস্তু (অর্থাৎ যে গুণত্রয়) ভগবৎস্বরূপের বিকার, তাহাদিগকে ছাড়ার সাধ্য কাহারও নাই।

সপ্তম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

Pathology শাস্ত্রের সহিত সংস্কার-তত্ত্বের সমন্বয়

Benevolent এবং malevolent germs

Pathology নামক ডাক্তারী শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমাদের শরীরে কতক **benevolent** অর্থাৎ হিতকর,এবং কতকগুলি **malevolent** অর্থাৎ অহিতকর বীজাণু জন্মায়। তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া সংহার করে; এবং অহিতকর বীজাণু সকল প্রবল হইলেই রোগ হয়। তাহাদের বিনাশের জন্য injection দ্বারা দেহে হিতকর বীজাণু প্রবেশ করাইলে, তাহারা দেহস্থ হিতকর বীজাণুদিগের শক্তি বৃদ্ধি করায়; এবং ঐ হিতকর বীজাণুসকলই জীব দেহকে রক্ষা করে।

এই কার্য্যের সহিত সংস্কারের কার্য্যের অতি নিকট-সম্বন্ধ দেখা যায়। পাতঞ্জল-দর্শনে সংস্কারকে 'বীজ' নাম দেওয়া হইয়াছে। সংসারে নিয়তই বস্তু সকলের মধ্যে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অবস্থায় এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল অবস্থায়, পরিণতি হইতেছে। অতএব কোন কোন সংস্কার (অর্থাৎ গুণ) যে সূক্ষ্ম বীজাণুর রূপ ধারণ করিবে, ইহা কোনক্রমেই বিচিত্র নয়। গুণ সকলই সূক্ষ্মরূপ হইতে স্থূলরূপে পরিণত হওয়াতে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অন্তর্জগতে, অর্থাৎ **mind**এর মধ্যে, গুণত্রয় এবং তৎসৃষ্ট সংস্কারের যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টিলীলা চলিতেছে, সেই ক্রিয়ার রূপান্তরই বহির্জগতে, অর্থাৎ **matter**এর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় এক প্রকার নিয়মের বশেই কার্য্য চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

সপ্তম অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)

দৈবীশক্তি প্রবল কি পুরুষকার প্রবল

এই বিতণ্ডা ভিত্তিহীন

সংসারে শ্রীভগবানের শক্তি ব্যতীত অপর আর কোন শক্তিই নাই। অতএব 'পুরুষকার' নামক একটী স্বতন্ত্র শক্তি আছে, এই কল্পনা করিয়া, কে বড়, কে ছোট এই আলোচনা জন্য বাক্যের বৃথা ব্যয় করিলে তাহাদের সদ্ব্যবহার হয় না। যখন 'পুরুষকার' নামক কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্বই নাই, তখন ঐ তর্ককে ভিত্তিহীনই বলিতে হইবে।

তার্কিকগণ কাহাকে 'পুরুষকার' বলেন

অবিদ্যার প্রভাবে যে 'অহং' নামক বস্তুটীকে আমরা কল্পনা করি, ঐ 'অহং'এর স্বতন্ত্র শক্তি আছে, এই বিষয়টী অনুমান করিয়া তার্কিকগণ সেই শক্তিকেই 'পুরুষকার' নাম দিয়াছেন। পুরে শেতে যঃ, অর্থাৎ যিনি আমাদের এই দেহ-রূপ 'পুরে'=গৃহে অবস্থান করেন, সেই বাসুদেবই যথার্থ 'পুরুষ'। তাঁহার শক্তিই যথার্থতঃ পুরুষকার পদবাচ্য। 'পুরুষকার' প্রকৃতপক্ষে 'পুরুষ' অর্থাৎ বাসুদেবেরই শক্তি, সুতরাং ইহা দৈবীশক্তি হইতে পৃথক নয়, উভয়েই এক বস্তু। অতএব উভয়ের মধ্যে কে প্রবল, কে দুর্ব্বল, সে তর্কই উঠিতে পারে না।

পুরুষকার সম্বন্ধীয় তর্ক কিয়ৎ-পরিমাণে হিতকর

সংসারে যাঁহারা দৈবীশক্তির দোহাই দিয়া 'বরাতে যা থাকে তাই হবে বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তামসিক ভাবাপন্ন। পুরুষকার-বাদীরা সাধারণতঃ রাজসিক প্রকৃতির মানব। রজোগুণ তমোগুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে বস্তু প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিহীন হইলেও তাহা তমোগুণকে সংযত করে, এবং রজোগুণের সহায়তা করে, সে বস্তু অবশ্যই মানবের হিতকর। এই জন্যই বলি যে, নিশ্চেষ্ট থাকার চেয়ে পুরুষকারের অনুসরণ করাও ভাল।

অষ্টম অধ্যায় (প্রথম অংশ)

'বিপদ' ও 'সম্পদ' কাহাকে বলে

সংসারী লোকের চক্ষে 'বিপদ' ও 'সম্পদ'

গমনার্থ 'পদ্' ধাতুর সহিত 'বি' (=বিপরীত) এবং 'সং' (=সম্যক্, অর্থাৎ অনুকূল) এই উপসর্গ দুইটীর যোগ করিয়া যথাক্রমে 'বিপদ' এবং 'সম্পদ' কথা দুইটী উৎপন্ন হইয়াছে। যখন যে বস্তুর প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে তাহার প্রতিকূল ঘটনাকে আমরা বিপদ এবং অনুকূল ঘটনাকে সম্পদ বলি।

মানবের মতি নানা সময়ে নানা প্রবৃত্তি (অর্থাৎ সংস্কার) দ্বারা পরিচালিত হয়। নিয়ত যে একই বস্তুর প্রতি মানবের লক্ষ্য থাকে তাহা নয়; সর্ব্বদাই ঐ লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন হইতেছে, সংস্কারই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। অতএব কোন কাম্য বস্তুতে বিঘ্ন হওয়াতে সংসারী মানবের নিকট আজ যে ঘটনা 'বিপদ' বলিয়া অনুশোচিত হয়, ঐ কামনার পরিবর্ত্তন হওয়াতে হয়ত আগামী কল্য ঐ লোকই সেই বিঘ্নকে আর বিপদ বলিয়া জ্ঞান করেন না; এবং তখন হয়ত কামনায় পরিবর্ত্তন হওয়াতে গত কল্য যাহা 'বিপদ' ছিল আজ তাহা 'সম্পদ' বলিয়া সমাদৃত হয়।

একবার একটী লোক ৫০০৲ টাকা বেতন হইতে আরও উন্নতির জন্য ৭০০৲ টাকা বেতনের একটী চাকরির আকাঙ্ক্ষায় সাগ্রহে চেষ্টা করিতেছিলেন। ঐ চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিপদ হইয়াছে। উহার তিনমাস পরে কেবল একমাত্র মুখের কথা খসাইয়া, ঐ অফিসেই ১১০০৲ টাকা বেতনের অপর একটী চাকরী তাঁহার জুটিল। তখন পূর্ব্বে যাহা 'বিপদ' ছিল, তাহা আর বিপদ রহিল না। কারণ পূর্ব্বের চেষ্টা যদি সফল হইত তাহা হইলে শেষের চাকরীটি পাইতে হয়ত বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা

হইত। অতএব প্রথমে যাহা কাম্য বস্তু (অতএব 'সম্পদ') ছিল, তাহার লাভই পরে 'বিপদ' বলিয়া পরিগণিত হইত। মাতাল নেশার ঝোঁকের সময় মদ না পাইলে ভাবে যে তাহার 'বিপদ' হইয়াছে; কিন্তু মদের জন্য ঐ আকাঙ্ক্ষা কাটিয়া গেলে আর তাহা ভাবে না; বরঞ্চ কেহ কেহ ভাবে যে তখন মদ না পাইয়া তাহার মঙ্গলই হইয়াছে।

যথার্থ 'সম্পদ' ও 'বিপদ'

অখণ্ড অনন্ত পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করাই যে মানব-জীবনের পরম পুরুষার্থ এই তত্ত্বটী পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব যে ঘটনা এই আদর্শের অনুকূল, অর্থাৎ যে বিষয় দ্বারা এই প্রকার সুখকে লাভ করা যায়, তাহাই যথার্থ সম্পদ; এবং যাহা এই আদর্শের প্রতিকূল, অর্থাৎ যে বিষয় দ্বারা এই প্রকার সুখলাভে বিঘ্ন হয়, তাহাই 'বিপদ' পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই পূর্ণ সুখ ব্রহ্মের স্বরূপভূত বস্তু; অর্থাৎ এই সুখই ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্ম-দর্শন হইলেই ঐ সুখ পাওয়া যায় (৬৭ পৃষ্ঠা)।

অতএব মোটের উপর মীমাংসা এই যে, ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ সুখকে লাভ করাই যথার্থ 'সম্পদ' এবং যাহা দ্বারা ঐ সুখলাভে বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহাই প্রকৃত 'বিপদ'।

'বিপদ' ও 'সম্পদ' পদদ্বয়ের প্রাস্বর্থ

যে ঘটনা সং = সম্যকভাবে, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম বস্তুর (= ব্রহ্মের) দিকে + পদ্ = গমন করে, অর্থাৎ যে ঘটনা মতিকে ব্রহ্মের দিকে লইয়া যায়, তাহাই 'সম্পদ' এবং যাহা মতিকে বি = বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে দূরে, লইয়া যায় তাহাই বিপদ।

ভাগবত কাহাকে যথার্থ 'সম্পদ' বলেন

প্রকৃত 'সম্পদ' কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

যত্তৈষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ
সম্পন্ন এবেতি বিদুঃ মহিম্নি স্বে মহীয়তে।

শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, যাঁহাকে আমরা 'মায়া' অর্থাৎ অবিদ্যা বলি,তিনি বস্তুতঃ 'দেবী' = দ্যোতনাত্মিকা,অর্থাৎ প্রকাশশক্তি বিশিষ্টা, এবং তিনি 'মতিঃ' = বিদ্যা। সেই মায়া যখন 'উপরতা'—'উপ' = সমীপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সমীপস্থা হইয়া + 'রতা' = আনন্দিতা হন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হইতে পূর্ণ আনন্দ লাভ করেন, [যে ব্যক্তির চিত্ত মায়ায় = অবিদ্যার, অধীন থাকাতে অসুখী, তিনি যখন ব্রহ্মদর্শন লাভ করেন তখন ব্রহ্মের স্বরূপভূত পূর্ণ সুখের আস্বাদ পান] তখন সেই জীবই 'সম্পন্ন' = যথার্থ 'সম্পদ' লাভ করিয়াছেন, এই কথা বলা যায়। এবং তখন ঐ জীব আপন 'মহিম্নি' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপে (নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) উন্নীত হইয়া 'মহীয়তে' = মহত্ব লাভ করেন।

মীমাংসা

অতএব উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে ব্রহ্মদর্শনের অবস্থাকেই যথার্থ সম্পন্ন অবস্থা বলিলেন। যে অবস্থায় মতি ব্রহ্ম হইতে বি = বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ভোগের দিকে, যায় তাহাই বিপদের অবস্থা।

বিত্তাদি লাভ প্রকৃত সম্পদ লাভ নহে

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি হইতে দেখা গেল যে, আমাদের মতি ব্রহ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে, কেবল ধন-ধান্যাদি কেন, যদি স্বর্গের ইন্দ্রত্বও লব্ধ হয়, তাহা হইলেও ঐ লাভকে প্রকৃত সম্পদ-লাভ বলা যাইতে পারে না। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, এইরূপ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও সুখ-বাসনার নিবৃত্তি হয় না; অতএব ইহা কিরূপে 'সম্পদ' পদবাচ্য হইতে পারে? তবে যিনি সুদামার ন্যায় সমুন্নত মনাঃ হইয়াছেন তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

———

অষ্টম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

সৃষ্টির আদি হইতেই বিপদ আছে

দর্শন, পুরাণ এবং বাইবেলের সাক্ষ্য

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত অল্প মাত্রায় আবরক বিক্ষেপের সংযোগ হইয়া যে রূপান্তর হয় তাহার নাম মিশ্র-সত্ত্ব, এবং তাহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় সংযোগ দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্বের রূপান্তরের নাম রজঃ, এবং আরও বেশী পরিমাণে আবরক বিক্ষেপের সংযোগ হওয়ার পরে শুদ্ধসত্ত্বের যে রূপান্তর হয় তাহার নাম তমোগুণ। কালশক্তির প্রেরণার প্রভাবে গুণত্রয় নিয়তই কার্য্য করিতেছে। তাহারা এবং তাহাদের হইতে উৎপন্ন সংস্কার সকলও পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। সংস্কার সকলের মধ্যে পরস্পরকে অভিভব করার জন্য যে চেষ্টার কার্য্য নিয়ত চলিতে থাকে তাহারই ফল বিপদ। আদিকল্প হইতেই গুণত্রয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ চলিয়া আসিতেছে, অতএব সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বিপদও সংসারে বর্ত্তমান আছে।

ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ার পরে, রজোগুণের প্রেরণায় এবং অবিদ্যাসৃষ্ট আত্মাভিমানের মোহের বশে (অর্থাৎ তমোগুণের প্রভাবে), ব্রহ্মা ঐ মৃণালের মূল অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই কার্য্যে অদম্য চেষ্টা করিয়াও ব্রহ্মা সিদ্ধিলাভ করেন নাই। কারণ, সাত্ত্বিক সংস্কার সকল তখন প্রবল হইয়া ব্রহ্মার চিত্তস্থিত রাজসিক সংস্কারকে অভিভূত করাতে তাঁহার চেষ্টা নিস্ফল হইয়াছিল। এই নৈষ্ফল্য তখন ব্রহ্মার নিকট বিপদ তূল্য প্রতীয়মান হইলেও, পরে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মদর্শন লাভ করিলেন, তখন তাঁহার চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হওয়াতে পূর্ব্বে যাহা বিপদ ছিল, তাহাই সম্পদে পরিণত হইয়াছিল।

Adam এবং Eveএর পতনের বিবরণেও দেখা যায় যে, Eveএর বাক্যে যে তমোমিশ্রিত রাজসিক ভাব ছিল সেই ভাবের প্রেরণায়, Adam শ্রীভগবানের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তখন সত্ত্বগুণের শক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের উভয়েরই 'অভিভব' অর্থাৎ অধোগতি, হইয়াছিল। এই ঘটনায় সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণের অধিক্ষেপের নিদর্শনই দেখা যায়। রজোগুণ তাঁহাদের উভয়কে বি=ভগবানের বিপরীত দিকে (অর্থাৎ আত্মাভিমানের দিকে) লইয়া গিয়াছিল, ভগবানের আদেশের 'বিপরীত' ভাবে আচরণ করার জন্য প্রবৃত্তিই তাঁহাদের পক্ষে বিপদের কারণ হইয়াছিল। ব্রহ্মার দৃষ্টান্ত এবং Adamএর দৃষ্টান্ত, এই উভয় দৃষ্টান্তেই দেখিলাম যে, সৃষ্টির আদি হইতেই বিপদ সংসারে বর্ত্তমান আছে।

অষ্টম অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিপদের স্থান

বাইবেলে বিপদের পরিচয়

Old Testamentএ বহু সহস্র বৎসর যাবৎ শ্রীভগবান, **Jehovah** The Great Chastiser (মহান্ শাস্তিদাতা জিহোভা) এই নামেই পরিচিত হইতেন। তিনি যখন সমবেত ইহুদি জাতির সমক্ষে **Moses**এর নিকট দশটী ধর্ম্মব্যবস্থা প্রচার করেন, সেই সময়ে গভীর মেঘ গর্জ্জন এবং প্রচণ্ড অশনি সম্পাত দ্বারা দিগদিগন্ত ঝলসিত করিয়া আপন বিরাট শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বাইবেলের এই প্রাচীন অংশে ইহুদিগণের যে জাতীয় জীবনের ইতিহাস আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভোগ-বাসনার বশে Jehovahর আদেশ অমান্য করাতে ইহুদিগণ ভূয়োভূয়ঃ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন।

অতএব অনুমান হয় যে ভোগবাসনার মোহে অন্ধ মানবের মনে ভয় উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে উপরোক্ত ধর্ম্ম-ব্যবস্থার অনুসরণে প্রবৃত্ত করার জন্যই ভগবান ব্যবস্থা গুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আপন শাসন শক্তির নিদর্শনও দেখাইয়াছিলেন।

যিশু যদিও প্রাচীন **Religion of Law**র পরিবর্ত্তে **Religion of Love** (প্রেমের ধর্ম্ম) প্রবর্ত্তিত করেন, তথাপিও তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, প্রকৃষ্ট সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে **Scourging** এবং **Crucifixion**এর নির্য্যাতন অবশ্যই সহ্য করিতে হয়; ভগবান যখন কাহাকেও এইভাবে নির্য্যাতন করেন তখন ঐ কার্য্য তাঁহার কঠোরতার পরিচায়ক নহে, উহা তাঁহার প্রেমেরই নিদর্শন। এই তত্ত্বটীও তাঁহাদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে, 'Whom the Lord loveth He chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth'; Humble yourself under the mighty hand of the Lord'—এই মর্ম্মের বহু বাক্যই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। এই মহাত্মাগণ আপন আপন জীবদ্দশায় যেরূপ বিপদ সহ্য করিয়াছিলেন, সেই বিপদ সকল স্মরণ করিলে বলিতে হয় যে, তাঁহাদের আত্মজীবনই ঐ মহাত্মাগণের মুখ-নিঃসৃত তত্ত্ব বাক্যের আদর্শ স্থানীয় হইয়া মানবকে পথ প্রদর্শন করিতেছে।

পুরাণাদিতে বিপদের পরিচয়

যাহাতে অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপর আত্মাভিমানের উপশান্তি হয়, ভারতীয় দর্শন সেই আদর্শেরই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দেহাত্মভাবের উপশম হওয়ার পরে যদি কাহারও দৈহিক সুখ বা দুঃখ হয়, তাহলে তদ্দারা তাঁহার চিত্ত-বিক্ষোভ হয় না, এইজন্যই বোধ হয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ বিপদে সহিষ্ণুতার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখেন নাই। মানব যাহাতে গুণাতীত হইয়া

মোক্ষলাভ করে, দর্শন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র মানবকে তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন।

যিনি গুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে বিপদেরও অতীত হইয়াছেন। যখন কাহারও মাথার উপর মেঘ থাকে, তখনই তাঁহার পক্ষে মেঘ হইতে বজ্রাঘাতের সম্ভাবনা থাকে, এইজন্যই তখন ভীত হওয়ার কারণ থাকে, কিন্তু যিনি মেঘ ও বিদ্যুতের রাজ্য অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত শিখরে সমারূঢ় হইয়াছেন তিনি নির্ভীক ভাবে দিনযাপন করিতে পারেন। যাঁহারা দার্জ্জিলিঙে পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ পর্ব্বতের সানুদেশে বিদ্যুতের খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই উপমাটীর বাস্তবতা উপলব্ধি করিবেন।

মানব যাহাতে অবিদ্যা-সৃষ্ট 'সুখ' ও 'দুঃখের' রাজ্য অতিক্রম করিয়া চিরশান্তির রাজ্যে যাইতে পারে, ভারতীয় দার্শনিক ও প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতাগণ তাহারই ব্যবস্থা করিয়া ছেন।

তাহলেও বিপদ বস্তুটী যে একটা নগণ্য ব্যাপার নয়, অবিদ্যার অধীন থাকার সময়ে ইহা যে সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করে, পুরাণাদির প্রণেতাগণ এই অপ্রিয় সত্যটীকে লক্ষ্য করিয়া তদ্বিষয়ে দুর্ব্বল মানবকে সাবধান করিয়াছেন।

চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে অসুরগণের সহিত মহামায়ার সংগ্রামের যে রোমাঞ্চকর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্ত্বগুণের সহিত রজো এবং তমোগুণের সংঘর্ষণেরই চিত্র এবং তাহাতে অসুরের মূর্ত্তিতে অবিদ্যার রূপ ও সংগ্রামের রূপে বিপদের রূপই দৃষ্ট হয়। Mosesএর নিকট দশটী ধর্ম্ম ব্যবস্থা প্রকাশের সময়ে যে অশনি-নিনাদ শ্রুত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালেও তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়াছিল, 'মন্দং মন্দং জলধরাঃ জগর্জ্জুরম্বুসাগরম্'—এই গর্জ্জনে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পূর্ব্বাভাষই প্রদত্ত হইয়াছিল।

মানব চিরদিনই ভোগসুখে আসক্ত ; যাহাতে ঐ সুখলাভে বিঘ্ন না হয়, সেইজন্য বেদে বহু যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। মহাভারতের প্রণয়ণকালে ব্যাস ঐ ব্যবস্থারই সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন। ভোগ-সুখে বিঘ্ন, অর্থাৎ 'বিপদ' নামক রোগটী, প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই বেদে এবং মহাভারতে ঐ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব ঐ সকল ব্যবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, বেদ প্রকাশের সময় হইতেই বিপদের প্রতাপ সংসারে আছে। বেদ পুরাণ এবং বাইবেল,—সকল শাস্ত্রেই আমরা বিপদের নিদর্শন পাই। অতএব 'বিপদ' আধুনিক বস্তু নয়।

নবম অধ্যায় (প্রথম অংশ)

অহঙ্কারের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ

যাহা যথার্থতঃ 'আমি' তাহা কিরূপ

পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ পৃষ্ঠায় 'জীব ও ব্রহ্ম' নামক মন্তব্যে জীবের প্রকৃত স্বরূপের আলোচনা করা হইয়াছে। গীতা বলেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বান্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ

অপরা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন 'অংশ' হইতে পঞ্চ মহাভূত (এবং, ঐ পঞ্চ বস্তুর সংযোগে, জীবের দেহ) এবং মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার সৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু 'পরা' প্রকৃতি যখন 'জীব' নাম ধারণ করিয়া অপরা দ্বারা সৃষ্ট দেহে অধিষ্ঠিতা হইলেন, সেই সময়ে তিনি কেবল-মাত্র আপন 'অংশের' দ্বারা 'জীব' রূপে অবতীর্ণা হন নাই ; তিনি 'স্বয়ং', অর্থাৎ পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের সহিত 'জীব' নাম ধারণ করিয়াছেন।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটীর মর্ম্ম অতি গভীর। ইহা হইতে দেখা যায় যে, যে পরা প্রকৃতি অনন্ত প্রেমের উৎস, যিনি বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির পার্শ্বে বিভূতিময়ী লক্ষ্মীদেবীর রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করেন, তিনি স্বয়ংই (অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের সহিত)'জীব' নামে আমাদের দেহে অবস্থান করিতেছেন। বাইবেল বলেন যে আমাদের দেহই **'Temple of God'**, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত জীবের দেহরূপ শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবান স্বয়ং অধিষ্ঠিত আছেন, এবং তিনিই বাসুদেব নামে আমাদের জীবন স্বরূপ। ব্রহ্ম হইতে অভেদ্যা পরা প্রকৃতি নিয়তই ব্রহ্মের পার্শ্বে অবস্থান করেন। অতএব আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত বাসুদেবের পার্শ্বে পরা প্রকৃতি নিয়তই 'জীব' নামে অবস্থান করিতেছেন।

আমাদের আত্মস্বরূপের এই উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে কেহ আর নিজদেহকে তুচ্ছ বস্তু ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না। যে দেহে স্বয়ং লক্ষ্মী ও নারায়ণ অধিষ্ঠান করিতেছেন, আমাদের সেই দেহেই বৈকুণ্ঠের প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়। তাই জনৈক লেখিকার সুমধুর ভাষায় বলি—

রাধা-কৃষ্ণ যুগল মিলন—
শোভিত হৃদি-কুঞ্জবন।
সখি! এই বুঝি সেই সুশোভিত দেশ
—দেহগত বৃন্দাবন।
সখি! এই বুঝি সেই প্রেমের যমুনা—
জ্ঞানে মিশে বহে সর্ব্বক্ষণ।

সংসারে অবিদ্যার মোহ বশতঃ যতই কষ্ট পাই না কেন, যাহা যথার্থ 'আমি', অর্থাৎ যাহা আমার যথার্থ স্বরূপ, তাহা তুচ্ছ বস্তু নয়।

শ্রীহরির কৌস্তুভ শোভিত বক্ষই আমার প্রকৃত নিবাসস্থান 'শ্রিয়ঃ নিবাসঃ যস্যোরঃ'—তাঁহার চরণ-সেবা করাই আমার প্রকৃত সুখ, দ্বাপর যুগে যখন আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন আমিও শ্রীরাধারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলাম। সত্য বটে যে

শ্রীহরি এখন আমাকে ঘোর যাতনা দিতেছেন, কিন্তু দ্বাপরে যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, তখনও কি শ্রীরাধা-রূপিনী আমাকে অল্প যাতনা দিয়াছিলেন! তাঁহার যাতনা দেওয়ার যেমন অধিকার আছে, সেই সঙ্গে আমারও একটী অধিকার আছে—অভিমানভরে শ্রীরাধার ন্যায় 'প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা' হওয়ার অধিকারও আমার আছে।

অতএব আত্মগৌরবের বশে আমি শ্রীহরিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

'প্রভো! তোমারি গরবে আমি গরবিনী'

তির্য্যক যোনিতে পতিত দশাতেও জীবের মনে এই আত্ম-উৎকর্ষের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় না। তাই ব্যাঘ্রাদি শক্তিমান পশু সকল মানবের বশ্যতা স্বীকার করে না। ক্ষুদ্রতম কীটও পদদলিত হইলে তাহার আত্মগৌরবে আঘাত পড়ে, তাই সে তখন দলনকারীকে দংশন করে।

A beam in darkness, let it grow

প্রাক্তন সংস্কার বশে আমরা যতই নীচ যোনিতে পতিত হই না কেন, কোন অবস্থাতেই অবিদ্যার আবরক শক্তি জীবের আত্মস্বরূপের জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

ঘন-ঘোর অন্ধকারে—তুমি ক্ষীণ আলো,
মৃগতৃষ্ণা মরুভূমে—বারিবিন্দু তুমি ;—
('নাম মাহাত্ম্য')

এই ক্ষীণ আলোক রেখা চিত্তে অবস্থান করে বলিয়াই, পতনের অধস্তম স্তরে গিয়াও আমাদের মুক্তির আশা থাকে। বিপদের প্রেরণাবশে যখন আমরা সাধনা করি, তখন সাধনা প্রভাবে ঐ ক্ষীণ রেখাই বিশুদ্ধ সত্ত্বের পূর্ণ প্রভায় পরিণত হয় ; তখন আর কিছুমাত্র মোহান্ধকার থাকে না। এই আলোকের নাম 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ'; এই জ্যোতিঃর স্বপ্রকাশ অবস্থা বর্ণনা উপলক্ষে গীতা বলেন, 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ, ন শশাঙ্কঃ, ন পাবকঃ'।

'Self-reverent each, reverencing each.'

যখন আত্ম-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হয়, মানব তখন বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখেন ; তখন তিনি আর নিজেকে একটী মাত্র দেহে আবদ্ধ থাকিতে দেখেন না। তিনি তখন অনুভব করেন যে, পরা প্রকৃতি রূপে তিনি সকল বস্তুতেই অধিষ্ঠিত আছেন। যে 'ভেদমোহ' (৩৩ পৃষ্ঠা) হইতে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি জন্মিয়াছিল, তাহা দূর হইয়া মানবের মনে তখন 'একীভাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ তখন তিনি আর আপনাকে অপর অপর বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া ভাবেন না। যে বিশ্বপ্রেম স্বয়ং শ্রীভগবানের স্বরূপ, মানবের মনে একীভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই বিশ্বপ্রেমের সুধা দ্বারা তাঁহার চিত্ত পরিপ্লুত হয়। ঐ অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরে ধনী ও নির্ধন, পণ্ডিত এবং মূর্খ, কেহই আর পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না।

পাশ্চাত্য মহাদেশে প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ, যে সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতা প্রায় ভগবানের তুল্য সম্মানার্হ বস্তু হইয়া আছে, যাঁহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞান সঞ্জাত হইয়াছে তাঁহাদের মনে ঐ বস্তু ত্রয় আপনিই জন্মায়। আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভেদভাব দূর হওয়াতেই সমভাব (অর্থাৎ 'সাম্য') জন্মায়, এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানেব সঙ্গে যে বিশুদ্ধ প্রেমের (অর্থাৎ ভক্তির স্ফুরণ হয়, তাহাই বিভুর বিশ্বপ্রেম ; এই প্রেম হইতে 'মৈত্রী' এবং 'স্বাধীনতার' স্ফুরণও হয়। সুতরাং যে ব্রহ্মদর্শন লাভ করাই জীবনের পরম পুরুষার্থ, যিনি তাহা লাভ করিয়াছেন, তিনি যে কেবল ধার্ম্মিক মানব হন তাহাই নয়, তাঁহার মনে citezenship উপলক্ষে আপন কর্ত্তব্য জ্ঞানও পরিমার্জ্জিত হয়। অর্থাৎ কেবল spiritual perfection নয়, সর্ব্ববিধ perfectionই জন্মায়।

এই জ্ঞানের সঙ্গেই ভক্তি ও বৈরাগ্য জন্মায়

পূর্ব্বে পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, যে সুখ জীবনের পুরুষার্থ-ভূত, তাহা লব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মদর্শন' অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান

জন্মায়। উপরে বলা হইল যে, আত্মস্বরূপের জ্ঞানের উদয় হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সুখস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতিও লব্ধ হয়। এই অনুভূতি হইতে আপনিই অহৈতুকী ভক্তি এবং পরম বৈরাগ্যও জন্মায়। অতএব যিনি যে সাধনমার্গই অবলম্বন করুন না কেন, সকল পন্থা একই বস্তুতে, অর্থাৎ ব্রহ্মে, পর্য্যবসিত হয়। তাই কালিদাসের ভাষায় বলি যে,—

বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্না পন্থানঃ সিদ্ধিহেতব
স্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণাবে

নবম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

মানবের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের পার্শ্বে দারিদ্র্যের ছবি

'ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনং'

যে পরা প্রকৃতি জীব হইয়া আছেন, তিনি ভগবান হইতে পৃথক্ নহেন, তিনি শ্রীভগবানের অবস্থান্তর মাত্র। অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী হইয়াও সংসারে আসার পরে তিনি কেন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন? যাঁহার ঐশ্বর্য্য অনন্ত, তিনি কেন 'কৃপণ'; অর্থাৎ দরিদ্র জীবের মত ত্রিতাপ ও জন্ম-মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতেছেন?

এই প্রশ্ন নূতন নয়, বিদুরও মৈত্রেয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, 'সেয়ং ভগবতো মায়া' অর্থাৎ ভগবানের মায়া নাম্নী ইচ্ছাশক্তির বশে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ....

ঐ ইচ্ছার উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা শ্রীভগবানই জানেন। তবে আমরা দেখিতে পাই যে, মায়ার বন্ধন দ্বারা বিভুর সৃষ্টিলীলা সম্পাদনে সৌষ্ঠবই হইতেছে। পূর্ব্বে ৫৬-৫৮ পৃষ্ঠায় এই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সংসারে কেবল অন্তরঙ্গা

শক্তিমাত্র থাকিলে সৃষ্টিলীলা 'নিখুঁত' হইত না; উভয় শক্তিই বর্ত্তমান থাকাতে সৃষ্টির সৌষ্টবই হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, জীবের কার্পণ্য দ্বারা অমঙ্গল না হইয়া মঙ্গলই সাধিত হইতেছে।

'No philosopher can bear the toothache.'

পাশ্চাত্য মহাদেশের Stoic দিগের ন্যায় এদেশেও মায়াবাদী সম্প্রদায় যাতনাকে অলীক বস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। যাতনা এমন বস্তুই নয় যে, মুখে কেবল 'মায়া' 'মায়া', অথবা 'অলীক' 'অলীক' বলিলেই সকল যাতনার অবসান হইবে। মতি যতকাল দেহের উপর আবদ্ধ থাকিবে, ততকালই চিত্তবৃত্তির উপর গুণত্রয়ের প্রভাব অবশ্যই থাকিবে। আর ততকালই তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষণও চলিবে; এবং এই দেহাত্মভাব হইতে যাতনাও জন্মিবে।

যুক্তি তর্কের মূল্য

যদি বল যে, যুক্তি-তর্ক দ্বারা মনকে বুঝাইয়া কি যাতনার উপশম করা সম্ভব নয়? এই কার্য্য যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা বলিতে লেখকের সাহস হয় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম, কেহ যদি যুক্তির প্রভাবে আপন চিত্তে সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের আবাহন করিতে সমর্থ হন, এবং আপনার চিত্তবৃত্তিতে যদি সেই জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই যুক্তি দ্বারা মায়ার স্বরূপ অনুভব করা সম্ভবপর হয়। মায়ার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিতে পারিলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এবং যাতনারও অবসান হয়। যিনি উন্নতির এই অত্যুচ্চ স্তরে উঠিতে পারেন নাই তিনি যদি কেবল 'মায়া' 'মায়া' বলিয়া বিপদকে উড়াইয়া দিতে চান, তাহলে ঐ মুখের কথাতে বিপদ কখন পলায়ন করিবে না।

আমাদের মত দুর্ব্বলের পক্ষে উপায় কি

আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল, আমাদের না আছে মেধা, না আছে ভক্তি এবং না আছে নিষ্ঠা। যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা উপরে উল্লেখ করা

হইল, তাহার যে আবাহন করি সে সাধ্য আমাদের অনেকেরই (প্রায় সকলেরই, বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না) নাই। এই প্রকার দুর্ব্বল মানবের 'সংসার-দুঃখ নির্ব্বাণ' করার জন্য ব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। ভাগবতের উপদেশের অনুসরণ করাই যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর, এই বিষয়ে অন্ততঃ পাঠকের চিন্তার উদ্দীপনা করার জন্য, কি উপায়ে বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, তাহা ক্রমশঃ এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)

Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning.

ভাগবতে নির্দ্ধারিত শ্রবণ কীর্ত্তন, এবং স্বাধ্যায় প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে করিতে যতই আমাদের মনে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রভাব স্থাপিত হয়, অবিদ্যার প্রতাপও ততই কমিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ, সংসার-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে, যাতনারও সম্পূর্ণ উপশম হয়। ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন অতি সুমধুর ভাষায় মানবের এই উৎকর্ষের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

Then comes the stateliest Eden back to man,
Then shines the world's great bridal chaste and calm,
Then springs the noblest raee of human kind.

এই অবস্থাই জীবের সহিত ব্রহ্মের মিলনের অবস্থা। কথাগুলির অনুবাদ দ্বারা রসভঙ্গ করিব না। বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির সহিত লক্ষ্মীদেবীর মিলনোৎসব বর্ণনা উপলক্ষে ভাগবতে যে ভাষার ব্যবহার হইয়াছে তাহা আমাদের কাছে অধিকতর সুমধুর ;—

শ্রীর্যত্ররুপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ
প্রেক্ষাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ রুদগীয়মানা প্রিয়কর্ম্মগায়তী

যে ভাগ্যবান মানব আত্মস্বরূপের যথার্থ উৎকর্ষ অনুভব করিয়াছেন, তিনি আপনার সহিত ব্রহ্মের প্রেমময় সুমধুর সম্বন্ধ অনুভব করেন; এবং তখন জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে রাসোৎসব আরম্ভ হয়। এই সময়ে আমাদের জীবদ্দশায় যাতনাময় অমানিশার অবসানের পর জীবনের সুপ্রভাত হয়। ঐ ভাগ্যবান মানবের চক্ষে স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সাংসারিক সকল বস্তুই যেন, অপর কোন এক রাজ্য হইতে আগত,মধুময় জ্যোৎস্নাময় জ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। ঐ ভাগ্যবান মানব তখন অনুভব করেন যে, সেই পরম প্রেমিক পুরুষ, জীবকে আপন অনন্ত প্রেমের উপহার প্রদানের জন্য, নিজেই স্ত্রী পুত্রাদির রূপ ধারণ করিয়া নিয়ত আমাদের কাছে আছেন এবং আমাদের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছিলেন। যে ধন বহু দুঃখের আকর, তাহাতেও শ্রীহরির রূপ দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মীদেবী যেমন বিভূতি নিচয়কে শ্রীহরির পাদমূলে অর্পণ করেন, তেমনি এই সকল ভোগোপকরণই শ্রীহরির পাদমূলে সমর্পণ করিয়া, জীব লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় প্রেমে বিভোর হন, তখন এই সংসারে অবস্থান কালেও তিনি বৈকুণ্ঠের আনন্দোৎসবের তুল্য প্রীতি লাভ করেন।

'নাম-মাহাত্ম্য' নাটকের রচয়িত্রীর ভাষা ধার করিয়া বলি যে, এই সমুন্নত অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরে সাধক দেখেন যে—

নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু, নাহিরে ত্রিতাপ;
হৃৎ-পদ্মে চিদানন্দ আনন্দে বিরাজে

তখন চিৎ এবং আনন্দের একত্র সমাবেশ হওয়াতে সকল বিপদেরই পর্য্যবসান হয়।

দশম অধ্যায় (প্রথম অংশ)

সংস্কারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে বিপদের উৎপত্তি

সুখ কামনা অনিবার্য্য

পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের যে নিত্য এবং দুর্ভেদ্য বন্ধন আছে, ঐ বন্ধনের আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে প্রকৃতি (অর্থাৎ জীব) নিয়তই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে চান (৩৪ পৃষ্ঠা)। ব্রহ্ম সুখ-স্বরূপ (অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সুখই ব্রহ্মের রূপ মাত্র), সেইজন্য স্বভাবতঃই জীবের অন্তরে সুখ লাভের জন্য কামনার উদয় হয়। প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে যে নিত্য এবং অভেদ্য প্রেমের বন্ধন আছে, ঐ বন্ধনকে ভেদ করিয়া যদি তাঁহাদের উভয়কে বিভিন্ন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয়, কেবল তাহা হইলেই জীবের চিত্তে সুখকামনা বিলুপ্ত হইতে পারে। যতকাল কেহ এই অসাধ্য-সাধন করিতে না পারেন, ততকাল স্বভাব গত ধর্ম্মের প্রেরণার বশে জীবের মতিতে নিশ্চয়ই সুখের কামনার উদয় হইবে, এবং কেহই ঐ কামনাকে নিরোধ করিতে পারিবে না।

এই কথাগুলি পড়িয়া কেহ হয়ত বলিবেন যে, তবে কি 'সংযম' অসম্ভব ? উত্তরে বলি যে, এই তত্ত্বের সহিত সংযম তত্ত্বের বিসম্বাদিতা নাই। যে প্রবল আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে কামনা জন্মায়, ঐ শক্তির প্রেরণা দ্বারা কামনা যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হয় তখন কামনাকে উন্মার্গ হইতে সন্মার্গে আনয়নের নামই 'সংযম'। সংযম দ্বারা কামনা বিলুপ্ত হয় না, কেবল উহার উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারিত হয়।

অবিদ্যা নিজের আবরক বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা জীবের আত্ম-স্বরূপ এবং ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সুখ-স্বরূপের জ্ঞানকে নিরুদ্ধ করে বটে, কিন্তু জীবকে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করার শক্তি অবিদ্যারও নাই ; কিম্বা

জীবের মতির উপর ব্রহ্মের আকর্ষণী শক্তির কার্য্যকে নিরোধ করার শক্তি অবিদ্যারও নাই। আবরক শক্তি যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ এবং ক্রিয়াশক্তিকে আবদ্ধ করে, সেই সময় ব্রহ্মের আকর্ষণী শক্তিরও খর্ব্বতা জন্মায়; শক্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ঐ শক্তি কখনই সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয় না। এইজন্য তমোপ্রধান তির্য্যকগণের মতিও কতক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাই তাহাদের মনেও কামনার সঞ্চার হইতে দেখা যায়; দারুণ উত্তাপে বৃক্ষ-লতাদি শুষ্ক হওয়ার পরে বর্ষার বারিধারা সম্পাতে তাহাদের মূর্ত্তি প্রফুল্ল দেখিলে, স্থাবরগণও যে উপরোক্ত আকর্ষণী শক্তির সীমার বহির্ভূত নয়, তাহারাও যে ঐ শক্তির অধীন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা দ্বারা জ্ঞানের নিরোধ হওয়াতে জীব বিশুদ্ধ সুখকে কল্পনা করিতে না পারিয়া ঐ সুখের বিকারকে, অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্ত সুখকে, কামনা করে। সুখের এই বিকৃত ভাবও ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সুখস্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নয়, ইহা কেবল ঐ বিশুদ্ধ স্বরূপেরই প্রচ্ছন্ন-বেশ।

গুণত্রয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ হওয়া সৃষ্টির স্বাভাবিক ধর্ম্ম

বিশ্বে কেবল ব্রহ্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র আছেন; ঐ গুণের সহিত ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আবরক বিক্ষেপের সংযোগ হইয়া কিরূপে প্রকৃতির গুণত্রয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (২৬—২৯ পৃষ্ঠা)।

নট যখন নাট্য লীলা সম্পাদন করেন তখন তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বিলুপ্ত হয় না। লীলার জন্য যে যে আবরণ আবশ্যক, তাহা ধারণ করার সময়েও, যাহা নটের যথার্থ স্বরূপ তাহা ছদ্মবেশের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে যে প্রবল ক্রিয়াশক্তি নিহিত থাকে, সেই শক্তি বিকার প্রাপ্ত গুণত্রয়ের মধ্যেও (অর্থাৎ আবরক বিক্ষেপ শক্তির আচ্ছাদনের নীচে) অবস্থান করে। এই শক্তি বলে

গুণত্রয় ক্রিয়াশীল হইয়া পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাই গীতা বলেন—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।

বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত গুণত্রয় পরস্পরকে নিজ ধর্ম্মাবলম্বী করিতে চায়, অর্থাৎ অপর গুণে আবরক বিক্ষেপের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া, ঐ গুণকে নিজের সমান করিতে চায়। গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে এই কার্য্যকে 'অভিভব' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকারে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ করাই তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা তাহাদের অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশক্তিরই ফল।

গুণসৃষ্ট সংস্কার সকলের মধ্যেও সংঘর্ষণ

সংস্কার সকল গুণেরই নামান্তর। এই medium অর্থাৎ আধারের, মধ্য দিয়া (অর্থাৎ সংস্কার সকলের দ্বারা) গুণত্রয় জীবের মন ও বুদ্ধির উপর আপন আপন প্রেরণা শক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদের মন এবং বুদ্ধিকে পরিচালিত করে। এবং গুণের ন্যায় সংস্কার সকলও পরস্পরকে অভিভূত করার চেষ্টা করে।

ভগবানের অনুগ্রহ ও নিগ্রহ

ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি (সংসারে ইহার নাম 'কালশক্তি') হইতে গুণের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি সন্নিবিষ্ট হয়। কারণ, প্রকৃতি এবং পুরুষ নিত্য-সম্বন্ধ, অতএব একের শক্তিবলে অপরে শক্তিমান হন। 'পুরুষের' নাম কাল, এবং 'কালের' অপর দুইটী নাম 'বিষ্ণু' ও 'বাসুদেব'। কালের শক্তিবলে গুণত্রয় ক্রিয়াশীল হয়; এবং গুণ ও (গুণের নামান্তর) সংস্কারের কার্য্য দ্বারা আমাদের জীবদ্দশায় সুখ এবং দুঃখ অর্থাৎ শুভ বা অশুভ ফললাভ হয়। আমরা যখন বলি যে, 'কালরূপী ভগবান কর্ম্মফল প্রদান করিলেন', তখন বস্তুতঃ ভগবান 'গুণ' নামক medium দ্বারা আপন শক্তির প্রয়োগ করেন, এবং সেই শক্তি দ্বারা কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি এবং পুরুষ যেরূপ

অভিন্ন, গুণ এবং কালও তেমনি অভিন্ন অর্থাৎ গুণই প্রকৃতি এবং কালই পুরুষ। ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাকে (functionকে) এই দুই পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে এবং একের শক্তি অপরের মধ্যেও থাকে। অতএব গুণের কার্য্যকে কালরূপী ভগবানের কার্য্য বলা অযৌক্তিক নয়।

সুতরাং গুণের কার্য্যকে ভাল বা মন্দ ভাবে পরিচালিত করিয়া ভগবান আমাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ করেন।

বিপদের উৎপত্তি

কোন সংস্কার প্রবল হইলে আমাদের চিত্তবৃত্তি ঐ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে চায়; কারণ তখন সংস্কারের প্রেরণা শক্তি আমাদের চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করে। ঐ সংস্কারের প্রতিকূল কোন সংস্কারও যদি ঐ সময় বলবান হয় তাহলে—

(ক) প্রতিকূল সংস্কার, আমাদের মন এবং বুদ্ধির উপর আপন প্রভাব বিস্তার করাতে, উপরোক্ত প্রবল সংস্কারের পূরণ উপলক্ষে বিঘ্ন জন্মায়।

(খ) কখন কখন প্রতিকূল সংস্কার দেহের গুণসাম্য বিনষ্ট করিয়া রোগ উৎপাদন করে। (সপ্তম অধ্যায় ১২৬—২৮ পৃষ্ঠা)।

(গ) কিম্বা কালশক্তির সহিত সংযোগে প্রতিকূল সংস্কার আমাদের প্রিয় বস্তুর বা প্রিয় ব্যক্তির বিনাশ করে।

তখন আমাদের কাম্য সুখলাভে বিঘ্ন হওয়াতে আমরা বলি যে 'বিপদ' হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, গুণ ও সংস্কারের Constitutional ধর্ম্ম প্রভাবেই আমাদের বিপদ জন্মায়; অর্থাৎ পরস্পরকে অভিভব করা গুণত্রয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হওয়াতে যখন কোন গুণ বা সংস্কার প্রবল হইতে চায়, তখন অপর গুণদ্বয় তাহাকে বাধা দেয়; এই প্রতিবন্ধক হইতে কাম্য সুখ-লাভে যে বিঘ্ন হয়, সেই বিঘ্নের অবস্থাকে আমরা বিপদ বলি। অতএব বিপদ গুণ ও সংস্কারের স্বাভাবিক ধর্ম্মের ফল মাত্র।

দশম অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

কালস্রোতে ভাসমান জীবের দ্বিবিধ গতি

দ্বিবিধ বিপরীত গতি

ভক্তি কি বস্তু তাহা বর্ণনা উপলক্ষে ভাগবত বলেন যে—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ

জাহ্নবীর পূতবারিধারা যেরূপ নিরবচ্ছিন্নভাবে সাগরের দিকে ধাবিত হয়, ভক্তের মনও সেইরূপ নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানের দিকে ধাবিত হয়, এবং সাগরের বারিধারার সহিত মিলিত হওয়ার পরে গঙ্গার গতি যেরূপ নিরুদ্ধ হয়, শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হওয়ার পরে সেই 'আনন্দ সংপ্লবে' লীন হইয়া ভক্তের আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হয়। শ্রীভগবান অনন্ত মহাসাগরের সহিত উপমেয়। অন্তরঙ্গা শক্তি গঙ্গার ন্যায় জীবকে সেই প্রেমের মহাম্বুধিতে লইয়া যাওয়ার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে। বহিরঙ্গা উহার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ বিষয়ের দিকে, লইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে। উভয় শক্তিই মহাম্বুধিতে পর্য্যবসিত হইতেছে।

এই দুই মহাসমুদ্র, নামে দুই হইলেও, স্বরূপতঃ এক। একটী অনন্ত 'চিৎ' এবং অপার 'আনন্দের' আধার; এবং অপরটীতেও চিদানন্দ আছেন, কিন্তু তাঁহারা আবরক শক্তি দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকাতে, আমরা উহাকে তামসিক অজ্ঞান ও নিরানন্দের সাগর বলি। ঐ আবরণখানি উঠাইবামাত্র উভয়বিধ সাগরের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। কংস বৈরীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে যখন এই আচ্ছাদনখানি উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখন 'চিন্তয়ানঃ হৃষীকেশং অপশ্যত্তন্ময়ং জগৎ'।

এই বিপরীতগামী স্রোতে পতিত জীব কখন বিপদের প্রভাবে অন্তরঙ্গার দ্বারা পরিচালিত হয়, কখন বা বহিরঙ্গার 'বান' আসিয়া প্রবলবেগে জীবকে বিপরীত দিকে লইয়া যায়। বহিরঙ্গার নিকট অসহায় জীব যখন অবিদ্যার মহাসাগরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়, তখনও তাহার উদ্ধারের আশা থাকে, কারণ সেখানেও অন্তরঙ্গার স্রোত ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হয়; এবং ঐ স্রোত দুর্ব্বল জীবকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া আবার পূর্ণ বেগে বহমান অন্তরঙ্গার প্রবাহের মধ্যে আনয়ন করে। আমাদের পতিত দশায় প্রভূ আপন অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করেন বলিয়া, ভগবানকে 'পতিতপাবন' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

কল্প হইতে কল্পান্তরে, কখন অগ্রসর এবং কখনও বা পশ্চাৎগামী হইতে হইতে, যিনি 'চিদানন্দ' সাগরে পতিত হন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। যাঁহারা সংসার স্রোতে নিবদ্ধ থাকেন, তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভের জন্য কি সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই ক্রমশঃ আলোচিত হইবে।

মোক্ষের অনুকূল 'অন্তর্মুখী' ও প্রতিকূল 'বহির্মুখী' সংস্কার

পাঠক ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন যে, ভগবান এমন সুচারু ব্যবস্থা করিয়াছেন যে,তাহা দ্বারাই জীব বিপদ হইতেও মোক্ষ লাভের সুযোগ পায়। সাধনা ব্যতীত এই সুযোগ কখন লব্ধ হয় না। সাধনা কি বস্তু এবং তাহার অনুষ্ঠান পদ্ধতিই বা কিরূপ তাহা ক্রমশঃ আলোচিত হইবে। আপাততঃ কেবলমাত্র বলি যে, সাধনা দ্বারা বিষয় সুখ-লাভের চেষ্টা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবের মতি শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্যে নিবদ্ধ থাকে।

জন্ম জন্মান্তর হইতে অসংখ্য ভোগবাসনার সংস্কার আমাদের মনে সঞ্চিত হইয়া আছে। ঐ সংস্কার সকলের মধ্যে প্রবল প্রেরণা

শক্তি (Stimulating power) আছে। কতক সংস্কারের শক্তি আমাদের মতিকে সাধনার দিকে যাইতে না দিয়া ভোগ সুখের দিকে পরিচালিত করে। এইজন্য তাহাদিগকে 'বহির্মুখী' (বহিঃ = ভগবানের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ভোগের দিকে + মুখী = গমনশীল) সংস্কার বলে। বহির্মুখী সংস্কার রজো এবং তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণ হইতেও কতকগুলি সংস্কার উৎপন্ন হয় ; তাহারা মতিকে শ্রীভগবানের দিকে পরিচালিত করিয়া সাধনার সুযোগ উৎপাদন করে। এই সংস্কার সকলকে 'অন্তর্মুখী' সংস্কার বলে। অন্তর্মুখী সংস্কার সকল সাধনার অনুকূল, এবং বহির্মুখী সংস্কার সকল প্রতিকূল।

উপস্থিত সমস্যা

এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল এই যে, এই দোটানার মধ্যে পতিত জীবের মতি সাধনমার্গে যাবেই বা কিরূপে এবং যাওয়ার পরে তথায় নিবদ্ধ থাকিবেই বা কিরূপে ?

'যাতনা' শক্তি দ্বারা সাধনায় সাহায্য

জীবসাধারণের মধ্যে রজো এবং তমোগুণই প্রবল। কেবল যদি সাত্ত্বিক সংস্কারের শক্তির উপরই জীবের মোক্ষ নির্ভর করিত, তাহলে জীবের পক্ষে মোক্ষলাভ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। অতএব জীবের পক্ষে মোক্ষ লাভকে সুসাধ্য করার জন্য ভগবান অপর একটী নূতন শক্তির সৃষ্টি (অর্থাৎ, প্রকটন) করিয়াছেন। সেই শক্তিটির নাম 'যাতনা' শক্তি। ঐ শক্তিটি কি, উহা কিরূপে প্রকাশিত হয়, এবং কিরূপে কার্য্য করিয়া ঐ শক্তি আমাদের হিতসাধন করে, ক্রমশঃ এই সকল বিষয় আলোচিত হইবে।

একাদশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

বিপদের যাতনা এবং যাতনার ফল

গুণের সাম্য ও বৈষম্য কাহাকে বলে

সপ্তম অধ্যায়ে ১১১—১৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, যে যোনিতে পুরণের যোগ্য 'ব্যুঢ়' সংস্কারের শক্তি অপর অপর যোনিতে পূরণের যোগ্য সংস্কারর শক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলবান হয়, জীব সেই বলবান সংস্কার সকল পূরণের জন্য সেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ সংস্কার সকল 'প্রারব্ধ' এই নাম দ্বারা অভিহিত হয়। প্রারব্ধ বশে জীব কোন বিশেষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করার পরেও তাহার লিঙ্গদেহে প্রারব্ধের প্রতিকুল বহু সংস্কার থাকে এবং তাহারা জীবদ্দশায় কার্য্য করিয়া প্রারব্ধের অনুকূল সংস্কারের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি উৎপাদন করে। এই সকল বিষয় সুবিস্তৃতভাবে সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

যখন কোন জীবের চিত্তবৃত্তিতে প্রারব্ধের অনুকূল এবং প্রতিকূল সংস্কারের শক্তির পরিমাণের জমা খরচ করার পরে দেখা যায় যে, গুণত্রয়ের মধ্যে যে আপেক্ষিক শক্তি (relative strength) আছে তাহা প্রারব্ধে স্থিত সংস্কারের অনুযায়ী কার্য্যের (ইহাকেই সংস্কার 'পূরণ বলে) অনুকূল, গুণের সেই অবস্থাকে গুণসাম্য বলে ; এবং যখন ঐ আপেক্ষিক শক্তি প্রারব্ধের অনুযায়ী কার্য্যের প্রতিকূল হয়, গুণের সেই অবস্থাকে 'বৈষম্য' বলে।

জন্মের পরে সংস্কারের কার্য্য (অর্থাৎ গুণের কার্য্য) নিয়তই চলে এবং গুণত্রয় পরস্পরকে অভিভূত করিতে চায়, এই কারণে এক এক গুণের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া আপেক্ষিক শক্তিরও ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়।

গুণসাম্যে সুখ এবং বৈষম্যে দুঃখ হয়

আমাদের দেহ প্রারব্ধের অনুযায়িভাবে কার্য্য করার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব দেহের Constitutionই (সংগঠন) প্রারব্ধের অনুকূল ভাবে কার্য্য করিতে চায়। যখন গুণত্রয়ের পরস্পরের মধ্যে এরূপ পরিমাণে শক্তি থাকে যে, দেহ আপন constitntionএর, অর্থাৎ সংগঠনের, অনুযায়িভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তখন দেহে 'সোয়াস্তি' ভাব জন্মায়। গুণের এই অবস্থাই গুণসাম্যের অবস্থা; এবং ইহাতেই সুখ অনুভূত হয়। যখন গুণের শক্তির তারতম্য হওয়াতে, দেহ আপন Constitution অনুযায়ী কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, তখন 'সোয়াস্তি' ভাব দূর হইয়া দুঃখই উপস্থিত হয়। বৈষম্যের অবস্থাতেই শক্তির তারতম্য উৎপন্ন হয়; অতএব গুণের বৈষম্য হইলেই দুঃখ জন্মায়।

বিপদের যাতনা

গুণত্রয়ের এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট সংস্কার সকলের মধ্যে সংঘর্ষণ হওয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম (১০ম অধ্যায় ১৫৩ পৃষ্ঠা)। কেবল প্রলয়ের নিশায় এই ক্রিয়া-শক্তির কার্য্য বন্ধ হয়। অতএব সংস্কার সকল যখন সুপ্ত অবস্থায় না থাকিয়া কার্য্যক্ষম অবস্থায় থাকে, তখন তাহারা স্ব স্ব ক্রিয়াশক্তি দ্বারা তাহাদের বিপরীত-ধর্ম্ম-যুক্ত সংস্কারকে অভিভূত করিতে চায়। এই কার্য্য বশতঃই সংস্কার সকলের পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হয়। আমরা যাহাকে 'বিপদ' বলি তাহা এই সংঘর্ষণ হইতেই উৎপন্ন হয়। (১০ম অধ্যায় ১৫৫ পৃষ্ঠা)।

সংস্কার সকল যখন পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ করে, তখন তাহারা ক্ষোভিত অর্থাৎ উত্তেজিত হয়। এবং যখন কোন গুণ অপর গুণকে অভিভূত করিয়া নিজে প্রবল হয়, সেই সময়ে যদি গুণসাম্যও বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রারব্ধের সংস্কারের অনুযায়ি ভাবে কার্য্যের জন্য যে যে গুণের যে পরিমাণ শক্তি থাকা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ শক্তি না

থাকিয়া ঐ শক্তির ন্যূনাধিক্য হয়, তাহলে ঐ ন্যূনাধিক্য দ্বারা গুণ-সাম্যের ব্যতিক্রম হওয়াতে যাতনা উদ্ভবের সুযোগ জন্মায়। এই ব্যতিক্রম যখন অত্যল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তখন যাতনা অনুভূত হয় না; যখন অধিক পরিমাণে ব্যতিক্রম হয়, তখনই চিত্তচাঞ্চল্য এবং মানসিক ক্লেশ জন্মায়।

এই স্থানে মনে রাখা আবশ্যক যে, জীবের মন এবং বুদ্ধি নামক বৃত্তিদ্বয় প্রারব্ধের গুণত্রয় দ্বারা, প্রারব্ধের অনুযায়ী ভাবেই গঠিত হইয়াছে, সুতরাং গুণসাম্যে সুখ এবং ঐ সাম্যের ব্যতিক্রম হইলে তাহারা যাতনা অনুভব করে।

প্রারব্ধের গুণের আপেক্ষিক শক্তির পরিবর্ত্তন

কেহ যেন না ভাবেন যে, কোন জীব ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে তাহার প্রারব্ধের গুণত্রয়ে যে পরিমাণে শক্তি থাকে, ঐ শক্তির পরিমাণ তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত একই ভাবে চলে। বস্তুতঃ জীবের প্রারব্ধে অনেক সংস্কারই থাকে; কতক সংস্কার, যাহা আগে সুপ্তভাবে ছিল, তাহারা জাগরিত হইয়া প্রবল হয়, আবার কতক প্রবল সংস্কার নিজের প্রতিকূল সংস্কার দ্বারা অভিভূতও হয়। অতএব জীব ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে প্রারব্ধের গুণত্রয়ে যে শক্তি ছিল, জীবদ্দশায় তাহাতে বহু পরিবর্ত্তন হইয়া সুখ এবং দুঃখের অসংখ্য উপাদান সৃষ্ট হয়। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমরা সংস্কারের শক্তির পরিবর্ত্তনের নিদর্শন দেখিতে পাই।

দেখা যায় যে, আমাদের বাল্যকালে কতক বস্তু ও কতক কথা প্রীতিপ্রদ থাকে, তাহা বয়োবৃদ্ধির সহিত আর রুচিকর বোধ হয় না। ইহার কারণ কি? প্রারব্ধের সংস্কারের শক্তির পরিবর্ত্তনই বোধ হয় ঐ রুচিভেদের কারণ; অর্থাৎ বাল্যকালে যে সকল সংস্কার শক্তিমান হওয়াতে মন কোন বস্তু বিশেষ কামনা করিত, কিম্বা বুদ্ধি বিশেষ

কোন কার্য্যপ্রবৃত্তি উৎপাদন করিত, সেই সকল সংস্কার অপর সংস্কার দ্বারা অভিভূত হওয়াতে পূর্ব্বের রুচি আর থাকে না। যে নূতন সংস্কার প্রবল হয় তাহাকে অনুসরণ করিয়া, অপর বস্তুর বা অন্য কার্য্যের প্রতি রুচি জন্মায়।

চিত্তের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাতনারও হ্রাস এবং বৃদ্ধি হয়

অতএব জীব সংসারে বাস করার সময়ে যেমন তাহার চিত্তে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট গুণ এবং সংস্কারের মধ্যে সংঘর্ষণ চলিতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহার লিঙ্গদেহে স্থিত সংস্কার সকলেরও পরিবর্ত্তন হইতে হইতে, প্রারব্ধস্থিত ভিন্ন ভিন্ন গুণের শক্তির কখন হ্রাস, কখনও বা বৃদ্ধি হইয়া, Sensibility (অর্থাৎ যাতনা অনুভব করার শক্তির) তারতম্য হয়। নরকের কীট বিষ্ঠা ভোজনেই সুখ পায়, অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে যদি তাহাকে পায়স পিষ্টক খাইতে দেওয়া যায়, তাহলে তাহার যাতনাই হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের সময় ঐ কীটের চিত্তে প্রারব্ধের প্রতিকূল সংস্কার পরিপুষ্ট হওয়াতে গুণসাম্য বিনষ্ট হয়, তাই যাতনাবোধ হয়। 'রুচি' গুণসাম্যের লক্ষণ মাত্র। গুণ-সাম্যের ব্যতিক্রম যত বেশী পরিমাণে হয়, বিপদের যাতনাও তত বাড়িতে থাকে।

বিপদের যাতনার ফল

বিপৎকালে, অর্থাৎ সংস্কার সকলের সংঘর্ষণ সময়ে, যখন আমাদের চিত্ত প্রবল ভাবে বিক্ষোভিত হয়, সেই সময়ে কতক গুণের সংস্কার প্রবল হইয়া গুণসাম্যের ব্যতিক্রম উৎপাদন করাতে আমাদের মনে যাতনা অনুভূত হয়। যাতনা কেবল সংস্কারের আপেক্ষিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির একটী incident, অর্থাৎ লক্ষণ মাত্র। কতক নূতন সংস্কার প্রবল হওয়ায় ফল কি দাঁড়ায়, তাহাই এখন বিবেচনা করা যাক্। গোড়াতেই বলিয়া রাখি যে, সংস্কারের প্রভাবে আমাদের মনে কোন প্রবৃত্তি প্রবল

হইলে, ঐ প্রবৃত্তি আমাদের মন ও বুদ্ধিকে আপন স্বভাবের মতই চালাইতে চায়, অপর গুণ (অর্থাৎ প্রবৃত্তি) যখন ঐ প্রবল প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়, তখন চিত্তে বিক্ষোভ জন্মায়। বিক্ষোভ দ্বারা গুণসাম্য বিনষ্ট হইয়া যাতনার উৎপত্তি হয়।

বিপদ তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে—

(ক) বিপদ, অর্থাৎ গুণ এবং সংস্কারের পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ, গুণত্রয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়।

(খ) ঐ সংঘর্ষণ সময়ে গুণের 'বিক্ষোভ' অর্থাৎ উত্তেজনা হওয়াতে গুণসাম্য নষ্ট হয়, তাহাতেই মনে যাতনা জন্মায়।

(গ) আমরা চলিত কথায় বলি বটে যে, যাতনায় ছটফট করিতে করিতে মতি ভগবানের আশ্রয়ে গমন করে। এই বাক্য দ্বারা চিত্ত-বৃত্তির কার্য্যের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয় না। যাতনা দ্বারা মতি ভগবানের নিকটও যায় না বা অপর কাহারও নিকট যায় না। যাতনা কেবল বিক্ষোভের একটী আনুষঙ্গিক লক্ষণ। বিক্ষোভের সময় যে সকল সংস্কার প্রবলভাবে উত্তেজিত হয় তাহাদের সকলের প্রেরণাই মতিকে আপন আপন ভাবে পরিচালিত করিতে চায়; এবং তাহাদের মধ্যে যে সংস্কার প্রাধান্য লাভ করে মতি সর্ব্বশেষে তাহারই অনুসরণ করে।

(ঘ) যখন সাত্ত্বিক সংস্কার উত্তেজিত হয়, তখন কাহারও মতি ভগবানের দিকে, কাহারও মতি দর্শন শাস্ত্র (Philosophy) অধ্যয়ন অথবা অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তার, দিকে গমন করে। মতি উপরোক্ত ভাবে যে দিকেই যাক্ না কেন,তাহার এই অবস্থা দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়।

(ঙ) প্রকৃষ্ট রাজসিক সংস্কার উত্তেজিত হইলে, আত্মাভিমান প্রবল হয় ও সেই সঙ্গে আশা, আকাঙ্ক্ষা, উত্তম, উৎসাহ এবং 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাবের তাণ্ডব নৃত্য চলে। সত্ত্বগুণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ কার্য্য-হানি, বিভ্রাট, অপমান, রোগ, শোক প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়াতে অভিমান বহু-বার বিধ্বস্ত হইতে হইতে, যখন সত্ত্ব গুণ রজোগুণকে অভিভূত করে

(অর্থাৎ যখন রজোগুণ সত্ত্বের প্রেরণাকে নিরোধ করিতে অক্ষম হয়) তখন সত্ত্বগুণের প্রভাবে মতি সাধনমার্গে গমন করে।

যতকাল সত্ত্ব অপেক্ষা রজোগুণের শক্তি প্রবল থাকে, ততকাল মতি 'অহং' ভাবকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং তখন ভগবান আমাদের মনে আমল পান না। প্রকৃষ্ট (অর্থাৎ তমোগুণের সংস্রব রহিত) রজোগুণই যাঁহার মতিতে প্রবল, সেই মতি হইতে, 'অহং'-ভাবের, (অর্থাৎ আত্মাভিমানের) উপশম করিয়া, ঐ মতিকে ভগবন্মুখী করা যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, পাঠক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহার পরিচয় পাইবেন।

(চ) নিকৃষ্ট (অর্থাৎ প্রবল তমোগুণ যুক্ত) রাজসিক ভাবযুক্ত মানবের মনে বিপৎকালে রজোগুণের উদ্দীপনা হইয়া তাহার মতি শঠতা, প্রতারণা, মদ্যপান, লাম্পট্য প্রভৃতির দিকেই যায়, কারণ তাহাদের মতিতে ঐ সকল সংস্কারই প্রবল শক্তিমান অবস্থায় থাকে।

(ছ) যখন রাজসিক বৃত্তির উদ্দীপনা না হইয়া কেবল তামসিক বৃত্তিরই উদ্দীপনা হয়, তখন বুদ্ধিতে জড়ত্ব ভাবেরই প্রাবল্য হয়। ঐ সময়ে লোকে ভয়ে আড়ষ্ট হয়, এবং ক্ষীণশক্তি রজোগুণের প্রেরণায় কেহ কেহ অতি কুৎসিৎ আচরণ করিয়া আরও অধঃপাতে যায়।

সংস্কার সকল আপন আপন প্রবৃত্তির অনুযায়ী ভাবে কার্য্য করিতে করিতে, ক্রমশঃ তাহাদের উত্তেজনার নিবৃত্তি হয়। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Exhaustion of energy বলে। উত্তেজনার নিবৃত্তি হওয়ার পরে গুণের বৈষম্যের হ্রাস হওয়াতে কিয়ৎকালের জন্য বিপদের যন্ত্রনার উপশম হইয়া জীবন আবার 'একঘেয়ে' ভাবে চলে। যে যত দুরাচার করে, তাহার মনে তত বেশী বেশী কুৎসিৎ সংস্কার সঞ্চিত হইয়া তাহার তত অধঃপতন হয়।

এক মাঘে শীত ফুরোয় না

একবার মাত্র বিপদে পড়িলেই মানবের সংশোধন হয় না, অনেকের পক্ষেই কেবল একবার মাত্র বিপদ দ্বারা বিশেষ কোন উন্নতিই হয়

না। বিপৎকালে যে বিক্ষোভ হয় তাহার বশে কোন না কোন শুভ বা অশুভ সংস্কার প্রবল হইয়া মতিকে উন্নতি বা অবনতির দিকে পরিচালিত করে। তাহার পর কিয়ৎকালের জন্য ঐ সংস্কারের উত্তেজনার উপশম হয়। উপশম হইলে গুণের বৈষম্য দূর হইয়া যাতনারও নিবৃত্তি হয়। তখন জীবনে আবার 'একঘেয়ে ভাব' চলিতে থাকে। বিক্ষোভের সময় কতকগুলি নূতন সংস্কারও জন্মায়, কারণ গুণের শক্তি অনন্ত। একঘেয়ে ভাব চলিতে চলিতে, যখন কোন না কোন ঘটনা সংযোগ দ্বারা পুনরায় গুণ এবং সংস্কারের স্বাভাবিক বিরোধী ভাব প্রবল হয় তখন সংস্কারের মধ্যে আবার প্রবল সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। তখন চিত্তে নূতন বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া জীবের আবার উন্নতি বা অবনতি হয়।

পুনঃ পুনঃ বা নিরবচ্ছিন্ন বিপদ হওয়া সৌভাগ্যের চিহ্ন

যাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি চলিতে থাকে, তাঁহাদেরই পুনঃ পুনঃ, এবং অনেক সময়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে,বিপদ হয় এবং ঐ বিপদ ভীষণমূর্ত্তি ধারণও করে। এই কথা পড়িয়া কোন কোন পাঠক হয়ত লেখকের উপর বিরক্ত হইবেন। রাগ করার পূর্ব্বে লেখকের একটা নিবেদন শ্রবণ করুন। জীব যত ভগবানের সান্নিধ্যে গমন করে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি ততই প্রবলভাবে কার্য্য করে। Staticsএর নিয়ম এই যে, the intensity of a force varies inversely as the square of its distance। অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তিই ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের কার্য্যও বোধ হয় এই নিয়মের বশেই চলে। অতএব সত্ত্বগুণ যত পুষ্ট হয়, তদ্বারা কেবল ইহাই বুঝায় যে, জীব ক্রমশঃ ভগবানের সান্নিধ্যে গমন করিতেছে (৪৩ পৃষ্ঠা)। এই অবস্থায় জীবের চিত্তে স্থিত সকল গুণের ক্রিয়াশক্তিই বলবান হয়। গুণত্রয়ের শক্তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে resistive

power অর্থাৎ প্রতিরোধ শক্তি আছে, তাহা প্রবলভাবে কার্য্য করে বলিয়াই মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সময় পুনঃ পুনঃ এবং ঘন ঘন বিপদ হয়। এই জন্য বিপদ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে।

যখন কাহারও জীবনে বিপদ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে, তখন ইহাই প্রকাশ পায় যে, সত্ত্ব গুণের সহিত রজো এবং তমোগুণের সংঘর্ষণ নিয়তই চলিতেছে; অর্থাৎ মানবের চিত্তে যতই সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতেছে, ততই নূতন নূতন রাজসিক ও তামসিক সংস্কারের উদ্দীপন হইয়া তাহাদের সহিত সত্ত্বের শক্তির সংঘর্ষণ চলিতেছে। এই সংঘর্ষণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে মানবের চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে। অতএব এই অবস্থাকে কি উন্নতির অবস্থা বলা উচিত নয়? এই অবস্থায় যাতনা হয় বটে, কিন্তু ভাবী সুখের তুলনায় এই যাতনা কি আশীষ তুল্য নয়?

পশু প্রভৃতি তামসিক জীব সকলের মধ্যে সত্ত্বগুণ অল্প, তাহারা ভগবান হইতে বহুদূরে আছে অতএব অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গার মধ্যে যে প্রতিরোধক শক্তি আছে, তাহ প্রবলভাবে কার্য্য করে না। সেই জন্য তাহাদের বেশী বিপদ হয় না।

বিপদ ভোগে 'অধিকার'

বিপদ ভোগের জন্য 'অধিকারী' হওয়ার অবস্থাও আছে। যিশুর শিষ্যগণ দীক্ষার পরে ঘোরতর বিপদভোগ করিতে যখন 'অধিকারী' হইয়াছিলেন তখনই তাঁহাদের ভয়ঙ্কর বিপদ হইয়াছিল। অতএব আমাদের কাহারও যখন অতি ভয়ঙ্কর আকারে বিপদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমরা ঐ বিপদ সহ্য করার অধিকার লাভ করিয়াছি। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ব্যক্তির দৃষ্টান্তটীর আলোচনা করা হইল, তিনি ১৩ হইতে ৫০ অর্থাৎ ৩৭ বৎসর যাবৎ তীব্র যন্ত্রণা ভোগের পরে ঘোরতর বিপদভোগে 'অধিকারী' হইয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

বিপদ চিত্তশুদ্ধির উপায় অতএব মঙ্গলসাধক

গুণত্রয়ের ক্রিয়া উপলক্ষে একটী বিশেষ নিয়ম

শক্তির কার্য্যে কি ভাবে বলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, বৈজ্ঞানিকগণ **Statics** শাস্ত্রে তাহার অবধারণা করিয়াছেন। নিয়মটী এই—The intensity of a force varies inversely as the square of the distance, অর্থাৎ কোন শক্তি যখন তাহার উৎপত্তি স্থল হইতে দূরে কার্য্য করে, তখন যে পরিমাণে, দূরত্বের বৃদ্ধি হয় সেই বৃদ্ধির বর্গফল অনুসারে শক্তির হ্রাস হয়, এবং যখন দূরত্বের হ্রাস হয় তখন হ্রাসের পরিমাণের বর্গফল অনুসারে শক্তির বৃদ্ধি হয়।

অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তি উভয়েই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে 'সৎ' নামক অনন্ত শক্তি, অর্থাৎ infinite energy, সংসারে পরিব্যাপ্ত আছে, মানসিক ক্ষেত্রে তাহার আকর্ষণী এবং বিকর্ষণী শক্তির নাম 'অন্তরঙ্গা' ও 'বহিরঙ্গা' এবং বহির্জগতেও যখন ঐ ক্রিয়াশক্তি দ্বিবিধভাবে কার্য্য করে, তখন কার্য্য ভেদে ঐ একই বস্তুর দুইটী পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐ নাম দুইটীকে **Attraction** ও **Repulsion** শক্তি বলা যায় (৫২-৫৪ পৃষ্ঠা)।

অন্তর্জগতে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্যেও কতকটা উপরোক্ত নিয়মের অনুযায়ী কার্য্য দেখা যায়। অর্থাৎ, কেহ যত অধিক পরিমাণে ব্রহ্মের সান্নিধ্যে আগমন করেন, তাঁহার চিত্তে 'অন্তরঙ্গা' এবং 'বহিরঙ্গা' এই উভয় শক্তির কার্য্য তত প্রবল ভাবে চলিতে থাকে, এবং কেহ ব্রহ্ম হইতে যত দূরে গমন করেন, তখন ঐ শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়ার বল তত কমিতে থাকে। অতএব কেবল গুণের বা সংস্কারের পরিমাণ অধিক বা অল্প থাকিলেই যে তাহার ফল প্রকাশ

পায়, তাহা নয়. তাহাদের ক্রিয়াশীলতা দ্বারাই ফলের নির্দ্ধারণ হয়। নিম্নে এই বিষয়টী আর এক ভাবে বিবেচনা করা হইল।

কেহ হয়ত বলিবেন যে ব্রহ্ম অরূপ তাঁহার আবার 'সান্নিধ্য' বা 'দুর' কি ? কোন জীব ব্রহ্মের সান্নিধ্যে আগমন বা ব্রহ্ম হইতে দূরে গমন করিয়াছেন কি না, তাহা জানিবই কিরূপে ? ব্রহ্ম উপলক্ষ্যে 'সান্নিধ্য' এবং 'দূর' পদদ্বয় দ্বারা কি বুঝায় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্ম অরূপ হইলেও বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ তাঁহার মূর্ত্তি, অতএব যাঁহার মনে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের পূর্ণ স্ফুরণ হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। এই অবস্থা সংসারে দেখা যায় না বলিলেও চলে, কারণ প্রকৃতির তিন গুণেই বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত আবরক বিক্ষেপের সংযোগ আছে।

অতএব সংসারে যাঁহার মনে, রজঃ এবং তমোগুণের উপশম হইয়া মিশ্রসত্ত্বের (এই গুণই 'সত্ত্ব' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) পরিমাণ বাড়িতে থাকে, তিনি ব্রহ্মের সান্নিধ্যে আসিতে থাকেন ; এবং যাঁহার চিত্তে সত্ত্বের হ্রাস হইয়া রজঃ এবং তমোগুণের পুষ্টি হইতে থাকে, তিনি ব্রহ্ম হইতে দূরে গমন করিতে থাকেন। অতএব আমাদের চিত্তে যতই সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতে থাকে তত আবরক ও বিক্ষেপ শক্তির কার্য্যপটুতার বল বাড়িতে থাকে এবং কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুই শক্তির বলের হ্রাস হয়।

বল বৃদ্ধি হওয়ায়ই স্বাভাবিক

সত্ত্বগুণের পুষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গার ক্রিয়াশক্তি বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ,সত্ত্বগুণ যে কেবল প্রকাশশক্তিরই আধার তাহাই নয়, এই গুণ ক্রিয়াশক্তিরও আধার এবং উৎপত্তি স্থান। সুতরাং সত্ত্বের পুষ্টি হওয়ার সঙ্গে ক্রিয়াশক্তি স্বতঃই প্রবল হয়। উপরে **statics** শাস্ত্রের যে নিয়মটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিয়মানুযায়ী কার্য্য অন্তর্জ্জগতে চলে কি না, সেই বিষয়ে যিনি

সন্দিহান হন, তিনিও স্বীকার করিবেন যে, যে অবস্থায় সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়, সেই অবস্থাতেই ক্রিয়াশক্তিও স্বভাবতঃ প্রবল হয়।

গুণের 'পরিমাণ' বৃদ্ধি এবং 'বলের' বৃদ্ধি এই দুই বস্তুর মধ্যে তারতম্য কি?

যখন গুণ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিয়া কার্য্য করে, তখনই 'বলের বৃদ্ধি' হইয়াছে বুঝা যায়। যদি ঐ ভাবে বলের বৃদ্ধি না হইয়া, কেবল গুণের পরিমাণেরই বৃদ্ধি হয়, তখন গুণের অধিক ভাগই সংস্কারের আকার ধরিয়া সুপ্তভাবে থাকে এবং কেবল অল্প সংখ্যক সংস্কারেই গুণ ক্রিয়াশীল ভাবে থাকে। সংস্কার রূপে পরিণত হওয়ার পরে যে গুণ সুপ্ত ভাবে থাকে, তাহা কেবল শক্তির লীন ভাব; অর্থাৎ latent বা potential form—তাহা তখন কোন কার্য্য করে না।

বহির্জগতেও শক্তির, ক্রিয়াশীল এবং সুপ্ত, এই দুইটি অবস্থা দেখা যায়। আমরা যে বস্তু আহার করি, তাহাতে পোষণ-শক্তি নিহিত থাকে। যাঁহাদের পরিপাক শক্তি অবিকৃত ভাবে থাকে, তাঁহারা কোন বস্তু আহার করিলে খাদ্যে নিহিত শক্তি বাহির হইয়া তাঁহাদের শরীরে প্রবেশ করে। যে শক্তি তাঁহারা গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহা আর খাদ্য হইতে বাহির হয় না, তাহা মলের মধ্যে potential (লীন) ভাবেই রহিয়া যায়; এবং মলের সঙ্গে দেহ হইতেও বাহির হইয়া যায়।

যাঁহাদের পরিপাক শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাঁহাদের দ্বারা ভুক্ত বস্তুতে যে শক্তি থাকে, সেই শক্তির অতি অল্প অংশই, বাহির হইয়া, দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তাঁহাদের দ্বারা ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে নিহিত শক্তির প্রায় সবই, অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া, মলের সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

ডাক্তারি শাস্ত্র হইতেও দেখা যায় যে, আমাদের শরীরের মধ্যে যক্ষ্মাদি কতক রোগের বীজ যখন torpid (নিষ্ক্রিয়) ভাবে থাকে, তখন তাহারা রোগ উৎপাদন করিতে পারে না। তখন দেহে বহু পরিমাণে রোগ উৎপাদনকারী শক্তি থাকিলেও, ঐ শক্তিকে বল (অর্থাৎ কার্য্য-পটুতা) না থাকাতে, তাহাদের দ্বারা রোগ উৎপাদন হয় না।

গুণের 'বলের' (active power) দ্বারাই উন্নতি বা অবনতি অবধারিত হয়

অতএব কেবল গুণের (অর্থাৎ সংস্কারের) পরিমান বৃদ্ধি হইলেই শুভ বা অশুভ ফল প্রকাশ পায় না। কোন গুণ বা সংস্কারের ক্রিয়াশীলতার (activity) বৃদ্ধি না হইলে, মানবের আচরণে সেই গুণের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। একখানি চাকুই ছুরিতে ইস্পাত কম পরিমাণে এবং তলোয়ারে বেশী পরিমানে থাকে বটে, কিন্তু যদি ধার থাকে, তখন ঐ চাকুই ছুরিখানি দ্বারা যে কাজ হয়, তলোয়ার খানি ভোঁতা হইলে তাহার দ্বারা সে কার্য্য হয় না।

সত্ত্ব এবং রজোগুণ সকল জীবের চিত্তেই আছে। কিন্তু তমোগুণের প্রভাবে সত্ত্বের বা রজোগুণের ক্রিয়াশক্তির খর্ব্বতা হয়; অর্থাৎ তমোগুণের আবরক শক্তি দ্বারা বহু জীবের চিত্তে অবস্থিত সাত্ত্বিক এবং রাজসিক সংস্কারের ক্রিয়াশক্তি সুপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের মনে ক্রমশঃ জড়ত্বের বৃদ্ধি পায়। এই জন্য মানবযোনিতে থাকিয়াও লোকে অলস, নিরুদ্যম, এবং নিরুৎসাহ হয়।

এই দোষ আরও বাড়িলে (অর্থাৎ তমোগুণের প্রভাবে ক্রিয়া-পটুতার আরও হ্রাস হইলে) জীব মানবযোনি হইতে তির্য্যক-যোনিতে নামে, এবং ঐ দোষ অধিকতর বাড়িলে জীব স্থাবর যোনিতে যায়। ঐ প্রকার অবনতির সময়েও চিত্তে সত্ত্ব ও রজোগুণ বহু পরিমাণেই থাকে। কিন্তু তৎসৃষ্ট সংস্কার সুপ্ত ভাবে থাকাতে, সত্ত্ব বা রজোগুণ দ্বারা তাহাদের অধোগতির নিরোধ হয় না।

অতএব দেখিলাম যে, কেবল গুণের পরিমাণ দ্বারা জীবের উন্নতি বা অবনতির নির্দ্ধারণ হয় না। গুণের ক্রিয়াপটুতাই ঐ নির্দ্ধারণের কারণ। ক্রিয়াপটুতা বাড়িলে উন্নতি, এবং কমিলে অবনতি হইতে থাকে।

উন্নতির সাহায্যকারী এবং অবনতির সংযমকারী শক্তি

বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত আবরক-বিক্ষেপের সংযোগ করিয়া ভগবান

এমন আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, গুণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বলেই জীবের উন্নতি বা অবনতি হইতেছে। গুণের যে স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে, তাহারই বশে গুণত্রয় নিয়তই পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ হয়ত বলিবেন, তবে কি জীবের উন্নতি এবং অবনতি সমানবেগেই চলে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, না, তাহা হয় না। ভগবান একটী বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহা দ্বারা উন্নতির সময়ে উচ্চ-গতির বেগ বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু অবনতির সময়ে জীবের পতনের বেগ কমিতে থাকে।

পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, যখন আমাদের কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন গুণত্রয়ের সকলেই প্রবল ভাবে কার্য্য করে। এই অবস্থায় additional impetus (অর্থাৎ নব শক্তির) সঞ্চার হওয়াতে, সত্ত্বগুণ দ্বারা প্রবল বেগে শোধন কার্য্য চলিতে থাকে। সত্ত্বের পুষ্টি দ্বারা সকল গুণেরই বলবৃদ্ধি হওয়াতে, সুপ্ত রাজসিক ও তামসিক সংস্কারকে প্রবোধিত করিয়া তাহাদের শোধন করার সুযোগ জন্মায় ; শোধন দ্বারা জীবের উন্নতির সাহায্য হয়।

কিন্তু যখন রজো বা তমোগুণ বেশী হয় তখন তাহাদের ক্রিয়াশক্তির হ্রাস হওয়াতে অবনতির বেগ কমিতে থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মের সান্নিধ্যে গমন করিলে বলের বৃদ্ধি, এবং দূরে গমন করিলে বলের হ্রাস হইবে— এই যে নিয়মটী আছে তাহা উন্নতির সহায়, এবং অবনতির পক্ষেও সংযমকারী (moderating) শক্তির ন্যায় কার্য্য করে। এই ব্যবস্থা দ্বারা জীবের অশেষ হিতসাধন হইতেছে।

'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'

প্রারব্ধে তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ কোন কোন জীব পতঙ্গ-যোনিতে গমন করে বটে, কিন্তু যাহাতে ঐ যোনি হইতে শীঘ্র মুক্তি-লাভও হয়, সেই জন্য প্রকৃতিতে এমন বিচিত্র ব্যবস্থা আছে যে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পতঙ্গদিগের মনে সেই অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার বাসনা স্বভাবতঃই প্রবল হয়।

ভগবান রজঃ এবং তমোগুণের সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহাতে

সত্ত্বগুণের দ্বারা রজো এবং তমোগুণের বিনাশ হয়, সংসারে তাহারও বিচিত্র ব্যবস্থা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। এই ব্যবস্থা আছে বলিয়াই, কাহারও মনে যখন সাত্ত্বিক সংস্কার শক্তিমান হয়, তখন রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার যেন 'যুদ্ধং দেহি' ধ্বনি করিয়া সাত্ত্বিক সংস্কারকে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষণের সময় যদি সত্ত্বগুণ আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে, তাহলে ঐ গুণ দ্বারা রাজসিক এবং তামসিক সংস্কারের উপর হইতে 'আবরক বিক্ষেপ' শক্তির আচ্ছাদন দূর হয়।

তখন রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সকল সাত্ত্বিকে পরিণত হওয়াতে তাহাদের দ্বারা সত্ত্বগুণের বলাধান হয়। এইভাবে সত্ত্বগুণে নূতন বলের সঞ্চারের হওয়াতে, কতক নূতন রাজসিক ও তামসিক সংস্কারের বিনাশের জন্য সুযোগ জন্মায়। অর্থাৎ যে রাজসিক ও তামসিক সংস্কার মানবের শত্রু ছিল তাহারাই মিত্রভাব ধারণ করে।

কতক বস্তু বৈরী হইয়াও কিরূপে মিত্রভাবে পরিণত হয়, তাহার বিবিধ দৃষ্টান্ত **Pathology** নামক চিকিৎসা শাস্ত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে ;—কলেরা প্রভৃতি কতক রোগের বীজ, যাহারা জীবিত অবস্থায় থাকার সময়ে আমাদের প্রাণনাশ করে, তাহাদিগকে মৃত অবস্থায় যদি আমাদের শরীরে প্রবেশ করান যায়, তখন তাহারা আমাদের দেহের মধ্যে স্থিত হিতকর বীজাণু সকলের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া স্বজাতিরই ধ্বংস করে। অর্থাৎ, যে সকল বীজাণু জীবিত অবস্থায় মানবের প্রাণনাশক ছিল, মৃত অবস্থায় তাহারাই প্রাণরক্ষক হয়। সেইরূপ যে রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সকল মানবের অনিষ্টকর ছিল, তাহারাই সত্ত্বগুণ দ্বারা অভিভূত হওয়ার পরে যখন মৃতবৎ হয়, তখন তাহারাই (সত্ত্বের পুষ্টি করিয়া) মানবের মিত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

ভিজে গামছা 'নিংড়ে' জল বাহির করার মত কার্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন।

ভিজে গামছাকে বারবার 'নিংড়াইলে' তবে তাহার জল বাহির

হইয়া যায় এবং গামছাখানি শুষ্ক হয়। আমাদের চিত্তের মধ্যে এতই রাজসিক ও তামসিক সংস্কার, অনাদিকাল হইতে, সুপ্ত ভাবে আছে যে, ঐ সুপ্ত সংস্কার সকলকে 'খোঁচাইয়া' প্রবোধিত করার পর, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না করিলে, সম্যক্ ভাবে চিত্তশুদ্ধি হয় না। আমরা অনেকে যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য সাধনা করি, তখন ঐ অবিদ্যাসৃষ্ট সংস্কার সকলই সাধনার অন্তরায় হয়।

কুৎসিৎ সংস্কার দ্বারা আমাদের চিত্ত কলুষিত অবস্থায় থাকে বলিয়াই, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার সময় শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করার ক্ষমতা আমাদের থাকে না। আমরা অনেকে 'স্বাধ্যায়' (অর্থাৎ, সু= শ্রেষ্ঠ+অধ্যায়=শাস্ত্র পাঠ) করি বটে, কিন্তু শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ গ্রহণ করিতে না পারাতে, আমাদের চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয় না।

অতএব কিরূপে চিত্ত বিশুদ্ধ হইতে পারে ? আর্দ্র বস্ত্রকে পুনঃ পুনঃ নিস্পেষণ করিলে (অর্থাৎ নিংড়াইলে) তাহার মধ্য হইতে জল বাহির হইয়া পড়ে। বিপদ যখন পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে নিস্পেসিত করে,তখন অনাদি কাল হইতে আগত সংস্কার সকল সুপ্ত অবস্থা হইতে প্রবোধিত হয়, তারপর সত্ত্বগুণ তাহাদিগের সংশোধন করে। এই সময়ে বিপদের যাতনা এবং সাধনা হইতে লব্ধ শক্তি—উভয়ই সত্ত্বগুণের মধ্যে বলাধান করে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিক্ষোভ দ্বারা সুপ্ত সংস্কারের উদ্দীপনের পরে তাহাদের পরাভব দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে।

চিত্তশুদ্ধি যত বেশী হয়, বিপদও তত বাড়ে

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৭১-৭২ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে যে, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বগুণের ক্রিয়া-শক্তি যত বাড়িতে থাকে, ততই অধিক পরিমাণে চিত্তের উদ্দীপন হওয়াতে, সংস্কার সকলের মধ্যে সংঘর্ষণের তীব্রতাও বেশী হয় ; ইহাই বিপদ বৃদ্ধির কারণ। ঐ সময়ে চিত্তবিক্ষোভও অধিকতর প্রবল হয়। ঐ বিক্ষোভ দ্বারা গুণসাম্য বিনষ্ট হওয়াতে, বিপদের

সময়ে লোকে যাহাতে দারুণ যাতনা ভোগ করে, তাহারও যোগাযোগ উপস্থিত হয়। তবে ঐ উন্নত অবস্থায় বিপদের যাতনা দারুণ হইয়াও সাধককে কাতর করিতে পারে না, তাঁহারা 'ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি' কারণ তাঁহাদের আত্মা 'অগুণাশ্রয়ঃ'।

এইজন্যই চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপদ ও তৎসংসৃষ্ট যাতনা উভয়ই তীব্র হইতে থাকে।

মানব তখন ভগবানের সান্নিধ্যে গমন করাতে অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা উভয় বস্তুরই ক্রিয়াশক্তি আপনিই বাড়িয়া যায়। অতএব কেবল যে, সাত্ত্বিক সংস্কার সকলই রাজসিক ও তামসিক সংস্কারকে খোঁচাইয়া তাহাদের সহিত সংঘর্ষণ দ্বারা বিপদ সৃষ্টি করে, তাহাই নয়। বহিরঙ্গা শক্তি প্রবল হওয়াতে কখন কখন রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সাত্ত্বিক সংস্কারকে খোঁচাইয়া বিপদ উৎপাদন করে।

অতএব কখনও বা সাত্ত্বিক সংস্কারের, কখনও বা রাজসিক অথবা তামসিকের, প্রেরণার প্রভাবে সংঘর্ষণ উৎপন্ন হইয়া, আমাদের চিত্তে স্থিত সংস্কার সকলের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দ্বন্দ্ব চলে। এই দ্বন্দ্বের ফলে বিপদও নিরবচ্ছিন্ন হয়।

বিপদের সহিত 'পুণ্য' এবং 'পাপের' সম্বন্ধ

সংসারে একটী চলিত ধারণা আছে যে, যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহাদের বড় একটা বিপদ হয় না ; এবং যাঁহারা 'পাপী' তাঁহাদেরই বিপদ হয়। এই ধারণাটী crude, অর্থাৎ অত্যন্ত 'মোটামুটি' রকমের বস্তু। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহাও বলিতে পারি না।

লোকে সাংসারিক সুখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 'পুণ্য' ও 'পাপের' কথা বলেন। তাঁহাদের মতে সুখ অক্ষুণ্ণ থাকাই পুণ্যের চিহ্ন ; এবং সুখের বিনাশ পাপের চিহ্ন। বিপদ দ্বারা সুখ বিনষ্ট হয়, অতএব তাঁহারা বিপদকে পাপের লক্ষণ বলিয়াই বিবেচনা করেন।

তত্ত্বের আলোকে বিষয়টীর পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে,

প্রকৃতপক্ষে বিপদের সহিত পুণ্যের বা পাপের ঘনিষ্ট সংস্রব নাই বলিলেও চলে। সংস্কারের সংঘর্ষণ হইতেই বিপদ হয়; এই উপলক্ষে কখনও শুভ সাত্ত্বিক সংস্কার দ্বারা সাংসারিক সুখ বিনষ্ট হয়। এইরূপ সুখনাশ পুণ্যেরই লক্ষণ। বস্তুতঃ সংসারে কোন ঘটনাই আমাদের অহিত সাধনের জন্য উৎপন্ন হয় না। যিনি প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি 'পুণ্য' এবং 'পাপ' এই উভয় বস্তুকেই অতিক্রম করিয়া তাহাদের উপরে উঠিয়াছেন।

যে কথা 'আধা সত্য' এবং 'আধা মিথ্যা', তাহা দ্বারা লোকে, পথ-হারাই হয়। বিপদের সহিত পুণ্য পাপের সংস্রব উপলক্ষে চলিত মত দ্বারা লোকের মতিবিভ্রমই হয়।

ভোগরত মানব আপন সংস্কারের অনুযায়ী **Ethical Code** (নীতি শাস্ত্র) সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং **Spiritual Code**ও সৃষ্টি করিয়াছেন। কালরূপী ভগবানের এক ফুৎকারে উভয় **Code**ই উড়ে যায় এবং মানব যাতনাই ভোগ করে।

'পুণ্যশ্লোক' যুধিষ্ঠিরের জীবনে বিপদ কম পরিমাণে হয় নাই, এবং দুরাচারী দুর্য্যোধন, কংস, শিশুপাল প্রভৃতির জীবদ্দশা আরামেই কাটিয়াছিল। এই ঘটনাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পুণ্য এবং পাপের ফল উপলক্ষে জনসমাজে যে কথা প্রচলিত আছে তাহার মূল্য বেশী নয়।

কিরূপ প্রকৃতির লোকের দিন নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে

যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান তাঁহাদের দিনগুলি যে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটে না, ইহা সুনিশ্চিত বলিলেও চলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা যত ভগবানের সান্নিধ্যে গমন করিতে থাকেন, সাত্ত্বিক সংস্কার সকল ততই রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সকলকে খোঁচাইয়া তুলিয়া তাহাদের সংশোধনের জন্য বিপদ উৎপাদন করে। তমোগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবরক বিক্ষেপের বলেরও হ্রাস হয়; এবং জড়তাচ্ছ

বৃদ্ধি হয়। অতএব যখন কাহারও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, সেই অবস্থায় বিক্ষোভশক্তি প্রবল হওয়াতে পুনঃ পুনঃ বিপদ হওয়ার লক্ষ্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (General tendency) থাকে। আবার আমাদের আধ্যাত্মিক অবনতির অবস্থায় বিক্ষোভ শক্তির হ্রাস হওয়াতে, জড়ত্ব ভাবেরই বৃদ্ধি হয়। অতএব ঐ অবনতির অবস্থায় সংস্কারের মধ্যে সংঘর্ষণ বড় একটা হয় না, তাই তখন বিপদ-হ্রাসের দিকেই "স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (General tendency) থাকে।

দুরাচারাদি দ্বারা যদি প্রারব্ধের প্রতিকূল কোন সংস্কারের প্রবলভাবে উদ্দীপনা হয়, তখন অবনতির অবস্থাতেও তীব্র বিপদ হইতে পারে।

পশুদিগের এবং তমোপ্রধান মানবের জীবনে যে 'এক ঘেয়ে' ভাব দেখা যায়, তাহাদের যে সুখ থাকে না কিন্তু বিপদও বড় বেশী পরিমাণে হয় না, তাহা বোধ হয় তমোগুণের আধিপত্যেরই ফল।

দ্বাদশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবাপন্ন মানবের উপর বিপদের কার্য্য ও ফল।

বিরাট-শোধন শক্তির ক্রিয়া

গুণত্রয়ের এবং সংস্কার সকলের মধ্যে, পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য, যে ক্রিয়াশক্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই সংসারে বিশাল ভাবে শোধন কার্য্য চলিতেছে। এই কার্য্যের গতি যে বরাবরই উত্থানের দিকে যায়, তাহা নয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে ziczac curve বলে, সেই ভাবে জীবের গতি চলিতেছে। অর্থাৎ কিয়ৎ-পরিমাণে উন্নতি হওয়ার পরেও, জীবের মনে কতক সুপ্ত কুসংস্কারের উদ্দীপনা হওয়াতে, উন্নত দশা হইতে জীবের অধোগতি, অর্থাৎ, পতন

হইতেছে ; বিভূর বিশাল ক্রিয়াশক্তির লীলাক্ষেত্র এই সংসারে ত স্বয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহই নিষ্ক্রিয় নাই। পতিত দশা হইতেও সাধনা বা সংস্কার প্রভাবে জীবের পুনরুত্থান হয়। পুনরায় পতন এবং আবার উত্থান,—এইভাবে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে এবং কল্প হইতে কল্পান্তরে, জীবের গতি চলিতেছে। এক দিকে যেমন কতক কতক সংস্কারের ক্ষয় হইতে থাকে,সেই সঙ্গে অপর দিকে আবার কতক নূতন সংস্কারও সৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে ভাল এবং মন্দ উভয়বিধ জিনিষের সংস্কারই থাকে, অতএব যতকাল তমোগুণের ক্ষয় হইয়া সত্ত্বগুণের সমধিক প্রাবল্য না হয়, ততকাল জীবের পক্ষে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয় না। ক্ষণকালের জন্য ঐ দ্বার একটু খোলা হওয়ার পরেই আবার বন্ধ হয়, —এই ভাবেই অসংখ্য জন্ম কেটে যায়।

উন্নতির পথ উন্মুক্ত হওয়ার পরেও 'মুক্তি' বহুদূরে থাকে।

দশম ও একাদশ অধ্যায়ে সংস্কার সকলের মধ্যে যে সংঘর্ষণের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, সেই সংঘর্ষণ হইতেই বিপদ জন্মায় ; এবং ঐ বিপদ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হওয়াতে, কেহ কেহ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, এবং কেহ বা প্রকৃষ্ট রাজসিক ভাবাপন্ন হন। তখনও বহু সংস্কার সুপ্ত অবস্থায় থাকে ; তাহাদিগকে (ক) প্রথমে প্রবোধিত করিয়া ক্রিয়াশীল করিতে হয় ; এবং (খ) তাহার পরে তাহাদিগকে বিনষ্টও করিতে হয়। এই কার্য্য উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়। ঐ সকল বিপদ দ্বারা সত্ত্বগুণের যত বেশী পুষ্টি হইতে থাকে, বিপদও ততই তীব্র হয় এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই বিষয়ের একখানি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

রোগের সুপ্ত বীজের ন্যায় সুপ্ত সংস্কারকে দূর না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না

যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের বীজ যখন সুপ্ত ভাবে আমাদের দেহের মধ্যে থাকে, তখন সুস্পষ্ট ভাবে রোগ দেখা যায় না বটে, কিন্তু

প্রকৃত স্বাস্থ্যের অবস্থা থাকে না। সুপ্ত শত্রুর উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করা যেরূপ রণনীতির বিরুদ্ধ, কোন সংস্কার সুপ্ত অবস্থায় থাকার সময়ে তাহাকে বিনষ্ট করাও বোধ হয় ধর্ম্ম-নীতির বিরুদ্ধ। আরও কথা এই যে, রাজসিক বা তামসিক সংস্কার সকল কখন বিনষ্ট হয় না; সত্ত্বগুণ দ্বারা আবরক বিক্ষেপের আচ্ছাদন দূর হওয়াতে তাহারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থান্তর উৎপাদনকে গীতা 'ভস্মসাৎ কুরুতে' বলিয়াছেন। অতএব কোন সাত্ত্বিক বা প্রকৃষ্ট রাজসিক ভাবাপন্ন মানবের জীবনে যখন বিপদ, ভয়ঙ্কর আকারে, উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের চিত্তে কতক সুপ্ত রাজসিক বা তামসিক সংস্কার প্রবোধিত হয়; এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা যখন তাহাদের উপর হইতে আবরক বিক্ষেপ শক্তির আচ্ছাদন তিরোহিত হয়, তখন ঐ সংস্কার সকল সত্ত্বগুণকে পুষ্ট করে।

বিপদ দ্বারাই সত্ত্বগুণের পুষ্টি সম্পাদন এবং তৎসঙ্গে সাধনার ফল

অতএব পুনঃ পুনঃ বিপদ হওয়াতে যখন সত্ত্বগুণের পুষ্টি সম্পাদিত হয়, তাহাকে বিপদ বলা যাইবে কি সৌভাগ্য বলা যাইবে, পাঠক তাহা স্থির করুন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কুন্তীর চিত্তে যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—

বিপদঃ সন্তু তা শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্

যে বিপদ দ্বারা চিরকালের জন্য বিপদমুক্তির সাহায্য হয়, তাহা কি সৌভাগ্য নয়? চোর সাধুগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। ভোগরত মানব বিপদকে ভয় করেন, এবং বিপন্নব্যক্তিকেও পাপী জ্ঞান করেন। কিন্তু কে পাপী, এবং কে পুণ্যবান্, তাহার অবধারণ করিতে হইলে চরম ফলের প্রতিই লক্ষ্য করা উচিত। What does it profit, if you

gain the whole world, but lose your own soul? যিশুর এই কথাটী যেন মনে থাকে। ভববন্ধনে আবদ্ধ থাকাই 'loss of soul'

বিপদের প্রভাবে মানবের মতি সাধন মার্গে গমন করাতে সত্ত্ব গুণ অধিকতর পুষ্ট হয়, তখন ঐ গুণ আরও তীব্রভাবে শোধন কার্য্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ বিপদ দ্বারাই শোধন কার্য্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য হয়।

যে কার্য্যকে গামছা নিংড়ে জল বাহির করার সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, প্রবলভাবে ঐ কার্য্য চলার সময়ে, সুপ্ত সংস্কারের উদ্দীপনা হইয়া সত্ত্বগুণ দ্বারা তাহাদেরও শোধনও চলিতে থাকে। এই সময়ে মৃত্যু যাতনা অপেক্ষাও তীব্র যাতনা অনুভূত হয়। প্রবল চিত্ত-বিক্ষোভ দ্বারা গুণসাম্যের ব্যতিক্রমই ঐ যাতনার কারণ। যে সে মানব এইরূপ যাতনা ভোগের 'অধিকারী' হন না। যাঁহাদের চিত্তে সত্ত্বগুণের সমধিক পুষ্টি হইয়াছে, তাঁহারাই এই 'অধিকার' অর্থাৎ 'priviledge' লাভ করেন।

মুক্তিমার্গের দ্বার উদ্‌ঘাটন

মোট কথা এই যে, সাধনার সঙ্গে ঘোরতম বিপদের সংযোগ দ্বারা যখন কল্পান্তর হইতে আগত সুপ্ত সংস্কারের প্রবোধন এবং সংশোধন হইতে থাকে, তখনই মানবের পক্ষে মুক্তিমার্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, এই কথাটী যেন মনে থাকে; সাত্ত্বিক ও 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক মানবই এই সৌভাগ্য লাভ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

জীবদ্দশায় বিপদ না হওয়া কি সৌভাগ্য?

সুদে আসলে ঋণ বৃদ্ধি হইলে লোক দেউলিয়া হয়

সংসারে সকলেই জানেন যে, মহাজনের প্রাপ্য সুদ যদি বাকী পড়ে, তাহলে আসল ঋণের সহিত ঐ সুদ একত্র হইয়া ক্রমে ঋণের

টাকা বাড়িয়া উঠার পরে, তাহা শোধ দিতে না পারিয়া লোকে দেউলিয়া হয়। আমাদের অবস্থাও ঐরূপ! অনাদি কাল হইতে সঞ্চিত রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার আমাদের চিত্তে স্তূপাকার হইয়া আছে। তার উপর নিয়তই নূতন সংস্কার জন্মিতেছে, এই গুলিকে ঋণের সুদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। শুভ এবং অশুভ সংস্কারের মধ্যে সংঘর্ষণ হইয়া যদি কতকগুলি সংস্কার পাতলা হয়, তাহলে ঋণের বোঝাটা একটু কমিতে থাকে; এবং তাহা মঙ্গলকর ভিন্ন, অমঙ্গলকর নয়।

আমরা অবিদ্যার মোহে অন্ধ হইয়া আছি, তাই ভোগসুখই ভাল বাসি। পাছে বাবুগিরিতে বিঘ্ন হয়, এই ভয়ে অদূরদর্শী মানব যেমন আয়ের টাকা হইতে মহাজনের সুদের টাকা শোধ না দিয়া সবই আপন ভোগ-বিলাসে খরচ করে, আমরাও সেইরূপ বিপদের যাতনা ভোগ করার ভয়ে, কুৎসিত সংস্কার রূপ ঋণের বোঝা কমাইতে চাহি না।

মহাজন যখন ডিগ্রিজারি করেন, তখন বিলাসী মানব স্ত্রীপুত্র লইয়া যেমন পথে দাঁড়ায়, আমরাও প্রবর্দ্ধিত কুসংস্কারের প্রভাবে মানব যোনি হইতে তেমনি স্থাবর বা তির্য্যক যোনিতে অধিক্ষিপ্ত হই। অর্থাৎ ভোগসুখরত দেনদারের মত আমরাও দেউলিয়া হই।

ধ্রুব এবং মহারাজ পরীক্ষিতের সৌভাগ্য

ধ্রুব প্রথমে ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীহরির নিকট রাজ্যলাভ রূপ বর-কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীহরির দর্শন এবং তাঁহার শঙ্খের স্পর্শ লাভ করাতে, ধ্রুবের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি অবিলম্বে আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ধ্রুব তখন প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন—

ভবচ্ছিদমযাচেহং ভবং ভাগ্য বিবর্জ্জিতঃ
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ ....

'হায়, আমি কি হতভাগ্য। যিনি সংসার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ —আমি কিনা তাঁর কাছে রাজ্য প্রার্থনা করিলাম। এই রাজ্য দ্বারাই আমি সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিব। কোন কাঙ্গাল যদি 'ঈশ্বর', অর্থাৎ যিনি সবই দিতে পারেন, এরূপ ক্ষমতাবান লোকের কাছে গিয়া একমুঠো আকাঁড়া চাউল চায়, তাহলে সে যেমন 'ক্ষীণপুণ্য' অবস্থার পরিচয়ই দেয়, আমিও তাহাই করিয়াছি'।

ধ্রুব তখন আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়ার পর শ্রীহরির কৃপা লাভ করিলেন। আমরা যখন ধন-ধান্য লাভ করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি,তখন কেবল আপন 'ভাগ্য-বিবর্জিত' অবস্থার পরিচয়ই দিই।

মহারাজা পরীক্ষিৎ জ্ঞানী ছিলেন। ক্ষণিক মোহের বশে দুষ্কার্য্য করার পরে যখন তাঁহার চিত্তে পুনরায় বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রবল হইল, তখন তিনি রাজ্যসুখ এবং স্বর্গসুখকেও হেয়জ্ঞান করিয়া, কিসে শ্রীকৃষ্ণের পদে আশ্রয় লাভ করিব, কেবল এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষায়, অনশন মৃত্যুর জন্য গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন—

তেতো বিহায়েদমমুঞ্চ লোকং
বিমর্ষিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ
উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্য নদ্যাং॥

আহা! এই উপলক্ষে কবি কি সুমধুর ভাষাতেই গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন! শ্লোকটীকে পাঠকবর্গের নিকট উপহার দেওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—

যা বৈ লসচ্ছ্রী তুলসী বিমিশ্র
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্বভ্যধিকাম্বুনেত্রী
পুণাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্
কস্তাং ন সেবেত মরিষ্যমানঃ

ধ্রুব, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি মহাত্মাগণ পাপী ছিলেন না। সংসারী মানবের চসমায় দেখিলে, তাঁহাদের জীবদ্দশায় অল্প 'বিপদ' হয় নাই।

বিমাতার কঠোর বাক্যে মনঃপীড়া পাইয়া কঠোর তপস্যার পর ধ্রুব শ্রীহরির দর্শনলাভ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় নাই, চিত্তশুদ্ধির জন্য আবার তপস্যা করিতে হইয়াছিল। ভগবান আপন প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায়ের পর 'মুক্তি' লাভের অধিকার দেন। ভোগসুখ নামক 'বর' যদি চাও তাহা তত দুর্লভ নয়।

মহারাজ পরীক্ষিতের ত সর্পাঘাতে প্রাণটাই গেল। যিশু এবং তাঁহার শিষ্যগণের ভাগ্যেও যাতনার মাত্রা কম হয় নাই।

এই মহাত্মাগণের বিপদ হইয়াছিল বলিয়া কি তাঁহাদের ভাগ্য মন্দ ছিল বলিতে হইবে? আর রামা শ্যামা ভুলিয়াও ভগবানের নাম করে না; কিন্তু দেখিতে পাই যে তবুও তাহাদের সারাজীবনই ধন, মান এবং প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিল, 'দেশের ও দশের' মান্য হইয়া তাহাদের জীবদ্দশা কাটিল। এই জন্যই কি রামা শ্যামাকে 'ভাগ্যবান' এবং ধ্রুব পরীক্ষিৎকে 'দুর্ভগ' বলিবে?

ভোগরত মানবের পক্ষে 'ভাগ্যের' মাপকাটীএক স্বতন্ত্র বস্তু। যথার্থ মাপকাটী তাহা হইতে ভিন্ন।

দ্বাদশ অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)

কর্ম্মক্ষেত্রে হিতকর কয়েকটী 'কাজের কথা'

বৈষয়িক কাজকর্ম্মেও শাস্ত্রের উপকারিতা

গীতা বলেন যে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'—যে 'কর্ম্ম' সংসার-বন্ধন সৃষ্টি করে, তাহাকেই ঐ বন্ধনমুক্তির উপায়ভুত করাকেই 'যোগ' বলে। কিরূপে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মতত্ত্ব সকলকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া, আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যগুলিকেই ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ো লাভের সোপান স্বরূপ করা যাইতে পারে, লেখক এই উদ্দেশ্যেই গত ৩৬ বৎসর যাবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পাণ্ডিত্য লাভ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না।

শাস্ত্রের যদি অল্প অংশও পড়া যায়, সেই অংশটুকুকেও কিরূপে বৈষয়িক কার্য্যাদির উপলক্ষে হিতকর করা যাইতে পারে, শাস্ত্র অধ্যয়ণের সময়ে ইহাই ছিল লেখকের লক্ষ্য। ঐ মুখ্য লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং শাস্ত্রকে বিষয় কর্ম্মের সহায় করার অভিপ্রায়েই, এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

লেখকের বিশ্বাস এই যে, আমরা যে কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত আছি, তাহাতেও সাধনা করা সম্ভবপর, এবং ঐ সাধনা দ্বারাও আমাদের প্রকৃষ্ট হিতসাধন হইতে পারে। লেখকের সুদৃঢ় ধারণা এই যে, লোটা-কম্বল গ্রহণই পুরুষার্থ লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায় নয়; আমরা চেষ্টা করিলে গার্হস্থ্যাশ্রমকেও প্রকৃষ্ট সিদ্ধি লাভের সোপান করিতে পারি।

সাধনা দ্বারা আমাদের নিজ নিজ সাংসারিক বা বৈষয়িক কার্য্যে বিঘ্ন না হইয়া সুশৃঙ্খলাই হয় এবং পারমার্থিক মঙ্গলও লব্ধ হয়। স্বীকার করি যে, প্রথমে কখন কখন কার্য্যহানি হয় বটে, কিন্তু ঐ হানি হইতে মনোবৃত্তির যে উন্নতি হয়, তাহা দ্বারা পরে বিষয়কর্ম্মে সুবিধা এবং পারত্রিক মঙ্গলও লব্ধ হয়। God refuses paymant in silver but afterwards pays in gold, আপন বৈষয়িক কর্ম্ম উপলক্ষে লেখক বহুবার বাইবেলের এই কথাটীর যাথার্থ্যের পরিচয় লাভ করিয়াছেন।

In quietness and confidence shall be thy Strength.

আমাদের অনেকের মনে তমোমিশ্রিত রজোগুণই প্রবল, তাই আমরা বিপৎকালে মনে করি যে, আপন শক্তি প্রভাবে কার্য্যসিদ্ধি করিব। যাঁহারা 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণ দ্বারা চালিত হন, তাঁহারা বিপদ হইতে নিজেকে কিরূপে উদ্ধার করিবেন, সে জন্য চিন্তিত হন না, বা ভগবানের শরণাগতও হন না। আত্মশক্তির উপর তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস থাকে; এবং ঐ শক্তি প্রভাবে নিজেকে উদ্ধার করিতে গিয়া তাঁহারা আরও বিব্রত হইয়া পড়েন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে লোকটীর বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি ১৩ হইতে ৪৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বিব্রত এবং বিপন্ন হইয়াও ঐ 'আত্মনির্ভরতা' বস্তুটীকে ছাড়িয়া ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। সংসারে রজোগুণের মর্য্যাদাই বেশী, তাই 'Self-reliance উপাসিত হয়। একদিকে এই আত্মাভিমানের গর্ব্ব অপর দিকে আছে 'অদৃষ্টবাদের' জড়ত্ব, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মানব কেবল যাতনাই ভোগ করে।

যাঁহার মনে 'নিকৃষ্ট' রজোগুণ প্রবল, তিনিও বিপৎকালে স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি, শঠতা, জাল, জুয়াচুরি দ্বারা বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে গিয়া ধরা পড়েন; তামসিক প্রকৃতির মানব ভয়ে ব্যাকুল হয়।

মোট কথা এই যে, বিপদ উপস্থিত হইলে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির থাকিতে পারে এরূপ মানব দেখা যায় না বলিলেও চলে। কেহ বা বাহাদুরি বুদ্ধি দ্বারা, কেহ বা শঠতা দ্বারা, এবং কেহ বা ভয় দ্বারা প্রেরিত হইয়া কোন না কোন একটা কার্য্য করে। কোন না কোন একটা কাজ অবশ্যই করা চাই, কিছু করিতে না পারি ত ভয়েও ব্যাকুল হইব; অভাব পক্ষে, ব্যাকুলতাও ত একটা কাজ!

কেন লোকে স্থির থাকিতে পারে না? কারণ এই যে, অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহং' ভাবের মোহে আমরা যে বিষয়কে 'স্বার্থ' বলিয়া জ্ঞান করি, বিপদ তাহার উপর আঘাত করে, এবং বিপৎকালে আমাদের মনে যাতনাও হয়। স্বার্থরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এবং যাতনার উপশমের জন্য ইচ্ছুক হইয়া রাজসিক মানবগণ কোন না কোন উপায় অবলম্বন করেন, এবং তামসিক মানবগণ স্বার্থনাশ বা দেহ নাশের ভয়ে ব্যাকুল হন। পাতঞ্জল দর্শনে এই ভয়কে 'অভিনিবেশ' বলেন। ইহা অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট 'ক্লেশ'।

প্রথমতঃ বলি এই যে, ভগবান যে তাঁহার ইচ্ছামাত্র আমাদের সকল বিপদই দূর করিতে পারেন, এই বিশ্বাস সাধারণ লোকের নাই,

লোকের আত্ম-শক্তির উপরই অধিক বিশ্বাস আছে, তাই তাহারা ভগবানের শরণাগত হইয়া স্থির থাকিতে পারে না, আপন শক্তির উপরই নির্ভর করে।

বিপৎকালে কেহই একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। আমরা মুখে যতই 'ভগবান' 'ভগবান' বলি না কেন, অনেকের কাছেই ভগবান একরূপ অপরিচিত, তাই আমরা তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারি না।

প্রকৃত পক্ষে 'quietness' এবং 'confidence' এই দুইটী বস্তু weakness অর্থাৎ দুর্ব্বলতার লক্ষণ নয়। মনে যখন এই বস্তু দুইটীর সঞ্চার হয় তখন আমরা ভগবৎশক্তি প্রভাবে শক্তিমান হই, এইজন্যই বাইবেল বলিলেন যে ইহা আমাদের strengthএর তুল্য, অর্থাৎ ইহা আমাদের চিত্তে বলাধান করে।

Confidenceএর উপকরণ

(ক) ভগবানের অপার শক্তি আছে, এবং ঐ শক্তি প্রভাবে তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন,

(খ) তিনি পরম কারুণিক, অতএব আমাকে রক্ষা করার প্রবৃত্তিও তাঁহার আছে,

(গ) তিনি মঙ্গলময়, অতএব এই বিপদ হইতে উদ্ধার-লাভ যদি আমার পক্ষে মঙ্গলকর হয়, তাহলে তিনি আমাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবেন, এবং যদি অনিষ্ট হওয়াই আমার পক্ষে চরমে মঙ্গলকর হয়, তাহলে তিনি আমাকে উদ্ধার না করিয়া ঐ বিপদ দ্বারা অনিষ্ট করাইবেন—কারণ সর্ব্বকার্য্য সাধনই তাঁহার শক্তিবলে হইতেছে

এই 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি', অর্থাৎ অটল বিশ্বাস, না থাকিলে কাহারও মনে confidence (অর্থাৎ শ্রদ্ধা) জন্মায় না। এই শ্রদ্ধার মধ্যে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই তিনটি বস্তুরই উপাদান আছে। এই উপাদান সকল আপাততঃ কতকটা দুর্ব্বল হইলেও তাহারা ক্রমশঃ 'বিশুদ্ধ' এবং 'পূর্ণ' ও প্রবল হয়।

Quietnessএর উপাদান

মানবগণের মনে মমত্বভাবই প্রবল। অতএব কোন বিপদ দ্বারা যখন ঐ মমত্ব ভাবের উপর আঘাত পড়ে তখন মানবের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। 'অহংকর্ত্তৃ' ভাব ধৈর্য্যচ্যুতির অন্যতম কারণ। অতএব অবিদ্যাসৃষ্ট মমত্বভাব এবং অহং-কর্ত্তৃভাবের কতকটা হ্রাস না হইলে কাহারও মনে শ্রদ্ধা (confidence) ও স্থৈর্য্যের (quietness) সঞ্চার হয় না

'শ্রদ্ধা' এবং 'স্থৈর্য্য'কে কেন 'strength' বলা হয়?

অবিদ্যার হ্রাস না হইলে কাহারও মনে শ্রদ্ধা জন্মায় না; কিম্বা স্থৈর্য্যও হয় না। অবিদ্যার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে 'বিদ্যা' অর্থাৎ যে বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বয়ং ব্রহ্ম, কিয়ৎপরিমাণে সেই জ্ঞানের সঞ্চার হয়। ঐ জ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্ম) অনন্ত শক্তির আধার, সুতরাং জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরও সঞ্চার হয়।

বিপৎকালে ব্রহ্মার স্থৈর্য্য

ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন ধরণী অকস্মাৎ জলমগ্না হইলেন। ব্রহ্মা রজোগুণের অবতার ছিলেন, অতএব এই বিপৎপাতে ব্যাকুল হওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ হইত। কিন্তু কঠোর তপস্যা দ্বারা তাঁহার মনে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইয়াছিল। সত্ত্বগুণ তখন প্রবল হইয়া রাজসিক 'অহংকর্ত্তৃ' ভাবকে সংযত করাতে, ব্রহ্মা বলিলেন—

যস্যাহং হৃদয়াদাসম্ স ঈশো বিদধাতু মে

যে শ্রীভগবানের নাভিপদ্ম হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, এখন তিনিই আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য তাহার অবধারণ করুন। ইহাই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের কথা, এবং ইহাতে আত্মাভিমানের লেশমাত্র নাই। ভগবান তখন বরাহ রূপ ধারণ করিয়া ধরণীর উদ্ধার করিলেন। বিপৎকালে ব্যাকুল হইয়া উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ উপলক্ষে 'আকাবাকা' করার

সময় আমরা কি যথার্থ শ্রদ্ধার সহিত ভগবানের নামটীকেও স্মরণ করি? সত্য বটে যে, তখন আমরা মুখে 'ভগবানকে' ডাকি, কিন্তু তখন কি আমাদের অন্তরে 'অহংকর্তৃ' ভাবের 'গর্ব্ব', অথবা কাম্য বস্তুর প্রতি 'লোভ', অথবা 'ভয়' থাকে না? 'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং' যাঁহার শক্তি এতই বেশী যে, স্বয়ং ভয় অর্থাৎ মহাকালও তাঁহাকে ভয় করেন, এরূপ ভগবানের উপর যাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহার মনে কখনও ভয় হইতে পারে না। মনে এই শ্রদ্ধাহীনতা থাকাতে, আমরা নিজেই বিপদের আবাহন করি।

Stand still and see the salvation of the Lord

ইহুদিগণ যখন মিশর হইতে পলায়ন করিতেছিলেন (Exodus) সেই সময় একদিন এমন সঙ্কট উপস্থিত হইল যে, অগ্রসর হইলে Red sea নামক সাগরে ঐ লক্ষ লক্ষ জীব ডুবিয়া মরিত, এবং পশ্চাদ্গামী হইলে মিশরাধিপতির সেনার হস্তে তাহাদের প্রাণনাশ হইত।

এই জীবন সঙ্কটের সময়, শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়ার পর তাঁহা হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া, পরম ভক্ত Moses, আপন সঙ্গিগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, যে হে ভ্রাতৃগণ তোমরা ব্যাকুল হইও না, যে যেখানে আছ তথায়ই 'স্থিরভাবে অবস্থান কর, ভগবান কিরূপে তোমাদের উদ্ধার করেন, তাহা দেখ'।

ঐ লোকগুলির উদ্ধারও অত্যদ্ভুত ভাবে সম্পাদিত হইল। যখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া ব্রজধামে গমন করিতেছিলেন, তখন 'যমানুজা' (=যমুনা) 'বিভিন্নতোয়া' হইয়া 'মার্গ' প্রদান করিয়াছিলেন; সাগরও বায়ুবেগে শুষ্ক হইয়া ইহুদিগণকে অতিক্রমের জন্য পথ প্রদান করিলেন; এবং মিসরাধিপতির সৈন্যগণ যখন, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, সাগরের গর্ভে প্রবেশ করিয়া পার হইতেছিল, তখন অকস্মাৎ বায়ুর গতির পরিবর্ত্তন হওয়াতে সাগরের বারিরাশি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ঐ অক্ষৌহিণীকে নিমজ্জিত করিল, একজনেরও প্রাণরক্ষা হইল না।

বিপদ চোখে আঙ্গুল দিয়া দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দেয়, তবুও আমরা দেখি না

লোকের যখন বিপদ হয়, তখন তাহারা ব্যাকুল হইয়া আপনাদিগকে উদ্ধারের জন্য যে চেষ্টা করে, তখন উদ্ধার হয় না, বরঞ্চ ঐ চেষ্টা দ্বারাই নূতন বিপজ্জাল সৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আরও সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে। তখন কেহ বা ভয়ে 'আড়ষ্ট' হয়, কেহ বা নৈরাশ্যে নাস্তিক হয়। ঐ অসহায় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবান দেখান যে, তাহাদের কাণাকড়ির শক্তিও নাই। কিন্তু আমরা এমনই অন্ধ যে, ভগবানের কার্য্য দেখেও দেখিতে পাই না। 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং', যে 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাবের দাসত্ব করিবার সময় আমরা ঘোর বিপন্ন হইয়াছিলাম, পুনরায় সেই মনিবের দাসত্বই করি। ঐ 'অহং'এর কাণাকড়ির শক্তি না থাকিলেও আমরা ভাবি যে তাহার শক্তির অন্ত নাই

'হাত গুটিয়ে বসে থাকিলে' ভগবান খেতে দেবেন কি?

তরুণ 'কর্ম্মবীর' গণের মুখে, 'audible aside' ভাবে, কখন কখন এই শ্লেষের কথা শ্রুত হয়; এই কথা বলার সময় বাপাজীরা যে গোড়াতেই গলদ করেন সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। 'হাত গুটাবে কে গো? অবিদ্যা তোমার মনে 'অহং' ভাব সৃষ্টি করেছেন বলিয়া তুমি মনে করছ যে, 'তুমি'ই যেন আপন দেহখানিকে চালাচ্চ! বাপুগণ! বস্তুতঃ তোমরা ভগবান হইতে স্বতন্ত্র ভাবে কিছুই ক'র্‌ছ না। যাহাকে তুমি নিজের দেহ মনে কর, তাহার সকল কার্য্যই ভগবানের গুণের শক্তি দ্বারা হইতেছে। অতএব তাঁহার শক্তি ব্যতীত হাত চালানর বা গুটানর ক্ষমতা তোমার কোথায়।

যদি বল যে—বেশ, আমার যদি কোন শক্তিই নাই, তাহলে আমি ভগবানে নির্ভর করি, কিম্বা ঐ শ্লেষের কথাই যদি বলি, তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি আছে?

এই বাক্যের উত্তরে বলি যে—বাপু! বিলক্ষণ ক্ষতি বৃদ্ধিই আছে। তুমি যখন অবিদ্যার মোহের বশে নিজেকে দেহের মালিক মনে কর,—অর্থাৎ দেহই 'অহং', দেহই তোমার যথার্থ স্বরূপ, এই ধারণা যখন তোমার মনে জন্মায়, তখন ঐ আত্মাভিমানের প্রভাবে তোমার মনে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নানা রকম উপসর্গও জন্মায়। ঐ উপসর্গ গুলির প্রভাবে তুমি সংসারে নানা ভাবেই 'নাস্তানাবুদ' হও।

নিজেকে 'কর্ত্তা' ভেবে (অর্থাৎ আমার দেহকে আমিই চালাচ্চি ইহা মনে করিয়া) তুমি যখন হাত চালাতে যাও, তখন ঐ উপসর্গগুলিই তোমার হাতকে এমন উল্‌টোভাবে চালায় যে, ঐ কার্য্য দ্বারা তুমি বিপদেই পড়।

এই যে এখন মনে কর'ছ যে তুমি হাত না চালালে ভগবান তোমাকে খেতে দেবেন না, এই কথাটীও ঐ সকল উপসর্গ দ্বারাই তোমার মনে সৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ দেহই, যেন তোমার যথার্থ স্বরূপ, এই ধারণা তোমার মনে প্রবল ভাবে থাকাতে তাহা হইতে যে 'আত্মাভিমান' নামক মোহ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ মোহের বশে তুমি মনে করিতেছ যে, আপন স্বাধীন শক্তিবলে নিজের আহার সংগ্রহ করিতে পারিবে। ঐ মোহ তোমাকে মুগ্ধ করেছে বলেই ভাবছ যে হাত গুটালে তুমি খেতে পাবে না।

প্রভো! 'Give me Faith'

যদি বল যে, বেশ আপনার কথা যেন মান্‌লাম, তাহলে এখন আমি করব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, গুণ ও সংস্কার নামক ভগবানের শক্তি তোমার দেহকে এবং মন ও বুদ্ধিকে চালাচ্ছে। অতএব তুমি হাত 'চালাবে' বা 'গুটাবে' সে বিষয় মোটেই চিন্তা না করিয়া কেবল আপন অন্তরে এই চিন্তা কর—

'হে প্রভো! আপনি ত বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছেন, আপনি এখন আমাকেও চালান, প্রভো! ঐ যে অবিদ্যা আমার মনে আত্মাভিমান সঞ্চার করিতেছে উহা থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

এই চিন্তা করা মাত্র দেখিতে পাইবে যে, অবিদ্যা 'বিলজ্জমানা' হইয়া তিরোহিত হইবেন। অবিদ্যা কেবল যে ভগবানের 'ঈক্ষাপথে' (=সম্মুখে) থাকিতে বিলজ্জমানা হন তাহাই নয়, ভক্তের সম্মুখেও আসিতে লজ্জিতা হন। Get thee behind me Satan, যিশুর মুখনিঃসৃত এই কথা কয়টীতে ঐ ভাবই রহিয়াছে। তখন ভগবানই (অর্থাৎ গুণের শুভ শক্তিই) তোমার মন ও বুদ্ধির পরিচালন করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করাইবেন। যেমন angels, অর্থাৎ দেবদুতগণ, যিশুর আহার যোগাইতেছিলেন, তোমার বৃত্তিসকল (মনে রেখো, তাহারাও ভগবানের 'দূত' এরই তুল্য) ভগবানের বিশুদ্ধ 'সত্ত্বের' দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে তাহাদের দ্বারা তোমার আহার সংগ্রহের এবং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থাও হইবে—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে

যদি এই নীতির অনুসরণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তাহলে আপন সাংসারিক কাজ কর্ম্ম বেশ ভাল রকমেই চলে যায়, এবং যে 'আমি' ভাব হইতে সকল বিভ্রাট জন্মায়, ঐ আমিত্ব ভাবও দূর হয়। মানব, বিপদ দ্বারা কেবল নির্য্যাতন ভোগ করিলেই, ঐ মার্গের অনুসরণ করিতে পারে না। অবিদ্যার প্রভাব আমাদের হাড়ে মজ্জায় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ; ঐ প্রভাবকে অতিক্রম করিতে হইলে যুগপৎ বিপদ এবং সাধনার শক্তির প্রয়োজন হয়—বিপদই মতিকে সাধনমার্গে নিবদ্ধ রাখে।

অযাচিত দান এবং তাহার সঙ্গে বিভীষিকা

একটী বিচিত্র ঘটনার কথা বলি, ঘটনাটী কাল্পনিক নয়, বাস্তব। কোন পরিবারে তিনটী লোক ছিল, তাহারা সকলেই অপুত্রক

অতএব, যাহাতে বংশে অন্ততঃ একটী সন্তানও হয়, তাহা সকলেই কামনা করিতেন। এই ভাই তিনটী তরুণ বয়স্ক, সকলেই সুশিক্ষিত এবং উন্নতমনাঃ—সকলেই দৈবী সম্পদ-সমন্বিত ছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা অসাধারণ পরিমাণে শ্রীভগবানের আশীষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই লেখকের ধারণা। অকস্মাৎ একদিন

(১) কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনার সংযোগ হওয়াতে তাঁহারা দত্তকভাবে একটী সন্তান লাভ করিলেন। ছেলেটি বিশেষ সুলক্ষণযুক্ত ছিল; এবং দত্তক সন্তান হইলেও যুবক তিনটী ছেলেটীকে আপন ঔরষজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

(২) ছেলেটীর জন্মের একমাস পরে তাহার দেহে একটী উৎকট রোগ দেখা গেল। বড়লোক ভিন্ন অপরের বাড়ীতে এইরূপ রোগ হইলে যেন মৃত্যুর অগ্রদূত আসিলেন, এই কথা বলা যাইতে পারে, কারণ—

(ক) প্রথমতঃ ত রোগটীর চিকিৎসা বহু-ব্যয়সাধ্য,

(খ) তার পর রোগীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যে বিশেষ রকমের পথ্য প্রয়োজন ছিল, তাহা সংগ্রহ করা বড়লোক ভিন্ন অপরের পক্ষে অসম্ভব।

(গ) তৃতীয় আশঙ্কার কারণ এই যে, ছেলেটী ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকেই দুর্ব্বল ছিল, উপরন্তু জন্মের এক মাসের মধ্যে এই উৎকট রোগ দ্বারা বলক্ষয় হইতেছিল! অতএব দীর্ঘকাল চিকিৎসার সময়েই হয়ত বলক্ষয় বশতঃ ছেলেটী মারা যাইতে পারে, এ আশঙ্কাও ছিল।

(ঘ) ঐ রোগে যে পথ্যের প্রয়োজন ছিল, তাহা এতই সুদুর্লভ যে যুবক তিনটী দ্বারা তাহা সংগ্রহের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অতএব হয়ত পথ্যের অভাবেই ছেলেটী বিনষ্ট হইবে, এ আশঙ্কাও ছিল

ভগবান অযাচিত ভাবে সন্তানটী দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন

বিভ্রাট সৃষ্টি করিলেন যে, ঐ আশীষ বুঝি শাস্তিতে পরিণত হয়, তাহার আশঙ্কাও উপস্থিত হইল।

লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ বজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ

এই বিষম বিভ্রাট সৃষ্টি করার পর ভগবান যে রকমে তাহা দূর করিলেন, তাহাও অত্যদ্ভুত। এক একটী বিষয় স্বতন্ত্র ভাবে বলি

(ক) চিকিৎসার ব্যবস্থা

চিকিৎসার জন্য যুবকগণ যে প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে আহ্বান করিলেন, তাঁহার দর্শনী দিয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে যে অর্থ ব্যয় হইবে, সে ব্যয় নির্ব্বাহ করার জন্য অর্থবল যুবকদিগের ছিল না। আমাদের ছেলেটীর এই উৎকট রোগ হইল কিন্তু অর্থাভাবে একজন ভাল চিকিৎসককে দেখাইতে পারিলাম না, —মনে যেন এই আপশোধ না থাকে, এইজন্য তাঁহারা গোড়াতেই বড় ডাক্তারকে ডাকিয়াছিলেন।

বরাবর ঐ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাণর অর্থবল না থাকিলেও, 'পরে যা হয় হবে', এখন ত একবার অমুক ডাক্তারকে দেখাই, —এই ভাবিয়া যেমন গরীব লোকে বড় ডাক্তারকে ডাকে, তাঁহারাও ঐ ভাবে গোড়াতেই বড় ডাক্তারকে ডাকিয়াছিলেন। রোগটী তেমন ছিল না যে ২।৪ দিন চিকিৎসায় আরাম হইবে—দীর্ঘকাল চিকিৎসা ব্যতীত ঐ ব্যাধি প্রায় কখনই দূর হয় না।

ছেলেটীকে দেখিয়া চিকিৎসক মহোদয় তাহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, যুবকগণ যদি টাকা দিতে না পারেন, তাহলে তিনি পারিশ্রমিক না লইয়াই চিকিৎসা করিবেন, এই কথা তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই বলিয়াছিলেন।

তাঁহার পারিশ্রমিক দিতে না পারিলে যুবক তিনটীর মনে বড়ই কষ্ট হইত—সে কষ্ট যাহাতে না হয়, অভাবনীয় রূপে তাহারও ব্যবস্থা হইল,—অকস্মাৎ এমন কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগ হইল যে,

ঐ ঘটনা সকল দ্বারা যুবকত্রয়ের, আর্থিক সচ্ছলতা না হউক, চিকিৎসার জন্য অর্থের অভাব মোটেই রহিল না।

[পয়সা খরচ না করিয়া অমন বড় ডাক্তার পাইলে অনেকে কৃতার্থ হয়; এবং ডাক্তার বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিতে রাজী— এই কথা শোনার পরে টাকার অভাব না থাকিলেও অনেকেই ডাক্তারকে তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেন না। কিন্তু এই যুবক তিনটী ঐরূপ ক্ষুদ্রমনাঃ ছিলেন না; তাঁহাদের মন যেমন উচ্চ, ভগবান ব্যবস্থাও তেমনি করিয়াছিলেন। ডাক্তারটীও মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইঁহারা তাঁহাকে ফাকি দিবেন না, তাই তিনি ইঁহাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং এখনও তিনি যুবকদিগের পরম শুভানুধ্যায়ী]

(খ) পথ্যের ব্যবস্থা

রোগীর পথ্য সুদুর্লভ হইলেও তাহার অভাব রহিল না। চিকিৎসক মহাশয় স্বয়ংই পথ্যের যোগাড় করিয়া দিলেন। ইহা ছাড়া শিশুর রোগ উপলক্ষে এমন একটী অভাবনীয় ঘটনা হইল যে, ঐ যুবকদিগের নিজের চেষ্টাতেই কিছু কিছু পথ্যের উপকরণ পাওয়া যাইতে লাগিল; সুতরাং পথ্যের কোন অনাটনই রহিল না।

একবার পথ্যলাভে বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কা হয়, কিন্তু যাঁহা দ্বারা বিঘ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল অকস্মাৎ তাঁহার তিরোভাব হওয়াতে সে আশঙ্কা দূর হইল। বিঘ্নের আশঙ্কা পুনরায় হওয়া মাত্র, যিনি 'বাগড়া' দিয়াছিলেন, তিনিও শক্তিহীন হইলেন।

[চিকিৎসক যে রোগীর পথ্য যোগাড় করেন, তাহার পরিচয় এই নূতন পাওয়া গেল! যোগাড়ের জন্য তাঁহার অদম্য চেষ্টা এবং উৎসাহও একটী দেখিবার জিনিষ ছিল, যেন তাঁহার নিজের ছেলেরই রোগ হইয়াছে। ধন্য ঐ মহামনাঃ চিকিৎসক!]।

মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন অদ্ভুত ভাবে রক্ষা

রোগটীর নিবৃত্তি যেরূপে হইল তাহাও এক অত্যদ্ভুত ব্যাপার। যখন crisis (সঙ্গীন অবস্থা) উপস্থিত হইল, তখন দেখা গেল যে, চিকিৎসকও নাই, এবং রোগীর শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীও নাই। ঐ সময়ে চিকিৎসক এক বাড়ীতে ৮টী মরণাপন্ন রোগীকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন; এই শিশুটির রক্ষার জন্য তিনি নিজে বিশেষ ব্যাকুল ছিলেন বটে, কিন্তু একটী জীবন রক্ষার জন্য ৮টী সঙ্কটাপন্ন রোগীর জীবনকেও অবহেলা করিতে পারেন না। ধাত্রী মাসাবধি রোগে শয্যাগতা ছিলেন, তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না। ধাত্রীর রোগের কথা শিশু জানিলে কি বিভ্রাট যে হইত তাহাও বলা যায় না। ধাত্রীর রোগের সংবাদ একমাস যাবৎ যে কিরূপে প্রকাশ হইল না, তাহাও বিস্ময়কর।

এই প্রকার অবস্থায় রোগীর মৃত্যু হওয়ারই কথা। কিন্তু মরা ত দূরের কথা; কোন রোগের crisis হইতে মুক্তির সময়, প্রায়ই যে convulsion প্রভৃতি উপসর্গ হয়, তাহা কিছুই হইল না। কে যেন অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া শিশুর দেহে আপন পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন, এবং যে বালক ৮ মাস যাবৎ রোগ শয্যায় শয়ান ছিল, সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সর্ব্ব ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইল।

ভগবান যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন যে রক্ষাকারী একমাত্র তিনিই—অপর কেহই নয়।

(ক) পাঁচ মিনিটে রোগ মুক্তি

বিনা চিকিৎসায়, বিনা চিকিৎসকে, এবং বিনা ধাত্রীতে—পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিশুটী রোগ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইল।

বালকটী 'বিষ্ণুরাত' সদৃশ, তথাপি অভিভাবকগণ অন্ধ।

বালকটীর জন্ম হইতে বহু ঘটনাতেই ভূয়ঃ ভূয়ঃ শ্রীহরির পদ চিহ্ন দেখা গিয়াছে। তথাপি তাহার অভিভাবকগণ আত্মশক্তিবলে

শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যাকুল হন। শ্রীহরি সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ করেন বটে,কিন্তু এই শিশুটীর রক্ষা উপলক্ষে বিশেষত্ব এই যে, প্রভু পদে পদে দেখাইয়াছিলেন যে তিনিই সকল কার্য্য করিয়াছেন।

ভগবান দেখাইয়াছিলেন যে, এই শিশুটীকে পুত্রভাবে প্রদান, তাহার রোগ সৃষ্টি, চিকিৎসক যোগাড়, চিকিৎসকের পারিশ্রমিকের জন্য অর্থের যোগাড়, পথ্যের যোগাড় এবং crisisএর সময় ধাত্রী ও চিকিৎসক উভয়েরই অনুপস্থিতি, এবং তাহা সত্ত্বেও যেন যাদুবিদ্যাবলে শিশুর রোগ হইতে মুক্তি,—এই সকল অসাধ্য সাধন তাঁহারই কৃপার ফল।

তবুও অবিদ্যার এতই প্রতাপ—যে শিশুর অভিভাবক ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ এই সকল ঘটনাতেও শ্রীভগবানের পদচিহ্ন দেখিতে পান নাই। মোহান্ধ মানব কেবল নিজের বাহাদুরীর উপলক্ষেই Extraordinary ঘটনা দেখিতে পায়। ভগবান তাঁহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া আপন কার্য্য দেখাইলেও তাঁহারা দেখিতে পান না। এবং লোকের কাছে তাঁহার কৃপার কথা কেহ বজ্রনিনাদে কীর্ত্তন করিলেও, লোকে বধিরবৎ থাকেন, কিছুই শুনিতে পান না।

বিপদে ব্যাকুলতা কেবল শ্রদ্ধাহীনতারই চিহ্ন।

যাঁহার মনে শ্রীভগবানের প্রতি বিশ্বাস অটলভাবে থাকে, বিপদ যতই ভয়ঙ্কর হউক, তাঁহার মনে কোন আশঙ্কাই হয় না। যদি আমাকে মারিতেই ভগবানের ইচ্ছা থাকে—তাহলে মরিব, তাতে ভয় কিসের? নিজের চেষ্টা দ্বারা কি তাঁহার কার্য্য নিরোধ করিতে পরিব? আর আমাকে রক্ষা করিতে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহলে আমাকে মারে কে? 'বিপদ', 'বিপদ', বলিয়া আমি যে এখন ব্যাকুল হচ্চি, সেই বিপদ প্রকৃত কি বস্তু? উহা ত কেবল 'গুণেরই' কার্য্য। আর 'গুণও' যে ভগবানেরই রূপান্তর! অতএব 'বিপদ' যে কেবল ভগবানেরই ছদ্মবেশ, যিনি 'প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্নবদনেক্ষণং', তাঁহারই মূর্ত্তি যে

বিপদের করালরূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেছেন—এই তত্ত্ব অনুভব করিয়া যাঁহার মতি সেই উচ্চ রাজ্যে ভ্রমণ করে, তিনি ভাবেন যে,

মস্তযাদ্বাতি বাতোঽয়ং, সূর্য্যস্তপতি মস্তয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মস্তয়াৎ॥

যিনি এত শক্তিমান আমি তাঁহারই প্রেমাস্পদ; আমি তাঁহারই 'পরা' প্রকৃতি! অতএব আমার ভয় কিসের?

অপার আনন্দ

এই জ্ঞান হইলে সম্পদ এবং বিপদ এই উভয় বস্তুর মধ্যেই লোকে শ্রীহরির বিভূতিই দর্শন করেন। ঐ সকল বস্তু আমার প্রেমময়ের প্রেম-উপহার,—যাঁহার মনে এই ধারণা প্রবল হয়,তাঁহার পক্ষে সম্পদ কেবল শ্রীভগবনের প্রতি প্রেমেরই সম্প্রসারণ করে এবং বিপদও ঐ প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে না।

এই প্রকার মানসিক অবস্থা যাহাতে প্রবর্দ্ধিত হয়, সেই জন্যই আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত। ইহা দ্বারা বৈষয়িক কোন কার্য্যেই হানি হইবে না; বরঞ্চ 'টাকা চাই' 'প্রতিষ্ঠা চাই' আরও কত কি 'চাই', এই সকল 'চাই' এর দাসত্ব করিয়া আমরা আপন আপন জীবনে যে অশান্তি উৎপাদন করি,—মনের গতির পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে সেই অশান্তি গুলি থাকিবে না। তখন মনে কেবল শান্তিই থাকিবে। কার্য্য হানি হবে ভাবিয়া যে ভয় করিতেছ সে ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। তোমার আমার 'আকারাকা' দ্বারা কার্য্যে যে সুশৃঙ্খলা হইবে—ইহা একরারের তরেও মনে করো না।

ত্রয়োদশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

বাস্তবজীবনে বিপদের Disciplinary এবং Regenerative কার্য্য

Things seen are mightier than things heard

শোনা কথার চেয়ে চোখে দেখা কথার মূল্য অনেক অধিক। অনেক তত্ত্বকথা নানাভাবে আলোচিত হইল বটে, কিন্তু এই আলোচনার মূল্য কি ? 'সত্ত্বগুণ রজো এবং তমোগুণকে অভিভূক করে'— এই কথাগুলি বলিতে বা লিখিতে বেশী সময় লাগে না ; এবং যাঁহার বাগ্‌বিভব আছে, তাঁহার মুখ হইতে এই তত্ত্ব উপলক্ষে সুললিত পদযুক্ত আলোচনা শুনিয়াও লোকে পরিতৃপ্ত হয়।

'তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্‌' নিজের বাক্‌সম্পদ অত্যল্প হইলেও, লেখক নানা আকারে বিপদ তত্ত্বে আলোচনা উপলক্ষে 'কথার খরচ' করিয়া প্রায় দেওলিয়া হইয়াছেন। কথাতেই মানবের মতির পরিবর্ত্তন হয় না,—ভোগসুখরত মানবের বহির্ম্মুখী মতিকে ভোগমার্গ হইতে সাধনমার্গে আনয়ন যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, বাস্তব জীবন হইতে তাহার একখানি চিত্র পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করা হইতেছে।

যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইতেছে তাহা সবই বাস্তব, এবং প্রতি ঘটনাই লেখকের সুবিদিত। ঘটনাগুলির উপলক্ষে তত্ত্বসম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে, কিন্তু Fact (ঘটনা) গুলির বর্ণনায় কোন অত্যুক্তি করা হয় নাই, 'নানৃতং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ নচাতিরিক্তমুচ্যতে'।

লোকটীর চিত্তে তমোগুণের প্রাধান্য

এই অধ্যায়ে যে লোকটীর জীবনের কতকগুলি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া নানা তত্ত্বের ক্রিয়ার আলোচনা করা হইতেছে, প্রথমে সেই লোকটীর মনোবৃত্তির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই দেখা যাক্‌। তিনি

আমাদের মতই মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংসারে বিশেষ আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু দারিদ্র্যও ছিল না। লেখক বাল্যকাল হইতে বরাবরই তাঁহার সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হওয়াতে তাঁহার 'মতিগতি' সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহাও জানেন।

(ক) কর্ম্মনিষ্ঠা

তাঁহার চিত্তে গুণত্রয় কিরূপ অবস্থায় ছিল প্রথমে তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। শ্বাসরোগ যখন তাঁহাকে, ৩৬ বৎসর যাবৎ, মৃত্যু যন্ত্রণার তুল্য যাতনা প্রদান করিয়াছে, তখনও তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা সাতিশয় প্রবল ছিল; তামসিক মানবগণের প্রকৃতিতে ঐরূপ কর্ম্মনিষ্ঠা দেখা যায় না। তাঁহার আচরণে ক্ষুদ্রতা এবং নীচতা ছিল না। এই কর্ম্মনিষ্ঠা এবং উচ্চতার সহযোগ দেখিয়া লেখক অনুমান করেন যে, তাঁহার চিত্তে তমোগুণ অত্যল্পই ছিল এবং রজোগুণেরই প্রাধান্য ছিল। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, সত্ত্বগুণেও ত কর্ম্মনিষ্ঠা থাকে, ঐ লোকটীর কর্ম্মনিষ্ঠা যে সাত্ত্বিক নয় তাহার প্রমাণ কি?

(খ) কর্ম্মনিষ্ঠা সাত্ত্বিক নয়

উত্তরে বলি যে, সাত্ত্বিক কর্ম্মপটুতায় যে স্থৈর্য্য এবং নিরহঙ্কার ভাব থাকে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে তাহা ছিল না, কর্ম্মদক্ষতার সঙ্গে তাঁহার মনে আমিত্ব ভাবও বিশেষ প্রবল ছিল। তাইতে তিনি আপন মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (contradiction) সহ্য করিতে পারিতেন না। সত্ত্বগুণে এরূপ 'অহং' ভাব থাকে না

(গ) জেদ ও আত্মগর্ব্ব

তিনি ভয়ানক 'জেদী' লোক ছিলেন, যে কাজ করিবেন বলিয়া স্থির করিতেন, তাহা করার সময়ে শারীরিক রোগকেও গ্রাহ্য করিতেন না। ঐ 'হাঁপো রোগী' তখন দম আটকে মরবেন কি না, সে চিন্তাও করিতেন না। লেখক জানেন যে, এই জেদের বশে লোকটী তিন-

বার মরিতে মরিতে বেঁচেছিলেন তবুও তাঁর জেদ কম হয় নাই। এখন যদিও তিনি বুড়ো হয়েছেন তবুও তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণ বৃদ্ধের 'জেদকে' উত্তেজিত করিতে ভীত হয়।

লোকটী একবার নিজের tour programme বজায় রাখার জন্য ৮ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভেজেন, মাথার উপর ছাতা নাই (ছাতা খুলিলে 'সালতি' উলটে যাবে), অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হচ্চে, আর তিনি 'সালতি' নৌকায় চড়িয়া গন্তব্য স্থানের অভিমুখে যাইতেছেন!! ঐ দিন দুইবার নৌকাডুবি হইতে তাঁহার প্রাণটা রক্ষা হয়। আর এক-বার এই জেদের বশে হাঁপানির সময় জোরে হাঁটিয়া appoplexy হওয়ার লক্ষণও দেখা গিয়াছিল। এই 'জেদ' রজোগুণেরই লক্ষণ।

রজোগুণের অপর একটী লক্ষণ এই যে, তাঁহার মনে আত্মাভিমান খুবই প্রবল ছিল—নিজে যে অভ্রান্ত, এই ভাবটীকে তিনি যে আপন মনে পোষণ করিতেন তাহা তিনি নিজেও স্বীকার করেন এবং পরে এইজন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঘোর বিপদও হইয়াছে।

(ঘ) প্রকৃষ্ট রজোগুণের প্রাধান্য

এই জেদ এবং আত্মাভিমান হইতে রজোগুণের প্রাধান্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ঐ সঙ্গে বহু পরিমাণে সত্ত্বগুণের সংশ্রব ছিল বলিয়া তাঁহার 'হাম বড়া' ভাবটী প্রচ্ছন্ন থাকিত। সত্ত্বগুণ তাঁহার মনের মধ্যে এই egotism ভাবটীকে প্রচ্ছন্ন না করিলে,লোকটী সমাজে এবং বন্ধুবান্ধবগণের নিকট nuisance অর্থাৎ জঞ্জাল তূল্য হইতেন।

রজোগুণ 'নিকৃষ্ট' শ্রেণীরএবং 'প্রকৃষ্ট' শ্রেণীরও হয় (৭৬—৭৭ পৃষ্ঠা)। এখন প্রশ্ন এই যে, উপরোক্ত লোকটীর রাজসিক প্রকৃতি কোন শ্রেণীর ছিল?

যাঁহাদের চিত্তে 'নিকৃষ্ট' (অর্থাৎ বহু পরিমাণে তমোগুণ যুক্ত) রজোগুণ প্রবল, তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য অপরের খোসামোদ এবং মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির আশ্রয় লন। পরশ্রীকাতরতা হিংসা প্রভৃতি দোষও তাঁহাদের থাকে, তাঁহাদের অনেকের রুচি এবং

আচরণও কুৎসিৎ হয়। ঐ লোকটীর এই সকল দোষ ছিল না। তাইতেই অনুমান হয় যে তিনি 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণ যুক্ত ছিলেন—অর্থাৎ বহু পরিমাণে সত্ত্বগুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া রাজাগুণ তাঁহার চিত্তে আধিপত্য করিত।

(ঙ) তমোগুণ অতি অল্প পরিমাণে ছিল

তাঁহার চিত্তে কুপ্রবৃত্তি এবং কদাচারের স্বল্পতা দেখিয়া অনুমান হয় যে, তমোগুণ অতি অল্প মাত্রায়ই ছিল—সেই অল্প মাত্রা তমোগুণ, অর্থাৎ আবরক শক্তি হইতে তাঁহার চিত্তে 'আত্মাভিমান' সঞ্জাত হইয়াছিল। এবং ঐ আবরক শক্তির সহিত সংযোগ হওয়াতে বিশুদ্ধ সত্ত্ব 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণে পরিণত হইয়াছিল।

অল্প হইলেও তমোগুণের tenacity

লোকটীর পরিচয় উপলক্ষে এই সকল কথা বলিয়া দেখান হইতেছে যে, তাঁহার বহু সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও, যে অল্প পরিমাণে তমোগুণ ছিল, তাহাই তাঁহার সারা জীবনটাকে যাতনাময় করিয়াছে। 'ছিনে জোঁক' যেমন দেহকে 'কামড়ে' থাকে—কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, তমোগুণ তেমনি তাঁহার চিত্তে সুদৃঢ় ভাবে নিবদ্ধ ছিল। ঘোর যাতনা সত্ত্বেও ছাড়িতে চাহে নাই। তমোগুণ অল্প হইলেও তাহার সেই শক্তিরই প্রতাপ কত প্রবল, এবং ঐ শক্তিকে অভিভূত করিতে কত বাধা বিঘ্ন হয়, এবং তখন বিপদ কিরূপ সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধারণ করে তাহারই পরিচয় এই অধ্যায়ে দেওয়া হইতেছে।

রজোগুণের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-রোগ এবং কার্য্যহানি [বয়স ১৩—৪২]

লোকটীর জন্ম হইল মরা ছেলের মত। বাল্যকালের ৮।৯ বৎসর রোগেই কেটেছে। তখন উদ্যম উৎসাহ ছিল না; আলস্যও ছিল না। ১৪ বৎসর বয়স থেকে উৎসাহের সঞ্চার হয়, এবং ১৬ বৎসর বয়স হইতে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের

পরেই, (অর্থাৎ রজোগুণের প্রাবল্য প্রকাশের সঙ্গেই), শ্বাসরোগ তাঁহার দেহকে অধিকার করিল—এই রোগ ১৭ হইতে ৫৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৩৬ বৎসর কাল, তাঁহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা দিয়াছে।

১৩ বৎসর বয়স থেকেই লোকটীর বিপদ আরম্ভ হয়। তাঁহার পিতৃদেব, এই সময় হইতে কএক বৎসর যাবৎ, প্রায় প্রতিবৎসরই এক একবার কোন না কোন রোগে মৃতপ্রায় হইতেন। দুইবার তাঁহার রোগ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি তখন ঐ বালককে সংসারের ভার বহন করিতে বলিয়া পরলোকে গমনের জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি ৪৭ বৎসর বয়সের সময় পেনসন লন। কিন্তু অবসর গ্রহণের পরেও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। তিনি ইহার পর ১৮ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শারীরিক স্বাস্থ্যসুখ ঘটে নাই।

এক দুর্দ্দিনের কথা বলি। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ঐ চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালককে নিজের শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন যে, আমি ত চলিলাম তোমার মাকে দেখো, এবং ভাই ভগ্নীদের যত্ন ক'রো। ঐ দুঃসময়ের পর ৪৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, সেই সময়ে যিনি বালক ছিলেন তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে সেই দুঃখের দিনের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

তাঁহার পিতা একজন সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসক ছিলেন, অতএব ঐ ভাবে পরিবারবর্গের ভার ঐ পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ দ্বারা কি বুঝায়, তাহা ঐ বালক বেশই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব যদিও সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য যে ভগ্ন হইয়াছে এবং অতর্কিত ভাবে দুর্ঘটনা হইয়া সংসার ভার হয়ত অকস্মাৎ একদিন তাঁহার স্কন্ধে পড়িবে—চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই বালকটীর মনে এই আশঙ্কা নিয়তই জাগরুক থাকিত।

তিনি নিজে যতদিন উপার্জ্জনক্ষম না হইয়াছিলেন, ততদিন এই

চিন্তার হাত হইতে উদ্ধার পান নাই। অনেকের পক্ষেই বাল্যকালে ভাবনা চিন্তা না থাকাতে, বাল্যস্মৃতি সুমধুর বলিয়া সমাদৃত হয়। কিন্তু এই বালকের পক্ষে বাল্যকাল হইতেই দুঃখের আরম্ভ হইয়া সারা জীবনই একটানা ভাবেই চলিয়াছে। যখন তিনি যৌবনে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নানা যাতনা দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছিলেন, তখনও কামনা করেন নাই যে, বাল্যকালের দিনগুলি ফিরিয়া আসিলে ভাল হইত।

পঞ্চদশা এবং চাকরীর প্রথম অবস্থা

[বয়স ১৫—৩২]

বালকটীর চিত্তে যে রজোগুণ এতাবৎকাল সুপ্ত অবস্থায় ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উদ্দীপনা হইতে লাগিল। তাঁহার পিতৃদেবের রোগ হইতে সঞ্জাত দুশ্চিন্তা প্রবল হইয়া তাঁহাকে সংসারে আত্মোন্নতির জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিল। বোধ হয় যে, এই দুশ্চিন্তা দ্বারাও রজোগুণের উদ্দীপনার বলবৃদ্ধি হইয়াছিল। রজোগুণের প্রভাবে ১৭ বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার মনে প্রতিষ্ঠা কামনা অপর সর্ব্ববিধ কামনা অপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সেই সঙ্গে শ্বাসরোগও তাঁহার দেহকে অধিকার করিয়াছিল। অর্থাৎ একদিকে যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বালককে 'ঠেলে তুলিতে' চাহিতেছিল, অপর দিকে রোগ তাঁহাকে শয্যায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছিল।

(ক) শ্বাসরোগ

আমাদের দেহ নামক যন্ত্রখানি কি বিচিত্র বস্তু তাহাই একবার লক্ষ্য কর। শ্বাসনালীর কম্পনের নামই 'শ্বাস রোগ'। এই ক্ষুদ্র নালীর কম্পনই এত বড় শরীর খানাকে জড়ের তুল্য অসহায় করিয়াছে। আহারের সময় যাতনা, এবং হাত পা নাড়িলেও যাতনা হইত; যে বায়ু আমাদের জীবন, সেই বায়ু দ্বারা জীবন ধারণেও যাতনা !! পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বালকটীর জীবনের প্রভাতকালের নির্ম্মল আকাশ দুশ্চিন্তা নামক মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঐ সময় হইতেই শ্বাসরোগ সেই মেঘের কোলে বিদ্যুৎতের তুল্য হইয়াছিল।

(খ) প্রতিষ্ঠা কামনা

রোগটী বালককে বিশেষ যাতনা দিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-কামনার তেজ কমাইতে পারে নাই। ধনকে যে তিনি তাচ্ছিল্য করিতেন তাহা নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠাই তাঁহার নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু ছিল। পঠদ্দশায় তাঁহার লক্ষ্য ছিল কিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিবেন; এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিরূপে হাইকোর্টের ব্যবহারজীবিগণের মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিবেন। যখন কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনার সংযোগ দ্বারা পঠদ্দশার অবসানে,তিনি বাধ্য হইয়া চাকরির ক্ষেত্রেই প্রবেশ করিলেন, তখন সিভিলিয়ানের সমকক্ষ পদলাভ করাই তাঁহার নিকট প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

(খ) 'আশা নিরাশায় করে উদ্গীরণ

তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, এবং ঐ আশার বশে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, সেই উত্তম কখনই পূর্ণ হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে Triple Honours পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অভীষ্টমত উচ্চস্থান পাইলেন না। চাকরিতে সিভিলিয়ানের উচ্চপদ পাইলেন বটে, কিন্তু যখন বাসনার বশে ঐ পদ-লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন সম্মানের বদলে অপমানই ভোগ করিয়াছেন।

একদিকে দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রবল চেষ্টা বরাবরই নিষ্ফল হইয়াছে, অপর দিকে সেই নৈস্ফল্যের সময়েই দেখা যায় যে,বহু বিষয় উপলক্ষে লোকটী হয়ত কোন চেষ্টাই করেন নাই, (অথবা নামমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন) তথাপি ঐ সকল বিষয়ে তিনি এত প্রকৃষ্ট ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, ঐ সকল ঘটনা দ্বারা তাঁহার জীবনের গতি উচ্চগামী হইয়াছে।

এই ত হইল ৩২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হিসাব। পরবর্ত্তী ১০ বৎসরের (অর্থাৎ বয়স ৩৩—৪২) অবস্থা আরও বিচিত্র। ঐ দশ বৎসরের কথা আলোচনা করা যাক্

Water water everywhere but not a drop to drink, [বয়স ৩৩—৪২]

ইংরাজ কবি Coleridge উপরে উদ্ধৃত কবিতায় যে নাবিকের বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বিশাল-বারিধি মধ্যে থাকিয়াও পানীয় জলের অভাবে যে প্রকার নৈরাশ্য অনুভব করিয়াছিলেন, এই লোকটীর ভাগ্যেও প্রায় সেইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছিল। এই দশ বৎসর যাবৎ, তিনি সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুই আপন আয়ত্তে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও দশদিনের তরেও সুখলাভ করেন নাই।

ধন, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক প্রতিপত্তি, এবং যে প্রকার কার্য্য করিতে মনে আনন্দ হয়, সেই প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, এবং যে সকল লোকের সাহচর্য্যে দিনপাত করিতে আনন্দ হয়, সেইরূপ বাছা বাছা কতকগুলি বাল্যবন্ধুর মধ্যে থাকিয়া দশের মান্য হওয়া,—এই সকল বস্তুই সুখের উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হয়। নাম মাত্র চেষ্টায়, অথবা বিনা চেষ্টায়, লোকটী ঐ সকল উপকরণই লাভ করিয়াছিলেন।

বই বগলে করিয়া পদব্রজে স্কুলে যাওয়ার সময় বালকগণ যখন কর্ম্মক্ষেত্রে আপন আপন উন্নতির কামনা করে, তখন যেরূপ মর্য্যাদা সমন্বিত রাজকার্য্য প্রাপ্তিই, বাল্য কল্পনার চক্ষে, জীবনের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হইত, লোকটী সেই পরাকাষ্ঠাও লাভ করিয়াছিলেন। যে স্কুলে পড়িবার সময় তিনি ঐরূপ উচ্চপদ প্রাপ্তির কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই স্কুলের পার্শ্বেই, রাজপ্রাসাদের তুল্য অট্টালিকায়, তিনি বাল্যকল্পনা দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিতও হইয়াছিলেন।

বাল্যকালে যে রাজা-রাজড়াগণ তাঁহার নিকট দেবতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন, যাঁহারা আসিতেছেন দেখিলে ঐ বালক দূর হইতেই সম্ভ্রমে পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইতেন, এখন তিনি ঐ রাজন্যবর্গের নিকট হইতেও আপন পদমর্য্যাদার যোগ্য সম্মান লাভ করিলেন। সংসারী মানবের নিকট এই সকল বস্তুই সুখের উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়,

এবং উহা হইতে সুখ লাভেরই কথা, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সুখের বদলে কেবল দুঃখই হইয়াছিল।

অলক্ষিত শক্তি দ্বারা কাম্য বস্তু প্রদান

এই দশ বৎসরে ভোগ্য বস্তু লাভের প্রণালীও বিচিত্র। কামনার সঞ্চার হওয়া মাত্র, কোন চেষ্টা না করিয়াও, কাম্য বস্তু তাঁহার আয়ত্তে আসিয়াছে। কখন্ তাঁহার মনে কি বাসনার সঞ্চার হয়, যেন কোন এক অলক্ষ্য শক্তি, নিয়ত তাহারই প্রতীক্ষায় থাকিত, এবং কোন বাসনার উদয় হওয়া মাত্র ঐ শক্তিই তাহার পুরণ করিত। বাল্যকালে লোকে অনেক কল্পনাই করেন, এই লোকটীও করিতেন; কিন্তু যে বিপুল সম্পত্তি, অথবা যে প্রতিষ্ঠালাভ কল্পনা করিতেও সকল সময়ে তাঁহার সাহস হইত না, অতি অল্প আয়াসেই সেই সম্পত্তিও লব্ধ হইয়াছিল; এবং একবার মাত্র মুখের কথা ব্যয় করিয়া তিনি ঐ প্রতিষ্ঠাও পাইয়াছিলেন।

অনেকে বহু চেষ্টা এবং বহু 'যোগাড় যন্ত্র' করিয়াও এইরূপ প্রতিষ্ঠা পান না। এই লোকটীর এমন কোন বিশেষ রূপ মনীষা ছিল না, যাহার দ্বারা এই প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তিনি দাবী করিতে পারিতেন।

Facts stranger than fiction

উপরোক্ত বর্ণনাটী পাঠ করিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, লেখক ভাবের আবেগে বাস্তব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কল্পনার রাজ্যে উপনীত হইয়াছেন। একটী ইংরাজী প্রবাদ আছে যে, Facts are sometimes stranger than fiction, অর্থাৎ সময়ে সময়ে বাস্তব ঘটনা কাল্পনিক ঘটনা অপেক্ষাও বিচিত্র হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নানৃতং লিখ্যতে কিঞ্চিৎ ন চাতিরিক্তমুচ্যতে। এই বর্ণনায় অবাস্তব কোন বিষয়ই বলা হয় নাই, কিম্বা অতিরঞ্জিতও কিছু নাই। অন্যত্র যে তত্ত্ব-কথার আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে পাঠক দেখিবেন যে, গুণত্রয়ের আপেক্ষিক শক্তির এক রকম বিশেষ অবস্থা হয়,

যে অবস্থায় লোকে প্রবল চেষ্টা না করিয়াও শক্তিমান গুণের প্রভাবে সর্ব্ববিধ ভোগোপকরণ লাভ করে।

তত্ত্ব কথা এই যে, যখন গুণত্রয়ের কোন একটী গুণ অপর গুণ-দ্বয়কে অতিক্রম করিয়া অত্যধিক মাত্রায় শক্তিমান হয়, তখন ঐ গুণ দ্বারা বহুকার্য্যই সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই লোকটীর চিত্তে রজোগুণ প্রবল ছিল; এই দশ বৎসর যাবৎ রজোগুণই তাঁহাকে উপরোক্ত বস্তু সকল প্রদান করিয়াছিল।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে শনিগ্রহ রজোগুণের স্থানীয় এবং বৃহস্পতিগ্রহ সত্ত্বগুণের স্থানীয়। এই লোকটীর কোষ্ঠীতে ঐ উভয় গ্রহেরই বলবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকটীর আচরণও রজো এবং সত্ত্বগুণের প্রাবল্য প্রদর্শন করে।

রজোগুণ যখন ভোগ্য বস্তু প্রদান করিয়াছিল,তখন বলীয়ান্ সত্ত্বগুণ সুখলাভে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল। ইহাই এই দশ বৎসরের রহস্য।

দশ বৎসরে দশদিনও সুখলাভ হয় নাই
[বয়স ১৩—৪২]

সুখের উপকরণ পাইয়াও দশ দিনের তরেও ঐ লোকটীর 'বরাতে' সুখলাভ হয় নাই। তাঁহার নিজের শ্বাসরোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তাঁহার পিতৃদেব এত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রোগে ভুগিতে লাগিলেন এবং তদ্দ্বারা সংসারে সকলেরই শান্তি বিনষ্ট হইল, সেই সঙ্গে সন্তানগণের রোগও প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্রটী এমন কঠিন পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইল যে, ঐ পীড়ার সময়ে তাহার জীবন-সঙ্কট হইয়াছিল এবং সেই পীড়ার 'জের' প্রায় ২৪ বৎসর যাবৎ চলিতেছে। সাংসারিক নানাবিধ অশান্তিতে লোকটীর জীবন তখন এতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেক সময় তিনি ভাবিতেন যে, ভগবান কি তাঁহাকে কেবল যাতনা ভোগ করিতেই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

এইরূপ নৈরাশ্য উদয় হওয়ার পরেই রজোগুণ আবার প্রবল

হইয়া নৈরাশ্যের স্থানে এত প্রবল আশার সঞ্চার করিত যে, তখন তাঁহার মনে সেই নৈরাশ্যের স্মৃতিও থাকিত না। ধন্য মায়াদেবীর মোহিকা-শক্তি।

৫৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাঁহার মনে যে স্থায়িভাবে রজোগুণের কোন উপশম হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না।

বিত্তনাশ এবং সম্ভ্রম-নাশ [বয়স ৪৩]

১৩ বৎসর বয়স হইতে যাতনার আরম্ভ হয়, তাহার পর ৪৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৩০ বৎসর যাবৎ, লোকটী যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। যে সময়ে লোকটী অত্যধিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, সেই সময় হইতেই, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার বিবেক শক্তিও এমন সুপ্ত হইয়া পড়িল যে, দুই বৎসর যাবৎ লোকটীর বিপুল সম্পদ যে দিন দিন ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইতেছিল, ঐ বিষয়ের উপর মোটেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না।

যখন তাঁহার ধনের অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়া অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন ঐ লোকটীর সম্মানও অপহৃত হইল এবং তাঁহার মস্তকে অপমানের ডালি স্থাপিত হওয়ার পরে তিনি অকুল পাথারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

কাহা দ্বারা বিত্ত ও সম্ভ্রম বিনষ্ট হইল

উপরের বর্ণনায় কেহ হয়ত বলিবেন যে 'ভগবান' লোকটীকে ৩০ বৎসর যাতনা দিয়াছিলেন, এবং তিনিই বিবেক শক্তির বিলোপ ও বিত্তহরণ এবং সম্মান হরণ করিলেন। অপর কেহ হয়ত বলিবেন যে 'গুণ'ই (এস্থলে সত্ত্বগুণ) ঐ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। পুরুষ এবং প্রকৃতি অভিন্ন। গুণ এবং ব্রহ্মও (অর্থাৎ ভগবানও) অভিন্ন। সুতরাং ঐ সকল কার্য্য 'গুণ' দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল বলাও যা, আর 'ভগবান' দ্বারা বিহিত হইয়াছিল বলাও তাহাই। এই প্রবন্ধে গুণের ক্রিয়ারই বিচার করা হইতেছে, অতএব ঐ সকল কার্য্যকে গুণের

কার্য্য বলা হইল। বস্তুতঃ গুণের কার্য্য ও 'ভগবানের' কার্য্য একই জিনিষ।

শোচনীয় অবস্থা

ঐ সময়ে লোকটীর স্বাস্থ্যের অবস্থা এতই মন্দ হইয়াছিল যে, ঐ ভগ্নদেহ লইয়া তিনি যে পুনরায় সংসারক্ষেত্রে জীবনসংগ্রাম চালাইতে পারিবেন, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহেরই কারণ ছিল। ছুটি না লইয়া তিনি ১৯ বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন, অতএব স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া বিচিত্র বস্তু নয়।

তখন তাঁহার স্কন্দে ছিল দুইটী বয়স্থা কন্যার বিবাহের ব্যয়ভার, এবং একটী ১৭ বৎসরের ও আর একটী ৭ বৎসরের পুত্রকে প্রতিপালন করার ভার—এই অবস্থায় ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে যে বিপুল সম্পদ প্রধান ভরসাস্থল হয়, তাহা লব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এই বিপৎপাতের পূর্ব্বে তাহা যেন 'কুহকরাদ্ধ' ধনের ন্যায় তিরোহিত হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

ভোজবিদ্যা বলে যে সকল বিস্ময়কর ঘটনা হয়, বাস্তব জীবনে তাহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে, আমরা মায়ার ঘোরে ঐ সকল ঘটনা দেখিতে পাই না। লেখক নিজেও বহুকাল ধরিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুটীর জীবনের এই প্রহেলিকাকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার দুঃখে কেবল দুঃখীই হইয়াছিলেন।

রজোগুণের sustaining power

এই 'সঙ্গীন' অবস্থায়ও রজোগুণের sustaining power (প্রভাব) একবার দেখ। অধিকাংশ লোক এই অবস্থায় পড়িলে কাতর হন ও দুশ্চিন্তায় আতঙ্কিত হন। কিন্তু চিত্তে 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণের আধিপত্য থাকাতে, এই বিপুল বৈভব বিনষ্ট হইলেও এই লোকটী টাকার শোকে মোটেই ব্যাকুল হন নাই; এবং কিরূপে সংসার চালাইবেন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়াও কাতর হন নাই; 'আত্মগর্ব্ব' (অর্থাৎ আমার নিজের বিরাট শক্তিবলে সবই ঠিক করিয়া লইব, এই বিশ্বাস)

তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। স্বাস্থ্য ভঙ্গের দরুণ আতঙ্ক, কিম্বা পরিবার প্রতিপালনের জন্য 'টাকা কোথায় পাইব' এই ভয় কেবল তমোগুণ হইতেই জন্মায়। যে প্রকৃষ্ট রজোগুণ এই লোকটীর চিত্তে আধিপত্য করিত, তমোগুণ তাহার ত্রিসীমানায় যাইতেও অক্ষম ছিল। অতএব তাঁহার মনে ভয় বা চাঞ্চল্য হয় নাই। যদি ঐ রজো 'প্রকৃষ্ট' না হইয়া 'নিকৃষ্ট' শ্রেণীর (৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা) হইত, তাহলে এই বিপদের সময় তাঁহার মনে ভয় হইত, এবং সেই সঙ্গে মিথ্যা শঠতা প্রভৃতি উপায় দ্বারা বিপদ হইতে মুক্তি লাভের প্রবৃত্তিও থাকিত।

কৃতজ্ঞতা এবং বিষয়বুদ্ধির লোপ [বয়স ৪৩]

এই ভয়ঙ্কর বিপদ লোকটীকে ব্যাকুলিত না করিলেও ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য করিয়াছিল। যে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠার হানি হইয়াছিল, তাঁহার মুখের উপর লোকটী তখন দর্পভরে বলিয়াছিলেন যে, Sir, the stone which the bnilders refuse will again become a part of the edifice.

যিশুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যগুলিকে এই ভাবে নিজের প্রতি ব্যবহার করাই যে অতি গর্হিত রকমের sacriledge, এই ক্রোধের বশে সে জ্ঞানও বিলুপ্ত হইল; এবং বাক্যগুলির এইরূপ অপব্যবহার করিতে লোকটী একটুও কুণ্ঠা বোধ করিলেন না!!

যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই দর্পের কথাগুলি বলিলেন, তিনি যে বহুকাল হইতেই ঐ লোকটীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁহার স্নেহ এবং কৃপাতেই যে ঐ লোকটী নানা বিষয়ে প্রতিষ্ঠালাভ কবিয়াছিলেন— ঐ পূর্ব্ব উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা-ভাবও বিলুপ্ত হইল!! স্বার্থপরতা মানুষকে কতদূর অধঃপাতিত করায় তাহাই এই ক্ষেত্রে দেখ। একবার অনিষ্ট করাতে পূর্ব্বের ১৫ বছরের উপকারের স্মৃতি মুছে গেল!!

যাঁহাকে এইভাবে অপমান করিলেন, সেই উচ্চকর্ম্মচারী আরও অনেক বেশী অনিষ্টই করিতে পারিতেন,—অতএব অপমান করা উচিত নয় এই বিষয়-বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইল।

অবিদ্যা মানবকে কি পশুত্বে পরিণত করে তাহারই চিত্র এই আচরণে দেখা যায়।

'অহঙ্কার' হইতে 'উন্মাদ' ভাব

[বয়স ৪৩—৪৪]

আত্মগর্ব্ব (অর্থাৎ আমি বিরাট কর্ম্মী, আমি নিজের শক্তি প্রভাবে পুনরায় সমুন্নত হইব, এই 'আমিত্ব' ভাবের আধিপত্য) তখন ঐ লোকটীর চিত্তে এতই উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তিনি তখন উন্মাদ তুল্য হইলেন। তাঁহার অধিক্ষেপ যে ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত হয় নাই, যিনি করুণাময় তিনি কেন এই যাতনা দিলেন, এই সকল বিষয়ের চিন্তাও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই।

'ভগবানের' কথা ছাড়িয়া যদি 'গুণের' কথাই ধর, তাহলে কোন্ 'গুণের' শক্তির বৈষম্য হেতু আমার এই দুরবস্থা হইল, এইরূপ কোন তত্ত্ব বিষয়ক চিন্তাও তাঁহার মনে একবারের তরেও উদয় হয় নাই।

আদত কথা এই যে, অবিদ্যা সৃষ্ট 'অহং' ভাব তখন যেন, কোন এক অসীম ও অনন্ত রূপ প্রকাশ করিয়া,তাঁহার বিবেক শক্তিকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, চিত্তে ভগবানের, বা অপর কোন বিষয়ের, চিন্তার উদয় হয় নাই

কংস শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে 'চিন্তয়ানঃ হৃষীকেশং অপশ্যত্তন্ময়ং জগৎ', অর্থাৎ জগৎ যেন শ্রীকৃষ্ণময় ইহাই অনুভব করিয়াছিলেন। অধিক্ষেপের পরে এই লোকটী আপন চিত্তকে সুদৃঢ় ভাবে 'অহং' ভাবের উপর নিবদ্ধ করাতে, ঐ ভাবের সহিত এতই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, প্রকৃষ্ট অহং রূপিনী 'পরা' প্রকৃতিতে (৯ম অধ্যায়) যে অনন্ত শক্তি আছে, সেই শক্তি অবিদ্যার মোহ দ্বারা সৃষ্ট 'অহং' এর উপর আরোপিত হইয়াছিল। এই স্থলেও 'বৃত্তি-সারূপ্য' নিয়মটীর কার্য্য দেখা যায়।

ঐ উন্মাদ অবস্থার পরে প্রায় ১৬।১৭ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অপর অপর বহু সদ্‌গুণ থাকিলেও কেবল এই 'অহং' ভাবের মোহের

বশেই লোকটী এই সুদীর্ঘকাল যাবৎ নানাবিধ যাতনাভোগ করিয়াছেন। এত কষ্ট পাইয়া, এখনও যে ঐ 'অহঙ্কারের' মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়েছে তাহা বোধ হয়না।

অবিদ্যা সৃষ্ট তমোগুণের যে আবরক শক্তির এত tenacity (আটা) আছে, লোকে কি না সেই গুণ দ্বারা সৃষ্ট বিষয়াসক্তিকে বক্তৃতার চোটে দূর করিবার দুরাশাও করে !! কেবল পাগলা গারদেই পাগল থাকে না, বাহিরেও আছে।

আত্মাভিমান ও ভোগবাসনা প্রবৃত্তি দূর করা যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহাই দেখানর জন্য এই লোকটীর বিষয় এত সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করিতেছি।

উন্মাদকে 'নাগপাশে' বন্ধন [বয়স ৪৪]

ঐ 'উন্মাদ' অবস্থায় লোকটী আত্মশক্তি প্রভাবে নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বিরাট উদ্যম উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সে কার্য্য প্রণালীও অতি বিচিত্র। লেখক এক ব্যক্তিকে জানেন যিনি,কোন্ ঘোড়া ঘোড়দৌড়ে জিঁতিবার সম্ভাবনা তাহা mathematical calculation দ্বারা স্থির করিয়া betting (বাজী) করেন। তাঁহার গণনা অনেক সময়ই ভুল হয়, এবং বলা বাহুল্য যে এই ভ্রম বশতঃ বাজীতে হার হইয়া অর্থও বিনষ্ট হয়।

এই প্রবন্ধে যে উন্মাদ ভাবাপন্ন লোকটীর বিষয় আলোচনা করিতেছি; তিনি টাকা রোজগারের জন্য কয়লার ব্যবসায় সংস্পৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় কয়লার আমদানি রপ্তানী প্রভৃতি অঙ্কের সমন্বয় দ্বারা দরের নির্দ্ধারণ করিয়া 'সওদা' করিলেন। জাহাজ অভাবে রপ্তানী কম হইলে, ঐ গণনা যে নিরর্থক হইতে পারে—এই বিষয়টা তখন তাঁহার আমলেই আসিল না।

যে বিষয় তাঁহার কামনার বিরোধী, তাহা আমলে না আসারই কথা। কারণ কাহারও মনে যখন কোন বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়, তখন রজোগুণ হইতে উৎপন্ন ঐ কামনা, সত্ত্বগুণ হইতে জাত

বুদ্ধির বিবেক শক্তিকে আবৃত করে। অতএব কেবল যে সকল যুক্তি তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুকূল, বুদ্ধিতে তাহাদেরই উদয় হয়। (৭৪ পৃষ্ঠা) জাহাজের অভাব হওয়াতে বাজারের গতি তাঁহার গণনার উলটা ভাব চলিল। তাঁহার অবধারিত সময়ের ৪ মাস পরে কয়লার দর তাঁহার গণনার অনুযায়ী হইল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার নিজের বিশেষ কোন লাভ হইল না। পূর্ব্বে বাজারের গতি উলটা হওয়াতে তিনি বিপুল ক্ষতি গ্রস্ত হইলেন।

মোটের উপর, এই সকল কার্য্য দ্বারা তিনি এমন সুদৃঢ়ভাবে বিপদের জালে আবদ্ধ হইলেন যে, ঐ বিপদকে 'নাগপাশ' বন্ধন বলা মোটেই অত্যুক্তি হয় নাই।

(ক) যেখানে 'ব্যাথা' সেই স্থানেই 'হাত'

এই বন্ধনের মধ্যেও বেশ একটু বৈশিষ্ট্যও ছিল—লোকটীর চিত্ত-বৃত্তির যেখানে 'ব্যাথা' ছিল, এই বন্ধন ঠিক সেই যায়গায়ই আঘাত করিল!! লোকটীর নিকট যে আত্মমর্য্যাদা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু ছিল—সেই 'ইজ্জতের' উপরই আঘাত পড়ার যোগাড় হইল, অর্থাৎ তখন এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, মর্য্যাদা বুঝি আর থাকে না।

সারা জীবনে একদিন মাত্র ব্যাকুলতা

এমন দুরবস্থায় পতিত হইয়াও লোকটী কেবল একটি দিন মাত্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন—তখন তাঁহার পক্ষে 'মান' রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল বলিয়াই ব্যাকুলতা জন্মায়। যাহাকে যথার্থ ব্যাকুলতা (অর্থাৎ অতি প্রবলভাবে চিত্ত-বিক্ষোভ হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা) বলে, সেইপ্রকার ব্যাকুলতা, লোকটীর সারা জীবনে, বোধ হয় ঐ একদিন মাত্র দেখা গিয়াছিল।

ঐ সময়, কয়লার ব্যবসায়ের দরুণ, কতক লোকের তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল। ঐ টাকা দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তখন তাঁহার ছিল না, তাঁহার কতক সম্পত্তি এমন সকল securityতে

আবদ্ধ ছিল যে, সে টাকা খালাস করার সম্ভাবনা ছিল না। তাইতে, কি উপায়ে পাওনাদারদের প্রাপ্য টাকা দিয়া আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন—সেই চিন্তাতেই তিনি তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

নাগপাশ তুল্য বন্ধনের সময়ই জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ [বয়স—৪৪]

পাওনাদারদের টাকা কিরূপে দিবেন—এই বিষয়ের কুল কিনারা না পাইয়া আপন মর্য্যাদা হানির আশঙ্কায় লোকটীর অবস্থা সম্পূর্ণ অসহায় মানবের অবস্থার মত হইলেও এই অবস্থাকে প্রকৃত বিপদের অবস্থা বলা যাইতে পারে না। ইহা তাঁহার জীবনের যথার্থ মাহেন্দ্রক্ষণ—কারণ এই বিপদই তাঁহা দ্বারা প্রকৃষ্ট 'সম্পদ' লাভের পথকে উন্মুক্ত করিল। কারণ—

(ক) এই অসহায় অবস্থায় লোকটী তাঁহার সহধর্ম্মিনীর মুখ হইতে একটী সঙ্গীতের দুই পাদ শ্রবণ করা মাত্র তাঁহার মতি প্রগাঢ়ভাবে সাধনমার্গে গমন করিল। রজোগুণ যখন প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল, তখন ঐ গুণ হইতে লোকটী সর্ব্ববিধ সুখের উপকরণ লাভ করিলেন। বয়সের বিগত ৪৪ বৎসর তিনি 'চলতি' ভাবে যে সাধনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে সাধনা নয়; তিনি এখন যথার্থ সাধনায় মতি দিলেন। মতির এইরূপ পরিবর্ত্তন অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়।

(খ) নারদ ব্যাসকে যে মহামন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সাধনা আরম্ভের দুইমাস পরে লোকটী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সেই মন্ত্রে দীক্ষালাভও করিলেন।

যে সকল ঘটনার যোগাযোগ দ্বারা এই উভয়বিধ সৌভাগ্য লব্ধ হইল তাহা অতীব বিচিত্র। তাহা ক্রমশঃ বর্ণিত হইবে। ঐ ঘটনাদ্বয় আলোচনা করার পূর্ব্বে দেখা যাক্ যে, জীবনের এই ৪৪ বৎসরে লোকটীর কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল! অর্থাৎ তিনি কিরূপে

এই সৌভাগ্যলাভে অধিকারী হইয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

পাঠক যেন না ভুলেন যে, কেহ যথার্থ 'অধিকারী' না হইলে এই দুইটী সৌভাগ্য লব্ধ হয় না।

আন্তরিক সাধনায় মতি এবং নারদ মন্ত্রে দীক্ষালাভে অধিকার

জীব যখন শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আগমন করেন, অর্থাৎ জীবের চিত্তে সত্ত্বগুণ যত পুষ্ট হয়, ততই গুণত্রয়ের সংস্কার সকলের ক্রিয়া-শক্তির 'বল' বৃদ্ধি হয়। এবং বলের বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের মধ্যে প্রবলভাবে সংঘর্ষণ চলিতে চলিতে ক্রমশঃ ঐ সংঘর্ষণ (অর্থাৎ বিপদ দ্বারাই) চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয়—এই যে তত্ত্বটীর কথা একাদশ অধ্যায়ে (১৬৭ পৃষ্ঠা) এবং অপর অপর স্থানে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা হইয়াছে। সেই তত্ত্বটীর ক্রিয়া আমাদের সকলের জীবনেই চলিতেছে। এই তত্ত্বটীকে বিভুর সংসার লীলার basic principle বলাও অত্যুক্তি নয়।

ঐ নিয়মটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, এই লোকটী কেন এখন সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং কিরূপেই বা তাঁহার দীক্ষায় অধিকার জন্মিল, এই উভয় বিষয়ই সুস্পষ্ট হইবে।

(ক)• [বয়স ১৩-৩২]—এই কুড়ি বৎসর যদিও ঘন ঘন বিপদ হইয়াছিল কিন্তু, পরবর্ত্তী সময়ের বিপদের তুলনায়, ঐ বিপদ সকল ছোট খাট রকমেরই ছিল। তথাপিও ঐ বিপদ সমষ্টি দ্বারা মোটের উপর লোকটীর চিত্তে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইয়াছিল।

(খ) [বয়স ৩৩-৪৩]—সত্ত্বগুণের পুষ্টি হওয়াতে (অর্থাৎ লোকটী ভগবানের সান্নিধ্যে গমন করাতে) অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা এই উভয়বিধ শক্তিতেই (অর্থাৎ তিন গুণের সংস্কারেই) ক্রিয়াশক্তির বলের বৃদ্ধি হইয়াছিল। এবং ক্রমশঃ বিপদ দ্বারা যত বেশী পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি

হইতে লাগিল, লোকটীর জীবনে বিপদও তেমনি বাড়িতে লাগিল,— অর্থাৎ বিপদ ততই বেশী বেশী তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন হইতে লাগিল, ১৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা)।

এই দশ বৎসরের প্রারম্ভে রজোগুণ যখন প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল, লোকটী সর্ব্ববিধ সুখের উপকরণ পাইয়াছিলেন এবং এই সময়ের শেষ দুই বৎসরে নিরবচ্ছিন্ন বিপদের প্রভাবে যখন রজোগুণের ক্রিয়াশক্তির বল অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল তখন রজোগুণ হইতে লোকটী বিপুল সম্পদ এবং অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠাও লাভ করিয়াছিলেন (২০৬ পৃষ্ঠা)।

বলা বাহুল্য যে, ঐ দশ বৎসরে সত্ত্বগুণেও বলাধান হইতেছিল —সেই সঙ্গে সঙ্গেই রজোগুণেও বলাধান হয়। বলীয়ান্ হওয়াতে সত্ত্বগুণ নিজ শক্তি দ্বারা সর্ব্ববিধ সুখে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। এইজন্য সকল কাম্য বস্তু পাইয়াও, এই দশ বৎসরের মধ্যে, লোকটী দশদিনও সুখ লাভ করেন নাই (২০৬ পৃষ্ঠা)।

(গ) [বয়স ৪৪-৪৫]—ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতেই লোকটীর চিত্তে সত্ত্বগুণ অপেক্ষা রজোগুণের শক্তি প্রবল থাকিলেও, ক্রমশঃ যে সত্ত্বগুণের শক্তির বৃদ্ধি এবং রজোগুণের শক্তির হ্রাস হইতেছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সত্ত্বের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছিল, (অর্থাৎ লোকটী ভগবানের সান্নিধ্যে যাইতেছিলেন) বলিয়াই, ১৩ হইতে ৪৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৩৬ বৎসর কাল, একটানা ভাবে তাঁহার বিপদ চলিয়াছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লোকটীর বিপদ যে অধিকতর তীব্র হইতেছিল তাহা দ্বারা প্রকাশ পায় যে,ক্রমশঃ বেশী বেশী পরিমাণে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতেছিল—অর্থাৎ তিনি ভগবানের যত সান্নিধ্যে যাইতেছিলেন প্রতিকূল সংস্কার সকলের মধ্যে সংঘর্ষণও তত প্রবলভাবে চলিতেছিল। ইহাই বোধ হয় বিপদের তীব্রতা বৃদ্ধি হওয়ার কারণ।

মোটের উপর, লোকটীর আধ্যাত্মিক উন্নতি যে Steady অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, হইতেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

(ঘ) [অধিক্ষেপ]—সত্ত্বগুণের পুষ্টি চলিতে চলিতে ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমের প্রারম্ভে, লোকটী এমন অবস্থায় উপনীত হইলেন যে, তখন ক্রমবর্দ্ধনশীল সত্ত্বের শক্তি রজোগুণের শক্তিকে অতিক্রম করিল।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন রজোগুণের শক্তি মোটের উপর সত্ত্ব অপেক্ষা বেশী ছিল তখন সত্ত্বগুণ সুখে বিঘ্ন করিয়াছে এবং কার্য্যে সিদ্ধি লাভেও বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে।

কিন্তু রজো অপেক্ষা সত্ত্বে সুস্পষ্টভাবে অধিকতর বল না থাকাতে, ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Disaster বলে, সেরূপ কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে নাই। এখন রজোগুণের শক্তিকে অতিক্রম করাতে সত্ত্বগুণ ঐরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিল,—ইহাই অধিক্ষেপের রহস্য।

(ঙ) [উন্মাদ-ভাব]—রজোগুণ সত্ত্ব দ্বারা পরাভূত হইল বটে কিন্তু বিনষ্ট হইল না, বরঞ্চ সত্ত্বের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রজোগুণের ক্রিয়াশক্তির বলও বাড়িল (১৬৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত নিয়ম দ্রষ্টব্য)। ঐ সময়ে লোকটীর আচরণে যে উন্মাদভাব দৃষ্ট হইয়াছিল,-তাহা রজোগুণের বল বৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। এই বলবত্তা যেরূপ তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা হইতে অনুমান হয় যে, লোকটী তখন ভগবানের অতি সান্নিধ্যে গমন করিয়াছিলেন। এই অনুমান ১৬৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত নিয়মের উপর অবস্থাপিত।

(চ) নাগপাশ বন্ধন—লোকটী যখন ভগবানের অতি সান্নিধ্যে গমন করিয়াছিলেন তখন কেবল রজোগুণেরই ক্রিয়াশক্তির বলেরই বৃদ্ধি হয় নাই সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তির বলও সেই অনুপাতেই বাড়িয়াছিল। পূর্ব্বে (ঘ) চিহ্নিত মন্তব্যে বলিয়াছি যে, সত্ত্বগুণের শক্তি মোটের উপর রজো গুণের শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছিল। লোকটী

ভগবানের আরও সান্নিধ্যে যাওয়ার পরে,সেই পরিপুষ্ট সত্ত্বগুণ অধিকতর বল দ্বারা কার্য্য করাতে, অনুমান হয় যে, লোকটী সেই শক্তি দ্বারাই নাগপাশ তুল্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা ও তাহার ফল

অতএব নাগপাশে আবদ্ধ অবস্থা কেবল ৪৪ বৎসর পরে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের অভিভব এবং সত্ত্বের অধিকতর বলবত্তাই প্রকাশ করে। ঐ গুণের প্রভাবেই তাঁহার মতি আন্তরিকভাবে (ক) সাধনায় প্রবৃত্ত হয়,এবং (খ) সাধনা দ্বারা (দুই মাস পরে) দীক্ষা লাভে অধিকার জন্মায়। সত্ত্বগুণের এই প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইতে ৪৪ বৎসর লাগিল।

সঙ্গীত দ্বারা চিত্তের গতি পরিবর্ত্তন

এই দিনের কথা, যেন সদ্যোদৃষ্ট ঘটনার ন্যায়, এখনও মনে গাঁথা আছে। সময়টা ছিল ভাদ্র মাসের গুমোটের দিনে অপরাহ্ণ কাল। লোকটী তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছেন। কয়লার ব্যবসায়ে পাওনাদারদের টাকা শোধ করিয়া, কিসে আপন মান ইজ্জত বজায় রাখিবেন (২১৩ পৃষ্ঠা) এই চিন্তাতেই তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত—কারণ তিনি তখন টাকা দেওয়ার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

এই সময়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী একখানি বই লওয়ার জন্য ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে চিত্তের একতানতা থাকাতে, ঐ মহিলা স্বামীর মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের কথা বলিতে পারিতেন,—কারণ স্বামীর অন্তর তাঁহার নিকট open bookএর মত অনাবৃত ছিল।

তখন ঐ মহিয়সী মহিলার মুখ হইতে, গুণ গুণ স্বরে উচ্চারিত, একটী সঙ্গীতের কএকটী বাক্য ঐ লোকটীর কর্ণে প্রবেশ করিল। কথাগুলি এই—

> অমৃতজলের সেই ত সাগর—কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর।
> অনায়াসে পান, কর রে সে জল—চরম শান্তি দায়ী রে।

কথা কয়টী যেন বারি নিক্ষেপ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিল। কথা কয়টী শ্রবণমাত্র ঐ লোকটীর মনে সকল ব্যাকুলতার পর্য্যবসান হইয়া 'সাধনার' জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। তাই এই সময় হইতে তিনি আন্তরিক আগ্রহের সহিত বাইবেল এবং গীতা পাঠে নিরত হইলেন। পূর্ব্বে কখনও তাঁহার মনে শাস্ত্র পাঠে এমন আগ্রহ হয় নাই।

সঙ্গীত হইতে কিরূপে সাত্ত্বিক শক্তি বাহির হইল [বয়স ৪৪]

শাস্ত্রের বাক্যে, এবং অনেক চলিত কথার মধ্যেও, সাত্ত্বিক শক্তি (অর্থাৎ, ভগবৎ-শক্তি) নিহিত থাকে, কারণ বাক্য কেবল ভাবেরই রূপান্তর অতএব ভাবের শক্তি বাক্যের মধ্যে অবস্থান করে। ঐ শক্তিকে বাহির করাই সুকঠিন ব্যাপার। যিনি শাস্ত্র পাঠ, বা কীর্ত্তন, অথবা শ্রবণ করেন, তিনি যদি (অন্ততঃ কতক পরিমাণেও) শাস্ত্রের সহিত একীভাবাপন্ন না হন, তাহলে শাস্ত্রের বাক্য হইতে ঐ শক্তি বাহির হয় না। এ স্থলেও 'বৃত্তিসারূপ্য' নিয়মটীর কার্য্য দেখা যায়।

যে মহিলার মুখ হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, তিনি অসাধারণ পরিমাণে সাত্ত্বিক গুণযুক্তা ছিলেন। লেখক তাঁহার সহিত সুপরিচিত, তাই এই কথা বলিতেছেন। ঐ মহিলা অন্তরের সহিত আপন স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতেন, এবং স্বামী যে তখন বিপন্ন তাহাও জানিতেন। বোধ হয় যে, স্বামীর তদানীন্তন কাতর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনায়, ঐ মহিলার মতি শ্রীভগবানের পাদমূলে গমন করিয়াছিল; তাইতে তাঁহার চিত্ত তখন ব্রহ্ম-শক্তির সহিত (কিয়ৎ পরিমাণে) 'তদাত্মভাব' প্রাপ্ত হইয়াছিল।

চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরে, ঐ 'তদাত্মভাব' দ্বারা প্রবোধিত হইয়া, সঙ্গীতের বাক্যের মধ্যে নিহিত শক্তি প্রথমে ঐ মহিলার চিত্তে প্রবেশ করে; এবং তথা হইতে তাঁহার স্বামীর চিত্তে

প্রতিভাত হইয়াছিল। [১২০-২১ পৃষ্ঠায় এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।]

ঐ বিশুদ্ধ শক্তি তমোগুণকে সংযত করাতে সঙ্গীত দ্বারা সেই লোকটীর মন হইতে (ক) তমোগুণ দ্বারা সৃষ্ট সকল আশঙ্কা অপসারিত হইয়াছিল, এবং (খ) ঐ শক্তিতে নিহিত সত্ত্বগুণের প্রেরণা দ্বারা লোকটীর মতিও সাধনায় নিরত হইয়াছিল।

সকল বিভ্রাটের তিরোভাব

লোকটীর মতি আন্তরিকভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় ১০।১৫ দিনের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঘোর বিভ্রাট যেন যাদু-মন্ত্র প্রভাবে তিরোহিত হইল। তিনি আপন সারা জীবদ্দশাতেই দেখিয়া আসিতেছেন যে, অলক্ষিত ভাবে বিভ্রাটের সৃষ্টি হয় এবং ঐ সকল বিভ্রাটের তিরোভাবও অলক্ষিত উপায় দ্বারা সম্পাদিত হয়। যে কার্য্য সম্পাদন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, অভাবনীয় ঘটনা সকলের যোগাযোগ হওয়াতে তিনি ঐরূপ বহুকার্য্য করিয়াছেন। তবুও অবিদ্যা সৃষ্ট 'অহং' ভাবটী এমন সুদৃঢ় ভাবে তাঁহার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাবকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারেন না, কিম্বা কামনা বাসনা প্রভৃতির হাত থেকে নিজেকে বিমুক্ত করিতে পারেন না। হায়রে অন্ধ অসহায় মানব। ভগবান তোকে বিপন্ন করিয়া তোর চোখে আঙ্গুল দিয়া তোর প্রকৃত দৈবাধীন অবস্থা দেখাইলেও তুই দেখবি না। কেবল যাতনা ভোগই করিবি।

ভাগবত হইতে নারদ-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ

[বয়স ৪৪]

সঙ্গীত হইতে আগত সত্ত্বগুণের অপর একটী মঙ্গলময় কার্য্যের কথা এখন বলি। চিত্তের গতি পরিবর্ত্তনের মাস দুই পরে, লোকটী একদিন কি একটা কারণে বিলক্ষণ মানসিক অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন। কোনমতেই শান্তি না পাইয়া তাঁহার মন, আলমারীতে সাজান শ্রীমদ্ভাগবতের দিকে, আকৃষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন যে,

ভাগবত খুলিয়া প্রথমে যে শ্লোকটি চোখে পড়িবে তাহাই পড়িয়া দেখি—যদি শান্তি পাই। ভাগবতের কোথায় কি বিষয় লেখা আছে তাহা তিনি তখন জানিতেন না। বলা বাহুল্য যে; অশান্তি তমোগুণ দ্বারাই সৃষ্ট হয়। সাধনা দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার চিত্তে ভাগবত হইতে শান্তি খুঁজিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

প্রথমেই ভাগবতের যে বইখানি হাতে পড়িল, তাহাই যদৃচ্ছাক্রমে খুলিয়া তিনি পড়িতে চেষ্টা করিলেন। খুলিবামাত্র নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার চোখে পড়িল, যথা—

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমো সঙ্কর্ষণায় চ।
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্র মূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনো পুমান্॥

নারদ নিজে এই মন্ত্রটী দ্বারা দীক্ষিত হন, এবং ব্যাসকেও দীক্ষিত করেন। তপস্যা দ্বারা এই মন্ত্রের সাধনা করার পরে, ব্যাস সম্পূর্ণ ভাবে 'পূর্ণ' পুরুষের এবং মায়া দেবীর 'দর্শন' লাভ (অর্থাৎ ব্রহ্মের এবং মায়ার স্বরূপ অনুভব), করিয়াছিলেন। এই অনুভূতি লাভের পরে, শ্রীমদ্ভাগবত রচনার জন্য ব্যাসের সামর্থ্য জন্মায়।

শ্লোকটী পাঠের পরে লোকটী টীকা হইতে এই শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং তখন যে অল্প পরিমাণে অর্থবোধ হইল, তাহাতেই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন। তখন তাঁহার চিত্তে আধ্যাত্মিক তত্ত্ববোধের শক্তি অতি অল্প মাত্রায়ই ছিল।

জীবনের ধ্রুবতারা

ঐ শ্লোকটীই তাঁহার কাছে এতাবৎকাল জীবনের ধ্রুবতারা তুল্য হইয়া আছে। এই দীক্ষার প্রবর্ত্তী ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ লোকটী নানা-বিধ কষ্টভোগ করিয়াছেন। এই সকল দুর্দ্দিনেও তিনি যে অবিদ্যার অতলস্পর্শ জলে ডুবিয়া যান নাই, তাহা বোধ হয় যে, এই শ্লোকেরই

রক্ষণশক্তিরই ফল। শ্লোকে বর্ণিত 'মন্ত্রমূর্ত্তি যজ্ঞ-পুরুষই' তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিপন্ন করিতেছেন এবং তিনি তাঁহার রক্ষাও করিতেছেন।

দীক্ষার পক্ষে দশ বৎসরব্যাপী নির্য্যাতন

[বয়স ৪৪—৫৩]

(ক) ঘোর নির্য্যাতন ভোগে 'অধিকার'

মতি সাধনমার্গে গমন করিল এবং দীক্ষাও হইল। এই উভয় বস্তু সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠারই পরিচায়ক। সাধনার সহিত দীক্ষার সংযোগ প্রভাবে 'ঘোর নির্য্যাতন' ভোগ করিতে তাঁহার 'অধিকার' (অর্থাৎ যোগ্যতা) জন্মিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। [২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

(খ) দশ বৎসর ব্যাপী বিপদ ও সাধনা

জন্মাবধি লোকটীর চিত্তে সত্ত্বগুণ অপেক্ষা রজোগুণই প্রবল ছিল (১৯৯ পৃষ্ঠা)। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৭-১৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, লোকটীর ৪৪ বৎসর বয়সের সময় চিত্তে রজোগুণের সেই আধিপত্য বিনষ্ট হয় এবং তখন সত্ত্বগুণ প্রবল হওয়াতে সাধনায় আন্তরিকতা এবং দীক্ষার যোগ্যতা জন্মায়। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, লোকটীর এই উন্নতিকে স্থায়ী করার জন্য অপর কি প্রয়োজন ছিল ?

রজোগুণের আধিপত্য নষ্ট হইলেও, "আত্মাভিমান' অর্থাৎ 'আমি বড়' এই ভাবের আকারে, রজোগুণ তখনও তাঁহার চিত্তে সাতিশয় প্রবল ছিল। রজো এবং তমোগুণের সংমিশ্রণ হইতে জাত ধনকাঙ্ক্ষা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ভাব সকলও কিছু কিছু ছিল। অর্থাৎ তখনও তাঁহার চিত্তে রজো এবং তমোগুণের বহু-বিস্তৃত অধিকারই ছিল।

যতদিন এই দুই গুণের দমন না হয়,ততদিন তাঁহার চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল না, অর্থাৎ তখনও রজোগুণের যে প্রবল শক্তি ছিল,তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিলে সেই শক্তি দ্বারা পুনরায় সত্ত্বগুণ অভিভূত হইয়া লোকটীর অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

'আবরক' শক্তির আধিক্য হইতেই রজোগুণের উৎপত্তি হয়।

সুতরাং ঐ শক্তিকে খর্ব্ব করিতে না পারিলে রজোগুণের শক্তিকে হ্রাস করার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব কি উপায়ে 'আবরক' শক্তিকে খর্ব্ব (অর্থাৎ কিরূপে সাত্ত্বিক 'প্রকাশ' শক্তিকে পুষ্ট) করিতে পারা যায়, তাহাই ছিল এখন লোকটীর জীবনের অবশিষ্ট সমস্যা।

'প্রকাশ' শক্তি সত্ত্বগুণেরই অঙ্গ, সুতরাং মতিকে আরও সুদৃঢ় ভাবে ভগবন্মুখী করিয়া কিসে তথায় নিবদ্ধ রাখা যায়, তাহাই ছিল এখন অবশিষ্ট কার্য্য।

(গ) বিপদের সহিত সাধনার সংযোগ

সত্ত্বগুণের পুষ্টি সাধনের জন্য—

(১) লোকটীর জীবনে যেমন একদিকে চলিল ঘোর বিপদ ;

(২) তেমনি, অপরদিকে, অর্থাৎ সেই বিপদের সঙ্গে সঙ্গে, চলিল সুদৃঢ় আন্তরিকতার সহিত গীতা এবং বাইবেল এই দুই শাস্ত্রকে অধ্যয়ন,—অর্থাৎ বিপদ এবং 'স্বাধ্যায়' নামক সাধনা যুগপৎ চলিল।

'কে হারে জিনে,—উভয়ে সমান'

ঐ দশ বৎসর যাবৎ সত্ত্ব এবং রজোগুণের মধ্যে সংঘর্ষণ উপলক্ষে লোকটীর যে সকল যন্ত্রণা হইয়াছিল তাহা দেখিয়াছি ; ঐ সুদীর্ঘ দুর্দ্দিনের ঘটনা সকল স্মরণ করিলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

(ক) শারীরিক যাতনা

লোকটীর শরীর ছিল তখন প্রবল শ্বাসরোগে কাতর। ঐ রুগ্নদেহ লইয়া, ১৯ বৎসর যাবৎ বিনা ছুটিতে চাকরি করাতে, তাঁহার দেহের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। বিশ্রামের আশায় তিনি ১৫ মাস ছুটী লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভূতগ্রস্ত মানবের ন্যায় ঐ ছুটীর সময়েও রাজসিক ভাবের প্রেরণায় উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিয়া তিনি বিপদের নাগপাশে আবদ্ধ হন। ছুটিতে তিনি বিশ্রাম পান নাই, মরণের যাতনা ভোগই করিয়াছিলেন।

ছুটী শেষ হওয়ার পরে উদরান্ন সংস্থানের জন্য লোকটীর আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইল। লীলাময়ের চক্রে তাঁহার বিপুল ধন

বিনষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং আবার চাকরি না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না।

আহা! সেই রোগাক্লিষ্ট দেহের উপর কি প্রচণ্ড আঘাতই না চলেছে!! তিনি যখন শ্বাসরোগে ধুঁকছেন,তখন কার্য্য করিতে হইয়াছে ভিজে ঘরে,—যেখানে মুক্ত বায়ু নাই বলিলেও চলে। এইরূপ জায়গায় 'ঠায় বসিয়া' বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা (কোনদিন ৮টা) পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হইয়াছে। বেলা দশটার সময় দুটো ভাত মুখে দিয়ে বেরুতেন—আর সন্ধ্যা ৮টার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতে পারিতেন না।

একদিন এক জালিয়াতের সঙ্গে প্রাতে ৮টা থেকে তার পরদিন প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত ঘুরিতে হইয়াছে। এই ২৫ ঘণ্টা তাঁহার আহার বা নিদ্রা কিছুই ছিল না। 'সালতি' চড়িয়া জয়নগরের খাল দিয়ে আসার সময় তিনি বাধ্য হইয়া সারা-রাত সেই জালিয়াতের বন্ধনরজ্জু ধরিয়া পাহারা দিয়াছিলেন। এই কার্য্য করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না, কারণ পাহারায় নিযুক্ত চাপরাশিরা সারাদিন পরিশ্রম করার পরে স্ব স্ব কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। দেহ সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়াতে, তাহারা আপন আপন চাকরিকে গ্রাহ্য না করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

লোকটী নিজেও তখন শ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদির অন্ন ত বজায় রাখিতে হইবে, অতএব তাহাদের মুখ স্মরণ করিয়া 'হাকিম' নিজেই প্রহরীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন,এবং সারারাত জালিয়াতের দড়ি ধরিয়া নৌকায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় আসামী পালাইলে পাছে তাঁহার নিজের চাকরিখানিও যায়, এই ভয়েই তিনি ঐ কার্য্য করিলেন। যিনি এক বৎসর পূর্ব্বে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন তাঁহারও এই দুরবস্থা!!

(খ) আরও বেশী দৈহিক যাতনা

এই একদিনের শাস্তি ভোগ করিয়াই তিনি যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। এই ঘটনার দুইদিন পরে একাদশীর অর্দ্ধাশন অবস্থায়

চৈত্র মাসের 'কাঠ ফাটা' রৌদ্রে লোকটী সেই জালিয়াতের পিছু পিছু ২০ মাইল পথ হাঁটিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐ দিনে তাঁহার দুর্দ্দশার একটু পরিচয় দিই। বেলা ১২টার সময় জালিয়াতের পিছু পিছু হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া তাহাকে লইয়া যখন রাত্রি ১০টার সময় ফিরিলেন, সেই ১৬ বছরকার পুরাতন কথা যেন কল্যকার ঘটনা বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার শ্রান্ত দেহ তখন প্রায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তিনি শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধাতুর অবস্থায় জালিয়াতটীকে সঙ্গে লইয়া কেওড়াপুখুর গ্রামে ফিরিলেন, তখন আর তাঁহার দেহে চলৎ শক্তি অবশিষ্ট ছিল না,—কাছারির পোষাকেই মাঠে ঘাষের উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার পত্নী সঙ্গে দুটো কমলা-লেবু দিয়াছিলেন, ঐ লেবু দুইটী দ্বারা তৃষ্ণার কিঞ্চিৎ উপশম হইল বটে, কিন্তু ক্ষুধা রহিল—কারণ সেদিন ছিল একাদশীর অর্দ্ধাশন। ঐ অবস্থায় ২০ মাইল পথ চলার পরে ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল হওয়ারই কথা। তখন একটী চাপরাসী সহানুভূতি বশতঃ তাঁহার হাত পা গুলো মর্দ্দন করাতে তাঁহার অসাড় দেহ পুনরায় কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। জালিয়াতটীকে জেলখানায় রাখিয়া তিনি বাড়ী ফিরিলেন রাত্রি ২৷৷০টার সময়। তিনি বাহির হইয়াছিলেন প্রাতে ৯টায়। সেদিন ১৭৷৷০ ঘণ্টা 'চাকরি' চলিল।

(গ) দৈহিক যাতনার সঙ্গে মর্য্যাদার হানি

তার পরদিন, Dalhousie square এর মত প্রকাশ্য যায়গায়, ঐ জালিয়াতের পিছু পিছু বেলা তিনটার সময় একজন সাধারণ পাহারাওয়ালার মত তাঁহার পদব্রজে চলিতে হইয়াছে। নিয়ম মত কার্য্য করিতে হইলে ইহা না করিয়া গত্যন্তর ছিল না।

উপরোক্ত আঘাত উপলক্ষে তত্ত্বকথা

পূর্ব্বে ২২০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, আবরক শক্তির খর্ব্বতা এবং প্রকাশ শক্তির পুষ্টি সম্পাদন কার্য্যই ছিল এই লোকটার জীবনের অবশিষ্ট সমস্যা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লোকটীকে এই সকল যাতনা দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল তাহাই দেখা যাক্।

(ক) 'পূর্ণ' আঘাতের জন্য সহন-শক্তি উৎপাদন

রোগ প্রভৃতি দ্বারা অনেকের দেহ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু দেহের বিনাশ দ্বারাই যে জীবনের পরাকাষ্ঠা লব্ধ হয়, তাহা নয়। জীব তখন কেবল এক দেহ ত্যাগ করিয়া অপর দেহ গ্রহণ করে; কিন্তু সংস্কার সকল বজায় থাকে। কেহ কেহ বা তিলে তিলে মৃত্যুযাতনা ভোগের পর দেহত্যাগ করে। তখনও যদি তাহার মনে দেহের উপর মমত্ব ভাব অক্ষুণ্ন থাকে, তাহলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ দ্বারাই যে ঐ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিল, তাহাও নহে। সংস্কার সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

নিজের দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অপর যে সকল বস্তুর উপর (অর্থাৎ বিত্ত, সন্তান প্রভৃতি যে সকল বস্তুর উপর) লোকে মমত্ব ভাব স্থাপন করে, যদি ঐ সকল বস্তুকে একই সময়ে বিনাশ করার উদ্যোগ হয় এবং ঐ উদ্যোগ দেখিয়াও যদি কোন বিপন্ন ব্যক্তির চিত্তে ব্যাকুলতা না জন্মায়, তখনই প্রকাশ পায় যে সেই ব্যক্তির চিত্তে রজোগুণের হ্রাস হইয়াছে। এইরূপ প্রচণ্ড এবং সর্ব্বব্যাপী আঘাত সহ্য করার শক্তি উৎপাদনের জন্য পূর্ব্ব হইতে অন্তরে সত্ত্বগুণের পুষ্টি এবং রজোগুণের হ্রাস করা আবশ্যক হয়।

যে লোকটীর বিষয় বর্ণিত হইতেছে তাঁহার দেহ এবং অপত্যাদি সকল বস্তুকে একই সময়ে বিনাশের উদ্যোগ করিয়া যাহাতে ঐ প্রচণ্ড আঘাত দ্বারা তাঁহার মতি সুদৃঢ় ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে নিবদ্ধ হয়, বোধ সেই ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ বজ্র নিক্ষেপের পূর্ব্বে সেই আঘাত সহ্য করার শক্তি হওয়া ত চাই, নতুবা আঘাত দ্বারা লোকটী মরিয়া যাইতেন,এবং তাহাতে লোকটীর কোন উপকারই হইত না। তাই পাঁচ বৎসর কাল অপর যাতনা দ্বারা ভগবান সেই পূর্ণ আঘাতকে সহ্য করার শক্তি উৎপাদন করিলেন।

(খ) আঘাতের 'রকম-ফের' দ্বারা সহন-শক্তি উৎপাদন

(১) মানবের দেহখানিই 'অহং' ভাবের (অর্থাৎ অবিদ্যার) কেন্দ্র।

অতএব এই দশ বৎসর ব্যাপী নির্য্যাতন যজ্ঞ আরম্ভ হওয়ার পরে প্রথম বৎসরটা দেহের উপরই ঘোর নির্য্যাতন চলিল। Job এরও নানাবিধ দৈহিক নির্য্যাতন হইয়াছিল

(২) পরবর্ত্তী তিন বছর (অর্থাৎ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বৎসর) 'মমত্ব' ভাবের উপরই আঘাত চলিল। এই সময় শ্বাস রোগটার উপশম হইয়াছিল। এই সময়ে পুনঃ পুনঃ বিত্তহরণ (অর্থাৎ কিছু কিছু ধন দানের পরে তাহা হরণ), প্রতিষ্ঠায় আঘাত, সন্তানাদির রোগ এবং সাংসারিক যে সকল বস্তুকে 'মমত্ব' ভাব আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই বস্তুর অনেক গুলিতেই বিঘ্ন জন্মিয়াছিল। Crematoriumএ শবকে দাহ করার সময়, যেমন নানা দিক হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইয়া মৃত-দেহকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ নানাদিক হইতে বিপদের অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া এই তিন বছর লোকটীকে দগ্ধ করিয়াছে

(৩) পঞ্চম বৎসরে শ্বাস রোগ সিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় দেহের নির্য্যাতন করিতে লাগিল। রোগের সঙ্গে বিপুল বৈভবও আসিল। রাজারাজড়ারা সোনার খাটে শুইয়া যেমন মৃত্যুযাতনা ভোগ করেন, লোকটীর সেইরূপ দশাই হইল।

(গ) মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতির পাঁচ বৎসর

বোধ হয় যে, এই পাঁচ বৎসরের নানাবিধ যাতনা দ্বারা লোকটীর চিত্তে সত্ত্বের পুষ্টি এবং রজোগুণের হ্রাস হওয়াতে সহন শক্তি পুষ্টি-লাভ করিয়াছিল। তখন বিপদ যে অষ্টবজ্রের রূপ ধরিয়া আসিয়া-ছিলেন তাহার পরিচয় পরে দেওয়া হইতেছে। শেষের এই পাঁচ বৎসরে বিপদ এবং সম্পদ, এই উভয় বস্তুরই পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। ধন যখন আসিয়াছে তখন জোয়ারের জলের মত বিপুলভাবেই আসিয়াছে। প্রতিষ্ঠাও শ্রেষ্ঠরূপ ধারণ করিয়া এবং অযাচিত ভাবে আসিয়াছে। ভাল এবং মন্দ সকল বস্তুতেই এই 'পূর্ণ' ভাবের রূপ দেখিয়া মনে হয় যে, এই পাঁচ বৎসর বিপদভোগ-রূপ মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতিরই সময়।

সবংশে নিপাতের উদ্যোগ

[বয়স ৫০]

বোধ হয় যে, ছয় বৎসর যাবৎ [বয়স ৪৪-৪৯] পূর্ব্ববর্ণিত যাতনা-ভোগের দ্বারা লোকটীর মনে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতেছিল। সত্ত্বের ক্রিয়াশক্তির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে রজোগুণের ক্রিয়াশক্তিও তীব্র হইয়াছিল (১৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অতএব ঐ গুণদ্বয়ের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষণ দ্বারা লোকটীকে সবংশে বিনাশ করার উদ্যোগ সৃষ্ট হইয়াছিল।

তখন লোকটী (ক) নিজে রোগে মরণাপন্ন হইলেন। (খ) তাঁহার একটী কন্যা অভাবনীয় রূপে মারা গেল, (গ) আর একটী কন্যা টাইফএড রোগে 'যায় যায়' অবস্থায় উপনীত হইল,(ঘ) ছেলে দুইটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠটীর মনে এই shock লাগিয়া তাহার অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইল। (ঙ) কনিষ্ঠ পুত্রটীর বয়স তখন ১৩ বৎসর মাত্র, সে এই shock এর ফলে যেন নির্জ্জীব জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মোটের উপর, অবস্থা এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল যে, হয়ত সংসারে লোকটীর কোন চিহ্নই থাকিবে না, তাহারই উপক্রম হইয়াছে, ইহাই বোধ হইল।

এই বিপৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে লোকটীর বিপুল সম্পদও বিনষ্ট হইল

(ক) দৈবশক্তি দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা

এত বিপদেও লোকটী যে বিশেষ কাতর হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। বিপদ আরম্ভের ১৪ দিন পূর্ব্বে ৺পুরীধামে শ্রীমন্দিরে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে তিনি যে অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, বিপদের সময় সেই জ্যোতির্ম্ময় রূপের স্মৃতি লোকটীর চিত্তে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় রাখিয়াছিল।

বিশেষ কাতর না হইলেও, এক এক সময়ে তাঁহার মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিত। বর্ত্তমান দুরবস্থা ছাড়িয়া তিনি যখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতেন তখন দেখিতেন কেবল অমানিশার তুল্য নিবিড়

অন্ধকার, তাহাতে প্রগাঢ় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, এবং ঐ আকাশে অশনি সম্পাতের লক্ষণ। এমন অবস্থায় পড়িয়া কাহারও চিত্ত চঞ্চল হওয়া বিচিত্র নয়।

(খ) শ্রীমদ্ভাবতের আগমনের পূর্ব্ব-সূচনা

এই রূপ চিত্তচাঞ্চল্যের সময়ে গীতা এবং বাইবেল হইতে শান্তি না পাইয়া,শান্তি লাভের আশায় লোকটী ৩।৪ মাস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তখন ভাগবতের শব্দের সুস্পষ্ট অর্থবোধ করিতে পারেন নাই,অনুবাদের সাহায্যে যে অত্যল্প পরিমাণে ভাববোধ হইল তাইতেই তাঁহার যাতনার লাঘব হইল। বোধ হয় যে, ছয় বৎসর পূর্ব্বে নারদ দ্বারা দীক্ষার প্রভাবেই, এখন তাঁহার মতি ভাগবতের দিকে গিয়াছিল কিন্তু প্রগাঢ়ভাবে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। সেইজন্যই বিপদ কম হইলে পাঠও বন্ধ হইল এবং মতি আবার বিষয় কর্ম্মেই নিবদ্ধ হইল। বোধ হয় যে চিত্তের যে পরিমাণ শুদ্ধি হইলে লোকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে যথার্থ যোগ্যতা লাভ করে, লোকটীর সেই পরিমান চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। ভাষান্তর ব্যবহার করিয়া বলা যায় যে, লোকটী তখনও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে 'অধিকারী' হন নাই।

পুনরায় মস্তকে সম্মানের উষ্ণীষ স্থাপন

[বয়স—৫১]

লোকটীর মস্তক হইতে সাত বৎসর পূর্ব্বে যে সম্মানের উষ্ণীষ অপসারিত হইয়াছিল, সেই উষ্ণীষ পুনরায় তাঁহার মস্তকে স্থাপিত হইল। তিনি এইজন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। লেখক অনুমান করেন যে, যে সত্ত্বগুণ রজোগুণের বৈরী ভাবে কার্য্য করিয়া ৭ বৎসর পূর্ব্বে লোকটীর সম্মান হরণ করিয়াছিলেন, সেই সত্ত্বগুণই এখন মিত্রভাবে কার্য্য করিয়া সেই সম্মান পুনরায় প্রদান করিলেন (২০৭-০৮ পৃষ্ঠা)। রজোগুণ এখন ক্ষীণবল হইয়াছিল, অতএব উহা সত্ত্বের এই কার্য্যে প্রতিবন্ধক উৎপাদন করিতে পারিল না।

সম্মানের জন্য তাঁহার মনে তখন কোন আকাঙ্ক্ষাই হয় নাই এবং উহা লাভ করিয়াও যে তাঁহার মন গরম হয় নাই, এই অবস্থাদ্বয় হইতেই প্রকাশ হয় যে, এই সময়ে রজোগুণের হ্রাস হইয়াছিল। সত্ত্বগুণের পুষ্টি দ্বারাই রজোগুণের হ্রাস হয়; অতএব তখন সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইয়াছিল এই অনুমান সুসঙ্গত।

রজোগুণের হ্রাস হইয়াছিল এই কথা পড়িয়া কেহ যেন না ভাবেন যে, রাজসিক সংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়াছিল। লোকটীর চিত্তে তখনও বহু রাজসিক সংস্কার ছিল; কিন্তু হয়ত তাহারা অনেকে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, অতএব বেশী রাজসিক সংস্কার জাগরিত অবস্থায় না থাকাতে, ঐ সময়ে তাঁহার মন গরম হয় নাই—ইহাই হইল লেখকের অনুমান মাত্র।

পুনরায় সবংশে নিপাতের উদ্যোগ

[বয়স—৫১]

ঐ সুপ্ত রাজসিক সংস্কারকে প্রবোধিত করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট না করিলে চিত্তশুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব যে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছিল তাহারই প্রবল ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে রজোগুণেও বলসঞ্চার হইল (১৬৭-৭০ পৃষ্ঠা)। ঐ বল দ্বারা সুপ্ত রাজসিক সংস্কার সকল প্রবোধিত হইয়া পুনরায় তাহাদের সহিত সাত্ত্বিক সংস্কারের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণ আরম্ভ হইল। বিপদের এই ভীষণ মূর্ত্তি হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সংঘর্ষণ সময়ে দ্বিতীয়বার লোকটীকে সবংশে নিপাতের উদ্যোগ হইল। প্রায় ৮ মাস এই অবস্থায় থাকার পরে ঐ বিপদের উপশম হইল। পূর্ব্বে যখন ঐরূপ বিপদ হয় তাহা ৭ মাস চলিয়াছিল।

Hunger and thirst after righteousness

অর্থাৎ 'স্বাধ্যায়' কার্য্যে প্রবৃত্তি [বয়স—৫৩]

দ্বিতীয় দফা নিপাতের উদ্যোগের এক বৎসর পরে অকস্মাৎ লোকটীর মনে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত বাইবেলের সমন্বয় করিয়া

অধ্যয়নের প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইল। ঐ প্রবৃত্তির বশে তিনি এক বৎসর যাবৎ প্রতিদিন এই 'স্বাধ্যায়' কার্য্যে ৮।১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়াছেন। পাঠের পর রাত্রিতে কোনদিন ১২টায় কোনদিন বা ১টায় শয়ন করিতেন। বই ছাপান উপলক্ষে প্রায় মাসাবধি কাল রাত্রিতে ছাপাখানায় 'হাজিরা' দিতে হইয়াছিল। তিনি তখন ক্ষুধা তৃষ্ণাকে গ্রাহ্য করেন নাই।

কাছারির কার্য্য শেষ করিয়া বৈকালে বাড়ী না ফিরিয়া ৬।৭ মাইল দূরের ছাপাখানায় যেতেন। সেখানে প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া (১০।১১ ঘণ্টা অনাহার অবস্থায় থাকার পরে) ডিসেম্বর মাসের শীতে রাত্রি ১০টা কোন দিন বা ১১টার সময় ছাপাখানা হইতে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ৬।৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। এই রকম অবস্থা প্রায় এক মাস চলিয়াছিল। ঐ দিন গুলির কথা ভাবিলেও মনে এখন আনন্দ হয়।

(ক) ধনলাভের আশার প্রেরণা ছিল না

লোকে কখন কখন পুস্তক বিক্রয় করিয়া ধনলাভের জন্য এইরূপ পরিশ্রম করে। এই লোকটী তখন যে পুস্তকখানি ছাপাইতেছিলেন তাহা, বিনামূল্যে এবং হাত হইতে ডাকমাশুলও দিয়া, বিতরণের জন্য মুদ্রিত হইতেছিল। ধনলাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তত্ত্বকথা প্রচার করিয়া লোকের তৃপ্তিসাধন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, তথাপি এই সকল বিঘ্ন হইয়াছিল।

নূতন বিপদের জন্য পথ প্রস্তুত করণ

[বয়স—৫৪]

এই এক বৎসর তিনি যে 'স্বাধ্যায়' কার্য্য করিয়াছিলেন, বোধ হয় যে, তাহা দ্বারা সত্ত্বগুণের আরও বেশী পুষ্টি হইয়াছিল, এবং তাইতেই বোধ হয় তাঁহার মনে সত্ত্ব এবং রজো উভয় গুণেরই ক্রিয়াশক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।

ঐ ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে অলক্ষিতভাবে দুইটি শুভ কার্য্য চলিতেছিল যথা—

(ক) যাহাতে সুপ্ত রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সকল প্রবোধিত হইয়া, তাহাদের সংশোধন হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছিল ;

(খ) এবং উপরোক্তভাবে সংশোধনে সহায়তা করার জন্য, তাঁহার মতি যাহাতে একনিষ্ঠ ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যয়নে নিরত হয়, এবং ক্রমশঃ যাহাতে ঐ শাস্ত্রের শক্তি তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে, তাহারও সুযোগ সৃষ্ট হইতেছিল

এই দুইটী শুভ কার্য্যের ব্যবস্থার জন্য পুনরায় অতি ভীষণ মূর্ত্তিতে বিপদের প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

লোকটীর চিত্তে তখনও সুপ্ত ভাবে বহু রাজসিক ও তামসিক সংস্কার ছিল। এই কারণেই এক বৎসর এইভাবে সাধনা চলার পরে, কতক তামসিক সংস্কার প্রবল হওয়াতে তাহাদের প্রভাবে পাঠে শৈথিল্য জন্মিল।

এই শৈথিল্য প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই, যাহাতে লোকটীর এই বহির্ম্মুখী মতি 'স্বখাদ সলিলে ডুবে মরে' তাহারও ব্যবস্থা (অর্থাৎ নূতন বিপদের জন্য পথ প্রস্তুত কার্য্য) অলক্ষিত ভাবে হইয়াছিল।

'স্বখাদ সলিলে ডুবে মরার' ব্যবস্থা

লোকটী যখন শ্রীমদ্ভাগবত ও বাইবেলের সমন্বয়ে বিভোর ছিলেন, তখন বহুদিন যাবৎ ধীরে ধীরে এমন কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগ হইয়াছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিলেই ঐ ৩।৪ মাস সময়ের মধ্যে যখন ইচ্ছা তখনই, আপনাকে সর্ব্ববিধ সাংসারিক 'ঝন্‌ঝাটের' বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে হইতে মুক্ত করিতে পারিতেন।

এই সুযোগ ৩।৪ মাস নিজের আয়ত্তে থাকিলেও, তিনি আপনাকে আবদ্ধ অবস্থাতেই রাখিলেন। এই আচরণের কারণ কি? কারণ এই যে, তখনও তাঁহার মনে বিষয়াকাঙ্ক্ষার উপশম হয় নাই। ঐ

আকাঙ্ক্ষার প্রভাবেই তাঁহার অন্তরে, বিষয় কার্য্য উপলক্ষে এমন কতকগুলি মতিভ্রম জন্মিল যে, ঐ বন্ধন-মুক্তির সুযোগকে অবহেলা করিয়া তিনি বিষয় সুখকেই বরণ করিলেন।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, ২।৪ মাস পরে বিষয়াকাঙ্ক্ষা হইতেই এমন বিপদের 'বেড়া আগুন' উৎপন্ন হইল যে, ঐ অগ্নির বেষ্টনী ছয় বৎসরকাল তাঁহাকে আপন বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নে নিরত রাখিল। এবং যাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের শক্তির প্রভাবে বিষয়াকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, অধ্যয়নের সঙ্গে তাহার সুযোগও উৎপন্ন হইয়া প্রবল ভাবে কার্য্য করিতে লাগিল।

রজোগুণের হ্রাসের সময়ও মতি বিভ্রমের রহস্য

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ৪৩ বৎসর বয়সের সময় লোকটীর চিত্তে রজোগুণ উন্মাদ ভাব ধারণ করিয়াছিল বটে (২১০-১১ পৃষ্ঠা) কিন্তু পরবর্ত্তী ১১।১২ বৎসর বরাবরই ত সত্ত্বের পুষ্টি এবং রজো ও তমোগুণের হ্রাসই চলিতেছিল তবুও বিষয়াকাঙ্ক্ষা কিরূপে তাঁহার মতিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে বিমুক্ত হইতে দিল না, বরঞ্চ পুনরায় নূতন বিপজ্জালে আবদ্ধ করিল ?

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৭ হইতে ১৭৪ পৃষ্ঠায় যে নিয়মটীর কার্য্যের আলোচনা করিয়াছি, সেই নিয়মটী হইতে এই প্রশ্নের উত্তরও লব্ধ হয়। আকাঙ্ক্ষা বস্তুটী 'সংস্কার' হইতে পৃথক নয়। লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, যেমন অপর অপর শুভ এবং অশুভ সংস্কারের বলের বৃদ্ধি হয়, সেই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার বলেরও বৃদ্ধি হয়। রজোগুণের ক্রিয়াশক্তির বল বৃদ্ধি হওয়াতে আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়াপটুতাও বেশী হয়, এবং তাহা হইতেই পুনঃ পুনঃ মতিভ্রম জন্মিয়া লোকে বিপন্ন হয়। অর্থাৎ লোকের অধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিপদের উপাদানও বাড়িতে থাকে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্বন্ধেও মতিভ্রম

ভক্তপ্রবর King David রাজসিক আত্মগরিমার মোহে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, My rock shall stand fast। পরে বিপদের পর বিপদ উপস্থিত হওয়াতে সেই মোহ দূর হইয়াছিল।

'নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মণ্ ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ'

এই বাক্য দ্বারা কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতিকে তাচ্ছিল্য করার পরে

'অহং চৈবার্জ্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ'

এই দর্পের কথাগুলি বলিয়া অর্জ্জুন যখন আপন বীর্য্য এবং গাণ্ডীব ধনুর গর্ব্ব করিয়াছিলেন, তখন রজোগুণই আত্মগর্ব্বের রূপ ধারণ করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ-সখারও মতিবিভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। গোবৎস-হরণ উপলক্ষ্যে ব্রহ্মার মতিবিভ্রম এবং গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা উপলক্ষ্যে ইন্দ্রের মতিবিভ্রমের কথা পাঠকের নিকট সুবিদিত।

শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্যে বাস করাতে অর্জ্জুনের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল,এবং স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখ হইতে গীতা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন 'নষ্টমোহ', অর্থাৎ মায়াতীত, অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপিও অবিদ্যা পুনরায় স্বীয় প্রভাব দ্বারা অর্জ্জুনের বিশুদ্ধ জ্ঞানকেও নিরুদ্ধ করিয়া মতিবিভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। এই মহাত্মাগণের সহিত তুলনায় আমরা কোন ছার!

অতএব একবার বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, অবিদ্যা পুনরায় তাঁহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবে না (১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা)।

ভগবান তাঁহার দর্পচূর্ণ করার পরে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া অর্জ্জুন পুনরায় দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বিপদ দ্বারা আপন আপন দর্পচূর্ণ হওয়ার পরে King David এবং ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, ইঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন,সেই জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের মন হইতে যখন অবিদ্যাসৃষ্ট আত্মা-

ভিমানের মোহ দূর হইল তখন তাঁহারা নিজে কত দুর্ব্বল এবং কি ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। বিবেক, অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তি, সত্ত্বগুণেরই ফল। সত্ত্বগুণ অভিভূত হইলে বিবেক শক্তিও অভিভূত হওয়াতে মতিভ্রম জন্মায় (৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা) অল্প-বিস্তর আধ্যাত্মিক উন্নতির পরেও অবিদ্যার অনেক সংস্কার আমাদের চিত্তে অবস্থান করে, এবং তখন মন ও বুদ্ধি ঐ সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং উন্নতির পথে যাওয়ার পরেও আবার মতি-বিভ্রম এবং তারপর বিপদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। পুনঃ পুনঃ মতিবিভ্রম হওয়াতে বার বার বিপদ, এবং বিপদের তাড়নার প্রভাবে সাধনা দ্বারা উন্নতি, পুনরায় অধঃপতন এবং পতনের পরে আবার বিপদ এবং সাধনা দ্বারা অভ্যুত্থান, এই ভাবে জন্ম হইতে জন্মান্তর-ব্যাপী শোধন কার্য্য চলিতে চলিতে, জীবের চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়, তখন জীব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চলোকে গমন করেন।

(ক) একটানা ভাবে উন্নতি সংসারে দেখা যায় না

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৭ হইতে ১৭৪ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের তত্ত্বকথা আলো-চিত হইয়াছে। একটানা ভাবে উন্নতি কল্পনার রাজ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু সংসারে নাই বলিলেও চলে। এখানে উত্থান ও পতন এবং পুনরুত্থান দ্বারাই জীবের উন্নতিসাধন হয়। জড়-জগতের **Evolution** কার্য্যেও এই নিয়ম চলে। ইহাকেই বিজ্ঞান বলেন **action** ও **re-action** নামক পর্য্যায়।

ব্যবসাক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যখন কোন বস্তু খরিদ বিক্রয়ের উপলক্ষে, দরে **boom** (অর্থাৎ প্রবল তেজ) হয়, তখন দর একটানা ভাবে না বাড়িয়া Ziczac ভাবে (অর্থাৎ বক্রগতিতে) বাড়ে। প্রথমে হয়ত অল্প বৃদ্ধি, তারপর বেশী বৃদ্ধি, তারপর কিঞ্চিৎ হ্রাস, তারপর হ্রাস অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি, এই ভাবে পুনঃ পুনঃ উত্থান এবং পতনের

পর্য্যায় দ্বারা মোটের উপর বাড়িয়া দর উচ্চ স্তরে উঠে। যিনি পাকা কারবারী তিনি প্রতিবার উত্থান ও পতনের সময় বেচাকেনা করিয়া বেশ দশ টাকা রোজগার করেন। সাধনকালে মানবের পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হয় বটে, কিন্তু যদি প্রতি পতনদশার পরে তিনি অধিকতর প্রবল ভাবে সাধনা করেন, তাহলে সাধনা দ্বারা তাঁহার চিত্তে নূতন শক্তি সঞ্চিত হয়, ঐ নব শক্তিই শ্রেয়োলাভের উপায় হয়। অতএব বার বার উত্থান ও পতন অহিতকর নয়, ইহা দ্বারা সাধনায় দৃঢ়তা জন্মিয়া ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইতে হইতে মানবের সমুন্নতিই হয়।

(খ) মতিবিভ্রমের হেতুবাদ

যে লোকটীর বিষয় আমরা সমালোচনা করিতেছি তিনি যখন বাইবেলের সহিত সমন্বয় করিয়া একাগ্রভাবে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, সেই একাগ্রতা দ্বারা তাঁহার চিত্তে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইয়াছিল, লেখক ইহাই মনে করেন। কেহ যদি বলেন যে এই অনুমানের কারণ কি? উত্তরে বলি এই যে—

(১) শাস্ত্র সমন্বয় কার্য্যে ব্রতী থাকার সময় লোকটীর মনে যে একাগ্রতা ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই (২৩০ পৃষ্ঠা)।

(২) যখন কেহ একাগ্রভাবে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তখন অধ্যয়নকারীর মতি ক্রমশঃ শাস্ত্রের সহিত তদাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র'। ঐ তদাত্মভাব দ্বারা চিত্তে স্থিত সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়। সত্ত্বগুণের শক্তি প্রবল হওয়ার সময় আমাদের চিত্তে স্থিত রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সকলও প্রবলভাবে কার্য্য করিতে থাকে, এই তত্ত্বকথা ইতিপূর্ব্বে ১৬৭-৭৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। রজোগুণের তামসিক অংশ (অর্থাৎ আবরক শক্তি) যখন এই লোকটীর চিত্তে স্থিত সত্ত্বগুণের প্রকাশ শক্তিকে অভিভূত করিল, তখন বিবেক শক্তিও অভিভূত হওয়াতে মতিবিভ্রম জন্মিয়াছিল। ঐ ভ্রমের বশে তিনি ধন ও প্রতিষ্ঠা কামনার অনুসরণ করিয়া পুনরায় বিপন্ন হইয়াছিলেন।

পিঁপড়ের পাখা উঠে মরণের জন্য

পিঁপড়ের পাখা উঠে তাহাদের মরণের জন্য; রজো এবং তমোগুণের পুষ্টি হয় তাহাদের বিনাশের সুযোগ উৎপাদনের জন্য। সত্ত্বগুণের পুষ্টি হওয়ার সময় রজো এবং তমোগুণের পরিমাণ কম হইলেও তাহদের ক্রিয়াশক্তি প্রবল হইবে (১৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা), এই যে ব্যবস্থাটী আছে, তাহা আমাদের মঙ্গল সাধন করে। চিত্তে রজো বা তমোগুণের ক্রিয়ার বলবৃদ্ধি হওয়াতে আপাততঃ কাহারও অধঃপতন হইলেও, সেই অধঃপতনই চরমে উন্নতির সোপান হয়। রজো ও তমোগুণের ক্রিয়াশক্তির প্রাবল্যই ঐ গুণদ্বয়ের বিনাশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে। কারণ, রাজসিক এবং তামসিক সংস্কার সকল প্রবল হইয়া আপন প্রভাব দ্বারা আমাদের বুদ্ধির বিজ্ঞান শক্তিকে খর্ব্ব করাতে—(ক) মতিবিভ্রম জন্মায়, (খ) মতিবিভ্রম হইতে বিপদ্, (গ) এবং বিপদ হইতে সাধন প্রবৃত্তি জন্মায়। তার পর সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।

পুরাণাদিতে এইরূপ মতিভ্রমের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তপস্যা করার সময়ে রাজসিক সংস্কার প্রবল হইয়া কাহার কাহারও মনে যদি কামের, (অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ-সুখ-লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষার) উদ্রেক করে, তাহলে গুণত্রয়ের দ্বারা এমন কতকগুলি ঘটনার সৃষ্টি হয় যে, কোন অপ্সরা বা অপর নারী আসিয়া প্রলোভিত করাতে ঐ 'অপক্ক' যোগীগণ সাধনমার্গ ত্যাগ করিয়া ভোগমার্গে গমন করেন। রাজসিক সংস্কারের প্রভাবে যে সকল তাপসের মনে ধন অথবা যশ লাভের আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন হয়, তাঁহাদের তপোবিঘ্নের জন্য গুণত্রয় এমন কতকগুলি ঘটনার উৎপাদন করে যে, ধন অথবা যশের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সেই তাপসগণ সাধনমার্গ পরিত্যাগ করেন।

(ক) গুণ দ্বারা প্রলোভনের উপাদান সৃষ্টি

যদি বল যে, গুণত্রয়ের এমন কি উৎপাদক শক্তি থাকিতে পারে

যে,তাহাদের দ্বারা প্রলোভনের উপাদান অর্থাৎ নারী প্রভৃতি বস্তু সৃষ্ট হইবে এবং ঐ সকল বস্তু তাপসগণের নিকট আনীত হইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিবে ? উত্তরে বলি যে, গুণের পরিমাণ কত, এবং কত বিবিধ রকমের শক্তি গুণে আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সংসারের সৃষ্টি রক্ষণ ও বিনাশ এবং অপর যে কিছু ঘটনা হইতেছে তাহা সবই গুণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং গুণত্রয় যে তপস্যার প্রতিকূল ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিয়া তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিবে, ইহা মোটেই বিচিত্র নয়। যে নারী অথবা অপর যে কোন বস্তু বা যে কোন ঘটনা উদ্ভূত হইয়া তাপসকে প্রলোভিত করে তাহা গুণেরই 'বিকার' মাত্র।

বিশ্বামিত্রাদির ন্যায় যাঁহাদের মনে আত্মগর্ব্বের সংস্কার সঞ্চিত থাকে, রজোগুণ দ্বারা সেই সংস্কার প্রবোধিত হওয়ার পরে, আত্ম-গর্ব্বই এমন বীভৎস রূপ ধারণ করে যে ঐ দোষ দ্বারাই সেই তাপসগণের অধঃপতন হয়। আবার নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়ের ন্যায় যাঁহাদের চিত্তে 'কাম' নামের যোগ্য কোন সংস্কারই নাই, তাঁহাদের কোন অনিষ্ট হয় না।

(খ) পাখা উঠিয়া মরণ দ্বারাও পিপীলিকার মঙ্গল হয়

বিপদের (অর্থাৎ পতনের) পরে, পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রবলভাবে সাধনা দ্বারা তাপসগণ পতন দ্বারাও শ্রেয়োলাভ করেন। অবিদ্যার যে প্রাবল্যের চিত্র উপরে অঙ্কিত করা হইল, তাহা পিপীলিকার 'পাখা উঠার' তুল্য। পাখা উঠিলে পিপীলিকা বিনষ্ট হয়, অবিদ্যাও তাপসকে অধিক্ষিপ্ত করিয়া তাঁহার দ্বারা প্রবলভাবে সাধনার জন্য সুযোগ উৎপাদন করে অতএব অবিদ্যার পুষ্টিই তাহার আত্মবিনাশের কারণ হয়।

মতিবিভ্রম দ্বারা হিতসাধন

ভূমিকা

মতিবিভ্রম দ্বারা যে চরমে হিতসাধন হয়, এই কথাটীর আলোচনা অনেকবারই academic ভাবে, অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা, করা হইয়াছে। এক ছটাক বাস্তব ঘটনার মূল্য এক গাদা theoryর মূল্য অপেক্ষা বেশী। ১৯৬ হইতে ২৩২ পৃষ্ঠায়, সংসার ক্ষেত্রে গুণত্রয়ের ক্রিয়া যে কিরূপে চলে, একটী লোকের জীবনের কতকগুলি বাস্তব ঘটনার আলোচনা দ্বারা সেই বিষয়টী দেখান হইয়াছে। ঐ আলোচনায় ২৩২ পৃষ্ঠায়, মতিবিভ্রম হইতে যে 'বেড়া আগুনের' ন্যায় শক্তিসম্পন্ন বিপদ-বহ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাও বলা হইয়াছে। এই বর্ণনা পড়িতে পড়িতে লোকের মনে এই প্রশ্ন উঠে যে,—(১) সেই অগ্নির উপাদান কি পরিমাণে লোকটীর চিত্তে ছিল, (২) এবং কি কারণেই বা তাঁহার জন্য ছয় সাত বৎসর ব্যাপী 'বিপদ' নামক 'কড়া পাহারার' প্রয়োজন হইয়াছিল। বিষয়টী একটু তলিয়ে দেখা যাক।

(ক) সাধনকালে অবিদ্যা প্রবল থাকার লক্ষণ

সাধনকালে, অর্থাৎ ভাবগত ও বাইবেলের সমন্বয় করার সময়ে, লোকটীর আচরণ লক্ষ্য করিয়াছি। তখন তিনি বৈষয়িক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন নাই, রাজসিক ধনাকাঙ্ক্ষা তখন বেশ প্রবল ভাবেই তাঁহার মনের উপর রাজত্ব করিতেছিল। সকল কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া লোটা কম্বল না নিলে যে সাধনা হয় না, লেখক একথা বলিতেছেন না। বরঞ্চ গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়াও যে সুচারুভাবে সাধনা করা যায়, এবিষয়ের কএকটী শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত লেখক দেখিয়াছেন। অতএব এই মন্তব্যে লেখক গার্হস্থ্যাশ্রমের উপর হেয়ত্ব ভাবের আরোপ করিতেছেন না। বলা বাহুল্য যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে নানা বিঘ্ন আছে, যাহার কতক সন্ন্যাসাশ্রমে নাই। এখন আলোচ্য বিষয়টী বিবেচনা করা যাক্।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ১৭ বৎসর বয়স হইতেই প্রতিষ্ঠা কামনার আকার ধরিয়া রজোগুণ উপরোক্ত লোকটীর চিত্তে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল ; ক্রমশঃ ৩২ বছর বয়স হইতে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠাকামনার সঙ্গে রাজসিক ধনাকাঙ্ক্ষার সংযোগ হইল। অর্থাৎ ব্যবসাক্ষেত্রে আত্মশক্তি প্রভাবে ধন অর্জ্জন করিয়া, আমি 'বিরাট কর্ম্মী'—এই আখ্যা লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিব, তাঁহার মনে এই বাসনা প্রবল হইল।

কেহ কেহ প্রবল ধনাকাঙ্ক্ষার বশে জাল জুয়াচুরি শঠতা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন। যদি কেবলমাত্র ধনের প্রতিই ইঁহার আকাঙ্ক্ষা থাকিত,তাহলে রজোগুণের সহিত সংমিশ্রিত যে প্রবল তমোগুণ থাকে, তাহার প্রভাবে ইনিও হয়ত ঐ সকল হেয় উপায় দ্বারা আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করিতেন। ইঁহার রাজসিক ভাবের সহিত বিপুল সত্ত্বগুণের সংযোগ ছিল, তাই ইনি চাহিতেন যে আপন মনস্বিতা প্রভাবে বিপুল ধনার্জ্জন দ্বারা কৃতিত্বের খ্যাতিলাভ করিবেন।

অতএব ১৭ হইতে ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর যাবৎ ইঁহার চিত্তে, প্রবল প্রকাশ ও ক্রিয়াশক্তি সংমিশ্রিত, রজোগুণের রাজত্বই চলিয়াছে। এই সময়ে তাঁহার বিপদের অন্ত ছিল না, নির্য্যাতনের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ ধনক্ষয় অপমান এবং দুইবার সবংশে নিপাতের উদ্যোগও হইয়াছে। এত নির্য্যাতনেও রজোগুণ মরে নাই। সত্ত্বগুণ যত প্রবল হইতেছিল রজোগুণের বলও তত বাড়িয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু শাস্ত্র সমন্বয় কার্য্য আরম্ভ করার পরে এক বৎসরকাল সত্ত্বগুণ রজো অপেক্ষা বলবান থাকাতে স্বাধ্যায় কার্য্য বন্ধ হইতে পারে নাই। স্বাধ্যায় দ্বারা যত সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতে ছিল, রজোগুণের বলও তত বাড়িতেছিল, অর্থাৎ 'পিঁপড়ের পাখা উঠিতেছিল'।

এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরে রজোগুণের প্রতাপের ফলে স্বাধ্যায় কার্য্য বন্ধ হইল। তখন রজোগুণ যে অত্যন্ত প্রবল ছিল লেখকের এই অনুমান দুইটী লক্ষণের উপর স্থাপিত, যথা—

প্রথম লক্ষণ—ধনলাভের আশায় তিনি প্রায় ২৮ বছর পূর্ব্ব হইতে আপনাকে কতকগুলি ঝনঝাটের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ বেষ্টনী ছিল বলিয়াই তাহা দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মতিবিভ্রমের সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে এবং ঐ ঝনঝাট গুলিই তাঁহার যাতনায় অস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ সকল ঝনঝাট যে রাজসিক ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত 'মতিবিভ্রম' নামক শক্তি হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

লোকটী তার পর যখন শাস্ত্র সমন্বয়ে নিরত ছিলেন সেই সময়ে ঐ সকল ঝনঝাট হইতে নিজেকে বিমুক্ত করার সুযোগ উপস্থিত হইল এবং সেই সুযোগ ছয় মাস যাবৎ তাঁহার আয়ত্তেও রহিল, কিন্তু নিজেকে ঐ ঝনঝাট হইতে মুক্ত করা ত দূরের কথা, আরও বেশী পরিমাণে ধনলাভের আকাঙ্ক্ষার মোহের বশে তিনি নিজেকে ঐ প্রকার আরও কতক নূতন ঝনঝাটে আবদ্ধ করিলেন।

এই আচরণ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় যে, তখন তাঁহার মনে রজোগুণ সাতিশয় প্রবল ছিল। যে প্রকাশ শক্তি প্রভাবে লোকে আপনাকে ঝনঝাট হইতে বিমুক্ত করে, সেই প্রকাশ শক্তি রজোগুণের আবরক শক্তি দ্বারা নিরূদ্ধ হইয়াছিল ও আশার মোহ তাঁহার চিত্তকে বিবেক মার্গ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল।

রজোগুণ ছিল ঝনঝাটের বীজ, রাজসিক আকাঙ্ক্ষা ছিল ক্ষেত্র, এবং বিপদের 'বেড়া আগুন' হইয়াছিল ঐ বীজের ফল। অতএব ঝনঝাটেই হইয়াছিল তাঁহার নির্য্যাতনের জন্য সুশাণিত অস্ত্র। যাহাতে উৎপত্তি তাহা হইতেই বিপদের নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইল!

দ্বিতীয় লক্ষণ—যখন বিপদের জালে আবদ্ধ হইলেন তখন তিনি পুনরায় শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত না হইয়া নভেল নাটক পড়িয়া বিপদের যাতনা ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই আচরণ হইতেও অবিদ্যার প্রাবল্যের অপর পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)।

তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিপদ উপলক্ষে কয়েকটী তত্ত্বকথা।

I shall send the showers in their season, I will send showers of blessing.

উপরের কথা কয়টী বাইবেল হইতে উদ্ধৃত হইল ; কথা কয়টীর মর্ম্ম অতি মধুর। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রবল রৌদ্রে জমি পাথরের মত শুষ্ক হওয়ার পরে যদি বর্ষা নামিতে দিন কতক দেরী হয়, তাহলে লোকে ভাবে যে ঐ বুঝি সব পুড়ে গেল, এবার বুঝি কিছুই ফসল হইবে না। তাই দুর্ব্বলচিত্ত মানবকে আশ্বস্ত করার জন্য ভগবান বলিলেন যে, তিনি যথাসময়ে বারি প্রদান করিবেন, এবং তখন যে বারিবর্ষণ হইবে তাহা ছিটে ফোটা ভাবে হইবে না, showers অর্থাৎ অজস্র বারি ধারা পতিত হইয়া কৃষকদিগের হিতসাধন করিবে।

বাইবেলের এই কথা কয়টী নৈরাশ্যের সময় লোকের মনে আশার সঞ্চার করে ; এখন আমরা যে কষ্ট পাইতেছি তাহা চৈত্র মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের ন্যায় হইলেও, কেহ যেন না ভুলেন যে, রৌদ্রের পর বর্ষার আগমন হইয়া পৃথিবী শীতল হয় এবং মানব শস্যসম্পদ লাভ করেন। এই নৈরাশ্যের উত্তাপের পরে আমাদের পক্ষেও যখন শুভ সময় আসিবে (অর্থাৎ অন্তরের যে অবস্থায় ধন ধান্যাদি আকারে আশীষ লব্ধ হইলেও চিত্তবিকার হইবে না, আমাদের সেই আধ্যাত্মিক উন্নতির সময় আসিবে), তখন ভগবান আমাদিগকেও ধন-মানাদির আকারে আশীষ প্রদান করিবেন। ঐ সময়ে ধনসম্পদ প্রদান দ্বারাই যদি আমাদের হিতসাধন সম্ভবপর হয়, তাহলে ভোগরত মানব ভোগসুখের যে সকল উপদানকে 'আশীষ' বলেন, তাহা ছিটে ফোটা

Man must wait for time

ভাবে নয়, শ্রাবণের বারি ধারার ন্যায় অজস্র পরিমাণেই ঐ সকল বস্তু লব্ধ হইবে।

যাহা হিতসাধক হওয়াতে 'আশীষ' পদবাচ্য, তাহা অনেক সময়েই ভোগসুখের উপকরণের রূপ না ধরিয়া, ভোগরত মানব যাহাকে 'বিপদ' বলেন সেই বিপদের রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং প্রকৃত 'আশীষ' ঐ রূপ ধারণ করিরা পুনঃ পুনঃ আগমন করেন। এই অধ্যায়ে আলোচিত ব্যক্তির জীবদ্দশায় যে অজস্র 'বিপদ' হইযাছিল, তাহা প্রকৃত পক্ষে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অজস্র আশীষেরই ধারা।

আশীষ কাহাকে বলে।

আবরক শক্তি প্রভাবে, আমাদের হিতাহিত বিচার করার ক্ষমতা (যে ক্ষমতাকে 'বিবেক' বলে) দূষিত হওয়াতে, আমরা দৈহিক সুখের উপকরণ লাভ হওয়াকে আশীষ লাভ বলি। ঐ সকল উপকরণ দ্বারা যদি প্রকৃতই সুখলাভ হইত, তাহলে ঐ লাভকে আশীষ বলাতে আপত্তি থাকিত না। কিন্তু দেখিতে পাই যে, ঐ প্রকার সুখের উপকরণ পাইয়াও আমাদের (ক) আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না এবং (খ) ভোগকালেও অনাবিল সুখ সঞ্জাত হয় না; (৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা)। অতএব যে বস্তু লাভ হওয়াকে আমরা 'আশীষ' মনে করি তাহা পাইয়াও যখন সুখ হইল না তখন ঐ লাভকে কি আশীষ বলা উচিত? 'বেড়া আগুণের' ন্যায় বিপদ জন্মিয়া সেই বিপদই যদি কাহাকেও অনন্ত সুখ লাভের জন্য সুযোগ প্রদান করে, তাহা হইলে ঐ নিরবচ্ছিন্ন বিপদকেও কি অজস্র আশীষের ধারা বলা উচিত নয়?

(ক) প্রকৃত 'আশীষ' উপলক্ষে বিকৃত ধারণা

আমাদের মনে ধন ধান্যাদি ভোগসুখের উপকরণের প্রতি আশক্তি বড়ই প্রবল, তাই যে ঘটনা দ্বারা ঐ বস্তুর বিনাশ হয়, সেই ঘটনাকে আশীষ বলিয়া স্বীকার করার প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। প্রবৃত্তি হইলেও পুনরায় পূর্ব্ব সংস্কার প্রবল হইয়া মতের

পরিবর্ত্তন করায়। কেবল যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোক বুদ্ধির উপর পতিত হয়, তখন অবিদ্যাসৃষ্ট বিষয়াশক্তি দূর হওয়াতে, লোকে অনুভব করেন যে, চলিত ভাষায় যাহা বিপদ বলিয়া কথিত হয় তাহা সম্পদ লাভের সোপান এবং যাহা সম্পদ বলিয়া সমাদৃত হয় তাহাই বিপদের অগ্রদূত।

অজস্র আশীষের অমৃতধারা প্রদানের জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

বহির্জগতে দেখা যায় যে 'ধূমজ্যোতিসলিল মরুতাম সন্নিপাতঃ', অর্থাৎ বাষ্প, তেজ, বারি এবং বায়ু এই চারি বস্তুর শক্তির স্বাভাবিক কার্য্য প্রভাবে, মেঘ উৎপন্ন হয়। ভগবানের ইচ্ছার প্রেরণায়, তাঁহার বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত আবরক শক্তির সংযোগ হইয়া (ক) প্রথমে গুণ-ত্রয়, এবং (খ) গুণত্রয় হইতে পরে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রভাবে বহির্জগতে কার্য্য করিয়া গুণত্রয়ই কখন বা মার্ত্তণ্ডের প্রবল উত্তাপ, কখন বা শ্রাবণের অমৃতধারা প্রদান করিতেছে। অন্তর্জগতেও, তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যের প্রভাব হইতে সৃষ্ট, ভোগ-বাসনা নামক মোহের শৃঙ্খল দ্বারা মানব সংসারে আবদ্ধ থাকে; মানবকে আবদ্ধ করিলেও ঐ দশা হইতে যাহাতে মানবের মুক্তি হয়, গুণত্রয় তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। আবরক শক্তি, 'চোক বাঁধা বলদের মত' আমাদের চক্ষে ঠুলি পরাইয়া রাখিয়াছে, তাই আমরা অন্তর্ ও বহির্জগতে যে একই শক্তি গুণত্রয় নামে কার্য্য করিতেছে, এই তত্ত্বটী অনুভব করিতে পারি না।

মানবকে অনন্ত সুখভোগের যোগ্যতা প্রদান করার জন্য গুণত্রয়ই মানবের সারা জীবদ্দশায় নানা আকারে 'বিপদ' সৃষ্টি করিয়া করিয়া অবশেষে মানবকে নিরবচ্ছিন্ন বিপদের অমৃতধারায় স্নান করাইয়া তাহার চিত্ত হইতে অবিদ্যার সকল কালিমা দূর করেন।

মানব তখন অনন্ত সুখভোগে অধিকারী হন। এই শোধন কার্য্য গুণত্রয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে সম্পাদিত হয়।

নিরবচ্ছিন্ন বিপদকে কেন আশীষের অমৃতধারা বলা হইল তাহাই এখন বিচার করা যাক্। কেবল abstract যুক্তি দ্বারা তত্ত্বকথা প্রতিপাদন করিলে, ঐ সকল যুক্তি অনেক সময়ে অন্তরের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া পদ্মপত্রের উপর নিক্ষিপ্ত জলের ন্যায় গড়াইয়া যায়। কিন্তু concrete দৃষ্টান্ত দ্বারা যুক্তির পোষণ করিলে, তত্ত্বকথা হৃদয়ঙ্গম হয়। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বাস্তব জীবনে সংঘটিত, যে সকল বিপদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল বিপদ কিরূপে উৎপন্ন হইল, সেই বাস্তব বিষয় উপলক্ষ্যে আলোচনা দ্বারা তত্ত্বগুলিকে সুস্পষ্ঠ করার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

এই প্রসঙ্গের গোড়াতেই বলি এই যে, অত্যধিক পরিমাণে চিত্তবৃত্তির উন্নতি না হইলে কেহ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘোর বিপদ ভোগের জন্য অধিকারী হইতে পারেন না, এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিপদও হয় না।

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘোর বিপদ ভোগের 'অধিকার' লাভ।

(ক) যে সে লোকের এই 'অধিকার' নাই।

'অধিকার' পদের অর্থ যোগ্যতা। যোগ্যতা পদ দ্বারা সহন-শক্তি বুঝায়; একজন যুবার মাথায় আধ মন বোঝা চাপাইলে তিনি বহিতে পারেন, কিন্তু একটী শিশু ঐ বোঝা বহিতে পারে না। তাই আমরা বলি যে বোঝা বহিবার যোগ্যতা শিশুর নাই কিন্তু যুবার আছে। সহন-শক্তি না থাকাতে যে সে লোক তীব্র বিপদ ভোগের যোগ্য হয় না।

যাহারা যোগ্যতা লাভ করে নাই, তাহাদের তীব্র আকারে বিপদ হয় না, বিপদের বদলে অধোগতিই হয়। কেহ হয় ত বলিবেন যে,

'যোগ্যতা' অর্থাৎ সহন-শক্তি কিরূপে আসে? উত্তরে বলি যে, প্রকাশ এবং আবরক এই উভয় শক্তি প্রবলভাবে যুগপৎ ক্রিয়াশীল না হইলে যোগ্যতা জন্মায় না। কারণ, এক শক্তির বেগকে অপর শক্তি সম্বরণ করিতে পারা বা না পারা দ্বারা যোগ্যতা বা অযোগ্যতার অবধারণা হয়। অতএব যুগপৎ ঐ দুই শক্তির প্রবল উদ্দীপন না হইলে যোগ্যতার প্রকাশ হয় না। এবং তখন তীব্র বিপদও হয় না, কারণ, শক্তিদ্বয়ের প্রবল সংঘর্ষণের নামই বিপদ।

(খ) কিরূপ অবস্থায় পাপের ফলে তীব্র বিপদ হয়

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, যাহারা ঘোর পাপ করে তাহাদের তীব্র ভাবে বিপদ হয়। এই কথা আংশিক ভাবে সত্য এবং আংশিক ভাবে ভ্রান্ত। রজঃ বা তমোগুণের অত্যধিক প্রাবল্যের বশে যে সকল দুষ্কার্য্য করা যায়, তাহাদিগকেই আমরা পাপ বলি। আমাদের রজোগুণে সুস্পষ্ট ভাবে 'প্রকাশ' শক্তির সংযোগ থাকে এবং তমোগুণেও কিয়ৎ পরিমাণে সংযোগ থাকে। কোন দুষ্কার্য্য করার সময়ে যখন রজঃ বা তমোগুণের অভ্যন্তরস্থ আবরক শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রবল হয় সেই সময়ে যদি প্রকাশ শক্তিও তদনুযায়ী ভাবে উদ্দীপিত হয়, কেবল তখনই ঐ শক্তিদ্বয়ের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হওয়া সম্ভবপর হওয়াতে তীব্র বিপদ প্রকাশ পায়। অতএব যাহাদের অন্তরে প্রকাশ শক্তি কতকটা প্রবল আছে, কেবল সেই সকল লোকেই তীব্র পাপাচরণ করিলে, দারুণ বিপদ হয়।

পাপীদিগের তীব্র বিপদ হইলেও, তাহা অনেক সময়ে দীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়ী হয় না। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের চিত্তে আবরক শক্তিই বলবান, বিপৎকালে ঐ শক্তি প্রকাশ শক্তিকে অভিভূত করে, এবং ঘোর পাপীর অন্তরে আবরক শক্তির আধিপত্যই বাড়িতে থাকে। আবরক শক্তি যে কেবল সত্ত্বগুণের প্রকাশ শক্তিকেই আচ্ছন্ন করে, তাহাই নয়, ক্রিয়াশক্তিকেও আচ্ছন্ন করে। ক্রিয়াশক্তি

আচ্ছন্ন হওয়াতে বিপদের তীব্রতা আপনিই কমিয়া যায়। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, যে ক্রিয়াশক্তি সত্ত্বগুণের মধ্যে কার্য্য করে তাহাই তমোগুণের মধ্যেও কার্য্য করে। সুতরাং সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তি খর্ব্ব হইলে অপর গুণদ্বয়ের ক্রিয়াপটুতা আপনিই কমিয়া যায়। অতএব তখন বিপদের তীব্রভাব থাকে না।

(গ) ঘোর পাপীদের অধোগতিই হয়, দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র বিপদ হয় না।

চলিত ভাষায় যাহাকে আমরা 'তীব্র বিপদ' (অর্থাৎ প্রকাশ এবং আবরণ শক্তির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষণ) বলি, ঘোর পাপীদিগের সে ভাবের বিপদ হয় না। তাহাদের অন্তরে আবরক শক্তি প্রবল, ঐ শক্তি ক্রিয়াশক্তির নিরোধ করিয়া জড়ত্ব ভাব উৎপাদন করে, অতএব তাহাদের চিত্তে ক্রিয়াশক্তি প্রবল না হওয়াতে গুণের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষণ হয় না।

এই কারণে বলা যাইতে যে, ঘোর পাপীগণ তীব্র বিপদভোগে 'অধিকারী' নহেন। দুস্কার্য্য দ্বারা যাহাদের চিত্তে আবরক শক্তি অধিকতর পুষ্ট হয়, সেই পাপীগণ নিজের তুল্য আবরক শক্তি বিশিষ্ট কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, অর্থাৎ কেহ হেয় মানব, কেহ তির্য্যক, কেহ বা স্থাবর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। (১১২-১৬ পৃষ্ঠা) 'ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু'।

(ঘ) দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র বিপদ।

তবে কাহারা নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ একটানা ভাবে এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী 'ঘোর' বিপদভোগে অধিকারী হন ? গুণের কার্য্য প্রবল ভাবে না চলিলে তীব্র বিপদ হইতে পারে না। এবং যতদিন ঐ কার্য্যে প্রবল ভাব থাকে কেবল ততদিনই তীব্র বিপদ স্থায়ী হয়। প্রকাশ শক্তির সহিত যে ক্রিয়াশক্তির সংযোগ থাকে, সেই ক্রিয়াশক্তি আবরক শক্তির মধ্যেও থাকে, কারণ আবরক শক্তি প্রকাশেরই রূপান্তর, অতএব

প্রকাশ শক্তির বলেই বলীয়াম হইয়া আবরক শক্তি প্রকাশকে অভিভূত করার চেষ্টা করে।

(ঙ) মৃদু একঘেয়ে বিপদ

যখন প্রকাশ শক্তির তীব্রতা অত্যল্পকাল মাত্র বজায় থাকিয়া আবরক শক্তি দ্বারা অভিভূত (অর্থাৎ আচ্ছাদিত) হয়, তখন তীব্র বিপদ অল্পকাল স্থায়ী হইয়া জুড়াইয়া যায়, এবং 'ঘুষঘুষে' পুরাতন জ্বরের ন্যায় মৃদু বিপদের একঘেয়ে ভাব পুনরায় উপস্থিত হয়।

দীর্ঘকাল ব্যাপী তীব্র বিপদ ভোগে অধিকার

যখন কাহারও জীবদ্দশায় ঘোর বিপদ অবিরাম গতিতে বহুদিন যাবৎ চলে, তখন ইহাই প্রকাশ পায় যে, সেই বিপন্ন ব্যক্তির অন্তরে প্রকাশ শক্তি এতই প্রবল হইয়াছে যে আবরক শক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই সেই তেজকে খর্ব্ব করিতে পারিতেছে না। অত্যধিক মাত্রায় আধ্যাত্মিক উন্নতি না হইলে প্রকাশ শক্তি অত প্রবল হয় না, কিম্বা সেই প্রাবল্য অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকে না। আবরক শক্তি প্রকাশের তেজ খর্ব্ব করে বলিয়াই মাস কএক প্রবল থাকায় পরে বিপদ জুড়াইয়া যায়।

(ক) 'অধিকার' লাভ দুঃসাধ্য ব্যাপার

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে যে লোকটীর বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে তিনি ১৭ হইতে ৫৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৩৬ বৎসর, পুনঃ পুনঃ দারুণ বিপদভোগ করার পরে প্রায় ৭ বৎসর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বিপদভোগে অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

৪২ বৎসর বয়সের সময় ঘোর বিপদ উৎপাদন করিয়া সত্ত্বগুণ যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন (২০৭ পৃষ্ঠা; তাহার পরে ১০ বৎসর কাল প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে যেন দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়াছে ; (২২১-৩০ পৃষ্ঠা)। প্রথমে ৪ বৎসর বিপদ প্রবল ভাবে চলার পরে এক বছর বিরাম ছিল এবং পুনরায় ৪ বৎসর অতি ভয়ঙ্কর মুর্ত্তিতে চলায়

পরে (২২৫-২৮ পৃষ্ঠা) আবার এক বৎসর বিপদের বিরাম ছিল। শেষ বিরামের সময়ে যখন লোকটী শাস্ত্র সমন্বয়ে নিরত ছিলেন তখন অলক্ষিত ভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিপদ সৃষ্টির উপকরণ সংগৃহীত হইতেছিল, তারপর শাস্ত্র অধ্যয়ন কার্য্য বন্ধ হইল এবং অকস্মাৎ একদিন আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

Evolution কার্য্য ও বিপদ

সঙ্ক্ষেপতঃ বলি এই যে,

(১) 'পাপের' পুষ্টি হইলে অধঃপতনই হয়। শুভ ঘটনার যোগযোগ হওয়াতে যদি কোন পাপীর অন্তরে সাত্ত্বিক সংস্কার বলবান হইয়া উঠে, তাহলে সত্ত্বগুণ তমোগুণকে আক্রমণ করিয়া তীব্র বিপদ সৃষ্টি করে। পাপীর চিত্তে প্রায়ই আবরক শক্তিই প্রবল থাকে; বিপদ সৃষ্টির পরে সত্ত্বগুণ নিজেই আবরক শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে বিপদের উপশম হয়, এবং তমোগুণ ক্রমশঃ যত পুষ্ট হয়, জীবের ততই অধোগতি হয়।

(২) জীবের লিঙ্গদেহে বহু দূষিত প্রাক্তন সংস্কার সঞ্চিত থাকে; তাহারা আবরক শক্তিকে পুষ্ট করাতে ঐ শক্তি বলবান হইয়া যখন সত্ত্বগুণকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে, তখন বিপদের উপশম হয়; কখনও বা আবরক শক্তি সত্ত্বগুণের বলের হ্রাস করে, তখন তীব্র বিপদ মৃদুভাব ধারণ করে। এই জন্য সত্ত্বগুণ বার বার প্রবল হওয়ার ফলে, কাহার কাহারও পুনঃ পুনঃ তীব্র বিপদ হইলেও অল্পদিন পরে সেই তীব্রতা কমিয়া যায়। আবার তীব্র বিপদ হয়, পুনরায় তাহা নরম পড়ে। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ বিপদের উৎপত্তি এবং উপশম চলিতে চলিতে সত্ত্বগুণে বলাধান হইতে থাকে।

(৩) পুনঃ পুনঃ বিপদ চলিতে চলিতে যখন কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণ এত প্রবল হইয়া উঠে যে, আবরক-বিক্ষেপ শক্তি কিম্বা তাহা দ্বারা সৃষ্ট প্রাক্তন সংস্কার সকল সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিতে পারে না,

তখন তীব্র বিপদের সৃষ্টি হইয়া সেই বিপদ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে। এই অবস্থায় উপনীত হওয়াকে নিরবচ্ছিন্ন বিপদ ভোগে 'অধিকার' লাভ করা বলে।

বিপৎকালে মোহের অদ্ভূত কার্য্য

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে যে লোকটীর বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে তিনি যখন দেখিলেন যে, ঘোর বিপদ যেন 'বেড়া আগুনের' ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার চিত্তে স্থিত আবরক শক্তি অলক্ষিত ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ঐ শক্তি দ্বারা সৃষ্ট মোহের প্রেরণায় তিনি বিচিত্র ভাবে আচরণ করিলেন :—

(ক) আবরক শক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি করাতে, তিনি শাস্ত্র সমন্বয় কার্য্য বন্ধ করিয়াছিলেন।

(খ) আবরক শক্তি, অর্থাৎ রজোগুণ, দ্বারা সৃষ্ট ধনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার বিবেককে আচ্ছন্ন করিয়া এমন মতিবিভ্রম উৎপাদন করিল যে, ঐ ভ্রমের বশে তিনি আপনাকে আবার কতক নূতন ঝঞ্ঝাটের জালে আবদ্ধ করিলেন।

(গ) এখন মোহের তৃতীয় কার্য্যের পরিচয় দিই—তিনি আপনাকে যে সকল ঝঞ্ঝাটে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা হইতে উৎপন্ন বিপদ যখন সংহারক মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি নভেল পাঠ দ্বারা বিপদের যাতনা ভুলিতে চেষ্টা করিলেন (২৪০ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ প্রকাশ শক্তি প্রবল হইয়া যে যাতনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তিনি নভেল হইতে লভ্য আবরক শক্তি দ্বারা সেই যাতনার উপশমের জন্য চেষ্টা করিলেন।

তাঁহার চিত্ত যদি তমোপ্রধান হইত, তাহলে নভেল পাঠ দ্বারা যাতনার উপশম হইতে পারিত, (২৫২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু অন্তরে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য থাকাতে বিপরীত ফল হইল। তাঁহার মতি নভেলের

সহিত একাগ্রভাবযুক্ত হওয়া ত দূরের কথা, সন্নিবিষ্টও হইতে পারিল না। কাজেই নভেল পড়িয়া আবরক শক্তির পুষ্টি হইল না এবং মোটেই যাতনার উপশম হইল না।

(ক) একটী প্রশ্ন

নভেল পাঠ করিয়া অনেকেই ত আনন্দ পান, কিন্তু এই লোকটীর পক্ষে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও মানসিক যাতনার উপশম হইল না কেন ? এই প্রশ্নটীর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে, বিপৎকালে লোকে কেন মদ্যপান এবং অপর কদাচার দ্বারা যাতনা ভুলিতে চায়, এবং কিরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে ঐরূপ আচরণ দ্বারা যন্ত্রণার উপশম হয় ও কাহাদের বা উপশম হয় না, তাহা আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দুরাচার দ্বারা কেন কাহারও যাতনার বৃদ্ধি কাহারও বা হ্রাস হয়।

বিপৎকালে মদ্যপান, নাচ গাওনা এবং অপর কদাচার দ্বারা কাহার কাহারও যাতনার উপশম হয় এবং কাহারও যাতনার বৃদ্ধি হইতেও দেখা যায় ; এইরূপ পৃথক ফলের কারণ কি ?

চিত্তে যদি অধিক পরিমাণে আবরক শক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহলে কদাচার দ্বারা ঐ শক্তি আরও পুষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণকে আচ্ছন্ন করে। অনুভব (perception) কার্য্য সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। যখন কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণ আচ্ছন্ন হয়, তখন সুখ বা দুঃখ অনুভব করার ক্ষমতাও কমিয়া যায় ; এইজন্য তিনি যাতনা অনুভব করিতে পারেন না, তাই আমরা বলি যে যাতনার উপশম হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই deadning অবস্থা মৃত্যুর অবস্থার তুল্য। ইহা উন্নতি নয়, ইহা অধোগতি।

যখন কাহারও চিত্তে আবরক শক্তি অল্পপরিমাণে থাকে, তখন স্বতঃই ঐ ব্যক্তির চিত্তে প্রকাশ শক্তির আধিক্য থাকে। প্রকাশ শক্তির আধিক্য থাকাতে, ঐ শক্তি দ্বারা যাতনা অনুভব করার

সামর্থ্যও প্রবল হয়; তাই তাঁহারা তীব্র ভাবে যাতনা অনুভব করেন। অতএব প্রকাশ শক্তির আধিক্য, অথবা ন্যূনতা, হইলে যথাক্রমে যাতনার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়।

(ক) অধঃপতিত ব্যক্তিরও অনুভব ক্ষমতা

যাঁহাদের চিত্তে আবরক শক্তি (অর্থাৎ তমোগুণ) অত্যন্ত প্রবল, যদি তাঁহাদের অন্তরেও কোন সাত্ত্বিক সংস্কারের উদ্দীপনা হয়, তখন কিয়ৎকালের জন্য সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইয়া গুণসাম্যের ব্যতিক্রম উৎপাদন করে। ঐ ব্যতিক্রম হইতে যাতনা জন্মায়। পূর্ব্বে যাঁহারা তমোগুণের আধিক্য বশতঃ যাতনা অনুভবে অক্ষম ছিলেন (২৫০ পৃষ্ঠা), তাঁহাদের অন্তরে যতক্ষণ সত্ত্বগুণের এই ক্ষণিক পুষ্টি বজায় থাকে, ততক্ষণ তাঁহারা যাতনা অনুভব করিতে পারেন।

অধঃপতিত ব্যক্তিরও এই প্রকার ভাবান্তর সংসারে দেখা যায়

বিপৎকালে কেন চিত্তে চাঞ্চল্য জন্মায়

প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে প্রবল সংঘর্ষণই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ। তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণের সংযোগ হইলে, উভয় গুণেই ক্রিয়া শক্তির বৃদ্ধি হয়; তখন সংঘর্ষণের চাঞ্চল্য প্রকাশ হয়। যদি তমোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে প্রকাশ শক্তির হ্রাস হওয়াতে যাতনা অনুভব করার শক্তি কমিয়া যায়, এবং ক্রিয়াশক্তির হ্রাস হওয়াতে চাঞ্চল্যও কমিয়া যায়, চিত্তে তখন জড়ত্ব ভাবই প্রবল হয়।

(ক) 'প্রকাশ' ও 'আবরক' এই উভয় শক্তির একের হ্রাস হইলে অপরের বৃদ্ধি হয়

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে স্বভাবতঃই তমোগুণের হ্রাস, এবং তমোগুণের বৃদ্ধি হইলে সত্ত্বের হ্রাস, হয়। কারণ, সত্ত্বগুণের প্রকাশ শক্তির অভাবই তমোগুণ এবং তমোগুণের আবরক শক্তির খর্ব্বতাই সত্ত্বগুণ। অন্ধকারের অভাবই আলোক এবং আলোকের অভাবই অন্ধকার। এই দুইটী বস্তুর একটীর হ্রাস হইলে, স্বতঃই অপরটীর বৃদ্ধি হয়।

দুরাচার করিয়াও কিরূপে কতক লোকের যাতনার হ্রাস হয়।

যে মানবের চিত্তে স্বভাবতঃ তমোগুণই প্রবল, যদি কোন কারণে তাঁহার অন্তরে ঐ গুণের হ্রাস হয়, তখন কিরূপে তমোগুণকে পুষ্ট করিয়া আবার পূর্ব্ব অবস্থায় আনিতে পারিবেন, তাহারই জন্য সেই ব্যক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়।

যদি বল যে ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়ার কারণ কি? উত্তরে বলি যে, বিপৎকালে তমোগুণের হ্রাস হওয়ার পরেও লোকের চিত্তে বহু তামসিক সংস্কার অবশিষ্ট থাকে; তমোগুণের হ্রাস হইলে স্বতঃই সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয় (২১১ পৃষ্ঠা); সত্ত্বের পুষ্টি তামসিক সংস্কারের ক্রিয়াশক্তিতে বলসঞ্চার করিয়া আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করে।

মদ্যপানাদি তামসিক আচরণ দ্বারা তমোগুণের পুষ্টি হয়, তাই বলিয়া বিপৎকালে সকলেই যে মদ্যপান করিতে চায় তাহা নয়। লোকের চিত্তে স্থিত সংস্কারই তাহাদের আপন আপন প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করে, এবং ঐ বৈশিষ্ট্য অনুসারে লোকে আচরণ করে। অর্থাৎ,সংস্কারের প্রেরণায় কেহ বা মদ্যপান কেহ বা নাচ গাওনা কেহ বা নারীসঙ্গ দ্বারা স্বীয় চিত্তস্থ তমোগুণের যে অংশ নষ্ট হইয়াছিল তাহার পূরণ করেন। যখন নষ্ট অংশের পূরণ হয়, তখন পুনরায় গুণসাম্য স্থাপিত হইয়া যাতনার নিবৃত্তি হয়।

(ক) বিপৎকালে কেহ কেহ কেন রোদন করেন।

বিপৎকালে কেহ কেহ হাহাকার করেন, শোকের আবেগে অনেকে রোদন করেন। রোদন বা হাহাকার তমোগুণের প্রেরণারই পরিচায়ক। পরে দেখান হইবে যে, বিপদের সময় প্রিয় বস্তুর বিনাশ বা কার্য্যহানি প্রভৃতি বিভ্রাটের উৎপাদন, গুণত্রয়েরই কার্য্য; প্রকাশ শক্তি আমাদের কোন প্রিয় বস্তুর বিনাশে উদ্যত হইলে, কিম্বা বিনাশ করিলে, অবিদ্যা-সৃষ্ট 'মমত্ব' ভাবের উপর আঘাত পড়ে। আঘাতকালে প্রকাশ শক্তির প্রাবল্য দ্বারা গুণসাম্য নষ্ট হয়, অর্থাৎ তমোগুণের

হ্রাস হয়। সেইজন্য তমোগুণের প্রেরণায় হাহাকার করিয়া, কিম্বা রোদন দ্বারা, আমরা আবরক শক্তির নষ্ট অংশের পূরণ করি।

(খ) **The healing hand of time**

হাহাকার, বিলাপ প্রভৃতি দ্বারা আবরক শক্তির নষ্ট অংশ পুর্ণ হওয়ার পরে, তমোগুণ পুনরায় সত্ত্ব গুণের প্রকাশ এবং ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে চায়। যদি আচ্ছাদন করিতে পারে, তাহলে উভয় শক্তিরই বলের হ্রাস হওয়াতে, শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষণে তীব্রতার হ্রাস হয়; অর্থাৎ বিপদের তীব্রতা কমিয়া যায়। প্রকাশ শক্তির হ্রাস হওয়াতে যাতনা অনুভব করার শক্তিও কমিয়া যায়, (২৫০ পৃষ্ঠা)। তমোগুণের নষ্ট অংশ পূর্ণ হইতে কিছু সময় লাগে,সেই সময়ে লোকে শোক করে। পুরণ হইলে আর শোক করে না। নষ্ট অংশের যত পুরণ হইতে থাকে, দিন দিন শোকও তত কমিতে থাকে।

ভাষান্তর ব্যবহার করিয়া বলা যায় যে, গুণসাম্যের স্থাপন হইয়া যাতনারও নিবৃত্তি হয়। উপশম গুণের দ্বারাই হয়, সময় দ্বারা নয়।

Selling our birthright for a mess of pottage

ধীরে ধীরে তমোগুণের পুষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বগুণের ক্ষয় হইতে থাকে (২৫১ পৃষ্ঠা); ঐ সময়ে আবরক শক্তি সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও ক্রিয়াশক্তি উভয়কেই আচ্ছন্ন করাতে সত্ত্বগুণের বল কমিয়া যায়। কদাচার দ্বারা যখন তমোগুণ আবার পূর্ব্বের মত পুষ্ট হয়, সেই সময়ে গুণসাম্য স্থাপন দ্বারা তখনকার মত আমাদের 'বিপদের' উপশম হয় বটে,কিন্তু তমোগুণের পুষ্টি দ্বারা আমাদের অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত হয়।

কেহ হয়ত বলিবেন যে, আপাততঃ কষ্ট পাইলাম না,ইহাই লাভ। তাঁহাকে বলি যে, তমোগুণ যে কেবল দুঃখ অনুভব করার শক্তিকেই নষ্ট করে, তাহাই নয়, সেই সঙ্গে সুখ অনুভব করার শক্তিকেও বিনষ্ট করে; অতএব যাতনার হাত হইতে মুক্ত করার সময়ে তমোগুণ জীবকে সৃষ্টির অধঃস্তরে বিক্ষিপ্ত করে।

এই অধঃপতনের দুর্দ্দশার তুলনায় বিপদের যাতনা কি তুচ্ছ বস্তু

নয় ? এই তুচ্ছ বস্তুর খাতিরে কি অধঃপাতে যাওয়ার উপায়কে সাদরে অবলম্বন করা উচিত ? আমরা যখন আপাত-সুখের কামনায় অনন্ত দুঃখভোগের পথ পরিষ্কার করি, তখন এইরূপ অদূরদর্শীর ন্যায় আচরণই করি।

নভেল পাঠ নিরর্থক হওয়ার কারণ।

এখন ২৫০ পৃষ্ঠায় উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিই, অর্থাৎ নভেল পাঠ কেন নিরর্থক হইয়াছিল তাহার বিচার করা যাক। যে লোকটীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাঁহার জীবদ্দশায় ৩৬ বৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ বিপদ হওয়াতে, তাঁহার চিত্তে, বক্র (ziczac) গতিতে, সত্ত্বগুণের পুষ্টি এবং তমোগুণের হ্রাস হইতে হইতে মোটের উপর সত্ত্বগুণেরই প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রকাশ এবং আবরক এই দুই শক্তির মধ্যে যে শক্তিই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না কেন, সংসারে থাকার সময় ঐ প্রতিষ্ঠা অব্যাহত থাকে না, তখনও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শক্তির প্রতিকূল শক্তি বজায় থাকে, ও তাহার কার্য্যও চলিতে থাকে। অতএব শক্তি দ্বয়ের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধির পর্য্যায় চলে।

এই প্রকার পর্য্যায়ের সময় যদি, কিয়ৎকালের জন্য, সত্ত্ব বা তমোগুণের পুষ্টি হয়, তখন গুণসাম্যে ব্যতিক্রম দ্বারা বিপদ হয়। বিপদের যে 'বেড়া আগুণের' উল্লেখ হইয়াছে তাহা সত্ত্বগুণের শক্তি প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল। বিপদের প্রবল বহ্নিই সত্ত্বগুণের বিপুল শক্তির পরিচয় প্রদান করে।

উপরে বলা হইয়াছে যে, ৩৬ বৎসর ব্যাপী বিপদের কার্য্য দ্বারা সত্ত্বগুণ প্রতিষ্ঠার পদবী লাভ করিয়াছিল, যখন শাস্ত্র সমন্বয়ের অবসানে তমোগুণ প্রবল হইল, তখনও সত্ত্বগুণ সেই পদবী হইতে অধিক্ষিপ্ত হয় নাই। উপরে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির যে হ্রাস বৃদ্ধির পর্য্যায়ের উল্লেখ হইল, তমোগুণের পুষ্টি সেই পর্য্যায়ের একটী passing phase, অর্থাৎ তাহা ক্ষণিক প্রতিপত্তি মাত্র। তখন তমোগুণের প্রেরণা প্রবল হওয়াতে লোকটীর চিত্তে নভেল পাঠে প্রবৃত্তি হইয়াছিল বটে,

কিন্তু লোকটীর মতিতে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকাতে, নভেলে বর্ণিত বিষয়ের সহিত তদাত্মতা ভাব জন্মান দূরের কথা, নভেলের সহিত মনের একাগ্রতাও জন্মিল না।

একাগ্রতা না হওয়াতে নভেল হইতে কোন নূতন তামসিক শক্তি তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য তমোগুণের পুষ্টি স্থায়ী হয় নাই। যদি স্থায়ী হইত,তাহলে তমোগুণ সত্ত্বের উপর আপন আবরক শক্তি বিস্তার দ্বারা, অনুভব ক্ষমতাকে খর্ব্ব করিয়া, যাতনার উপশম করিতে পারিত। তাহা হইল না, বরঞ্চ সত্ত্বগুণের বলবত্তা দ্বারা গুণের বৈষম্য দিন দিন অধিক হইয়া যাতনা বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে সত্ত্বগুণের প্রেরণা প্রভাবে তিনি ভাগবতের আশ্রয় লইলেন।

যাতনা উপশমের যথার্থ ঔষধ

নভেলের বদলে শাস্ত্রপাঠই ছিল এ ক্ষেত্রে যাতনা উপশমের যথার্থ ঔষধ, উহা কালক্রমে সত্ত্বগুণের শক্তিকে পুষ্ট করিয়া পুনরায় গুণসাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত।

কেহ হয়ত বলিবেন যে শাস্ত্র পাঠ করিলেই কি বিপদের উপশম হয়? উত্তরে বলি যে, পুনরায় গুণসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিপদের উশশম হয় না। বরঞ্চ শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে সত্ত্বগুণের আরও পুষ্টি হইয়া বিপদ আরও তীব্র হয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেই বিপদ দূর হইবে,এই আশা পূর্ণ হয় না। বিপদ দ্বারা যে সকল মানবের প্রকৃষ্ট উন্নতি হয় না, কেবল তাঁহাদের পক্ষেই শীঘ্র বিপদের উপশম হয়। প্রকৃষ্ট উন্নতির সময়ের বিপদেও নিবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু যাতনার উপশম হয়। কেন হয়, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

সত্ত্বগুণের পুষ্টির প্রভাবে বিপদ যদি বজায় থাকে, কিম্বা অধিকতর প্রবল হয়, তাহলেও সত্ত্বের বৃদ্ধি দ্বারা আবরক শক্তির ক্ষয় হওয়াতে 'অহং' ভাবের ক্ষয় হইতে থাকে; যাতনা 'অহং' ভাবকেই আশ্রয় করিয়া জন্মায়; ঐ ভাবের যত ক্ষয় হইতে থাকে, যাতনার তেজও তত

কমিতে থাকে। অতএব কিছুদিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে বিপদকালেও যাতনা থাকে না। 'গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে'; প্রহ্লাদ প্রভৃতির বহু বিপদ হইয়াছিল কিন্তু যাতনা ছিল না। ইহার কারণ এই যে, তাঁহাদের চিত্তে তমোগুণ সত্ত্বের সহিত প্রায় সমধর্ম্মী হইয়া মমত্ব ভাবের হ্রাস করিয়াছিল।

শাস্ত্রপাঠ যাতনা উপশমের ঔষধ হইলেও বিপদের আরম্ভে শাস্ত্রপাঠ উপলক্ষে তমোগুণই প্রতিবন্ধক উৎপাদন করে। এই লোকটীর পক্ষেও ৩।৪ মাস যাবৎ বহু বাধা হইয়াছিল। তমোগুণের হ্রাস, অর্থাৎ সত্ত্বের পুষ্টি, না হইলে পুনরায় শাস্ত্র অধ্যয়নে মতি হয় না; তাহার কারণ এই যে, যে প্রেরণার প্রভাবে বিপন্ন ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন ঐ প্রেরণা কেবল সত্ত্বগুণ হইতে আগমন করে।

যতকাল তমোগুণের প্রাধান্য থাকে ততকাল অধ্যয়নে একাগ্রতা বা নিষ্ঠা হয় না। এই লোকটী দারুণ শোকাতুর অবস্থাতেও যে প্রগাঢ় ভাবে ভাগবত পাঠ করিতে পারেন নাই, এবং বিপদ একটু কমিলেই যে পাঠ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, তখনও তাঁহার চিত্তে আবরক শক্তি প্রবল ছিল (২২৮ পৃষ্ঠা)।

(ক) বিপৎকালে বীভৎস আচরণ না করার কারণ।

লোকটীর সারাজীবনই বিপদ চলিয়াছে, এবং বৃদ্ধ বয়সেও (বয়স তখন ৫৩) আবার ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। এই সময়ে নাস্তিক ভাবাপন্ন হওয়া কিম্বা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বীভৎস আচরণ করা বিচিত্র হইত না। এইরূপে কতক লোককে অধঃপাতে যাইতে দেখা গিয়াছে। যদি লোকটীর চিত্তে তমোগুণের কুৎসিৎ সংস্কার বলবান থাকিত, তাহলে ঐ সকল সংস্কার তাঁহার মতিকে বীভৎস আচরণের দিকে প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিত।

এইপ্রকার দুরাচার করার জন্য প্রবৃত্তি না হওয়ার কারণ এই যে, সত্ত্বগুণ যত প্রবল হইতে থাকে তত তমোগুণের উপর হইতে আবরক

শক্তির পরদাকে পাতলা করিয়া তমোগুণকে কতকটা সত্ত্বের ভাবযুক্ত করে। যখন তমোগুণের এই রূপান্তর হয়, তখন বীভৎস আচরণের জন্য প্রবৃত্তিই হয় না।

যে গুণ যখন প্রতিষ্ঠালাভ করে তাহা আপন ধর্ম্ম অনুসারে জীবের মতিকে পরিচালিত করে। এ স্থলে মোটের উপর লোকটীর মতি সত্ত্বের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছিল। সত্বগুণ, কখন বা প্রকাশ্য ভাবে কখনও বা প্রচ্ছন্ন শক্তি দ্বারা (অর্থাৎ তমোগুণকে সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত করিয়া), লোকটীর পরিচালনা করিতেছিল।

প্রবল ঝাড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতির শান্ত ভাব।

বয়ঃক্রমের ৪৩ হইতে ৫৩, এই দশ বৎসর লোকটীর জীবনে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে যে তীব্র সংঘর্ষণ চলিয়াছিল (২০৭-২৩০ পৃষ্ঠা), সেই সময়ে যদি আবরক শক্তি প্রকাশ শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিত, তাহলে ঝঞ্ঝাট এবং বিপদের উপশম হইত, এবং লোকটী আপন জীবনের অপরাহ্নকাল অল্প ঝঞ্ঝাটে অতিবাহিত করিতে পারিতেন; কিন্তু ঐ অবস্থা প্রকৃত সৌভাগ্যের দশা হইত না।

সংসারের থাকার সময়ে প্রকাশ শক্তির কার্য্য বন্ধ হয় না, আবরকেরও হয় না। আবরক শক্তি যদি প্রকাশ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে তাহলে, কিরূপে আপন ক্ষমতার আরও সম্প্রসারণ হইবে, আবরক শক্তি সেই জন্যই কার্য্য করে, এবং সেই ক্রিয়া দ্বারা আরও অধিকতর পরিমাণে তমোগুণের পরিপুষ্টি হয়। এই ভাবে তমোগুণের পুষ্টি দ্বারা লোকটীর পক্ষে অধঃপতনের পথই উন্মুক্ত হইত।

[আবরকের বদলে যদি প্রকাশ শক্তি প্রবল হয়, তাহলে বিপদের উপশম না হইয়া বৃদ্ধিই হয়। ঐ বৃদ্ধির চরম লক্ষ্য হইল মোক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন। আবরক শক্তির বৃদ্ধি হওয়ার চরম লক্ষ্য হইল জীবকে পশুত্বে, এবং পশুত্ব হইতে জড়ত্বে, অবনত করা]

(ক) দশ বছরে কেবল দুইবার মাত্র ঝণঝাটের নিবৃত্তি

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২৯-৩০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, লোকটীর চিত্তে প্রবল ভাবে 'স্বাধ্যায়' অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ করার জন্য প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ঐ প্রবৃত্তি প্রায় এক বৎসর যাবৎ বজায় ছিল। ঐ প্রবৃত্তি প্রকাশের সময়ে লোকটীর বয়স ছিল ৫৩।

(১) তখন ও তার পরে এক বৎসর তাঁহার কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না বলিলেও চলে।

(২) এই ঘটনার ৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় এক বৎসর সময়ও অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়াছিল।

(খ) শাস্তির অবসান ও পাঁচ বৎসর ব্যাপী বিপদ

প্রথম বারের শাস্তির সময় এক বছরের পরে শেষ হইল এবং তাহার পর অতি ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইল; ৫ বৎসর কাল সেই বিপদের বিরাম ছিল না এবং নানা মূর্ত্তি ধরিয়া বিপদ তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়াছে। ঐ সময়ে দুইবার তাঁহাকে সবংশে বিনাশ করার উদ্যোগও হইয়াছিল।

বয়ঃক্রমের ১৩ হইতে ৪৩ এই ত্রিশ বৎসর কাল পুনঃ পুনঃ বিপদ চলার পরে যখন সত্ত্বগুণ রজোগুণকে অভিভূত করিল (২০৭-১০ পৃষ্ঠা), তাহার পরে দশ বৎসরের মধ্যে লোকটীর জীবনে কেবল দুইবার মাত্র বিপদের বিরাম হইয়াছে; এবং ঐ বিরাম এক এক বছর অপেক্ষা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই ও প্রতি বিরামের অবসানেই ভয়ঙ্কর প্রবল ঝড়ের আকার ধারণ করিয়া বিপদ পুনরায় উপস্থিত হইয়াছে।

এই দশ বৎসরের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মনে দুইটী প্রশ্নের উদয় হয়, যথা—

(গ) দুইটী প্রশ্ন

(১) যখন ঘোর বিপদ চলিতেছিল তখন দুইবার অকস্মাৎ, সেই বিপদের অবসান হইয়া, যে শাস্তির সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কারণ কি?

(২) যেমন বিপৎকালে অকস্মাৎ শান্তির সময় আসিয়াছিল তেমনি অকস্মাৎ এবং অলক্ষিত ভাবে দুইবারই কেন শান্তির অবসান হইয়া প্রথমবারে ৫ বৎসর ব্যাপী এবং শেষবারে ৭ বৎসর ব্যাপী বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল ?

এই উপলক্ষে তত্ত্বকথা জানিতে স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা হয়। তাই এই রহস্য ভেদ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। লেখকের অনুমান যে অভ্রান্ত তাহা বলিতে ভরসা হয় না, কারণ বিষয়টী অত্যন্ত জটিল।

কিরূপে বিপদের অকস্মাৎ উপশম হয়

গুণত্রয়ের কিরূপ অবস্থা হইলে ভয়ঙ্কর বিপদ চলিতে চলিতে অকস্মাৎ তাহার উপশম হয়, সেই বিষয়টীর উপলক্ষে তত্ত্বকথার আলোচনা প্রথমে করা যাক।

(ক) চিত্ত কিরূপে শান্তির উপযোগী হয়

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, বাল্যকাল হইতেই ঐ লোকটীর চিত্তে 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণের প্রাধান্য ছিল; অর্থাৎ চিত্তে প্রবল পরিমাণে সত্ত্বগুণ ছিল এবং তাহার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কতকটা আবরক শক্তি (অর্থাৎ তমোগুণ) ছিল (৭৬ পৃষ্ঠা)। তাঁহার চিত্তে তমোগুণের পরিমাণ তত অল্প ছিল না যে, লোকটীকে 'মিশ্র-সত্ত্ব' গুণযুক্ত বলা যাইতে পারে (২৮ পৃষ্ঠা); এবং তমোগুণের পরিমাণ তত বেশীও ছিল না, যাহার জন্য তাঁহাকে 'নিকৃষ্ট' রাজসিক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে (৭৭ পৃষ্ঠা)।

প্রবল সত্ত্বগুণের সহিত সংযোগ হওয়াতে তমোগুণের ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে লোকটীর মনে 'নাছোড়বান্দা' ভাব অর্থাৎ জিদ অত্যন্ত বলীয়ান হইয়াছিল (২০০ পৃষ্ঠা)। এইজন্য রজোগুণের sustaining power, রক্ষণ শক্তিও অত্যন্ত প্রবল ছিল (২০৮ পৃষ্ঠা)।

সৃষ্টিতে কেবল প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণই আছেন এবং তমোগুণ বিশুদ্ধ

সত্ত্বগুণের উপর আবরক শক্তির আবরণ অর্থাৎ পরদা স্থাপন করাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বই প্রকৃষ্ট 'রজোগুণ' নাম ধারণ করিয়াছিল। কিসে ঐ পরদা উঠাইয়া ক্রমে ক্রমে রজো এবং তমোগুণকে সত্ত্বগুণের সহিত সমধর্ম্মী করিতে পারা যায়, এবং অবশেষে ঐ গুণদ্বয়কে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরিণত করিতে পারা যায়, ইহাই হইল সকল লোকের জীবনের মুখ্য সমস্যা। ইহাই হইল বিভুর সৃষ্টি লীলার মুখ্য লক্ষ্য, সকল লোকের জীবনেই এই সমস্যা পুরণের জন্য গুণত্রয়ের কার্য্য চলিতেছে।

এই অধ্যায়ে যে ব্যক্তির বিপদের আলোচনা করা হইতেছে তাঁহার চিত্তে জন্মাবধি 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণের প্রাধান্য থাকাতে আবরক শক্তির পরদা খানি স্বভাবতঃই কতকটা পাতলা ছিল, কারণ 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণে সত্ত্বগুণ বহু পরিমাণে থাকে। জন্মের পরে বয়ঃক্রমের ১৩ বৎসর হইতে বরাবরই বহু বিপদ হওয়াতে, সেই পরদা আরও পাতলা হইতেছিল। এইজন্য লোকটীর ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সত্ত্বগুণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিল।

যখন কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয় তখন প্রকাশ এবং আবরক উভয় শক্তিই বলীয়ান্ হওয়াতে, অকস্মাৎ বিপদের তুফান উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা হয়। তন্মধ্যে কখন কদাচিৎ 'গুণসাম্য' প্রকাশ হওয়াতে অকস্মাৎ তুফানের উপশম হয়; 'গুণসাম্যের' অবস্থায় শান্তির সুযোগ আসে। এই লোকটীর চিত্তে প্রকাশ শক্তির যেরূপ পুষ্টি হইতেছিল, তাহা দ্বারা তিনি বিপদের ভীষণ ঝড়, এবং ক্রমশঃ আরও ভীষণ ঝড়ের উপযোগী হইতে ছিলেন। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে 'গুণসাম্য' উপলক্ষে এই বিষয়ে তত্ত্বকথার আরও আলোচনা করা হইবে।

(খ) প্রথম এক বৎসরের নির্ঝঞ্ঝাট উৎপাদন

প্রথম কিস্তি নির্ঝঞ্ঝাটের সময় আসার পুর্ব্বে যে চারি বছর ভীষণ বিপদ চলিয়াছিল (২২২-২৬ পৃষ্ঠা) সেই সময়ে লোকটী যত্নের সহিত

গীতা ও বাইবেল পাঠ করিয়াছিলেন ; এই সাধনা দ্বারা লোকটীর চিত্তে তমোগুণের আবরণের পরদা পাতলা হওয়াতে তমোগুণ ক্রমশঃ সত্ত্বের সহিত সমধর্ম্মী হইতেছিল, এবং তাহার বলও বাড়িতেছিল, সেইজন্য বিপদের তেজ বেশী হইতেছিল। এই চারি বৎসর প্রকাশ শক্তি দ্বারা আবরক শক্তির ক্ষয় হওয়াতে উভয় শক্তিতেই বলের পরিবর্ত্তন চলিতেছিল ; সেই জন্য বিপদও চলিয়াছিল।

তার পরে একটা সময় আসিল যখন ঐ দুই প্রতিকূল শক্তির বলের কোনরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় নাই। এই অবস্থাকে 'গুণসাম্য' অবস্থা বলে। ইহা উপস্থিত হইলে বিপদের নিবৃত্তি হয় (১৪ অঃ ২য় অংশ)। এই অবস্থা জন্মানর পরে শক্তিদ্বয়ের বল এক বৎসর একই ভাবে ছিল। তাইতে এক বৎসর বিপদের নিবৃত্তি হইয়াছিল ।

(গ) নির্ঝনঝাটের সময় বিপদের সঞ্চার

এই নির্ঝনঝাটের সময় বহুপরিমাণে ধনাগম হওয়াতে লোকটীর চিত্তে মমত্বভাব মূলক ধনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। অনুমান হয় যে, লোকটীর চিত্তস্থ রজোগুণে যে আবরক শক্তি ছিল, সেই শক্তিই বহু ধন প্রদান করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ঐ শক্তি দশ বৎসর যাবৎ ইচ্ছার উদয় হওয়া মাত্র সকল কাম্য বস্তুই প্রদান করিয়াছিল (২০৫ পৃষ্ঠা)। যখন ধনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল, তখন তমোগুণের পরিমান আর পূর্ব্ববৎ রহিল না এবং সত্ত্বের সহিত সমধর্ম্মী ভাবও রহিল না ; তমোগুণের পুষ্টি হওয়াতে তাহার শক্তির হ্রাস হইল।

(ঘ) শান্তির অবসান এবং সংহারক বিপদ

বলের এই ব্যতিক্রম দ্বারা গুণসাম্য বিনষ্ট হইয়া পুনরায় ভয়ঙ্কর বিপদের সৃষ্টি হইল। নূতন বিপদ প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ একটানা ভাবে চলিয়াছিল (২২৬-২৯ পৃষ্ঠা)। এই সময়ে সত্ত্বের পুষ্টি ও আবরকের পরদা আরও পাতলা হইতেছিল, অতএব সত্ত্বগুণের প্রেরণায় ভয়ঙ্কর শোকের সময়ে লোকটীর মতি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে প্রবৃত্ত হয়। এই মতি হইতে প্রকাশ শক্তির বলের বৃদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

(ঙ) পুনরায় এক বৎসর ব্যাপী শান্তির সময়

আগে চারি বৎসর ভয়ঙ্কর বিপদ চলিতে চলিতে এমন একটা সময় আসিয়াছিল যখন প্রকাশ ও আবরক শক্তির বলের হ্রাস বৃদ্ধি বন্ধ হওয়াতে বিপদের উপশম হইয়াছিল। এবারও পাঁচ বৎসর ভয়ঙ্কর ভাবে বিপদ চলায় পরে শক্তিদ্বয়ের মধ্যে পুনরায় সেইরূপ অবস্থা হইল, অর্থাৎ গুণসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এক বৎসর যাবৎ এই সাম্য অবস্থা বজায় থাকাতে বিপদের নিবৃত্তি হইল, এবং প্রকাশ শক্তির প্রেরণায় লোকটী ভাগবতের সহিত বাইবেলের সমন্বয় কার্য্যে নিরত রহিলেন।

(চ) শান্তির অবসান এবং সাত বৎসর ব্যাপী বিপদ

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যেমন নির্ঝঞ্ঝাটের সুযোগ পাইয়া আবরক শক্তি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবারেও তাহাই করিল। করারই কথা, কারণ এই এক বৎসরে রাজসম্মানলাভ এবং বিপুল ধনাগম হইয়াছিল। এই সকল আহার্য্য পাইলে তমোগুণের পুষ্টিই হয়। তমোগুণের পুষ্টি হওয়াতে গুণসাম্যের ব্যতিক্রম হইয়া আবার সাত বৎসর ব্যাপী বিপদের সৃষ্টি হইল।

বিপদ একটানা ভাবে চলার কারণ।

যদি প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের, অর্থাৎ প্রকাশ এবং আবরক শক্তির, বলে পুনঃ পুনঃ হ্রাস বৃদ্ধি চলিতে থাকে, তাহলে গুণসাম্য স্থাপিত হইতে পারে না, অতএব বিপদ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে। বিপদ চলার সময় শক্তিদ্বয়ের বলে কি ভাবে তারতম্য হয়, তাহাই নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

• কখন আবরকশক্তি প্রকাশ শক্তির উপর আপন আচ্ছাদন বিস্তার করিয়া প্রকাশের বলের হ্রাস করে এবং প্রকাশ শক্তিকে কতক পরিমাণে নিজের সহিত সমধর্ম্মী করে। তখন উভয় শক্তিতেই ক্রিয়াশক্তির খর্ব্বতা হওয়াতে বিপদের তীব্রতা কমিয়া যায়। নিকৃষ্ট রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন মানবের জীবনে এইরূপে বিপদের হ্রাস হয়।

কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে প্রকৃষ্ট রজোগুণ প্রবল, তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশ শক্তির প্রভা এবং বল উভয়ই অধিক পরিমাণে থাকে, অতএব আবরক শক্তি সহজে প্রকাশকে আচ্ছাদন করিতে পারে না. বরঞ্চ প্রকাশ শক্তি আবরকের আচ্ছাদন পাতলা করিয়া তাহার বলের বৃদ্ধি করে, এইজন্য তাঁহাদের জীবনে শক্তিদ্বয়ের মধ্যে মুহুর্মুহু সংঘর্ষণ হয়।

এই কারণে সত্ত্বপ্রধান অথবা 'প্রকৃষ্ট' রজোপ্রধান মানবের জীবন বিপদসঙ্কুল হয়। আমরা যে লোকটীর বিপদের আলোচনা করিয়াছি তাঁহার এই অবস্থা ছিল।

দুইটী প্রধান সমস্যা

যখন লোকটীর ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রকাশ শক্তি আবরক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহার পরে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ শক্তির পুষ্টিই হইয়াছে, ঐ পুষ্টি দ্বারা আবরকের বলও বাড়িয়াছে। বিবদমান শক্তিদ্বয়ের উভয়েই বলীয়ান্ হওয়াতে সময়ে সময়ে বিপদের মূর্তি এমন ভীষণ হইয়াছে যে, তখন এই সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল—

(ক) হয় লোকটীর পাপ দেহ বিনষ্ট হইবে, কারণ, ঐ দেহে জন্মাবধি রজোগুণের প্রাধান্য ছিল

(খ) নতুবা রজোগুণের বিশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা দেহেরও বিশুদ্ধি সম্পাদন হইবে,

এই দুইটী সমস্যার সমাধান গত বার বছর চলিতেছে।

প্রকৃষ্ট রজোগুণের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া তাঁহার দেহে বহু পরিমাণে সত্ত্বগুণ ছিল বলিয়াই বোধ হয় যে,ঐ ভয়ঙ্কর বিপদ দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশ হয় নাই, উদ্যোগ হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু প্রকাশ শক্তি এবং, 'প্রকৃষ্ট' রজো গুণের সহিত সংযুক্ত, আবরকশক্তি উভয়েই সিংহের ন্যায় বলবান থাকাতে, তাহাদের উভয়ের কাহারও বলের হ্রাস হয় নাই; বরঞ্চ প্রকাশ শক্তি যত জয়লাভ করিয়াছে আবরক শক্তির বলও তত বেশী হইয়া গুণের বৈষম্যই প্রবল হইয়াছে। প্রবল বৈষম্য

থাকাতে বিপদ লোকটীকে 'ঝাড়ে বংশে' নিপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছে। মরিব তবু বশ্যতা স্বীকার করিব না, ইহাই হইল প্রকৃষ্ট রজোগুণের নীতি, তাই আবরকের বাঁকী অংশ ছাড়িতে চায় নাই। রোগের বীজ শীঘ্র মরে না

পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির পরস্পরের কার্য্য আলোচনা উপলক্ষে দেখান হইয়াছে যে, কাহারও চিত্তে আবরক শক্তি যত পুষ্ট হয়, অর্থাৎ ঐ শক্তির পরিমাণ যত অধিক হয়, ততই আবরক শক্তির বলের, অর্থাৎ ক্রিয়াপটুতার হ্রাস হইতে থাকে; এবং আবরক শক্তির পরিমাণের যত হ্রাস হয় তাহার ক্রিয়াপটুতা তত বাড়িতে থাকে। কেন ইহা হয়, তাহা উপরোক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

আবরক শক্তির পুষ্টি হইয়াছে বলিলে প্রকাশ শক্তির হ্রাস বুঝায় এবং আবরকের হ্রাস হইয়াছে বলিলে প্রকাশ শক্তির বৃদ্ধি বুঝায় (২৫১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং সত্ত্বগুণের পুষ্টি হওয়ার ফলে তমোগুণের ক্রিয়াপটুতা প্রবল হয়, এবং সত্ত্বের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের ক্রিয়াপটুতাও কম হইতে থাকে।

যাঁহাদের জীবদ্দশায় ঘটনাবলী দ্বারা ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতে থাকে, তাঁহারা ক্রমশঃ এমন অবস্থায় উপনীত হন যখন আবরক শক্তির হ্রাসই হইতে থাকে অর্থাৎ তাহার বল বাড়িতেই থাকে। সেইজন্য অবিরাম গতিতে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষন চলে অতএব বিপদও অবিরাম গতিতে চলে।

আমরা যে লোকটীর বিষয় আলোচনা করিতেছি তাঁহার চিত্তে ক্রমশঃ প্রকাশ শক্তির পুষ্টি হইতেছিল কি না, এই বিষয়ে কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই এখন দেখা যাক্।

(ক) প্রকাশ শক্তির পুষ্টির পরিচায়ক ঘটনাবলী

লোকটীর ১৩ বৎসর বয়স হইতেই বিপদ আরম্ভ হইয়া (২০১ পৃষ্ঠা) ৪৩৷ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩০ (যাবৎ) বৎসর একটানা ভাবে

না চলিলেও প্রথম কুড়ি বৎসর মাঝে মধ্যে, তার পর পাঁচ বৎসর ঘন ঘন এবং শেষের পাঁচ বছর প্রায় অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। ঐ ৩০ বৎসরের শেষের দশ বৎসর অশান্তির মাত্রা যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা কেবল প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষণ দ্বারাই সৃষ্ট হইতে পারে। এই ভাবে বিপদের ক্রমিক বৃদ্ধি দেখিয়া অনুমান হয় যে, প্রকাশ শক্তি ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছিল, এবং ঐ পুষ্টির ফলে তমোগুণের মধ্যে স্থিত আবরক শক্তির বলও বেশী হইয়াছিল। উভয় শক্তির বলই বেশী হওয়াতে শেষের দশ বৎসরে কামনার সঞ্চার হওয়া মাত্র, রজোগুণ তাঁহাকে সর্ব্ববিধ কাম্য বস্তু প্রদান করিয়াছিল; তখন সত্বগুণ, রজোকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিতে অক্ষম হইলেও, আপন পরিপুষ্ট শক্তি দ্বারা ভোগ-সুখে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে (২০৪-০৬ পৃষ্ঠা)। লেখক লোকটীর অপর যে সকল আচরণ দেখিয়াছেন তাহা হইতেও রজোগুণের মধ্যে প্রবল সাত্বিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তিনি যে সকল প্রলোভনকে অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা অদ্ভুত ব্যাপার। প্রলোভনের উৎপত্তি হইয়াছিল আবরক শক্তি দ্বারা এবং নিরোধ হইয়াছিল প্রকাশ শক্তি দ্বারা।

এইভাবে প্রকাশ শক্তির পুষ্টি চলিতে চলিতে, বোধ হয় যে লোকটীর ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সত্বগুণ অত্যধিক পরিমাণে পুষ্ট হওয়াতে তাহার বলও বেশী হইয়াছিল; ঐ বল দ্বারা প্রকাশ শক্তি 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণের সহিত সংযুক্ত আবরক শক্তিকে অভিভূত করিতে পারিল, এবং লোকটী তখন অকুল পাথারে পড়িলেন (২০৭ পৃষ্ঠা)। অভিভবের পরে পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আবরক শক্তির দ্বারা বিরাট্ উদ্যমের চিত্র পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৭ হইতে ২১৩ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৭ হইতে ২২০ পৃষ্ঠায়, প্রকাশ শক্তির প্রভাবে নারদমন্ত্রে দীক্ষা প্রভৃতি যে সকল ঘটনাবলীর উল্লেখ হইয়াছে, তাহা হইতেও সত্বগুণের প্রতিষ্ঠা লাভের পরিচয় পাওয়া যায়।

(খ): প্রকাশ শক্তি কি দুইবার শান্তি উৎপাদন করিয়াছিল ?

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, সত্বগুণের পুষ্টির সহিত উপরোক্ত দুই কিস্তির শান্তির কি কোন সম্বন্ধ আছে ? সম্বন্ধ এই যে, যেহেতু সত্বগুণের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবরক শক্তির পরদা পাতলা হয়, অতএব সত্বগুণ যত পুষ্ট হইতেছিল আবরক শক্তিও ততই প্রকাশ শক্তির সহিত সমধর্ম্মী হইয়া উঠিতেছিল। আবরক শক্তিতে এইরূপ অবস্থান্তর উৎপাদন হওয়ার সময় মাঝে মধ্যে যখন শক্তিদ্বয়ের বল কিছুদিন একই ভাবে ছিল, তখন 'গুণসাম্য' অবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল গুণসাম্যই বিপদের উপশমের কারণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫৮ পৃষ্ঠায় প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, ঘোর বিপদ চলিতে চলিতে কিরূপে অকস্মাৎ ঐ বিপদের নিবৃত্তি হইয়াছিল ? প্রশ্নটীর উত্তর উপরের আলোচনা হইতে পাওয়া গেল।

নিবৃত্তির পরেও কেন ভয়ঙ্কর বিপদ হয়।

দুইবার এক এক বৎসরব্যাপী শান্তির সময় চলার পরেও পুনরায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে বিপদ হওয়ার কারণ কি ? ২৫৯ পৃষ্ঠাতে উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নটীর আলোচনা করা যাক।

'গুণসাম্য' স্থাপন হওয়াকে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়া বলে না। গুণসাম্যের অবস্থা অনেকটা armed neutrality অবস্থার তুল্য, তখন ঝঞ্ঝাট হয় না বটে, কিন্তু গুণের কার্য্য বন্ধ হয় না। শান্তির সময়ে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির কার্য্য চলিতে চলিতে যেমন তাহাদের বলের তারতম্য হয় অমনি গুণসাম্য বিনষ্ট হইয়া আবার নূতন বিপদ উপস্থিত হয়। তখন যদি উভয় শক্তির বল বেশী হয়, তাহলে বিপদের মূর্ত্তিও ভয়ঙ্কর হয়।

ভাগবত পাঠে 'অধিকার' লাভ

ভাগবত সত্বপ্রধান শাস্ত্র, সত্বগুণ অতিমাত্রায় প্রবল না হইলে

কেহ ভাগবত পাঠে যথার্থভাবে 'অধিকারী' অর্থাৎ যোগ্য হইতে পারেন না।

এই প্রবন্ধে 'পাঠ' পদ দ্বারা পল্লবগ্রাহিতার কথা বলা হইতেছে না। যে ভাবের অধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রের মর্ম্ম অন্তরে প্রবেশ করে, যে অধ্যয়নের সময় শাস্ত্রের ভাবার্থ চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া পাঠককে নিজের সহিত কতকটা সমভাবাপন্ন করে, 'পাঠ' পদ দ্বারা সেইরূপ অধ্যয়নের কথাই বলা হইতেছে।

(ক) বিপৎকালে ভাগবতে দীক্ষা।

আমরা যে লোকটীর বিষয় আলোচনা করিতেছি তিনি ৪২ বৎসর বয়সের সময় অকুল পাথারে পতিত হওয়ার পরে যখন বিপদের দ্বারা যেন নাগপাশের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তখন সত্বগুণ অল্পদিনের জন্য তাঁহার চিত্তে আধিপত্য লাভ কবিয়াছিল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঐ গুণ তাঁহাকে অধিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। সত্বগুণের প্রভাবে ভাগবত হইতে নারদোক্ত মন্ত্রে তাঁহার দীক্ষা হইল (২১৯ পৃষ্ঠা)।

(খ) 'অনধিকারী' হওয়াতে পাঠে অক্ষমতা

কিন্তু তখনও তাঁহার চিত্তে সত্বগুণ তত প্রবল হয় নাই যে, ঐ গুণের প্রভাবে তিনি ভাগবতের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন; অতএব আবরক শক্তির প্রভাবে তিনি পাঠে অক্ষম হইলেন এবং পাঠ বন্ধ হইল। এই ঘটনার পরে প্রায় ৪।৫ বৎসর বিপদের তাড়না এবং তাহার সাঙ্গ সাধনা চলার পরে, যখন শোকের বজ্র তাঁহার মস্তকে পড়িল, তখন কেবল মাস ৩।৪ যাবৎ, সত্বগুণ অত্যধিক পরিমাণে প্রবল হওয়াতে, লোকটী ভাগবত পাঠের 'অধিকার' অর্থাৎ যোগ্যতা লাভ করিলেন। ঐ সময়ে তিনি 'পাঠ' করিয়াছিলেন বটে (২২৮ পৃষ্ঠা), কিন্তু সেই পাঠ অত্যন্ত মোটামুটি রকমের ছিল, ভাবগ্রহণ হয় নাই। ৩।৪ মাস পরে সত্বগুণের খর্ব্বতা হওয়াতে ভাগবত পাঠে তাঁহার অধিকার রহিল না, মতিও দূর হইল।

(গ) ছয় বৎসরব্যাপী বিপদের পরে অত্যল্প 'অধিকার' লাভ

নারদ মন্ত্রে দীক্ষার পরে প্রায় ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। ঐ

সময়ের প্রথম চারি বৎসর, যখন প্রবল বিপদ চলিয়াছিল, তখন লোকটী গীতা এবং বাইবেল অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন। তার পরে এক বৎসর ছিল নির্ঝঞ্ঝাটের সময়, কিন্তু তখনও গীতাপাঠ বন্ধ হয় নাই। তার পরে আবার এক বৎসর যাবৎ রোগের ভীষণ যাতনা ভোগ করিয়া লোকটী নিজে যখন 'মর মর' অবস্থায় উপনীত হইলেন তখন শোকের বজ্র তাঁহার মস্তকে পতিত হইল। এই সময়ে ৩।৪ মাসের জন্য তিনি আবার ভাগবত পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিপদ দ্বারা ভাগবত পাঠে মতি

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে

(১) কেন ভাগবত পাঠে মতি হইল ?

(২) লোকটী কি তখন পাঠে যথার্থ 'অধিকারী' হইয়াছিলেন ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, ঐ সময়ের বিপদগুলি সত্ত্বগুণের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল, লেখক ইহাই অনুমান করেন। ধননাশ, প্রাণনাশ এবং স্বাস্থ্যনাশ করিয়া এবং সবংশে বিনাশের সম্ভাবনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ শক্তি তখন আবরক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট মমত্ব ভাবের উপর আঘাত দিতেছিল। ভাগবত সত্ত্বগুণের সহিত সমধর্ম্মী, অতএব সত্ত্বগুণ লোকটীর মতিকে ভাগবত পাঠের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহাই অধ্যয়ন প্রবৃত্তির উদ্ভবের কারণ। ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বে নারদ মন্ত্রে দীক্ষা লাভ সত্ত্বগুণেরই প্রেরণার ফল, কিন্তু চিত্তে ঐ প্রেরণার বল শীঘ্র কমিয়া যাওয়াতে, তখন ভাগবত পাঠ সম্ভবপর হয় নাই

(ক) অধিকার অভাবে পাঠ বন্ধ

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, উপরোক্ত শোকের সময়েও লোকটীর চিত্তে অত্যধিক পরিমাণে রাজসিক ভাব ছিল, উহা প্রকাশ শক্তিকে আবরণ করাতে, সত্ত্বগুণের স্বল্পতা বশতঃ তিনি ভাগবত পাঠের জন্য স্থায়ীভাবে 'অধিকারী' হন নাই। এই কারণেই তিনি ৩।৪ মাস

পাঠের সময়ও ভালরূপে ভাগবতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং তার পর পাঠও বন্ধ হইয়াছিল।

(খ) পুনরায় অধ্যয়ন প্রবৃত্তির সঞ্চার

আবার ২ বৎসর ভয়ঙ্কর রকমের বিপদ চলিল; এবং সেই সময়ে দ্বিতীয়বার লোকটাকে সবংশে নিপাতের উদ্যোগও হইল। বিপদের বহর দেখিলে তখন সত্ত্বগুণ যে অত্যন্ত প্রবল হইতেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। সত্ত্বের প্রাবল্যের দ্বারা সেই সঙ্গে আবরক শক্তির হ্রাস হওয়াও বুঝায়।

এই ভাবে আবরকের পরদা পাতলা হইতে হইতে, গুণসাম্য উৎপন্ন হইয়া যখন দ্বিতীয় কিস্তি শান্তির সময় আসিল, তখন প্রকাশ এবং আবরক শক্তি উভয়েই অনেকটা সমভাবাপন্ন হইয়াছিল। তখন ভাগবতের সহিত বাইবেলের সমন্বয় করিয়া অধ্যয়নের জন্য যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ শক্তির কার্য্য। ঐ শক্তির সহিত আবরক সমভাবাপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐ কার্য্যে উৎসাহ এক বৎসরকাল পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল (২২৯-৩০ পৃষ্ঠা)।

(গ) পুনরায় পাঠ বন্ধ

পুনরায় আবরক শক্তিতে বল সঞ্চার হওয়াতে, আবরকের প্রভাব এবং সত্ত্বগুণের দুর্ব্বলতা বশতঃ, পাঠ বন্ধ হইল (২৩২ পৃষ্ঠা)

(ঘ) আবার অধ্যয়ন প্রবৃত্তির সঞ্চার ও তাহার সংরক্ষণ

তার পরে আবার যে অধ্যয়ন প্রবৃত্তি জন্মিল, তাহার উৎপাদন প্রকাশ শক্তিরই কার্য্য। তখনকার বিপদ যে পূর্ণ সাত বছর অতি উগ্র মূর্ত্তিতে চলিয়াছে, সেই উগ্রতাও প্রকাশ শক্তির প্রচণ্ড তেজের পরিচয় দেয়। প্রকাশ শক্তির আকর্ষণ প্রভাবে গত ৮ বৎসর কাল লোকটীর মতি অধ্যয়ন কার্য্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। ১৩ হইতে ৫৩ অর্থাৎ ৪০ বৎসর যাবৎ ন্যূনাধিক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিপদ ভোগের পরে ভাগবত পাঠে প্রকৃত অধিকার জন্মিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদুপলক্ষে বাধা বিঘ্ন।

অবিদ্যার বশে শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রবৃত্তি

কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, কেহ বা অপর কোন রকমের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, শাস্ত্র অধ্যয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অপর অপর 'ব্যবসার' ন্যায় ইহাও একটী ব্যবসা। এই কার্য্যের জন্য সাত্ত্বিক প্রেরণায় প্রয়োজন হয় না। রাজসিক আকাঙ্ক্ষাই এই প্রেরণার উৎপাদন করে। এইভাবে শাস্ত্রপাঠ দ্বারা চিত্তবৃত্তির উন্নতি যে হইতে পারে না তাহা নয়, কিন্তু পাঠের সময়ে এত রাজসিক বা তামসিক ভাব আসিয়া পড়ে যে, উন্নতি হওয়া সুকঠিন। 'ব্যবসার' ভাব ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে বলিয়া অধ্যয়ন প্রবৃত্তিতে অবনতির দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

শাস্ত্রের এইরূপ ব্যবহার দ্বারা নানা দেশে ধর্ম্মের বিপ্লবই জন্মিয়াছে। অবিদ্যা বহু বস্তুকেই আপনার সহায় করে। অবিদ্যার প্রভাবে কেহ কেহ শাস্ত্রকেও কখন কখন আপন কদাচার সমর্থনের জন্য ব্যবহার করেন। ধর্ম্ম বিপ্লবের সময়ে, কিম্বা লোকের প্রবৃত্তি বশে, কোন কোন শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত দোষও ঘটিয়াছে। অতএব অমুক শাস্ত্রে এই কথা আছে বলিয়া তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ না করিয়া, শাস্ত্রবাক্যকে বিবেকের আলোকে বিচার করা অসঙ্গত নয়।

শাস্ত্রের অপব্যবহার

শ্রীভগবানের রাসলীলা অতি বিশুদ্ধ বস্তু। 'যথাদিপুরুষঃ ভজতে মুমুক্ষুন্', ব্রহ্ম যেমন মোক্ষকামীর সঙ্গে মিলিত হন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই ভাবে গোপীগণের মিলনের উৎসবই রাসলীলায় বর্ণিত আছে। এই মিলনের দোহাই দিয়া, কেহ যদি ব্যভিচারের সমর্থন করেন, তাহলে শাস্ত্রের অপব্যবহার করা হইল, ইহাই বলিতে হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রও পরম পবিত্র বস্তু, তাহারও অপব্যবহারের কথা শোনা যায়। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমি অমুক সার্থসিদ্ধি করিব, এইরূপ কোন বাসনার বশে, কেহ যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার প্রবৃত্তি যে তখন রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না।

অধ্যয়ন প্রবৃত্তির উদয় হইয়াও তাহা বজায় থাকে না

(ক) 'খোসমেজাজি' রকমের অধ্যয়ন প্রবৃত্তি

বিপৎকালে সত্ত্বগুণের প্রেরণায় অধ্যয়ন প্রবৃত্তি জন্মায় বটে, কিন্তু তাহা বজায় রাখাই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই পুস্তকের ২১৮ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে যে, ঘোর বিপদের পরে সাত্ত্বিকশক্তির প্রেরণায় একটী লোকের মনে শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। বিপদের পূর্ব্বে সেই লোকটী গীতা পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু সেই পাঠ 'খোসমেজাজি' ভাবের বস্তু ছিল, অর্থাৎ যখন 'সখ' হইবে তখনই পড়িব, মনে এই ভাবই ছিল, পাঠের জন্য আন্তরিক আগ্রহ ছিল না। যেমন থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিতে ইচ্ছা হইলে লোকে তথায় যায়, কাহার কাহারও পক্ষে শাস্ত্রপাঠ তেমনি একটা সখের ব্যাপার ভাবে থাকে। উহাতে সাত্ত্বিক ভাব থাকে না বলিলেও চলে।

প্রকাশ শক্তি প্রবল হইয়া বিপদ উৎপাদন করার কিছুদিন পরে প্রকাশ এবং আবরক শক্তিদ্বয়ের একের বলের কিয়দংশের হ্রাস ও অপরের বলের আংশিক বৃদ্ধি হইয়া যে নব শক্তির প্রকাশ হয়, তাহাকে **Resultant force** বলে; ইহাকে গুণ সাম্যের অবস্থাও বলা যায়। তখন সত্ত্বগুণে আর পূর্ব্ববৎ বল থাকে না, অর্থাৎ বিপৎকালে সত্ত্বগুণের যে বল পাঠের জন্য প্রেরণা উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা কমিয়া যায় অথবা মোটেই থাকে না।

বিপদের তাড়নায় যাহাদের মনে কোন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য

প্রবৃত্তি হয়, সেই বিপদের অবসানে যখন গুণসাম্য জন্মায়, তখন প্রেরণার অভাবে সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রবৃত্তিও বন্ধ হয়। গুণসাম্যের অবস্থায় তমোগুণের বল কিয়ৎপরিমাণে বেশী হওয়াতে, তমোগুণ অধ্যয়ন প্রবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে। অতএব অধ্যয়ন প্রবৃত্তির উপশম হয়।

অধ্যয়নে অধিকার

এই উপলক্ষে বলা আবশ্যক যে, 'অধিকারী' (অর্থাৎ যোগ্যতা) নামক অপর একটী বস্তুও আছে। ইহা পাঠকের চিত্তে গুণ বিশেষের প্রাধান্যের উপর নির্ভর করে। যে শাস্ত্রে যে গুণের প্রাধান্য থাকে, ঐ গুণ যদি কোন পাঠকের চিত্তে প্রবল না হয়, তাহলে তিনি সেই শাস্ত্র পাঠে 'অধিকারী' হন না।

ইতিপূর্ব্বে ২১৯-২০ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে যে, একটী লোক বিপদের তাড়নায় ভাগবত হইতে নারদোক্ত মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভাগবত পাঠ করিতে পারিলেন না, এই অধিকার লাভের চেষ্টা কিরূপে পুনঃ পুনঃ নিস্ফল হইয়াছিল এবং তাহা প্রাপ্তির পূর্ব্বে কি ভয়ঙ্কর বিপদ দশ বৎসর যাবৎ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহার আলোচনা ২৬৭-৬৯ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

আমরা যে শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকারী নহি, অর্থাৎ যে শাস্ত্রের ভাব গ্রহণের সামর্থ্য আমাদের নাই, তাহা পড়ার জন্য চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া, যে শাস্ত্রের অর্থ এবং ভাব গ্রহণের সামর্থ্য আমাদের আছে, সেই শাস্ত্রকেই একাগ্রভাবে অধ্যয়ন দ্বারা উপকার হয়। ঐরূপ শাস্ত্রপাঠ দ্বারা মানসিক উন্নতি হওয়াতে এই লাভ হয় যে, পূর্ব্বে আমাদের যে শাস্ত্রপাঠে 'অধিকার' ছিল না, সেইরূপ কোন কোন শাস্ত্র পাঠে অধিকার পরে জন্মায়।

পাণ্ডিত্যের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য, আপন ক্ষমতার অতীত শাস্ত্র অধ্যয়ন নামক 'ক্রীড়া' দ্বারা কেবল লোকের সময়ই নষ্ট হয়।

শাস্ত্র শ্রবণে বা অধ্যয়নে আগ্রহ

কষ্টি পাথরে যেমন সোণা পরীক্ষা করা যায়, আগ্রহ বস্তুটী দ্বারা আমরা তেমনি আপন আপন চিত্তের অবস্থা পরীক্ষা করিতে পারি। প্রথমে দেখা যাক্ যে, আগ্রহ কিরূপে জন্মায়। আমরা যখন কোন বস্তু পান ভোজন বা পরিধান করিয়া আনন্দ অনুভব করি, তখন আনন্দের স্মৃতি আমাদের চিত্তে অবস্থান করে, এবং তাহার প্রেরণা দ্বারা আমরা আবার সেই বস্তুটী চাই। এই প্রেরণা শক্তির নামই আগ্রহ। শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে পাঠকের বা শ্রোতার অন্তরে যদি আনন্দ জন্মায়, তাহা হইলে আনন্দের প্রেরণা শক্তি আগ্রহ উৎপাদন করে।

যে আনন্দের কথা বলা হইল তাহা কি বস্তু? পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় ভোগ সুখ উপলক্ষে এই বিষয়ের তত্ত্ব কথার আলোচনা করা হইয়াছে। আবরক শক্তির সংযোগ হওয়াতে বিশুদ্ধ জ্ঞান অবিশুদ্ধ রূপ ধারণ করিয়াছে, ঐ সংযোগ দ্বারা আনন্দময়ের বিশুদ্ধ আনন্দও অবিশুদ্ধ আনন্দের রূপ ধারণ করে। অবিশুদ্ধ আনন্দের প্রেরণা শক্তি দ্বারা কাম লোভ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া নানা বিভ্রাট উৎপাদন করে।

যিনি যে ভাবযুক্ত হইয়া শাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহার মনে সেইরূপ আনন্দ হয়। যাঁহাদের চিত্ত কামকলুষিত, তাঁহারা ভগবানের রাসলীলা শ্রবণ করিয়া লীলায় প্রাকৃত নর নারীর সংযোগের চিত্রই কল্পনা করেন, এবং তাহা হইতে তাঁহারা অবিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করেন বলিয়া ঐ লীলা কীর্ত্তনাদির জন্য অনুরোধ করেন। পুনরায় ঐরূপ আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা হওয়াতে লোকে আগ্রহের সহিত লীলা শ্রবণ করেন। জ্ঞানী বা ভক্ত ঐ লীলাতে বিশুদ্ধ আনন্দ পান, তাঁহার পক্ষে আগ্রহ উৎপাদক প্রেরণা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব হইতেই আসে।

আগ্রহ বিশুদ্ধই হউক আর অবিশুদ্ধই হউক, যখন কেহ কোন শাস্ত্র শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন অন্ততঃ দেখা যায় যে, শাস্ত্রের ভাব শ্রোতার বা অধ্যয়নকারীর অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। আগ্রহশূন্যতা অপেক্ষা অবিশুদ্ধ আগ্রহও মঙ্গলকর। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, আদিতে অন্তরে অবিশুদ্ধ ভাব থাকিলেও ভগবৎ শক্তি প্রভাবে তাহাই বিশুদ্ধভাবে পরিণত হইয়াছে; ভাগবত বলেন যে ভগবান 'হৃদ্যন্তস্থঃ' হইয়া অশুচি বস্তুকে শুচি করেন, কারণ তিনি 'সতাং সুহৃৎ'। আগ্রহ প্রকৃতপক্ষে ভগবানকেই আশ্রয় করে, অতএব অশুচি হইলেও ভগবৎ কৃপায় তাহারই শুচি হওয়া বিচিত্র নয়।

শাস্ত্র পাঠে বিঘ্ন

'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', যখন কেহ প্রকৃষ্ট আগ্রহের সহিত শাস্ত্র অধ্যয়নে বা শ্রবণে নিরত হন, তখন তাঁহার চিত্তে সত্ত্বগুণ প্রবল হইতে চায়; পূর্ব্বে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির বলের মধ্যে যে অনুপাত (ratio) ছিল, সত্ত্বগুণে বলাধিক্য হওয়াতে তাহার ব্যতিক্রম হয়। এই অবস্থাকে 'গুণসাম্যের' ব্যতিক্রম হওয়া বলে (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গুণসাম্যের ব্যতিক্রম হইলে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষণের তেজ বৃদ্ধি হইয়া বিপদ জন্মায় এবং তাহার আনুসাঙ্গিক চিত্তচাঞ্চল্য মনঃপীড়া প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, এবং প্রকাশ শক্তির কার্য্যকে নিরর্থক করায় অন্য আবরক শক্তি কখন কখন অপর বিঘ্নও উৎপাদন করে।

অন্যত্র দেখান হইয়াছে যে, গুণত্রয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করার শক্তি আছে। তান্ত্রিকগণ সিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে তাঁহাদের সাধনায় নানা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, ঐ সময়ে যে সাধক অবিচলিত থাকেন তাঁহারই সিদ্ধিলাভ হয়। এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম উপলক্ষে যে প্রয়াস করিতে

হয়, তাহা দ্বারা ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের আরও পুষ্টি হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬৯ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে যে, পূর্ণ ৪০ বৎসর যাবৎ নানা বিঘ্ন হওয়ার পরে, একটী লোক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে 'অধিকার' লাভ করিয়াছিলেন।

ভয় করিলে কখনই শাস্ত্র পাঠে 'অধিকার' জন্মায় না

অধিকার লাভের পূর্ব্বে সত্ত্বগুণের দ্বারা সৃষ্ট ঘোর বিপদের প্রেরণায় তিনবার সেই লোকটী ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন এবং তিনবারই ছাড়িয়া দেন। ভাষান্তর ব্যবহার করিয়া বলা হইয়াছে যে, লোকটী তখন অধ্যয়নে 'অধিকারী' ছিলেন না, সেইজন্য অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 'অধিকার' বস্তুটী ত গাছের ফল নয় যে, সংগ্রহ করিলেই আয়ত্তে আসিবে। ইহা সত্ত্বগুণের প্রাধান্যেরই লক্ষণ; সত্ত্বগুণের যে পরিমাণ প্রাধান্য হইলে আমাদের শাস্ত্র বিশেষ অধ্যয়নে 'অধিকার' (=যোগতা) জন্মায়, সেই প্রাধান্য বিনা চেষ্টায় জন্মায় না। পাঠ উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ বাধা বিঘ্ন এবং বিপদ-ভোগ করিতে করিতে, এবং সেই সময়ে আপন ক্ষমতা অনুসারে সাধনাও করিতে করিতে, ক্রমশঃ যখন সত্ত্বগুণ পুষ্ট হয়, সেই পুষ্টি দ্বারা অধিকার জন্মায়। আমি অমুক শাস্ত্রে অনধিকারী, এই ধারণার ভয়ে যিনি আপন শক্তির উপযোগী অপর কোন শাস্ত্রই পড়েন না, তাঁহার অধিকার কোনকালেই জন্মায় না।

শুভকার্য্যে বিঘ্ন না হওয়াই আতঙ্কের বিষয়

কোন ভাল কাজ করার সময় যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন ইহাই প্রকাশ পায় যে, সত্ত্বগুণ প্রবল হইতে চাহিতেছে বলিয়া তমোগুণ বাধা দিতেছে। আমাদের সকলের অন্তরেই তমোগুণ আছে এবং অনেকের চিত্তে উহা প্রবলভাবেই আছে। সুতরাং সত্ত্বগুণ প্রবল হইতে উদ্যম করিলে বিঘ্ন উৎপন্ন হওয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের স্বাভাবিক কার্য্যেরই ফল।

যদি বাধা বিঘ্ন না হয়, তখন আশঙ্কার কারণ এই থাকে যে, আমরা যে কাজকে ভাল মনে করিয়া করিতেছি, তাহা কি প্রকৃতপক্ষে ভাল কাজ নয়? তাহাতে প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাব নাই বলিয়াই কি তমোগুণ আমাদের উদ্যমে বাধা দিতেছে না? কোন সত্ত্বপ্রধান শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় বিঘ্ন না হইলে অধ্যয়নকারীর ভাবা উচিত যে, আমার মতি কি প্রগাঢ় ভাবে শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইতেছে না? আমি শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই কি, অধ্যয়ন দ্বারা আমার চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্দীপনা হইতেছে না? অধ্যয়নের দ্বারা আমার চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্দীপনা হইতেছে না বলিয়াই কি তমোগুণ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে না?

আমরা স্বভাবতঃই ভাবি যে, আমরা ঠিক ভাবেই পাঠ করিতেছি, এবং তখন কোন বিঘ্ন হইলে ভীত হই। বিঘ্ন হইলে অন্ততঃ ইহা প্রকাশ হয় যে সত্ত্বগুণের উদ্দীপনা হইতেছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, বিঘ্ন নিজেই একটী শুভ লক্ষণ। বিঘ্ন হইল না দেখিয়া চিত্তপ্রসাদ না হইয়া, বরঞ্চ পাঠকের মনে উপরোক্ত রকমের আশঙ্কা হওয়া ভাল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)।

Staticsএর নির্দ্ধারণের সহিত দার্শনিক প্রতিপাদনের সমন্বয়

Statics এর নির্দ্ধারণ

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় **statics** শাস্ত্রে প্রতিপাদিত একটী নিয়মের আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, 'আমাদের চিত্তে যতই 'সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতে থাকে, তত আবরক-বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য- 'পটুতায় বল বাড়িতে থাকে ; এবং কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণের হ্রাসের 'সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তির বলের হ্রাস হয়'। এই বিষয়টীর আরও আলোচনা

করিয়া ১৭০-৭১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, গুণের পরিমাণ দ্বারা জীবের উন্নতি বা অবনতির মাত্রার নির্দ্ধারণ হয় না; জীবের চিত্তে গুণত্রয়ের ক্রিয়াপটুতা দেখিলে উন্নতি বা অবনতি হওয়া না হওয়া বুঝিতে পারা যায়। যাঁহার ক্রিয়াপটুতা বেশী দেখা যায় তাঁহার উন্নতি হইয়াছে (অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মের সান্নিধ্যে গমন করিয়াছেন), এবং যাঁহার ক্রিয়াপটুতা অল্প তাঁহার অবনতি হইয়াছে (অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম হইতে দূরে গমন করিয়াছেন), ইহাই প্রকাশিত হয়।

Statics শাস্ত্রে নির্দ্ধারণের মূল্য

এই পুস্তকের পরবর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে,'স্বরূপশক্তি' কি বস্তু তাহা আলোচনা উপলক্ষে দেখান হইবে যে, যাঁহাকে আমরা ব্রহ্ম বলি, স্বরূপশক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন নয়। তিনিই অনন্তশক্তির আধার, এবং যে শক্তিকে আমরা 'গুণ' বলি, ব্রহ্মই সেই শক্তির উৎপত্তি স্থান। পঞ্চদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে 'গুণসাম্যের' আলোচনায় দেখান হইবে যে, বহির্জগতে শক্তির কার্য্য উপলক্ষে বিজ্ঞান বহু **experiment** দ্বারা যে সকল সারভূত নিয়মের প্রতিপাদন করিয়াছেন, অন্তর্জগতে গুণের কার্য্যও তদনুরূপ নিয়মের অধীন। যে শক্তিকে আমরা 'গুণ' আখ্যা প্রদান করিয়াছি, তাহা এবং বহির্জগতে ক্রিয়াশীল **energy** শক্তি, স্বতন্ত্র বস্তু নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে, বহির্ এবং অন্তর্জগতে, ঐ একই শক্তি হইতে ভিন্ন ভিন্ন **attributes**এর, অর্থাৎ বিভূতির, প্রকটন হইয়াছে,এবং তাহাদের পৃথক পৃথক নামকরণ হইয়াছে।

সার কথা এই যে, **Statics** শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত নিয়মটীকে গুণত্রয়ের ক্রিয়ার উপর প্রয়োগ কবিলে দেখা যায় যে, জীব যত ব্রহ্মের সান্নিধ্যে আগমন করেন, অর্থাৎ জীবের অন্তরে যত সত্ত্বগুণের পুষ্টি হইতে থাকে, তত সত্ত্বগুণের শক্তিতে বলের বৃদ্ধি হয়; এবং জীব ব্রহ্ম হইতে যত দূরে গমন করেন, অর্থাৎ জীবের অন্তরে যত তমোগুণের

(=আবরক শক্তির) পুষ্টি হয়, তত তমোগুণের বলের হ্রাস হয়। এই নির্দ্ধারণটীর মূল্য অত্যন্ত বেশী, এবং দর্শনশাস্ত্র অপর এক ভাবের যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া যে প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা এই নির্দ্ধারণটীর পোষণ করে।

গুণত্রয়ে বলের হ্রাস বৃদ্ধির মূখ্য কারণ

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে 'গুণত্রয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রকৃত অবস্থা' নামক মন্তব্যে প্রকৃতির গুণত্রয় স্বরূপতঃ কি বস্তু তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ বিষয়ের পুনরুক্তি না করিয়া সংক্ষেপে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে সংসারে কেবল একই গুণ আছেন, তাঁহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং তিনিই ব্রহ্ম। 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' 'সংসার ব্রহ্মময়', এই বাক্য বলিলে যাহা বুঝায়, সংসার 'বিশুদ্ধ' সত্ত্বগুণের বিকার (=রূপান্তর), এই কথা বলিলেও, তাহাই বুঝায়।

ইতিপূর্ব্বে নানাস্থানে বলা হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত আবরক বিক্ষেপ শক্তির সংযোগের দ্বারা বিকার কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সংযোগ দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই রূপান্তরিত হইয়া মিশ্রসত্ত্ব, প্রকৃষ্ট রজঃ, নিকৃষ্ট রজঃ, এবং তমোগুণ, এই চারি নাম ধারণ করিয়াছেন। এই গুণচতুষ্টয়ে বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহাতে যত বেশী পরিমাণে আবরক শক্তি সংযুক্ত হইয়াছে তাহার বলেরও তত হ্রাস হইয়াছে।

অতএব আবরক শক্তির ন্যূনাধিক্যই বলের বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণ। প্রকৃতির এই চারি গুণের সকলের মধ্যেই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিরাজ করিতেছেন।

সত্ত্বগুণে আবরক শক্তির সংযোগের ফল

আমরা দেখিতে পাই যে, কোন উজ্জ্বল আলোকের উপর এক খানি পাতলা পরদা ধরিলে সেই আলোকের প্রভা হ্রাস হয়, এবং

পরদার উপর নূতন নূতন পরদা যোগ করিয়া আচ্ছাদনকে যত পুরু করা যায়, আলোকের প্রভা তত কমিতে থাকে। নির্ম্মল আকাশে যদি একখানি পাতলা মেঘ আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে আচ্ছাদন করে, তাহলে চন্দ্রের প্রভা অতি অল্প মাত্রায় কম হয়, কিন্তু আবরণ যত বেশী গাঢ় হইতে থাকে, চন্দ্রও তত নিস্প্রভ হয়।

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত যখন ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আবরক শক্তির সংযোগ হয়, তখন আবরক শক্তি, আলোকের উপর আচ্ছাদন কিম্বা পূর্ণ চন্দ্রের উপর মেঘের ন্যায়, সত্ত্বগুণের প্রকাশ এবং ক্রিয়া-শক্তিকে খর্ব্ব করে।

প্রকাশ এবং ক্রিয়াশক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের মুখ্য বিভূতি। উপরে বর্ণিত গুণ চতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বেশী বেশী মাত্রায় আবরক শক্তির সংযোগ হওয়াতে, বিশুদ্ধ সত্ত্ব অপেক্ষা মিশ্রসত্ত্বে প্রকাশ এবং ক্রিয়া-শক্তির পরিমাণ অল্প. 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণে আরও অল্প, 'নিকৃষ্ট' রজোগুণে তার চেয়েও কম, এবং তমোগুণে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে প্রকাশ এবং ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়।

গুণভেদে লোকের আচরণের বৈশিষ্ট্য

আবরক শক্তির সংযোগ দ্বারা ক্রমশঃ কোন গুণে প্রকাশ শক্তির হ্রাস হওয়ার সময়ে তাহাতে ক্রিয়াপটুতাও কমিতে থাকে। তাই আমরা সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত মানবকে জ্ঞানী এবং কর্ম্মপটু হইতে দেখিতে পাই।

রজোপ্রধান মানবের আচরণ

'প্রকৃষ্ট' রাজসিক ভাবাপন্ন মানবের চিত্তে

(ক) বহু পরিমাণে সত্ত্বগুণ থাকাতে সেই গুণের প্রকাশ শক্তির প্রভাবে নীচতা ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি দোষ থাকে না

(খ) এবং সত্ত্বের ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের মনে বিপুল কর্ম্মপটুতা থাকে,

(গ) আবরক শক্তির মাত্রা অত্যল্প হওয়াতে তাঁহারা বিপদে ভীত হন না, মরিতেও ভয় করেন না, ভাঙ্গেন তবু মচকান না। আবরক শক্তি তাঁহাদের অন্তরে আত্মগরিমায় বিরাট মূর্ত্তি সৃষ্টি করে। যদি আবরকের পরিমাণ কিছু বেশী হয়, তাহলে 'আত্মগরিমা' অর্থাৎ self-relianceএর বদলে 'আত্মগর্ব্ব' অর্থাৎ self-conceit দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৯ ও ২০৮-০৯ পৃষ্ঠায় এই শ্রেণীর জনৈক ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

'নিকৃষ্ট' রাজসিকের চিত্তে সত্ত্বগুণের পরিমাণ বেশী নয়, অতএব ক্রিয়াশক্তির স্বল্পতাবশতঃ তাঁহাদের বেশী কর্ম্মপটুতা থাকে না। প্রকাশ শক্তির মাত্রাও বেশী না হওয়াতে, তাঁহারা আপন চেষ্টা দ্বারা কোন অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে না পারিলে ফিকির ফন্দির দ্বারা আপন মতলব সিদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন না। 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক ভাবাপন্ন মানবের সত্ত্বপ্রধান মতি যে সকল উপায়কে হেয় এবং আত্মমর্য্যাদার খর্ব্বকারী বলিয়া ঘৃণা করে, নিকৃষ্ট রাজসিক ভাবাপন্ন মানবের অন্তরে প্রকাশ শক্তির স্বল্পতা বশতঃ ঐরূপ কতক উপায় সমাদৃত হয়।

(ঘ) 'নিকৃষ্ট' রাজসিক মানবের অধঃপতন

ফিকির ফন্দি করিতে করিতে আবরক শক্তির মাত্রা দিন দিন বাড়িতেই থাকে। ক্রমশঃ এমন অধঃপতন হয় যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই শ্রেণীর কেহ কেহ কোন রকম মিথ্যা, শঠতা জাল, জুয়াচুরি করিতেই পশ্চাৎপদ হয় না। অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ শক্তি দুর্ব্বল এবং আবরক শক্তি পুষ্ট হইতে থাকে; অতএব দুষ্কার্য্য করার সময় প্রকাশ শক্তি আলরকের কার্য্যে বাধা দিতে অক্ষম হয়। আবরক শক্তির প্রাধান্য স্থাপনের প্রারম্ভে ঐ শক্তি ফিকির ফন্দির বা অত্যধিক লোভের প্রভাবে সম্পাদিত কোন কোন কার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে। প্রকাশ শক্তি দুর্ব্বল হওয়াতে সিদ্ধিদানের সময় আবরক শক্তি কোন বাধা পায় না। সিদ্ধি লাভ দ্বারা আরও অধঃপতন হয়, ও এই শ্রেণীর অনেকে তামসিক ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়।

তমঃপ্রধান মানবের লক্ষণ

যখন চিত্তে তমোগুণের প্রাধান্য হয়, তখন জ্ঞানের হ্রাস এবং মোহের বৃদ্ধি হইয়া লোকের গতি জড়ত্বের দিকে চলে। ইঁহাদের ধীশক্তির তীক্ষ্ণতা থাকে না, কারণ চিত্তে প্রকাশ শক্তির মাত্রা অতি অল্প। ক্রিয়াশক্তির স্বল্পতা বশতঃ উদ্যম, উৎসাহ বা ক্রিয়াপটুতা থাকে না। আবরক শক্তির প্রাধান্য বশতঃ মিথ্যা শঠতা প্রভৃতিতে এই সকল লোকের ঘৃণা নাই, কেবল ক্রিয়াপটুতা অল্প বলিয়াই 'নিকৃষ্ট' রাজসিক মানবের ন্যায় ইঁহারা আগ্রহের সহিত দুরাচার করেন না। যখন এইরূপ আচরণ দ্বারা বিশেষ কোন স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগ হয়, তখন ইঁহারা দুরাচারে পশ্চাৎপদ হন না। আলস্যই ইঁহাদের চিত্তে তামসিক আচরণের প্রধান অঙ্গ।

বিজ্ঞের মত কথা কহিয়া 'বরাতের' দোহাই দিয়া এই সকল মানব জীবনের 'দিন কটা' কাটাইতে চান। 'বরাত' যে কি বস্তু, তৎসম্বন্ধে ইঁহাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। অলস মানব পুরুষানুক্রমে ঐ চলতি কথা বলিয়া আপন আলস্যকে আচ্ছাদন করে, এবং অজ্ঞানকে জ্ঞানের বেশ ধারণ করায়। এই শ্রেণীর মানব পশু অপেক্ষা একটু উচ্চস্তরে থাকে। তমঃপ্রধান জীব কখন মানব, কখন বা তির্য্যক যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে।

Statics যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন দর্শনও সেইরূপ নির্দ্ধারণ করেন

Statics যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার ফল দাঁড়ায় এই যে, জীব গুণের উৎপত্তিস্থানের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) যত সান্নিধ্যে গমন করে, তত তাহার অন্তরে গুণের বল, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি, বাড়িতে থাকে। 'সান্নিধ্যে গমন', এইবাক্য দ্বারা বুঝায় এই যে, আবরক শক্তির হ্রাস হওয়াতে চিত্তের বিশুদ্ধি কিছু বাড়িয়াছে। ব্রহ্মই 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' এবং যখনই ঐ বিশুদ্ধ বস্তুর উপর তমোগুণের আবরণ পড়ে তখন: বিশুদ্ধির হ্রাস,

অর্থাৎ অবিশুদ্ধ ভাবের পুষ্টি হয়। অতএব গুণের উপর হইতে আবরণ যত কমিতে থাকে গুণ তত ব্রহ্মের সান্নিধ্যে গমন করিতেছে, অর্থাৎ গুণ তত ব্রহ্মের বিশুদ্ধ সত্বের সহিত সম-ভাবাপন্ন হইতেছে, ইহাই বুঝায়। অতএব Statics এবং দর্শন শাস্ত্র উভয়ের প্রতিপাদনের মর্ম্ম এই যে, সত্বগুণ যত বিশুদ্ধ হইতে থাকে তত তাহার ক্রিয়াপটুতা বেশী হয়।।

ক্রিয়া পটুতার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ শক্তি অর্থাৎ জ্ঞানও বাড়ে। জ্ঞানের আলোচনা Staticsএর সীমার অন্তর্ভূর্ত নয়, সেই জন্য Staticsএই বিষয়ে কিছু বলেন না। জ্ঞানও ক্রিয়াশক্তির সহিত নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং যে নিয়মের বশে ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা দ্বারা জ্ঞানেরও বৃদ্ধি হয়। অতএব বলের বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের প্রতিপাদনকে জ্ঞান উপলক্ষেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দর্শনের নির্দ্ধারণ Staticsএর অনুরূপ। আবরক শক্তি যত কমিতে থাকে, তত প্রকৃতির গুণত্রয়ের অভ্যন্তরে স্থিত বিশুদ্ধ সত্ব গুণের প্রকাশ এবং ক্রিয়াশক্তির উপরের আচ্ছাদন পাতলা হয়, অতএব জ্ঞান ক্রমশঃ বিশুদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রিয়া পটুতাও বাড়িতে থাকে। দর্শন শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের মীমাংসা দ্বারা একই তত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

গুণসাম্য এবং নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থা

Resultant force.

যে শাস্ত্রে বহির্জগতে ক্রিয়াশীল শক্তির কার্য্য প্রণালীর নিয়ম সকলের নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের নাম **Statics**। বহির্জগতে শক্তির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যখন একই বস্তুর উপর দুইটী প্রতিকূল শক্তির প্রয়োগ করা যায়,

তখন যদি একটী শক্তি অপরকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিতে না পারে, তাহলে শক্তিদ্বয় যতক্ষণ পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য চেষ্টা করে, ঐ সময়ে বস্তুটী দোটানার মধ্যে পড়াতে তাহাতে চাঞ্চল্য দেখা যায়।

এই চাঞ্চল্য যে বরাবরই বজায় থাকে, তাহা নয়। Order ও harmony, অর্থাৎ সাম্যাবস্থা উৎপাদন করা ও তাহা বজায় রাখা, হইল প্রকৃতির নিয়ম। ব্রহ্ম স্বয়ং 'শান্তং শিবং সুন্দরং'; ঐ উৎকর্ষ প্রকৃতিতেও থাকে, সেই জন্য প্রকৃতিও সাম্যাবস্থা উৎপাদন করিতে চান। অতএব কিছুক্ষণ চাঞ্চল্য চলার পরে, প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের সংযোগে এক তৃতীয় শক্তি উৎপন্ন হয়; ঐ তৃতীয় শক্তির বৈজ্ঞানিক নাম **Resultant force**। এই তৃতীয় শক্তি উৎপন্ন হওয়ার পরে, বস্তুটী উপরোক্ত প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের কোনটীরই অনুসরণ করে না, কিন্তু আংশিকভাবে উভয় শক্তিই সেই তৃতীয় শক্তিতে বিদ্যমান থাকে। এবং তৃতীয় শক্তি প্রকাশ হওয়ার পরে প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের মধ্যে সাম্যবস্থা (অর্থাৎ স্থিরতা) বিদ্যমান থাকে। পূর্ব্বে বস্তুটীতে যে চাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, সাম্যাবস্থা প্রকাশ হওয়ার পরে তাহা থাকে না।

Resultant শক্তি প্রকাশ হওয়ার সময়ে প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের বলে যে পরিমাণ ছিল, যদি তাহার ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ শক্তিদ্বয়ের কাহারও (অথবা উভয়ের) বলের মাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া তাহাদের আপেক্ষিক মাত্রা (ratio) যদি পূর্ব্বের মত না থাকে, তাহলে Resultant শক্তি বিনষ্ট হইয়া পুনরায় গুণের মধ্যে সংঘর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং তখন স্থির ভাব দূর হইয়া বস্তুটীতে চাঞ্চল্য প্রকাশ হয়। কিছুক্ষণ চাঞ্চল্য চলার পরে যখন আবার নূতন Resultant শক্তি জন্মায়, তখন পুনরায় সাম্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদি প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের মধ্যে ঘন ঘন বলের তারতম্য হয়, তাহলে সময় অভাবে Resultant শক্তি প্রকাশ হওয়ার জন্য

সুযোগ হয়না, কারণ শক্তিদ্বয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ দ্বন্দ্ব চলিতে চলিতে, তাহাদের পরস্পরের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া বলের adjustment না হইলে, **Resultant** শক্তি জন্মিতে পারে না। অতএব তৃতীয় শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল শক্তি সকলের বল কিছুক্ষণ একই ভাবে থাকা আবশ্যক হয়। যখন এই জন্য সময়ের অভাব হয়, তখন সাম্যাবস্থা প্রকাশ না হইয়া চাঞ্চল্যই অবিরত ভাবে চলিতে থাকে।

সুতরাং যখন পুনঃ পুনঃ বলের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়, তখন সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হইয়া অবিচ্ছেদ ভাবে চাঞ্চল্যই বজায় থাকে।

যখন দুইটী অপেক্ষা অধিক প্রতিকূল শক্তি একই বস্তুর উপর কার্য্য করে, তখনও **Resultant** শক্তি জন্মায়; এবং ঐ শক্তির উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ উপরে আলোচিত নিয়মের বশেই চলে।

গুণত্রয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের শুভফল

আমাদের মন ও বুদ্ধির উপর প্রকৃতির গুণত্রয় যে পরস্পরের প্রতিকূল আচরণ করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ এবং আবরক নামক দুইটী শক্তিরই কার্য্য। সংসারে একই গুণ আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং তাহাই ব্রহ্ম। বিভু সৃষ্টিলীলা সম্পাদনের জন্য আপন বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সংযোগ করিয়া, ঐ বিশুদ্ধ বস্তুকেই প্রকৃতির গুণত্রয় নামে রূপান্তরিত করিয়াছেন, (২৭-২৯ পৃষ্ঠা)।

গীতা বলেন যে, গুণত্রয় পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য অবিরত কার্য্য করিতেছে; সত্ত্বগুণের প্রভাবেই এই দ্বন্দ্ব চলে। গুণত্রয়ের সকলের অভ্যন্তরেই রসত্ত্বগুণ আছেন, ক্রিয়াশক্তি সত্ত্বগুণের একটী মুখ্য অঙ্গ, ঐ শক্তি সকল গুণের অভ্যন্তরে থাকাতে তাহার প্রভাবে গুণত্রয় কার্য্য করে।

গুণত্রয় যখন কার্য্য করিতে থাকে, তখন তমোগুণ সত্ত্বগুণের প্রকাশ শক্তির উপর নিজের 'আবরক' নামক পরদা স্থাপন

করিতে চায়, এবং সত্ত্বগুণও আপন প্রকাশ শক্তি দ্বারা তমোগুণ হইতে ঐ আচ্ছাদন দূর করিতে চায়। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ আপন প্রকাশ শক্তির প্রভা দ্বারা অবিদ্যার অন্ধকার দূর করিয়া তমোগুণের অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশক্তির স্ফূরণ করিতে চায়, এবং তমোগুণ সত্ত্বগুণের প্রকাশ শক্তির প্রভা এবং ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছন্ন করিতে চায়।

যদি মোটের উপর সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তাহলে অবিদ্যা আপন আবরক শক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপরে যে আচ্ছাদন স্থাপন করিয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে তমোগুণে পরিণত করিয়াছে (২৯ পৃষ্ঠা), সেই আচ্ছাদন পাতলা হইতে থাকে এবং তখন তমোগুণের রূপান্তর হয়। যাহা আগে ছিল 'তমোগুণ', আবরণ পাতলা হওয়াতে তাহা 'নিকৃষ্ট' রজোগুণে পরিণত হয়; 'নিকৃষ্ট' রজোগুণ 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক ভাব প্রাপ্ত হয়; প্রকৃষ্ট রজঃ 'মিশ্র' সত্ত্বগুণে এবং 'মিশ্র' সত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ হইলে জীব সংসার হইতে মুক্ত হইয়া উচ্চলোকে গমন করেন।

(ক) গুণের শক্তির উপর সংস্কারের প্রভাব

গুণত্রয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হইল, তাহা প্রকৃত পক্ষে প্রকাশ শক্তি এবং আবরক শক্তির মধ্যে বলের পরীক্ষা। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে যে সংস্কার সকলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহারা গুণেরই নামান্তর। গুণত্রয়ের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব চলে, তখন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম বিশিষ্ট সংস্কারের উদ্দীপন হয়; এবং তাহারা আপন আপন স্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট গুণের সহিত মিলিত হইয়া সেই সেই গুণের বলের বৃদ্ধি করে। অতএব কেবল যে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির স্বীয় তেজের প্রভাবে তাহাদের বলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহাই নয়; প্রাক্তন সংস্কারের উদ্দীপনও শক্তিদ্বয়ের বলের হ্রাস-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

গুণত্রয়ের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি লাভের সুযোগ

সংস্কার সকলের প্রভাব চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, যে পুরাকল্পে জীব সর্ব্বপ্রথমে এই ভোগালোকে আগমন করিয়াছেন, সেই সময়

হইতেই তাঁহার চিত্তে গুণের শক্তির জমা-খরচ হইতে হইতে 'নেট' বলের জের জন্ম হইতে জন্মান্তরে চলিয়া আসিতেছে। জীবের লিঙ্গদেহ জন্ম হইতে জন্মান্তরে জীবকে অনুসরণ করে, এবং তাহাতে ঐ বলের জের অবস্থান করে। গুণত্রয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্বারা জীব সংসার হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য সুযোগ লাভ করুক, সেই জন্য আদি কল্প হইতে বরাবরই গুণত্রয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। অতএব গুণত্রয় যে পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য চেষ্টা করে, তাহার চরম লক্ষ্য যে জীবের পক্ষে হিতকর, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

Up-to-date record of progress

প্রারব্ধের শক্তি প্রভাবে জীব নানা লোকে এবং নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছেন (১১২-১১৬ পৃষ্ঠা)। ঐ অবস্থায় তাঁহার চিত্তে প্রকাশ বা আবরক শক্তির যতটুকু বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে থাকে, তাহার জমা খরচ হইয়া সংস্কারের শক্তির nett, অর্থাৎ অবশিষ্ট মাত্রা সংস্কারের সহিত 'লিঙ্গ শরীরে' অবস্থান করে, (১৭-১৮ পৃষ্ঠা)। মৃত্যুর সময় জীবের লিঙ্গদেহে স্থিত সংস্কার সকলই তাঁহার উন্নতি বা অবনতির অবস্থা প্রকাশ করে। এই হিসাব up to date ভাবে থাকে। এক দিনের তরেও ঐ জমা খরচের হিসাব বাকি পড়িয়া থাকে না।

জীবকে মোক্ষলাভের যোগ্যতা প্রদান

গুণত্রয়ের মধ্যে সঙ্ঘর্ষণ উপলক্ষে সার কথা এই যে, গুণত্রয় পরস্পরকে অভিভূত করার জন্য অবিরত যে কার্য্য করিতেছে, তাহার মুখ্য লক্ষ্য হইল জীবের চিত্ত হইতে আবরক শক্তির আচ্ছাদন দূর করিয়া, জীবকে সংসার হইতে 'মুক্তি' লাভের উপযোগী করা, অর্থাৎ জীব যাহাতে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া অনন্ত শান্তিময় এবং অবিচ্ছেদ আনন্দময় উচ্চলোকে গমনের

জন্য যোগ্যতা লাভ করিতে পারে সেই জন্যই গুণত্রয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। তাই কবির ভাষায় বলি—

Slowly slowly let us range,
Down the ringing grooves of change.

'গুণসাম্য' কাহাকে বলে

Resultant শক্তি উপলক্ষে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে 'গুণসাম্য' উপলক্ষে বক্তব্য অনেক কথা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বহির্জগতে **energy** অর্থাৎ শক্তির কার্য্য এবং অন্তর্জগতে গুণের কার্য্য একই ভাবে চলে। চলারই কথা, কারণ বহির্জগতে ক্রিয়াশীল energy এবং অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল 'গুণ' উভয়ে একই বস্তু। কারণ তাহারা উভয়েই ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিরই অঙ্গ। কেবল স্থান এবং অবস্থা ভেদে ঐ দুই বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন attributes এর, অর্থাৎ লক্ষণের বা বিভূতির, প্রকাশ হওয়াতে, আমরা ঐ শক্তিদ্বয়কে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করি।

বহির্জগতে প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের বলের ব্যতিক্রম দূর হইলে যেমন **Resultant** শক্তি নামক সাম্যাবস্থা জন্মায়, সেইরূপ আমাদের অন্তরে প্রকাশ এবং আবরক ধর্ম্মযুক্ত শক্তিদ্বয় কার্য্য করার সময়ে, যদি কিছুদিন তাহাদের বলের ব্যতিক্রম না হয়, তাহলে ঐ শক্তি দ্বয়ের মধ্যে সাম্যাবস্থা জন্মায়। এই সাম্যাবস্থাকে **গুণসাম্যের** অবস্থা বলে। **Resultant** শক্তি বহির্জগতে চাঞ্চল্যের উপশম করে। 'গুণসাম্য'ও জীবের চিত্তে চাঞ্চল্যের উপশম করে। Resultant শক্তি প্রকাশ হওয়ার পরে প্রতিকূল শক্তিতে বলের ব্যতিক্রম হইলে তাহা বিনষ্ট হয়, এবং বস্তুর স্থির ভাব দূর হইয়া পুনরায় চাঞ্চল্যের অবস্থা দৃষ্ট হয়; আমাদের অন্তরেও গুণ-সাম্যের বিনাশ হইলে চিত্তের শান্তভাব বিনষ্ট হইয়া পুনরায় চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। এই চাঞ্চল্যের অবস্থাকে আমরা বিপদ বলি।

বিপদ্‌ কালে চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ কি।

যদি দুইটী প্রতিকূল শক্তি একই সময়ে একই বস্তুর উপর আপন বল প্রকাশ করিতে থাকে তাহলে ঐ বস্তু একই সময়ে উভয় শক্তির অধীন হওয়াতে, কখন সেই বস্তুটী একটী শক্তির অনুসরণ করে, এবং পরক্ষণে অপর শক্তির অনুসরণ করে; এই দোটানার অবস্থায় থাকার সময়ে বস্তুটী স্থিরভাবে থাকিতে পারে না, তাহাতে নিয়ত চাঞ্চল্যই প্রকাশ পায়। কিছুক্ষণ এইরূপ চঞ্চল ভাব চলার পরে যখন **Resultant** শক্তি সৃষ্ট হয়, তখন প্রতিকূল শক্তিদ্বয়ের মধ্যে যেন একরকম 'রফা-রফি' ভাব হইয়া চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয়।

আমাদের চিত্ত যদি একই সময়ে ভগবানের দিকে এবং বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহলে না পারে ভগবানের দিকে যাইতে এবং না পারে বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতে; আমাদের মতি তখন দোটানের মধ্যে পড়িয়া অস্থির হয়। এইভাব কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে অন্তরে যখন গুণসাম্য স্থাপিত হয়, তখন দোটানার মাঝামাঝি এক প্রকার অবস্থা হয় যে অবস্থায় চিত্তে চাঞ্চল্য থাকে না। অতএব দেখা গেল যে, যখন একাধিক প্রতিকূল শক্তি (অর্থাৎ গুণ) যুগপৎ চিত্তের উপর কার্য্য করে তখন মতি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গুণের অনুসরণ করাতে চাঞ্চল্য হয়। বিপৎকালে প্রকাশ ও আবরক শক্তির সংঘর্ষণ হওয়াতে চিত্তে চাঞ্চল্য হয়।

বিপদের সময় কেন যাতনা জন্মায়

গুণসাম্যের ব্যতিক্রম হইলে বিপদ হয়, এবং তখন চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে ১৬০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, গুণসাম্যে সুখ এবং তাহার ব্যতিক্রমে দুঃখ হয়; কেন এবং কিরূপে সুখ বা দুঃখ জন্মায় তৎসম্বন্ধে তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়া বিষয়টীকে একটু বিশদ করা আবশ্যক।

অবিদ্যা যে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের

মনে দেহের উপর 'মমত্ব' ভাব জন্মায়। মমত্ব ভাবের শক্তি এতই প্রবল যে, লোকে নরকে থাকার সময় তাহার একটু যাতনার উপশম হইলে যদি সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তোমার এই দেহ খানিকে ত্যাগ কর তাহলে সর্ব্ববিধ যাতনার অবসান হইবে, এই কথা শুনিয়াও কেহ আপন নারকীয় দেহকে ছাড়িতে চায় না। তাই ভাগবত বলেন যে 'নরকস্থোঽপি বৈ দেহং ন পুমান্ ত্যক্তুমিচ্ছতি'। আমরাও সংসারে নরক-যাতনা ভোগ করি, তবুও দেহখানি ছাড়িতে হইবে ভাবিয়া মৃত্যুকালে কাতর হই। লোকে দেহ ছাড়িয়া মোক্ষ, অর্থাৎ অনন্ত সুখ, চায় না ; সংসারে থাকিয়া দৈহিক সুখই চায়।

যোগমায়া, অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাশক্তি, প্রভাবে জীবঅবিদ্যা দ্বারা বিমোহিত হওয়াতে সম্পূর্ণরূপে বিভোর হইয়া (অর্থাৎ যেন নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায়) আছে। ঐ মোহ বিবেককে আচ্ছন্ন করাতে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ (অর্থাৎ যাহা প্রকৃত 'আমি', সেই বস্তুটী) যে 'পরা' প্রকৃতি অতএব তাহা দেহাতিরিক্ত, দেহের নাশ হয় কিন্তু আমার ঐ যথার্থ স্বরূপের নাশ হয় না, এই তত্ত্বটী আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। আমরা এই তত্ত্বটীর কথা শাস্ত্রে পড়ি, গুরু মুখে শ্রবণ করি, কিন্তু ইহা আমাদের অন্তরে স্থান পায় না, মনের গতিও পরিবর্ত্তন করে না। কেন? কারণ, অবিদ্যা আমাদিগকে 'অহঙ্কারের' মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অতএব দেহের উপর মমত্ব ভাব আমাদের অন্তরে সুদৃঢ় হইয়া থাকে।

যখন ঐ মমত্ব ভাবের উপর আঘাত পড়ে তখন আমরা দুঃখ অনুভব করি ; এবং যখন দৈহিক সুখে বিঘ্ন না হয়, তখন আমরা তৃপ্তি অনুভব করি, এবং ঐ সুখে বিঘ্ন হইলে কাতর হই।

গুণসাম্য বজায় থাকার সময় আমাদের 'মমত্ব' ভাবের উপর অঘাত পড়ে না, কিম্বা আমাদের উপস্থিত কোন সুখও বিনষ্ট হয় না, অথবা কোন দৈহিক সুখ বিনাশের আশঙ্কাও হয় না। তখন

লোকের অন্তরে প্রকাশ বা আবরক এই শক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে শক্তিই প্রবল হউক না কেন, উপস্থিত সুখে যে বিঘ্ন হয় না অথবা বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে না, মানব তাইতেই তৃপ্তি লাভ করে। এই জন্য গুণসাম্য বর্ত্তমান থাকার সময় সকল মানবই সুখ অনুভব করে।

গুণসাম্য বিনষ্ট হইয়া যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন (ক) অবিদ্যাপ্রবল মানবের মনে কেন যাতনা জন্মায়, এবং (খ) সত্ত্বপ্রধান মানবের মনেও কেন যাতনা হয়, এই বিষয় দুইটী স্বতন্ত্রভাবে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

বিপৎকালে অবিদ্যা-প্রবল মানবের যাতনা

(ক) যাহাদের অন্তরে অবিদ্যা প্রবল, বিপৎকালে তাহাদের মমত্ব ভাবের উপর আঘাত পড়ে। কারণ এই যে, যে প্রকাশ শক্তি প্রবল হওয়াতে গুণসাম্য বিনষ্ট হইয়া বিপদ হয়, তাহা কখন বা দেহের রোগ উৎপাদন করেন, কখন বা রোগ দ্বারা মরণের আশঙ্কা উৎপাদন করেন, কখন বা প্রিয় বস্তু বিনাশের আশঙ্কা, এবং কখন বা অপর বৈষয়িক বিভ্রাট উৎপাদন করেন।

এই সকল বিভ্রাট দ্বারা উপস্থিত সুখে বিঘ্ন হয়। এবং যে সুখ লাভের আশা করিয়া লোকে আনন্দ পায়, সে আশাও বিনষ্ট হয়। অথবা সুখে অপর কোন না কোন প্রকার বিঘ্ন হয়। ধনাসক্ত মানবের সঞ্চিত অর্থ যখন বিনষ্ট হয়, তখন উপস্থিত সুখে বিঘ্ন হয়; এবং যখন কারবারাদিতে বিত্তলাভের আশায় বিঘ্ন হয়, তখন ভাবী সুখ বিনষ্ট হয়।

এই সুখ 'অহঙ্কার'কে, অর্থাৎ দেহের উপর মমত্ব ভাবকে, আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অবিদ্যা যত প্রবল হয় মমত্ব বুদ্ধিও তত প্রবল হওয়াতে সুখবাসনা সুদৃঢ় হয়।

রোগাদি দ্বারা সুস্পষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে, মমত্ব বুদ্ধির উপর আঘাত পড়ে; অপর কারণে সুখের উপর যখন আঘাত পড়ে, সেই

আঘাত পরোক্ষভাবে মমত্ব ভাবের উপর পতিত হয়। অতএব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মমত্ব বুদ্ধির উপর আঘাত পড়াতে বিপৎকালে যাতনা অনুভূত হয়।

বিপৎ-কালে সত্ত্ব-প্রধান মানবের যাতনা

কতক লোক বরাবরই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, অর্থাৎ তাঁহাদের অন্তরে সত্ত্বগুণ অত্যন্ত প্রবল। যাঁহারা 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক ভাবাপন্ন তাঁহাদের মধ্যে কতকের অন্তরে জন্মাবধি সত্ত্বগুণ প্রবল, এবং কতকের অন্তরে আদিতে আবরক শক্তি প্রবল থাকিলেও, দীর্ঘকাল ব্যাপী ভয়ঙ্কর বিপদ এবং তাহার সঙ্গে সাধনা দ্বারা, ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের পুষ্টি এবং তমোগুণের হ্রাস হইতেছে। এই উভয় শ্রেণীর মানবের পক্ষে বিপৎকালে রোগ হইতে মরণাপন্ন দশা, প্রিয় বস্তুর বা প্রিয় ব্যক্তির বিনাশ (অথবা বিনাশের সম্ভাবনা), কিম্বা বিত্তনাশ, অথবা পারিবারিক বিভ্রাট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এইরূপে গুণসাম্য বিনাশের সময়ে অবিদ্যার মাত্রাভেদে তাঁহাদের মনেও ন্যূনাধিক যাতনা হয়।

কেহ হয়ত আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, যাঁহাদের অন্তরে প্রকাশ শক্তি প্রবল, তাঁহাদের চিত্তে ত 'মমত্ব' ভাব জন্মানর সম্ভাবনা নাই, কারণ ঐ ভাব কেবল আবরক শক্তি হইতেই জন্মায়। যদি 'মমত্ব' ভাবই না থাকে, তাহলে ঐ ভাব আঘাতে পড়ার সম্ভাবনা নাই, অতএব সত্ত্ব-প্রধান মানবেরও কেন যাতনা হয় ?

এই আপত্তির উত্তরে বলি যে, যদি সত্ত্ব-প্রধান এবং 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক মানবের অন্তরে মোটেই আবরক শক্তির সংযোগ না থাকিত (অর্থাৎ যে সত্ত্বগুণে আবরক শক্তির লেশ মাত্র সংশ্রব নাই কেবল সেই 'বিশুদ্ধ' সত্ত্বগুণই যদি থাকিত) তাহ'লে তাঁহাদের চিত্তে যে মমত্ব ভাব মোটেই থাকিত না, এই কথা স্বীকার করি।

কিন্তু সেই সঙ্গে বলি যে, এই অবস্থায় চিত্তে গুণত্রয় থাকে না, কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বই থাকে, তখন নিয়ত সাম্য অবস্থাই থাকে।

'গুণসাম্য' পদটীর ব্যবহার দ্বারাই আবরক শক্তির সংযোগ থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

সংসারে যে সত্বগুণ আছে, তাহার সহিত কতক তমোগুণের সংযোগ নিয়ত থাকে, সেইজন্য সত্ব প্রধান মানবের মনেও 'মমত্ব' ভাব থাকে, এবং তাহার উপর আঘাত পড়িলে, তমোগুণের ন্যূনাধিক্য অনুসারে, তাঁহাদেরও কম বেশী যাতনা হয়।

গুণাতীত অবস্থার কোন যাতনা হয় না

যখন সত্বগুণ হইতে এই তামসিক অংশ দূর হয়, তখন যত তীব্র বিপদই হউক না কেন, কোন যাতনাই থাকে না, কারণ তখন জীব গুণাতীত অবস্থায় থাকেন। 'গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে' 'এ ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি', কেন? উত্তর, 'যতঃ আত্মা অগুণাশ্রয়ঃ'।

এই অবস্থা হইল মুক্তির দশা। ইহাতে কোন বিপদ হওয়ার কথা নয়; কারণ যে গুণত্রয় বিপদের উপকরণ, তাহা এই অবস্থায় থাকে না, কেবল বিশুদ্ধ সত্বগুণই থাকে। যিশু প্রভৃতির বিপদ হইয়াছিল কেবল 'লোক সংগ্রহ' অর্থাৎ লোকশিক্ষার জন্য; রামাবতারে এবং কৃষ্ণাবতারে ভগবান নিজেকেও লোকশিক্ষার জন্য বিপন্ন করিয়াছিলেন। ইহা বিপদ নয়, লীলা মাত্র।

তমঃ এবং রজঃ-প্রধান মানবের যাতনা

যখন আবরক শক্তি পুষ্ট হইয়া প্রকাশ শক্তিকে আচ্ছন্ন করে, তখন প্রকাশের বলের হ্রাস হওয়াতে গুণসাম্য বিনষ্ট হয়, তাই তখন বিপদ হয়। ক্রমশঃ তমোপ্রধান মানবের অন্তরে আবরক শক্তির পুষ্টি দ্বারা জড়ত্বভাবের বৃদ্ধি হওয়াতে, পূর্ব্বে অনুভূত সুখের মাত্রা কমিয়া যায়। কারণ, প্রকাশ শক্তির বল দ্বারাই জীবের মনে সুখের অনুভূতি জন্মায়। আবরকের পুষ্টি হইলে প্রকাশ শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায়, অতএব অনুভব শক্তিরও হ্রাস হয়। সুখ যখন কমিতে আরম্ভ করে,

তখন গোড়ায় গোড়ায় প্রকাশ শক্তির প্রভাবে তমোপ্রধান মানব কতক পরিমানে যাতনা অনুভব করে। কিন্তু কিছুদিন এই অবস্থায় থাকার পরে, যখন ক্রমশঃ জড়ত্ব ভাব আরও প্রবল হইয়া উঠে, তখন যাতনার লাঘব হয়।

রজঃ-প্রধান মানবের চিত্তে কখন সত্ত্বগুণের অর্থাৎ প্রকাশ শক্তির, কখন তমোগুণের, অর্থাৎ আবরক শক্তির, প্রাধান্য থাকে। অতএব সাত্ত্বিক এবং তামসিক ভাব উপলক্ষে উপরে প্রকাশিত মন্তব্যদ্বয়ের মর্ম্ম, যথাসম্ভব, রজঃ-প্রধান মানবের পক্ষেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গুণসাম্যের পরেও নূতন বিপদ।

গুণসাম্য উৎপত্তির পরে যদি কোন কারণে প্রকাশ বা আবরক শক্তির বলের তারতম্য হয়, তখন গুণসাম্যের ব্যতিক্রম দ্বারা আবার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া নূতন বিপদ জন্মায়।

কেহ যদি বলেন যে, গুণসাম্যের উপাদান স্থানীয় শক্তিতে বলের ব্যতিক্রম হইলে কেন গুণসাম্য বিনষ্ট হয়? উত্তরে বলি যে, বস্তুর উপর experiment দ্বারা বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যখন প্রতিকূল শক্তি সকলের বল কমিতে বা বাড়িতে থাকে, তখন **Resultant** শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং সাম্যাবস্থা উৎপত্তির পরেও যদি factor, অর্থাৎ উপাদান স্থানীয়, শক্তি সকলের মধ্যে বলের তারতম্য হয়, তাহলে যে Resultant শক্তি পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া পুনরায় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।

জীবদ্দশায় নির্ঝঞ্ঝাটের সুযোগ

গুণসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও যে আবরক ও প্রকাশ শক্তির কার্য্য বন্ধ থাকে তাহা নয়, কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলে, কিন্তু একের কার্য্য অপরটী দ্বারা উপশান্ত (neutralised) হওয়াতে, তখন চিত্তে চাঞ্চল্য থাকে না, অর্থাৎ চিত্ত তখন দোটানার মধ্যে পড়িয়া ব্যাকুল হয় না। এই সময়কে আমরা জীবদ্দশায় নির্ঝঞ্ঝাটের সময় বলি।

নির্ঝঞ্ঝাটের পরে নূতন ঝঞ্ঝাট

গুণত্রয়ের প্রকৃত অবস্থা এবং তাহাদের কার্য্য আলোচনা উপলক্ষে নানাস্থানে বলা হইয়াছে যে, প্রকাশ শক্তি স্বীয় প্রতিভা বলে যখন তমোগুণের উপরিস্থিত আচ্ছাদনকে পাতলা করিতে থাকে, তখন তমোগুণ সত্বগুণের সহিত সমধর্ম্মী হইয়া উঠে।

(ক) গুণসাম্য উৎপন্ন হওয়ার পরে যদি, সত্বগুণ তমোগুণের হ্রাস করে, তখন ঐ গুণের সহিত সংযুক্ত আবরক শক্তি পাতলা হয়, সেইজন্য তমোগুণের ক্রিয়াশক্তির বল বেশী হইয়া উঠে। এই পরিবর্ত্তন দ্বারা গুণসাম্য বিনষ্ট হওয়াতে নূতন বিপদের সৃষ্টি হয়।

(খ) যদি তমোগুণ সত্বের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে আবরক শক্তি দ্বারা সত্বের ক্রিয়াশক্তি আচ্ছন্ন হওয়াতে, সত্বের বলের হ্রাস হয়। এই হ্রাস দ্বারাও শক্তিদ্বয়ের মধ্যে আপেক্ষিক বলের ব্যতিক্রম হওয়াতে, গুণসাম্য বিনষ্ট হইয়া নূতন বিপদের সৃষ্টি হয়।

(গ) গুণসাম্যের সময় বিবিধ সংস্কারের উদ্দীপন হইয়া কখন বা প্রকাশ শক্তির, কখন বা আবরক শক্তির পুষ্টি হয়, এই কারণে ঐ শক্তিদ্বয়ের বলের পরিবর্ত্তন হইয়া গুণসাম্যের বিনাশ হওয়াতে নূতন বিপদ দেখা যায়।

ঐ ত্রিবিধ কারণের, কোন না কোনটী দ্বারা, নির্ঝঞ্ঝাটের অবস্থা দূর হইয়া আবার নূতন ঝন্ঝাট (অর্থাৎ বিপদ) উপস্থিত হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় (তৃতীয় অংশ

কে আমাদিগকে কর্ম্মফল প্রদান করেন

ভূমিকা

এই অধ্যায়ের নামকরণ দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত একটু বিস্মিত হইবেন। কেহ কেহ হয়ত মনে করিবেন যে, লেখক কি ভগবান মানেন না? তাইতেই কি এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন?

অধম লেখকের নানা দোষ আছে, কিন্তু নাস্তিকতা দোষটী আপাততঃ নাই বলিয়াই বোধ হয়। সারাজীবনটা 'কাল-রূপী' শ্রীভগবানের কশাঘাত খাইয়া 'সাধে কি বাবা বলি, লাঠির চোটে বাবা বলায়'—এই অবস্থা হইয়াছে। এই পুস্তকের নানাস্থানে এবং নানা বিষয় উপলক্ষে গুণের শক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অতএব স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, গুণত্রয় কি আমাদের কর্ম্মফল প্রদান করেন? অথবা অপর কেহ কি কর্ম্মের শুভ বা অশুভ ফল প্রদান করেন? যদি কর্ম্মফলদাতা অপর কেহ থাকেন, তাহলে তিনি কে?

বাইবেলেও 'যোগমায়া' শক্তির পরিচয়

The Lord said, let there be Light and there was Light, সৃষ্টি প্রকরণের বর্ণনা উপলক্ষে এই কথা কএকটীর ব্যবহার বাইবেলে দেখা যায়।

কথা কয়টী বলিতেছেন যে, 'Lord', অর্থাৎ যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সেই ভগবান বলিলেন যে, 'আলোক' (অর্থাৎ চিদাভাষ) প্রকাশ হউক; অমনি আলোকের প্রকাশ হইল। Lord পদটী দ্বারা নিয়ন্তৃত্ব বুঝায়, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য কোন কার্য্য করিতে হয় না, বা কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, ইহাই বুঝায়। 'Light' পদ দ্বারা ব্রহ্মের চিদাভাষ অর্থাৎ 'চিৎ' সংজ্ঞায় অন্তর্ভূত জ্ঞান এবং শক্তি প্রভৃতি সকল বস্তুই বুঝায়।

'said' এই কথাটীতেও বিশেষ অর্থ গৌরব আছে। কোন বক্তার অন্তরের ইচ্ছা তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। অতএব এই 'said' কথাটী দ্বারা ভগবানের ইচ্ছাশক্তিই উপলক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজী কথাগুলির সারার্থ এই যে, ভগবানের ইচ্ছাশক্তি (যাহার পারিভাষিক নাম 'যোগমায়া') প্রভাবে চিদাভাষের প্রকটন হইয়া সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইল। বাইবেল পদে পদে ভগবানের ইচ্ছাশক্তির অমোঘত্বের খ্যাপন করিয়াছেন।

বাল্যকালে এই কথা কয়টীর উৎকর্ষ অনুভব করিতে পারি নাই। এই কথা কয়টীর পুর্ব্বের শ্লোকে (verseতে) বলা হইয়াছে যে, স্বষ্টির আদিতে কেবল ভগবান মাত্র ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না, তার পরে আলোকের স্বষ্টি হইল। এস্থলে প্রশ্ন উঠে যে, Light কোথা হইতে আসিল ?

যেহেতু স্বষ্টির আদিতে ভগবান দ্বারা দ্বিতীয় বস্তু ছিল না, অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, ভগবৎসত্ত্বা হইতেই Light এর আবির্ভাব হইয়াছিল। অর্থাৎ,

(ক) নিগুর্ণ ব্রহ্ম হইতে যেরূপ স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হয়, বাইবেলের Light, অর্থাৎ চিদাভাষও সেইরূপ ভগবান হইতে প্রকটিত হইয়াছিল

(খ) আলোক প্রকাশের পূর্ব্বে ভগবানের যোগমায়া শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল।

(গ) যোগমায়া শক্তি অমোঘ, সেইজন্য ভগবানের অন্তরে ইচ্ছার উদয় হওয়া মাত্র, অপর কোন কার্য্য বা কাহারও সাহায্য ব্যতীত, Light অর্থাৎ চিদাভাষের প্রকটন হইয়াছিল।

কোন্ শক্তি প্রভাবে কর্ম্মে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি জন্মায়।

গুণত্রয় দ্বারা যে বিশ্বের স্বষ্টি হইয়াছে, অর্থাৎ গুণত্রয়ই যে রূপান্তরিত হইয়া বিশ্বমুর্ত্তির প্রকটন করিয়াছেন, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, গুণত্রয়ের প্রভাবে কখন আমাদের সুমতি হওয়াতে কার্য্যে সিদ্ধি হয়; কখনও বা কুমতি প্রবল হওয়াতে কার্য্যে হানি হয়। যে দেহ দ্বারা আমরা সুখ বা যাতনা অনুভব করি, তাহার স্থূল এবং সূক্ষ্ম সকল অংশ যে গুণত্রয়ের বিকার, যে বুদ্ধি নামক ইন্দ্রিয় দেহে থাকাতে জীব তদ্দ্বারা যাতনা অনুভব করে, সেই দেহ ও তাহার ইন্দ্রিয় সকল যে গুণত্রয়ের বিকার, এ কথাও বলা হইয়াছে। অতএব

যখন আমাদের কার্য্যের সিদ্ধি বা বিঘ্ন হয়, তখন সিদ্ধি বা বিঘ্নের সহিত গুণত্রয়ের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে কি না, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়।

রোগ—কেহ হয়ত বলিবেন যে, গুণত্রয় কিরূপে দেহে রোগ উৎপাদন করিবে? উত্তরে বলি যে, ইন্দ্রিয় সমষ্টি যখন প্রারব্ধের অনুকুল ভাবে কার্য্য করে তখন দৈহিক স্বাস্থ্য থাকে, এবং তাহারা প্রতিকূল ভাবে কার্য্য করিলে রোগ হয়, (১০৯ পৃষ্ঠা)। অতএব ইন্দ্রিয় সমষ্টির কার্য্যের ব্যতিক্রমই রোগের কারণ। প্রশ্ন উঠে যে, ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ব্যতিক্রম কিরূপে হয়?

উত্তরে বলি যে, স্বরূপশক্তি দ্বারাই গুণত্রয় পরিচালিত হয়, গুণত্রয় আবার ইন্দ্রিয় সকলের পরিচালন করে। গুণত্রয় স্বরূপশক্তির রূপান্তর, তাহারা যখন প্রারব্ধের সংস্কার সকলের প্রতিকূল ভাবে কার্য্য করে, তখনই ঐ সকল ব্যূঢ় সংস্কার দ্বারা নির্ম্মিত দেহের (১০৮ পৃষ্ঠা) এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়, এবং সেই ব্যাঘাত হইতে রোগ, অর্থাৎ দেহের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা হয়।

ঐ সময়ে, প্রারব্ধের সংস্কার আকারে ক্রিয়াশীল, গুণের শক্তির ব্যতিক্রম হওয়াতে গুণসাম্যের ব্যতিক্রম হয়; সেইজন্য দেহের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইলে দেখা যায় যে, 'মমত্ব' ভাবের অর্থাৎ দেহাত্মভাবের উপর আঘাত পড়াতে সুখের ব্যাঘাত হইয়া যাতনা জন্মায়। এবং যদি রোগ দ্বারা দেহ-নাশের সম্ভাবনা উৎপন্ন হয়, তাহলে ঐ আঘাত আরও তীব্র ভাবে পড়াতে চিত্ত ব্যাকুল হয়।

কার্য্যহানি—এখন বৈষয়িক কার্য্যে হানির কথা ধরা যাক্। প্রশ্ন উঠে যে, গুণত্রয় কি কার্য্যহানি করিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, গুণত্রয়ই যখন বিশ্বের সর্ব্বকার্য্য করিতেছেন, সে স্থলে গুণবিশেষ দ্বারা আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল কার্য্য উৎপাদন করা মোটেই অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, যখন আবরক শক্তি রজোগুণের মধ্যে থাকিয়া কোন বাসনার উৎপাদন করে,তখন যদি প্রকাশ শক্তির

(অর্থাৎ সত্ত্বগুণের) বল বেশী হয়, তাহলে সত্ত্বগুণ দ্বারা রজোগুণের কার্য্যকে নিরর্থক করা অসম্ভব নয় (২০৬-০৭ পৃষ্ঠা)। আবরক শক্তি (রজোগুণ) বলবান হইলে, তাহা দ্বারা প্রকাশ শক্তির কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনও অসম্ভব নয় (২২৭ ও ২২৯ পৃষ্ঠা)।

প্রাণনাশ—প্রশ্ন উঠে, গুণত্রয় কি কাহারও প্রাণনাশ করিতে পারে? উত্তরে বলি যে, গুণত্রয় স্বরূপশক্তির বিকার, স্বয়ং বাসুদেব জীবনীশক্তি ভাবে স্বরূপশক্তিতে এবং জীবদেহে ও বিশ্বের সর্ব্ব বস্তুতে এবং তাহাদের অণু পরমাণুতে অধিষ্ঠিত থাকেন, বাসুদেব আপন যোগমায়া নাম্নী ইচ্ছা শক্তি দ্বারা গুণের পরিচালন করাতেই গুণত্রয় কার্য্য করে, অতএব গুণত্রয়ের কার্য্য ব্রহ্মেরই কার্য্য। সুতরাং গুণত্রয় দ্বারা প্রাণনাশ অসাধ্য ব্যাপার নয়।

কার্য্যের দৃষ্টান্ত—একটী লোকের জীবদ্দশায় যখন প্রকাশ শক্তির সহিত আবরক শক্তির অতি ভয়ঙ্কর রকমের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তখন অত্যল্প ব্যবধানের, অর্থাৎ দুই তিন মাস সময়ের, মধ্যেই বিপদ নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের উদ্যোগ করিয়াছিল। তাঁহার একটী সন্তান মারা গেল, তিনি নিজে ও অপর একটী কন্যা মর মর হইলেন, এবং যাহাতে তাঁহার সবংশে বিনাশ হয় তাহারও উদ্যোগ হইল; সেই সঙ্গে বিপুল ধনও বিনষ্ট হইয়াছিল (২২৭ পৃষ্ঠা)।

এস্থলে যদি বলা যায় যে, আবরক শক্তিকে (অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রজোগুণের অন্তরস্থ আবরক শক্তিকে) অভিভূত করার জন্য সত্ত্ব-গুণই এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহলে ঐ কথা অসঙ্গত হয় না। বিষয়টী আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক্।

গুণ এবং ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা

যেহেতু আমরা দেখিতে পাই যে, দর্শনশাস্ত্রে 'ব্রহ্ম,' 'প্রকৃতি', 'গুণত্রয়' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর নামকরণ হই-য়াছে, তাইতে আমরা মনে করি যে, ঐ সকল নামীয় বস্তু পরস্পর হইতে

পৃথক্ পৃথক ভাবে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বস্তু ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নয়, তাহারা ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকগণ, তত্ত্ববিষয়গুলির বিচারের সুবিধার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা উপলক্ষে ঐ সকল নাম ব্যবহার করিয়াছেন (৫ পৃষ্ঠা)। তত্ত্বতঃ ঐ সকল বস্তু ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়।

গুণত্রয়ের উপর ভগবানের ইচ্ছা শক্তির কার্য্য

শুকদেব অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ; এবং, যাহাতে প্রকৃতি বা গুণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু, এই কল্পনা করিয়া লোকের মনে ভ্রম না হয়, সেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। গুণত্রয় যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়, এই কথাটী সুস্পষ্ট করার জন্য শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন যে,

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভো।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২ স্কন্ধ ৫অ ১৮ শ্লোক)

অর্থাৎ ব্রহ্ম যদিও 'নির্গুণ' (= গুণাতীত), তথাপি সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ নামক গুণত্রয় 'তাঁহারই গুণ', অর্থাৎ গুণত্রয় তাঁহা হইতে পৃথক নয়। প্রথমতঃ ত শ্লোকে ষষ্ঠী বিভক্তির ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে গুণ ব্রহ্মের অংশ।

ষষ্ঠী বিভক্তির যে এই অভিপ্রায়, তাহা হয়ত কেহ কেহ লক্ষ্য করিতে নাও পারেন, এবং লক্ষ্য করিয়াও কেহ কেহ হয়ত গুণকে ব্রহ্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিতে পারেন, কারণ অংশ মূল বস্তু অপেক্ষা নিকৃষ্টই হইয়া থাকে এইজন্য শুকদেব 'গুণাত্মনঃ' পদটীর ব্যবহার দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, স্বয়ং ব্রহ্মই গুণের 'আত্মা' (অর্থাৎ জীবন), সুতরাং গুণের কার্য্য ব্রহ্মেরই কার্য্য।

পুনশ্চ বলিলেন যে, 'মায়য়া' অর্থাৎ আপন 'যোগমায়া' নাম্নী

শক্তি দ্বারা, সৃষ্টি স্থিতি ও 'নিরোধ' (অর্থাৎ প্রলয়) লীলার জন্য ব্রহ্ম দ্বারা গুণত্রয় 'গৃহীতাঃ', ব্রহ্ম গুণত্রয়কে 'গ্রহণ' করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আপন স্বরূপ হইতে প্রকটন করিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। 'গ্রহণ' পদটীও ইঙ্গিত করে যে, গুণত্রয় যখন কার্য্য করে, তখন প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম স্বয়ংই কার্য্য করেন। শ্লোকে একবার বলিলেন ব্রহ্ম 'নির্গুণ' আবার বলিতেছেন তিনি গুণত্রয়কে গ্রহণ করিলেন ; এই দুই বাক্যের মধ্যে যাহাতে সামঞ্জস্য বজায় থাকে, সেই জন্য 'মায়য়া' পদটীর ব্যবহার হইয়াছে।

'মায়যা' পদটী দ্বারা ব্রহ্মের 'যোগমায়া' নাম্নী ইচ্ছাশক্তি বুঝায়। অতএব শ্লোকটীর মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম গুণাতীত বটেন, কিন্তু তিনি যখন সংসার লীলা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহারই গুণাতীত স্বরূপ হইতে গুণত্রয় আবির্ভূত, অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। 'মায়য়া' পদে তৃতীয়া বিভক্তি প্রকাশ করে যে, গুণত্রয় ব্রহ্মের 'যোগমায়া' শক্তির, প্রেরণা দ্বারা কার্য্য করে। শ্রীমদ্ভাগবতে সৃষ্টি প্রকরণ উপলক্ষে যখন প্রকৃতি এবং গুণত্রয়ের কার্য্যের বর্ণনা করা হইয়াছে, তথায় ভগবানের 'ঈক্ষা চোদিতঃ' এই কথা দুইটীর পুনঃপুনঃ প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থাৎ, গুণত্রয় যে ভগবানের ইচ্ছার বশে কার্য্য করে, এই বিষয়টী যেন আমরা না ভুলি, শুকদেব সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

ভাগবতের অপর এক স্থানে অমৃতস্রাবী ভাষায় এই ভাবেরই পুনরুক্তি হইয়াছে। পাঠককে ঐ সুধার আস্বাদ প্রদানের জন্য শ্লোক দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হস্তিনায় পুর-নারীগণ বলিতেছেন,

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনঃ
য এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্ নিশি সুপ্তশক্তিষু॥

স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং
স্ব জীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী-
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ

'নিজবীর্য্যচোদিতাং' পদটীতে 'নিজ' পদ দ্বারা, প্রকৃতির কার্য্য যে স্বয়ং ব্রহ্মের কার্য্য, এই ভাব প্রকাশিত হয়; এবং 'স্বজীবমায়াং' বাক্যে 'স্ব' পদটী দ্বারা প্রকৃতি এবং ব্রহ্মের মধ্যে অভেদত্ব প্রকাশিত হয়।

ভাগবতে রাসলীলার বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, ভগবান শরৎকালের নির্ম্মল আকাশে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের শোভাময় রজনীতে প্রকৃতির মনোহর মুর্ত্তি দর্শন করিয়া, গোপীদিগকে আপন প্রকৃষ্ট 'আনন্দ' স্বরূপের আস্বাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন ঐ ইচ্ছা পুরণের জন্য ভগবানের 'যোগমায়া' শক্তিই আবির্ভূতা হইলেন।

রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ

শ্লোকে 'উপ', এই পদটী প্রকাশ করে যে, 'যোগমায়া' নিয়তই ব্রহ্মের সমীপে অবস্থান করেন, এবং 'আশ্রিত' পদটী ইঙ্গিত করে যে, ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করাতেই যোগমায়া শক্তিতে বলাধান হয়।

A distinction withont a difference

গুণত্রয় আমাদিগের কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন, কি ভগবান করিতেছেন, এই বিষয়ে কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করেন বটে, কিন্তু ঐ তর্ক কেবল কথার মারপেঁচ মাত্র, উহাতে সার আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃতি বা গুণত্রয় ভগবান ছাড়া নয়, এবং ভগবানের যোগমায়া নাম্নী ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতি ও গুণত্রয় কার্য্য করেন। অতএব ভগবানই গুণত্রয় নামক আপন শক্তি দ্বারা সকল কার্য্য করাইতেছেন; এবং গুণ দ্বারা কার্য্যে সিদ্ধি বা বিঘ্ন উৎপাদন প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং ভগবানেরই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য।

লেখকের কৈফিয়ত

গুণ এবং ব্রহ্ম উপলক্ষে উপরে যে কথাগুলি বলা হইল তাহা দার্শনিক হিসাবে নির্দ্দোষ, এই কথা বলিতে লেখকের ভরসা হয় না। কয়েক বৎসর হইতে বিলাতের রাজনীতি ক্ষেত্রে terminological in-exactitude, এই শব্দ দুইটীর চলন হইয়াছে; কোন বিষয় বর্ণনা উপলক্ষে ব্যবহৃত বাক্য সকল যে ভাব প্রকাশ করে, তাহাতে মোটের উপর দোষ না থাকিলেও, যদি ঐ সকল বাক্যে technical অর্থাৎ পারিভাষিক দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে এই ইংরাজী কথা দুইটী ব্যবহার করিয়া প্রকাশ করা হয় যে, কথা গুলি মোটের উপর ভ্রমাত্মক না হইলেও তাহাতে ভাষার দোষ আছে। লেখকের মন্তব্য বোধ হয় ঐরূপ দোষ-দুষ্ট হইয়াছে।

এই ত্রুটী উপলক্ষে নিবেদন এই যে, লেখক নিজে দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন। শ্রীমদ্ভগবতকে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের বোধগম্য করার জন্য, কএক বৎসর পূর্ব্বে লেখক ভাগবতের একটী টীকা প্রণয়ন করিয়া তাহা ছাপাইতেছিলেন। তখন দর্শনশাস্ত্রে নিজের অত্যল্প জ্ঞানের বিষয় লেখক বিস্মৃত হন নাই। ঐ কারণে তিনি সেই টীকাটী সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।

যে মহোদয় এখন বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারী দার্শনিক, তিনি জনৈক বন্ধুর মুখে এই কথা শুনিয়া, অধম লেখকের প্রতি করুণার প্রেরণায়, স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই একদিন লেখকের গৃহে পদার্পণ করেন, এবং নিজেই টীকার কিয়দংশ দেখিতে চান। তিনি যখন কয়েকটী শ্লোকের টীকা দেখিয়া লেখককে উৎসাহিত করিলেন, তখন তাঁহার উৎসাহ বাক্য দ্বারা ভরসা পাইয়া, লেখক নিজে যে দর্শন শাস্ত্রের অতি অল্প অংশ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং সেইজন্য টীকাটী প্রকাশ করিবেন কি না তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না, এই কথা সেই মহোদয়কে নিবেদন করিলেন।

লেখকের কথা শুনিয়া ঐ মহোদয় উত্তরে বলিলেন যে, সংসারী মানবের পক্ষে দর্শনের যে সার কথা জানা প্রয়োজন, তাহা শুকদেবের মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব শুকদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত দার্শনিক তত্ত্ব সকল যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ঐ তত্ত্বের অনুসরণ করিতে পারেন, তিনি দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের প্রতিপত্তি লাভ না করিলেও, দর্শন শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব-কথা তাঁহার অবিদিত থাকে না।

এই উদারচেতা মহোদয়ের উৎসাহ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া লেখক, নিজের টীকাতে ভাগবতের শ্লোকের ভাবার্থ আলোচনায়, দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, এবং এই পুস্তকেও করিলেন।

শুকমুখ হইতে ভাগবতে প্রকাশিত দার্শনিক তত্ত্ব লেখক যে ভাবে বুঝিয়াছেন, শুকদেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, তাহাই এই পুস্তকে লিখিলেন। গীতায় প্রকাশিত দার্শনিক তত্ব লেখক যে ভাবে বুঝিয়াছেন, ব্যাসদেবের পাদপদ্মে নিজ মস্তক অবনত করিয়া, লেখক তাহা 'যথাধীতং যথামতিঃ' এই পুস্তকে লিখিলেন। বুঝিতে হয়ত লেখকের ভ্রম হইয়াছে; তিনি মর্ম্ম গ্রহণের চেষ্টায় ত্রুটি করেন নাই তথাপিও যদি ভ্রম হইয়া থাকে তাহা লেখকের দুর্ভাগ্য।

পুনশ্চ নিবেদন এই যে, এই বইখানি দর্শনের গ্রন্থ নয়। দর্শনের আলোচনা না করিলে বিপদের রহস্য-ভেদ হয় না, সেইজন্য দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ভাষায় technical দোষ যাহাই থাকুক না কেন, যদি মোট ভাব প্রকাশে ভ্রম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে লেখক আপন চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন। ভাষায় দোষ থাকারই কথা, কারণ লেখকের পাণ্ডিত্য নাই।

আরও নিবেদন এই যে, ভাগবতকে মুখ্য আশ্রয় করিয়াও, লেখক তাঁহার দৃষ্টি কেবল ভাগবতেই নিবদ্ধ রাখেন নাই। বাইবেল ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া যাহাতে জটিল প্রশ্নগুলির সমাধানে কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, সে চেষ্টাও করা হইয়াছে। এবং সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা যাহাতে দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা না হয়, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তবে ঐ চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা বলা লেখকের সাধ্যাতীত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় (চতুর্থ অংশ) ।

গুণের উপর কারুণ্য বাৎসল্যাদির আরোপ করা কি অসঙ্গত

'সঙ্গত' 'অসঙ্গত' উপলক্ষে কয়েকটি কথা

'গুণ'কে যদি ভগবানের সহিত অভেদ বস্তু ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কারুণ্য বাৎসল্যাদি graces গুলিকে 'গুণে'র উপর আরোপ করাতে কি অসঙ্গতি হয়, লেখক তাহা বুঝিতে অক্ষম। গুণত্রয় যে ভগবানের 'ঈক্ষার' প্রেরণায় কার্য্য করে, এই কথাটি যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে ভগবান যে আপন কারুণ্য বাৎসল্যাদির পরিচায়ক কার্য্য সকল গুণত্রয় দ্বারা সম্পাদন করেন, এই কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। ব্রহ্ম স্বয়ং নিস্ক্রিয় হইলেও তাঁহার স্বরূপশক্তি, এবং ঐ শক্তির বলে বলীয়ান গুণত্রয়, ব্রহ্মের **executive** স্থানীয়, এবং তাহাদের পরিচালনা ব্রহ্মের 'যোগমায়া' অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টীকে বিশদ করা যাক্ ।

'গুণের' স্নেহ

পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, রজোগুণের আবরক-শক্তির প্রাদুর্ভাবের ফলে একটী লোক ঘোর বিপন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় ১০।১৫ দিনের মধ্যেই যেন যাদুমন্ত্র বলে তখনকার বিভ্রাটের তিরোভাব হইয়াছিল। তখন যাতনার উপশম হইলেও বিপদ হইতে মুক্তি হয় নাই, লোকটীর সারা জীবদ্দশাতেই অলক্ষিত ভাবে বিভ্রাটের সৃষ্টি এবং তিরোভাব হইতে হইতে, তাঁহার মতি সাধনমার্গে আনীত হইয়াছে।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই সকল বিপদের সৃষ্টি দ্বারা লোকটীর মতিকে সাধনমার্গে আনয়ন করাতে যে করুণার প্রকাশ

হইয়াছে, সেই করুণা কি ভগবান দেখাইয়াছিলেন? অথবা 'গুণত্রয়' কি ঐ করুণা দেখাইয়াছিলেন?

উত্তরে বলি যে, ভাগবত বলেন, 'সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনং'। প্রকাশ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মদর্শন লব্ধ হয়, এবং যে সত্ত্বগুণ হইতে প্রকাশ শক্তি লব্ধ হয় সেই সত্ত্বগুণই ব্রহ্ম। ঐ লোকটীর অন্তরে যখন 'আবরক' শক্তি-যুক্ত 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণের আধিপত্য ছিল, তখন প্রকাশ শক্তি এমন বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, তখন মান ইজ্জত ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কাও উৎপন্ন হইয়াছিল (২১২ পৃষ্ঠা)। একদিকে এই কার্য্য যেমন প্রকাশ শক্তির লীলা, অপর দিকে আবার যাহাতে মান ইজ্জত বিনষ্ট না হয়, তাহার সুব্যবস্থা করাও প্রকাশ শক্তির কার্য্য।

যদি কেহ বলেন যে, প্রকাশ শক্তির এমন কি ক্ষমতা থাকিতে পারে, যাহা দ্বারা এই উভয় কার্য্যই সম্পাদিত হয়? উত্তরে বলি যে, সত্ত্বগুণ স্বয়ং ব্রহ্মের স্বরূপ এবং প্রকাশ শক্তি সত্ত্বগুণেরই অঙ্গ। অতএব স্বয়ং ব্রহ্মের শক্তি যেমন অনন্ত, সেইরূপ প্রকাশ শক্তির সামর্থ্যেরও সীমা নাই। অতএব ক্ষমতা সম্বন্ধে আপত্তি চলে না। তবে motive সম্বন্ধে, অর্থাৎ কেন করিলেন, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে; তাহার উত্তর নিম্নে দিতেছি।

করুণাময় জনক, সন্তানকে কঠোর শাসন করেন বটে, কিন্তু 'খাট' না করিয়া যদি সন্তানের সংশোধন সম্ভবপর হয়, তাহলে অপর পাঁচ জনের নিকট সন্তানকে 'খাট' হইতে দেন না। ইহাই হইল সংসারের নীতি। বহু দোষ-দূষিত সংসারের উপর যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণের বিমল প্রভায় কএকটী রশ্মি মাত্র পড়িয়া, এই কারুণ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, যিনি কারুণ্য এবং বাৎসল্যের আধার, সেই সত্ত্বনিধি যে, নিজের স্বরূপভূত সত্ত্বগুণ দ্বারা উপরোক্ত কারুণ্যের আদর্শচিত্র প্রদর্শন করিবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য কি আছে?

বরঞ্চ বলি যে, পরবর্ত্তী সময়ের আচরণ হইতে দেখা যায় যে, ঐ লোকটীর সংশোধন অসাধ্য ব্যাপার ছিল না, অতএব তাঁহার বিপৎকালে

যদি সত্ত্বগুণের কারুণ্যের নিদর্শন না পাইতাম তাহা হইলে বিস্ময়ের হেতু থাকিত। তাই বলি যে, যে সত্ত্বগুণ তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছিলেন, সেই গুণই কঠোরতার সঙ্গে সঙ্গে করুণাও দেখাইয়াছিলেন।

কেবল একবারেই করুণার অবসান হয় নাই, পরবর্ত্তী ১৬।১৭ বৎসর ব্যাপী বিভ্রাটের সময় আরও ২।৩ বার তিনি এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, যে তখনও পুনরায় সম্ভ্রম নাশের আশঙ্কা সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিবারেই ক্ষতির সঙ্গে এমন কতকগুলি অনুকূল ঘটনার সংযোগ হইয়াছে যে, লোকটীকে ব্যাকুল না করিয়া, ঐ ঘটনা সকল দ্বারা প্রতিবারেই তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ এমন ভয়ঙ্কর বিপদ হওয়া সত্ত্বেও,সারাজীবনে যে ব্যক্তি কেবল একদিন মাত্র ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরে সত্ত্বগুণের শক্তি কত প্রবল, পাঠক নিজেই তাহা অনুমান করুণ। ঐ একদিন ছাড়া আবরক শক্তি আর কখনও তাঁহার চিত্তের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই সেই জন্য, তিনি ব্যাকুল হন নাই (২১২ পৃষ্ঠা)।

অতএব মীমাংসায় দাঁড়ায় এই যে, সত্ত্বগুণই আপন শোষন শক্তি দ্বারা বিপদ ও সম্ভ্রম নাশের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং সত্ত্বগুণই আপন কারুণ্য প্রভাবে তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা নিজ শোধন শক্তি প্রকাশ করিয়া দোষীর শাসন করেন, এবং যোগ্য অযোগ্য বিচার করিয়া, করুণ শক্তির প্রকাশ দ্বারা তাহাকে রক্ষাও করেন। রাজার এই কার্য্য ভগবানের নীতিরই প্রতিচ্ছায়া। অতএব উপরোক্ত কারুণ্য ভগবানে আরোপ করা, কিম্বা তাঁহার **executive**, অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়াশীল মূর্ত্তি, গুণের উপর আরোপ করা, একই কথা।

যিনি করুণার আধার তাঁহাতেও কেন এত কঠোরতা দেখা যায় ?

কেহ হয়ত বলিবেন যে, প্রথম কিস্তি বিপদের সময় সম্ভ্রম

রক্ষার পরেও কেন ৪ বৎসর অবিরাম গতিতে লোকটীর নিস্পেষণ চলিয়াছিল ? সেই সময়ে প্রকাশ শক্তির করুণা প্রকাশ হইল না কেন ? লোকটীকে উচ্চ রাজপদ এবং সচ্ছল অবস্থা হইতে অকুল পাথারে অধিক্ষিপ্ত করার পরেও কি, প্রকাশ শক্তির অন্তরে নির্য্যাতন প্রবৃত্তির উপশম হইল না ? ঐ ভগ্ন-স্বাস্থ্য ভগ্ন-উদ্যম, এবং অধিক্ষিপ্ত লোকটীকে সত্ত্বগুণ কেন তাঁহার অধীনস্থ চাপরাসীরও অধম করিলেন (২২৩-২৪ পৃষ্ঠা) ? কেন হেঁপো রোগীকে মুক্ত বায়ু হইতেও বঞ্চিত করিলেন, (২২৩ পৃষ্ঠা) ? যে ব্যক্তি ছিলেন সচ্ছল অবস্থায়, উদরান্নের অভাবের রজ্জুদ্বারা তাঁহাকে হাত পা বাঁধা ব্যক্তির মত অসহায় করিয়া, কেন ঐ সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য করিলেন ? (২২২-২৪ পৃষ্ঠা)। অমানুষিক কঠোরতার সহিত অপার করুণার সামঞ্জস্য কিরূপে করা যাইতে পারে ? এই প্রশ্ন সুসঙ্গত।

শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াও যিশুর যাতনা

এই বিষয়ে তত্ত্বকথা আলোচনার পূর্ব্বে দুই একটা নজির দেখাই। যিশুকে অবতার বলিয়া না মানিলেও, তিনি যে শুদ্ধসত্ত্ব ছিলেন,একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। অন্তিমকাল আসন্ন হইলে শিষ্যগণ যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, যিশু তখন দেখিলেন যে, তাঁহার সারা জীবনের কার্য্য নিরর্থক হইয়াছে। এই নৈরাশ্যের যাতনা কি ঐ লোকটীর অকুল পাথারে পড়ার যাতনা অপেক্ষা লঘু ছিল ? ঐ যাতনা প্রদান করিয়াই যিশুর প্রতি ভগবানের নির্য্যাতন প্রবৃত্তির উপশম হয় নাই। তারপর ভীষণ দৈহিক যন্ত্রণা চলিতে লাগিল। কারাগারে কাঁটার মুকুট পরাইয়া মস্তকের চর্ম্ম ক্ষত বিক্ষত করা হইল। সারারাত নিদ্রা নাই, সেই সঙ্গে পরিহাস এবং তিরস্কার সহ্য করিতে হইল ; এবং যখন সেই যাতনাময় অমানিশার অবসান হইল, তারপর ঘাতকের কশাঘাতে যিশুর পবিত্র দেহ

রুধিরাপ্লুত করা হইল। তখনও অব্যাহতি নাই, ঐ অবস্থায় বধ্য কাষ্ঠ নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া, যিশু বধ্যভূমিতে নীত হইলেন এবং দুইটী নরঘাতক দস্যুর পার্শ্বে, ক্রুসে বিদ্ধ হইয়া তিলে তিলে মৃত্যু যাতনা সহ্য করিতে করিতে সেই মহাত্মা প্রাণত্যাগ করিলেন।

অবিদ্যার tenacity (অর্থাৎ 'আটা') কত বেশী, এবং যে দেহ, 'অহঙ্কারের' প্রধান কেল্লা সেই অহঙ্কারের, অর্থাৎ অবিদ্যার, নিবৃত্তির জন্য দেহকেও কত যাতনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়, শুদ্ধসত্ত্ব যিশুর জীবনে ভগবান তাহারই চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহার সখা, তথাপিও তাঁহার সারাজীবনই কি যাতনায় কাটে নাই? নারী হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াও, দ্রৌপদী কি কম যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন? রাসমণ্ডলে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা গোপীগণকে যাতনা দিয়া ভগবান উন্মত্তবৎ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ নারদ এবং ধ্রুবের যাতনাও কম হয় নাই। যাঁহার যত উন্নতি তাঁহার পক্ষে তত বেশী যাতনার ব্যবস্থা হয়—পুরাণ ইহাই ঘোষণা করেন।

স্বয়ং শ্রীভগবান রামাবতারে সারা জীবনটাই যাতনায় কাটাইয়াছেন; ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল হইতেই, তাঁহার জীবনে বিপদের বাহুল্য দেখা যায়। আমরা স্ত্রী পুত্রাদির জন্য ব্যাকুল হই, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়িক দেহ ত্যাগ করার পূর্ব্বে, পুত্রাদির সহিত যদুবংশ ধ্বংশ করিয়া নিজের মাথা গুঁজিবার জন্য একটু যায়গাও রাখেন নাই। উদ্ধব দেখিলেন যে, যিনি শ্রীনিবাস তিনি নিরাশ্রয় হইয়া সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থান করিতেছেন।

'শ্রীনিকেতং সরস্বত্যা কৃতকেতং অকেতনং'

যাতনা প্রদানও সত্ত্বগুণের করুণার পরিচয় দেয়

আমরা যে লোকটীর কথা বলিতেছি তাঁহাকে যাতনা প্রদান কার্য্যেও ভগবানের অপার করুণার পরিচয়ই পাওয়া যায়। প্রবীন

ডাক্তার যখন অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা কোন অঙ্গচ্ছেদ করেন, তখন যাতনা হয় বটে, কিন্তু ঐ কার্য্য রোগীর প্রাণরক্ষা করে। অর্থাৎ সেই যাতনাভোগই স্বাস্থ্য লাভের উপায় হয়। লোকটীর চিত্তে প্রবল আবরক শক্তিকে নিবৃত্ত করার জন্য তখন প্রকাশ শক্তি কার্য্য করিতেছিলেন, তাইতে ঐ চারি বৎসর বিপদ অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। অর্থাৎ যাহাতে চরমে যাতনার চিরনিবৃত্তি হইয়া অনন্ত সুখ-লাভ হয়, প্রকাশ শক্তি তাহারই ব্যবস্থা করিতেছিলেন মাত্র। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, যাতনা প্রদান সত্ত্বগুণের অর্থাৎ ভগবনের করুণা এবং বাৎসল্যের পরিচায়ক।

যিশু প্রভৃতির যাতনার রহস্য

যিশুর প্রতিপক্ষগণের আচরণে আমরা অবিদ্যার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিতে পাই; নির্য্যাতন কালে যিশুর নিজের ধীরতায় সত্ত্বগুণের সহিষ্ণুতার মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাই। শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াও যিশুর দৈহিক যাতনা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সত্ত্বগুণের প্রভাবে আত্মা দৈহিক সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া অবিচলিত থাকিতে পারে।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আত্মচরিতে এই তত্ত্বের আরও সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখাইয়াছেন। তাঁহারা যাতনার যোগ্য ছিলেন না, তথাপিও লোকশিক্ষার্থ দারুণ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। যিশু উপলক্ষ্যে বাইবেল যথার্থই বলিয়াছেন—

By his stripes we are healed

পাপদেহ বিনাশের উদ্যোগ

আমরা যে লোকটীর বিষয় আলোচনা করিতেছি, তাঁহার যাতনার পঞ্চম বৎসরে, অর্থাৎ প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে যখন দ্বিতীয় কিস্তি দ্বন্দ আরম্ভ হইল সেই সময় হইতেই, শ্বাসরোগ পুনরায় সিংহমূর্ত্তি ধরিয়া আগমনের সঙ্গে সঙ্গে (২২৬ পৃষ্ঠা), লোকটীর দেহের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল; তিন বৎসরের অধিককাল

দেহের ক্ষয় চলিয়াছিল। তখন লোকটীর ওজন প্রায় ২৮ সের কমিয়া গেল; এবং এই সময়ে তিনি দুইবার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গুণত্রয় দেহকেও নাশ করিতে চায়

লোকটীর দেহ-নাশের জন্য উদ্যোগ করার কারণ কি? লেখক যাহা অনুমান করেন, তাহাই বলিতেছেন। জন্মের সময়ে লোকটীর প্রারব্ধে যে রজোগুণের প্রাধান্য ছিল, এই অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে (১৯৯ পৃষ্ঠা)। জন্মের পূর্ব্বে প্রারব্ধের যে সকল গুণ ব্যূঢ় ভাবাপন্ন হয়, তাহাদের দ্বারাই জীবের যোনি নির্দ্ধারণ হয় এবং জীব ঐ সকল গুণের উপযোগী দেহ ধরেণ করে। দেহে প্রারব্ধের গুণ বর্ত্তমান থাকে, অতএব ঐ লোকটীর দেহেও যে রজোগুণের আধিক্য ছিল, এই অনুমানও বোধ হয় সুসঙ্গত। সংসারে যখন গুণত্রয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে, তখন তাহারা কেবল যে চিত্তের উপরেই আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে, তাহা নয়; যে গুণ প্রবল হয়, তাহা জীবের দেহের উপরও আপন আধিপত্য স্থাপন করিতে চায়।

বাইবেলে বর্ণিত Job এর যখন ঘোর বিপদ হইয়াছিল, তখন বিপদ কেবল বৈষয়িক ব্যাপারেই নিবদ্ধ ছিল না; রোগ আকারে তমোগুণ অর্থাৎ Satan তাঁহার দেহকেও বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। চিত্ত সূক্ষ্ম বস্তু এবং দেহ স্থূল বস্তু; স্থূল-সূক্ষ্মের ভেদ দেখিয়া আমরা কল্পনা করি যে, ঐ উভয় বস্তুর মধ্যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধান আছে। বস্তুতঃ ঐরূপ ব্যবধান নাই; উভয় বস্তুই প্রারব্ধের গুণেরও বিকার; এবং চিত্তে গুণের বলের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে তাহা স্থূল দেহের উপরও প্রতিফলিত হয়।

দেহ এবং মন ও বুদ্ধির মধ্যে এই অতি ঘনিষ্ট সংশ্রবের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, যে সত্বগুণ লোকটীর শ্বাসরোগের সৃষ্টি করিয়াছিল (২০০ পৃষ্ঠা), সেই সত্বগুণ এখন সংহার মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া, লোকটীর দেহকে বিনাশ করিতে উদ্যত হওয়াতে দুইবার

তাঁহার জীবন-সংশয় হইয়াছিল। অর্থাৎ 'হয় দেহে অবিদ্যার ক্ষয় হউক নতুবা এই পাপ দেহের বিনাশ হউক' এই জন্য সত্ত্বগুণ কার্য্য করিতেছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই লোকটীর দেহের ঐ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল (২৬৩ পৃষ্ঠা)।

সঙ্কট দশায় কিরূপে প্রাণ রক্ষা হইল

কেহ যদি বলেন যে, লোকটী মরণাপন্ন দশায় নীত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তবুও মরিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, তাঁহার প্রারব্ধে 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণের প্রাধান্য ছিল, এই অবস্থায় সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকে, অতএব তাঁহার প্রারব্ধে সত্ত্বগুণের আধিক্য ছিল। প্রারব্ধের ব্যূঢ় সংস্কার সকলই জীবের দেহ-নির্ম্মাণ করে ; এই জন্য অনুমান হয় যে, এই লোকটীর দেহে সত্ত্বগুণের আধিক্য ছিল। দেহে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকাতে বিনাশ না করিয়াও দেহকে শোধন করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

বোধ হয় যে, এই কারণেই তিনি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার দেহের অবস্থা এতই খারাপ হইয়াছিল যে, তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা বেশী ছিল না। তাঁহার কতক ডাক্তার বন্ধু এবং আত্মীয়গণ এই কারণে আশঙ্কিত হইয়াছিলেন। ঐ দুই যাত্রায় প্রাণরক্ষা সত্ত্বগুণেরই কার্য্য : বিনাশের উদ্যোগও ঐ গুণের কার্য্য।

প্রাণরক্ষা কেন 'করুণার' পরিচায়ক

প্রাণরক্ষা কার্য্য সত্ত্বগুণের, অর্থাৎ ভগবানের, 'করুণা' এই কথা বলার কারণ এই যে—

প্রাণরক্ষা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি পরবর্ত্তী ৮।৯ বৎসর যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এবং শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের পরে শ্রীভগবানের কৃপায় মায়াদেবীর লীলারহস্য উচ্ছেদের জন্য প্রগাঢ় ভাবে চিন্তা করার সুযোগও পাইয়াছেন।

এই বিষয়ে কতক নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা উপলক্ষে সত্ত্বগুণই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন করিতেছেন।

তখন তিনি যদি ইহলোক পরিত্যাগ করিতেন, তাহলে গার্হস্থ্যাশ্রমে তাঁহার কতক কর্ত্তব্য অসম্পাদিত থাকিত। তাঁহার পুত্র দুইটীকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করান, ইত্যাদি যে যে কার্য্য অবশিষ্ট ছিল, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা শ্রীভগবানই করিতেন; এখনও ঐ বিষয়ে লোকটী যাহা করিতেছেন, তাহা ভগবানই করাইতেছেন। তথাপিও প্রভু যে, লোকটীকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া, ঐ কার্য্য, করাইতেছেন, ইহাকে অবশ্য 'করুণাই' বলিতে হয়।

গুণের করুণা ভগবানেরই করুণা

উপরে আলোচিত কারুণ্যের দৃষ্টান্ত গুলিকে স্থানে স্থানে গুণের কার্য্য বলা হইল বটে, কিন্তু যেন স্মরণ থাকে যে, গুণ শ্রীভগবানের 'যোগমায়া' অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। অতএব গুণ এবং ভগবানের মধ্যে ব্যবধান করা কেবল কথার 'মারপেঁচ' মাত্র, উহাতে বাস্তবতা নাই। গুণের করুণা প্রকৃত পক্ষে শ্রীভগবানেরই করুণা।

জীবন মরণ সমস্যা

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, প্রায় একই সঙ্গে লোকটীর নানা বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার রুগ্ন অবস্থায় মস্তকে ভয়ঙ্কর শোকের বজ্র পড়িল; এবং সেই সঙ্গে, অর্থাৎ ৩।৪ মাস সময়ের মধ্যে, অষ্টবজ্রের মিলনের ন্যায় অপর বিপদ সকল উপস্থিত হইল। এই যাতনা সহ্য করার শক্তি সেই শীর্ণ দেহে ছিল না। তখন তিনি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার সাধ্য ছিল না যে, ঐ বিপদের সময় গীতা কিম্বা বাইবেল অধ্যয়ন দ্বারা ঐ শাস্ত্র হইতে সাত্ত্বিক শক্তিসংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তখন তাঁহার বোধগম্য ছিল না; অতএব তখন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল যে, রোগে না মরিলেও, শোকের যাতনায়

কিম্বা অপর বিভ্রাট গুলির পীড়নে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া লোকটী হয়ত মারা যাইবেন।

একে ঐ দুর্ব্বল শরীর, তার উপর ভয়ঙ্কর শোক। এই উভয় কারণে বলিষ্ঠ লোকেরও হৃৎপিণ্ডে শক্তির হ্রাস হয়। সেই সঙ্গে উপস্থিত হইল কি না, সবংশে নিপাতের উদ্যোগ! যে বিপদ উপস্থিত হইলে জোয়ান মরদও ভয়ে আড়ষ্ট হয়, সেই বজ্র পড়িল কি না, এই জীর্ণ শীর্ণ ব্যক্তির মস্তকে! যে ব্যক্তি নিজের দেহের ভার বহন করিয়া দুই চারিপাদ চলিলে তাঁহার শ্বাস-রোধ হইত, ভগবান তাঁহার মস্তকে চাপাইলেন এই বিপদের গুরুভার! তাই ভাবি যে, ভগবানের লীলা কি অদ্ভুত! যে সকল বিপদ বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও জীবনসঙ্কট করে, তাহাই সহ্য করিল এই জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার মানব!। তাই বলি—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীঃ ভবতঃ ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কতি বা কথং বা কদাচিৎ
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্

অদ্ভুত উপায়ে দৈবশক্তি সঞ্চার

এই সঙ্গীন সময়ে অদ্ভুত উপায়ে লোকটীর জীবনরক্ষা হইল। দুর্ব্বলতা বশতঃ তিনি শাস্ত্র হইতে যে সাত্বিক শক্তি সংগ্রহে অক্ষম ছিলেন, যাহাতে তাঁহার অন্তরে সেই শক্তি অপেক্ষাও বলীয়ান্ শক্তির সঞ্চার হয়, অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মের বিশুদ্ধ শক্তির সঞ্চার হয়, তাহার ব্যবস্থা হইল। শ্রীভগবান স্বয়ং লোকটীর চর্ম্ম চক্ষুর সম্মুখে আপন ঐশ্বর্য্যের প্রভা প্রকটন করিয়া, তাঁহার অন্তরে ঐ শক্তির সঞ্চার করিলেন। ২২৭ পৃষ্ঠায় ৺পুরীধামের শ্রীমন্দিরে প্রকাশিত যে gloryর উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ glorious vision স্বয়ং শ্রীভগবানের অনুগ্রহই প্রচার করে। ঐ শক্তি তাঁহার অন্তরে অধিষ্ঠিত

ছিল বলিয়া, শোক বা অপর বিপদ তাঁহাকে যতই বিমর্দ্দিত করুক না কেন, তিনি মোটেই কাতর হন নাই। ঐ দৃশ্য দর্শনের পরে লোকটী পুরী ধাম হইতে মহাপ্রভুর একখানি পট সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং বিপদ আরম্ভের ১৪ দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি ঐ পটখানি পুনঃ পুনঃ দেখিতেন, এবং আনন্দে বিভোর হইতেন। যখন বিপদ উপস্থিত হইল তখন ঐ দৈবশক্তি পূর্ণ মাত্রায় তাহার অন্তরে কার্য্য করিতেছিল। বিপদ ঐ শক্তির সান্নিধ্যে যাইতে পারে না, এই জন্য তাঁহার প্রাণনাশ হইল না।

শ্রীকৃষ্ণ আপন যোগমায়া দ্বারা মাতৃ গর্ভে স্থিত পরীক্ষিতকে সমাচ্ছন্ন করিয়া অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি এই লোকটীকেও সে যাত্রায় রক্ষা করিলেন।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, ঐ রক্ষণকারী শক্তি ভগবানেরই বিভূতি। অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র কিম্বা লোকটীর পক্ষে বিপদের অষ্টবজ্র, উভয় বস্তুই ঐ শক্তি দ্বারা শক্তিমান হইয়াছিল। কেহ যদি বলেন যে, একই আধার হইতে কেন পরস্পরের প্রতিকূল শক্তি বাহির হইল? উত্তরে বলি যে, পরস্পরের সহিত বিরোধী শক্তির প্রকটন করিয়া জীবের উন্নতি সম্পাদন করাই হইল, বিভূতির সৃষ্টি লীলার গূঢ় তত্ত্ব।

No short cut to Salvation.

স্বয়ং শ্রীভগবান এই ক্ষেত্রে special ভাবে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, কারণ লোকটীর দেহ তখন এত দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, শক্তি সঞ্চার না করিলে হয়ত তাঁহার প্রাণরক্ষা হইত না। প্রাণরক্ষা না হইলে ইহ-জন্মে সাধনা দ্বারা তিনি আপন উন্নতি সাধন করিবার সুযোগ পাইতেন না।

যদি কেহ বলেন যে, ইহজন্মে প্রাণরক্ষার কি প্রয়োজন ছিল? উত্তরে বলি, বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বহির্জগতে শক্তির wastage অর্থাৎ অপব্যয় নাই। এই কথাটী যেন মনে থাকে।

লোকটীর দেহ এবং মনোবৃত্তি, এই বিপৎকালের পরবর্ত্তী সময়ে সাধনা করার জন্য উপযোগী হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ হয় ভগবান বিশেষ বিধান দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সাধনার উপযোগী না হইত, তাহলে হয়ত ঐ পাপদেহ বিনষ্ট করিয়া তখনকার ব্যূঢ় সংস্কারের অনুযায়ী ভাবে সাধনার উপযোগী, অপর কোন দেহের সৃষ্টি হইত। তাহলে লোকটী ঐ সময়ে মরিতেন।

যে সত্ত্বগুণ ঐ সময়ে করাল বিপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানেরই করাল রূপ। এক রূপে তিনি বিপদের সৃষ্টি করিলেন, অপর করুণরূপে তিনি নিজের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া লোকটীর প্রাণরক্ষা করিলেন। তারপর চলিত উপায়ে সাধনা দ্বারা লোকটী কার্য্য করুক, এই ব্যবস্থা হইল। আমি নিজে সাধনার উদ্যম ও পরিশ্রম করিব না, ভগবান আমার উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করুণ, যাঁহারা ইহা ভাবেন, তাঁহাদের আশা কখনই পূর্ণ হয় না। মোক্ষলাভের পথ অতি দুর্গম, মোক্ষের জন্য short cut, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা নাই।

রাজ্যে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য special আইন অর্থাৎ বিশেষ বিধি প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু ঐ আইন বেশীদিন বলবৎ থাকে না। উহা অল্পদিন পরে প্রত্যাহৃত হইয়া ordinary আইনের, অর্থাৎ সাধারণ বিধানের, কার্য্যই চলে। মুক্তি লাভ করিতে হইলে সুদীর্ঘ কাল যাবৎ কঠোর সাধনা করিতে হয়, এবং যত উন্নতি হয়, বিপদও তত তীব্র হয়, ইহাই হইল সাধারণ ব্যবস্থা। আমার পক্ষে ঐ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হউক, লোকের এই আশা দুরাশা মাত্র।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় (পঞ্চম অংশ)

বৈষয়িক কার্য্যে সিদ্ধিলাভ এবং বিভ্রাট

কার্য্য সিদ্ধিতে anomaly

পূর্ব্বে ২০৩ পৃষ্ঠায় একটী লোকের পরিচয় দিয়াছি, যাঁহার কর্ম্ম-পটুতা অল্প ছিল না, কিন্তু তিনি যে কার্য্যেই বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোনটীতেই পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। গোড়ায় গোড়ায় বরঞ্চ কতক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ হইত, কিন্তু যখন ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি অকুল পাথারে নিক্ষিপ্ত হইলেন (২০৭ পৃষ্ঠা), তার পরে প্রবল আশার বশে প্রচণ্ড উদ্যম উৎসাহের সহিত তিনি যে কাজই করিয়াছেন, তাহার কোনটীতেই সিদ্ধি লব্ধ হয় নাই, বরঞ্চ উৎসাহের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনেক কার্য্য হইতে কেবল বিভ্রাটই জন্মিয়া তিনি নাস্তা নাবুদ হইয়াছেন।

পাঠক এই কথাগুলি পড়িয়া বিস্মিত হইবেন না, বা কথাগুলি অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। ভগবানের চিড়িয়াখানা রূপ এই সংসারে, তামসিক ভাবাপন্ন মানব নিরুৎসাহ বশতঃ বিপন্ন হন, এবং 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক মানব (অবিদ্যা-সৃষ্ট 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাবের প্রেরণায়) প্রবল আশা এবং উদ্যম উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া বিপদে পড়েন। সংসারে এক নিয়মই চলে বটে, কিন্তু মানবের প্রকৃতি ভেদে, সেই এক নিয়মেরই ফল বিপরীত হইতে দেখা যায়।

কেবল এই একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিয়া লেখক এই অধ্যায়ের আলোচনার উত্থাপন করিতেছেন না। অপর কএকটী এইরূপ দৃষ্টান্তও দেখিয়াছেন। লেখকের একটী বন্ধু স্বোপার্জ্জিত অর্থবলে নিজেকে কলিকাতার ধনকুবের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে ঐ লোকটী তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য সুপ্রসিদ্ধ; ইংরাজ ভাটিয়া এবং

মাড়োয়ারীরা তাঁহার দূরদৃষ্টি এবং সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে প্রায় ২০.২৫ বৎসরের অধিককাল যশের সহিত কার্য্য করিয়া, প্রবল ধনাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় উদ্যম উৎসাহের কি ফল হয়, এই বিষয়ে বন্ধুবরের অভিজ্ঞতাও অনেক পরিমাণে লেখকের অভিজ্ঞতার অনুরূপ। অর্থাৎ সাত্ত্বিক উৎসাহ হইতে যে অমোঘ সিদ্ধি লব্ধ হয়, এবং রাজসিক উৎসাহ হইতে যে প্রায়ই অসিদ্ধি এবং বিভ্রাট জন্মায়, ইহা তিনিও দেখিয়াছেন। অর্জ্জুনের কর্ম্মপটুতাও অল্প ছিল না, তিনিও দেখিয়াছিলেন যে,—

নিশম্য পৌরুষং ধাম পার্থঃ পরম বিস্মিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতং॥

তবে স্বীকার করি যে, এই প্রকার কার্য্যহানির দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যায় না। বোধ হয় যে, কেবল 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক শ্রেণীর মানবের পক্ষেই এই ভাবে কার্য্যহানি হয়, কারণ তাঁহাদের চিত্তে সত্ত্বগুণ প্রবল ভাবে থাকে। তাঁহারা যখন রাজসিক 'অহংকর্ত্তৃ' ভাব এবং আশা ও উদ্যম প্রভাবে কার্য্য করেন, তখন বলীয়ান সত্ত্বগুণ দ্বারা তাঁহাদের প্রয়াস বিধ্বস্ত হওয়াতে, তাহা নিষ্ফল হয়; এবং নূতন বিভ্রাট জন্মায়। যদি সত্ত্বগুণ প্রবল না হইত, তাহা হইলে উদ্যম সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, অন্ততঃ বিভ্রাট জন্মিত না।

কিরূপে কার্য্যে সিদ্ধি অথবা বিঘ্ন হয়

আমরা যে গুণের প্রেরণা প্রভাবে কার্য্য করি, তাহার প্রতিকূল কোন গুণ যদি তখন আমাদের অন্তরে বলবৎভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই প্রতিকূল গুণ আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করে। কাম্য ফলের অনুকূল এবং প্রতিকূল গুণের শক্তির আপেক্ষিক মাত্রার উপর কার্য্য উপলক্ষে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি হওয়া নির্ভর করে।

(ক) কামনার প্রতিকূল গুণের শক্তি যদি অতি অল্প হয়, তাহলে কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধিলাভ হয়।

প্রতিকূল গুণের পরিমাণ কম হইয়াও তাহা যদি বলীয়ান হয়, তাহলে কার্য্যে আংশিক পরিমাণে সিদ্ধিলাভ হয়। উভয় শক্তি প্রায় তুল্যবল হইলে, কখন নাম মাত্র সিদ্ধি হয়, কখন তাহাও হয় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত লোকটীর চিত্তে সত্ত্বগুণ ৪৩ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত, ন্যূনাধিক পরিমাণে বলীয়ান ছিল। এই সময়ে তিনি যে সকল রাজসিক উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল, তার পরের দশ বছরে, যখন সত্ত্বগুণ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন উদ্যমের আংশিক সিদ্ধিও হয় নাই। তখন রজোগুণও প্রবল হওয়াতে ঐ গুণ নানা কাম্যবস্তু প্রদান করিয়াছে, কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রভাবে এক দিনের তরেও তিনি সুখ পান নাই।

(খ) প্রতিকূল গুণের বল যদি প্রেরক গুণের বল অপেক্ষা বেশী হয়, তাহলে প্রেরক গুণের সকল চেষ্টাই নিস্ফল হয়। ঐ সময়ে আবরক শক্তির বল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অতএব রাজসিক উদ্যম উৎসাহ হইতে তখন সিদ্ধিলাভ হয় না, বরং ঝনঝাটই জন্মায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত লোকটীর ৪৩ বৎসর বয়সের সময়, সত্ত্বগুণের বল আবরক শক্তির বলকে অতিক্রম করিয়া লোকটীকে অকূল পাথারে ফেলিলেন। তার পর বরাবরই সত্ত্বগুণ, অর্থাৎ প্রকাশ শক্তি, রাজসিক উদ্যমকে বিধ্বস্ত করিয়া বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(১) পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিপুল মাত্রায় রাজসিক উদ্যম করার পরে, সত্ত্বগুণ লোকটিকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলেন —২২১ পৃষ্ঠা।

(২) পরবর্ত্তী ৪ বৎসর মধ্যম ভাবে রাজসিক উদ্যম চলিয়াছিল, তখন বরাবরই কার্য্যহানি হইয়াছে, গোড়ার দুই বৎসর যখন

রজোগুণের শক্তির সহিত সত্বের শক্তির অধিক বৈষম্য ছিল, তখন সত্বগুণ লোকটীকে ভয়ঙ্কর যাতনা দিয়াছেন (২২২-২২৪ পৃষ্ঠা।

(৩) তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে বৈষম্য কম হওয়াতে, যাতনা কম হইতে থাকে ; এবং পঞ্চম বৎসরে ঐ দুই শক্তির মধ্যে 'গুণসাম্য' (২৮৭ পৃষ্ঠা) স্থাপিত হওয়াতে ঐ এক বৎসর কতকটা শাস্তিতে কাটিয়াছিল ;

(৪) তারপর আবার ৪ বৎসর রাজসিক উদ্যম প্রবল হইয়া উঠে (২৬১ পৃষ্ঠা)। তখন কার্য্যহানি এবং ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইয়া লোকটীকে সবংশে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়।

(৫) ইহার পরে পঞ্চম বৎসরে অবার 'গুণসাম্য' স্থাপিত হওয়াতে ঐ বছরটী শান্তিতে কাটিল।

(৬) আবার রাজসিক ভাবে বলসঞ্চার হওয়াতে (২৬২) পৃষ্ঠা ৭ বৎসরব্যাপী বিপদ এবং বৈষয়িক কার্য্যে বিঘ্ন চলিয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পক্ষে কার্য্যসিদ্ধি

(ক) সত্বপ্রধান মানবের কার্য্যসিদ্ধি

যাঁহারা সত্বপ্রধান তাঁহারা বিরাট উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন। তাঁহাদের অন্তরে তখনও আবরক শক্তি থাকে বটে, কিন্তু অনুষ্ঠিত কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের যোগ্য বল, আবরক শক্তিতে থাকে না। অতএব তাঁহাদের কার্য্যে প্রায় বিঘ্ন হয় না ; সিদ্ধিই হয়।

(খ) গজ-কচ্ছপের লড়াই

রজোপ্রধান মানবগণের মধ্যে যাঁহারা 'প্রকৃষ্ট' রাজসিক, অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তে সত্বগুণ বহু পরিমাণে থাকে, তাঁহারাও বিপুল উৎসাহে কার্য্য করেন। 'অহং কর্ত্তৃ' ভাবের মোহ, এবং আবরক শক্তির অভ্যন্তরে যে প্রকাশ শক্তি থাকে তাহার প্রেরণা, এই দুই বস্তুর প্রভাবে তাঁহাদের উদ্যম এবং আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। অর্থাৎ আশাও প্রবল হয় এবং চেষ্টাও প্রবল হয়। এই দুইটী ভাবই 'প্রকৃষ্ট' রজোগুণের লক্ষণ, এই লক্ষণ দ্বারা ঐ গুণটীকে চেনা যায়।

একদিকে থাকে এই দুইটী প্রবৃত্তি; অপরদিকে থাকে প্রকাশ শক্তির বলবত্তা। ইঁহাদের প্রায় সারাজীবনই প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে গজকচ্ছপের লড়াই চলে। ইঁহাদের কার্য্যে প্রায় কখনই পূর্ণসিদ্ধি দেখা যায় না। লড়াই চলিতে চলিতে যখন প্রকাশ শক্তির বল আবরক শক্তিকে অতিক্রম করে, তখনও ইঁহাদের উদ্যম উৎসাহের নিবৃত্তি হয় না, বরঞ্চ অবিদ্যার ক্ষয় হওয়াতে ক্রমশঃ উদ্যমের বল বেশীই হয়। প্রকাশ শক্তি দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া ইঁহাদের 'হাড়ীর হাল' হয়।

(গ) বিনা উৎসাহেও কার্য্য-সিদ্ধি

কিন্তু যখন এই শ্রেণীর মানব বিশেষ কোন রকম আশা আকাঙ্ক্ষা না করিয়া (অর্থাৎ আবরক শক্তির অনুসরণ না করিয়া), চলতি ভাবে কার্য্য করেন, তখন প্রকাশ শক্তি কখন কখন ইঁহা-দিগকে অভাবনীয় উপায়ে সিদ্ধি-দান করেন। ঐ সিদ্ধি কখন কখন এত উচ্চ রকমের হয় যে, পূর্ব্বে রাজসিক আকাঙ্ক্ষার বশেও ইঁহারা তত বেশী উন্নতির প্রত্যাশা করিতে সাহস করেন নাই। লেখক এইরূপ দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং ২০৩ পৃষ্ঠার শেষ ভাগে ইহার উল্লেখও করা হইয়াছে।

এই প্রকার সিদ্ধিলাভ হইল দেখিয়া লোকে এই সকল কর্ম্মীকে 'বাহাদুর' মনে করেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের কার্য্যে বাহাদুরী মোটেই নাই; আশা আকাঙ্ক্ষা এবং 'অহংকর্ত্তৃ' ভাবকে সংযত করিয়া চলতি ভাবে কাজ করিতে পারাই, এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে যথার্থ বাহাদুরী।

আকাঙ্ক্ষার এবং উদ্যমের সংযম করিয়া চলতি ভাবে কার্য্য করাই এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। ঐ সকল বস্তুর সংযম করা যে কত দুসাধ্য ব্যাপার, তাহা লেখক বেশ জানেন বলিয়াই এই কথা কয়েকটী লিখিতেছেন।

(ঘ) উদ্যম-উৎসাহ দ্বারা কাহাদের কার্য্য সিদ্ধি হয়।

যে সকল 'নিকৃষ্ট' রাজসিক মানবের অন্তরে প্রকাশ শক্তির বল আবরকের বল অপেক্ষা অনেক অল্প, তাঁহারা যখন উৎসাহ উদ্যমের সহিত কার্য্য করেন, তখন প্রকাশ শক্তি বাধা দেন না। অতএব কার্য্যসিদ্ধি হয়। বাধা দিলে তাঁহাদের আরও অধঃপতন হইত। কার্য্য সিদ্ধি হওয়াতে অধঃপতনের নিবৃত্তি হয়।

কেহ হয়ত বলিবেন যে, পুরুষকার সম্বন্ধীয় যে সকল কথা চলিত আছে, তাহা কি ভ্রান্ত ? উত্তরে বলি যে পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। মানবের চিত্ত অতি জটিল বস্তু, এবং চিত্তে গুণ ও সংস্কারের অবস্থা ভেদে, ব্যক্তি বিশেষের উপর প্রকাশ ও আবরক শক্তির ফল নির্দ্ধারিত হয়। এই কথাটী মনে না রাখিয়া আমরা ভ্রমে পড়ি। প্রকৃষ্ট রাজসিক ভাবাপন্ন মানবের চিত্তে পুরুষকারের অভাব নাই। ঐ বস্তুটীই তাঁহার বিপদের কারণ হয়। কিন্তু 'নিকৃষ্ট' রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন মানব, 'পুরুষকার' প্রভাবে, কাম্য ফল লাভ করেন। ইহার কারণ উপরে বলা হইয়াছে।

তমোপ্রধান মানবের চিত্তে প্রকাশ শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল। অতএব তাঁহারা যখন রজোগুণের প্রেরণায় কোন কার্য্য করেন, সেই কার্য্যে যে বিঘ্ন হয়, তাহা তমোগুণ দ্বারাই হয়। অতএব রজো এবং তমোগুণের আপেক্ষিক বলের উপর তমোপ্রধান মানবের কার্য্যসিদ্ধি, নির্ভর করে।

প্রবল আশাই কখন বিভ্রাটের কারণ হয়

'প্রকৃষ্ট' রাজসিক ভাবাপন্ন মানব যদি কোন বস্তু প্রাপ্তির জন্য প্রবল আশা করেন,সেই আশার মধ্যেও অহঙ্কার দ্বারা সৃষ্ট 'মমত্ব' ভাব থাকে। ঐ সকল মানব তখন যদি এমন অবস্থায় আসিয়া থাকেন, যে অবস্থায় তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশ শক্তির বল আবরকের বল অপেক্ষা

বেশী, তাহলে প্রকাশ শক্তি তখন এমন কতকগুলি ঘটনার যোগাযোগ উৎপাদন করেন যে, তাঁহাদের আশা কখনই পূর্ণ হয় না। আশা নিষ্ফল হওয়াতে তমোগুণ প্রবল হইয়া কেবল মনঃপীড়া উৎপাদন করে। অথবা রজোগুণ প্রবল হইয়া লোকটীর দ্বারা এমন কতকগুলি কার্য্য করায় যে, ঐ সকল কার্য্য হইতে বিভ্রাট জন্মিয়া যাতনা ভোগ করিতে হয়।

এইরূপ দৃষ্টান্ত লেখক এত বেশী দেখিয়াছেন যে, তিনি যখন দেখেন যে কেহ কোন ফল লাভের জন্য প্রবল আশা করিতেছেন, তখন লেখক ভাবেন যে, আহা! লোকটা কি মনঃপীড়ার আবাহনই করিতেছে! লোকটী কি ভয়ঙ্কর ভাবী বিপদের বীজই বপন করিতেছে।

যতই যাতনা-ভোগ করুক না কেন, তবুও লোকে 'আশা' করিতে ছাড়ে না। ছাড়িবে কিরূপে? যে আবরক শক্তি আশার উৎপাদন করে তাহা দ্বারাই মানবের মন ও বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে, এবং তাহারই বীজ যে মানবের হাড়ে মজ্জায় রহিয়াছে। ধন্য দেবী মহামায়ে! ধন্য প্রভুর সৃষ্টি-লীলার কৌশল !!

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ষষ্ঠ (অংশ)

ভয়ঙ্কর ও নিরবচ্ছিন্ন বিপদ

মানবের কি অবস্থায় ভয়ঙ্কর বিপদ হয়

দুইখানি রেল গাড়িতে যখন ধাক্কা লাগে, তখন তাহারা যদি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে তাহলে সংঘর্ষণে তীব্রতা দেখা যায় না। কিন্তু তাহারা যখন পুরা জোরে চলিতে থাকে, তখন ধাক্কা লাগিলে collision এর তেজ ভয়ঙ্কর হওয়া সম্ভবপর হয়। অতএব প্রকাশ এবং আবরক শক্তিতে প্রবল ক্রিয়াপটুতা (অর্থাৎ বল) না থাকিলে, তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষণ দ্বারা ভয়ঙ্কর বিপদ উৎপন্ন হইতে পারে না।

এস্থলে প্রশ্ন উঠে এই যে, আমাদের কিরূপ অবস্থা হইলে প্রকাশ এবং আবরক এই উভয় শক্তিরই ক্রিয়াপটুতা বেশী হয় ? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বে নানা বিষয়ের আলোচনা উপলক্ষে দেওয়া হইয়াছে। ঐ আলোচনায় দেখান হইতেছে যে, 'অপরা' প্রকৃতির গুণত্রয়ের উপরে আবরক শক্তির যে আচ্ছাদন থাকে, তাহা যত পাতলা হইতে থাকে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের যত পুষ্টি এবং তমোগুণের যত হ্রাস হইতে থাকে, তত প্রকাশ এবং আবরক শক্তির বলের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং দাঁড়ায় এই যে, মানবের যত বেশী পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে থাকে, মানব তত ভয়ঙ্কর বিপদের উপযোগী হয়।

যাঁহাদের উন্নতি হয় নাই তাঁহাদের চিত্তেও কখন কদাচিৎ কোন সংস্কারের উদ্দীপনা দ্বারা প্রকাশ এবং আবরক শক্তির বল-বৃদ্ধি হওয়াতে, তীব্র বিপদ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শ্রেণীর মানবের চিত্তে স্বভাবতঃই আবরক শক্তির প্রাধান্য থাকে, বিপৎকালে প্রকাশ শক্তির উদ্দীপন হইলেও আবরক শক্তি প্রকাশ শক্তিকে অবিলম্বে আচ্ছন্ন করে। আচ্ছন্ন করার পরে প্রকাশ শক্তির বলের হ্রাস হয়।

অতএব অনুন্নত মানবের ভয়ঙ্কর বিপদ মাঝে মধ্যে হইলেও, ঐ বিপদের তীব্রতা কমিতে বেশী বিলম্ব হয় না, এবং তাঁহাদের জীবদ্দশা বিপদ সঙ্কুল হইলেও সেই বিপদ মৃদু ভাবে চলিতে থাকে। প্রকাশ শক্তির সহিত আবরক শক্তির প্রবল সংঘর্ষণ না হওয়াতে, তাঁহাদের জীবদ্দশায় অবিদ্যার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে।

যাহাদের জীবদ্দশায় বিপদ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ আগমন করেন, তাঁহাদের চিত্তে যে, দিন দিন প্রকাশ শক্তির পুষ্টি এবং আবরক শক্তির ক্ষয় হইতেছে, ইহাই প্রকাশ হয়। এই অবস্থাকে সৌভাগ্যের চিহ্নই বলিতে হইবে।

কি অবস্থায় বিপদের নিবৃত্তি হয় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায়, গুণসাম্য উপলক্ষে এই বিষয়টীর আলো-

চনা করা হইয়াছে। বিপদ আরম্ভ হওয়ার পরে যদি প্রকাশ এবং আবরক শক্তির বল একই ভাবে থাকে, তাহলে 'গুণসাম্য' প্রকাশ হইয়া বিপদের উপশম হয়।

যখন কাহারও চিত্তে প্রকাশ বা আবরক শক্তির বলের স্বল্পতা দেখা যায়, তখন ইহাই প্রকাশ হয় যে, তাঁহার চিত্তে আবরক শক্তির প্রাধান্য বিদ্যমান আছে। আবরক শক্তি প্রকাশ শক্তিকে আচ্ছন্ন করাতেই উভয় শক্তির বলের স্বল্পতা দেখা যায়। তাঁহাদের বিপদ হইলেও আবরক শক্তি শীঘ্র প্রকাশ শক্তিকে আচ্ছন্ন করে, অতএব বিপদের তেজ কমিয়া আবার চিত্তে জড়ত্ব ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ শক্তিদ্বয়ের একের বল বেশী হইলে, অপরের বলও বাড়িবে, এবং প্রকাশ শক্তির বলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আবরকের পরিমাণ হ্রাস হইবে, ইহাই হইল গুণের কার্য্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম (২৮১-৮২ পৃষ্ঠা)।

ভাবান্তর ব্যবহার করিয়া বলা যাইতে পারে যে, উভয় শক্তির বল যত বেশী হইতে থাকে, ততই আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইতেছে, ইহাই প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য শক্তিদ্বয়ের বল যত বাড়িতে থাকে, বিপদের তেজও তত বেশী হয়। বিপদ চলিতে চলিতে, প্রকাশ শক্তি আবরকের পরিমাণকে যত ক্ষয় করিতে থাকে, ততই চিত্তশুদ্ধি হয়; অর্থাৎ চিত্ত হইতে অবিদ্যাসৃষ্ট কাম লোভাদির কালুষ্য দূর হইতে থাকে। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ এবং আবরক, এই উভয় শক্তির বল বেশী হওয়াতে, মানবের অধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপদের নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধিই হয়।

সংসারে অবস্থান কালে আমাদের উন্নতি হওয়ার সময় তীব্র বিপদ চলিতে চলিতে কখন কখন এমন একটা সময় আসে, যখন প্রকাশ ও আবরক এই উভয় শক্তির বল কিছুদিন একই ভাবে থাকে, অর্থাৎ শক্তির পরিমাণের ব্যতিক্রম না হওয়াতে, বলের ব্যতিক্রম হয় না।

এই অবস্থাকে গুণসাম্যের অবস্থা বলা যায়। এই অবস্থা যতদিন বজায় থাকে, ততদিন বিপদের নিবৃত্তি হয়। (২৮৭ পৃষ্ঠা)।

বহির্জগতে, পরস্পরের সহিত প্রতিকুল, বায়ুর সংঘর্ষণ বশতঃ ঝড় উৎপন্ন হইয়া, বায়ুর গতিতে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিপদ অসাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

তীব্র বিপদ কখন হয়, এবং কি অবস্থায় ঐ বিপদের বিরাম হয় না, এই দুই বিষয়ের আলোচনা হইতে পাঠক দেখিয়াছেন যে, যখন তীব্র বিপদ অবিরাম ভাবে চলে, তখন আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইতেছে ইহাই প্রকাশ হয়। অর্থাৎ আবরক শক্তির ক্ষয় হইয়া গুণত্রয় যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত সমধর্ম্মী হইতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা তখন হইতেছে, ইহাই বুঝায়। ইহা যে অসাধারণ সৌভাগ্য, তাহার অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

(ক) বিপদকে কেন 'সৌভাগ্য' বলা হইল

যে অনন্ত সুখলাভ করাই মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হইলে কেহ সেই সুখলাভের যোগ্য হন না। প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষণের উদ্দেশ্যই হইল, হইতে আবরক শক্তির মালিন্য দূর করিয়া, আমাদিগকে অনন্ত সুখভোগের উপযোগী করা। বিপদ যখন তীব্র হয় তখন আমাদের চিত্তশুদ্ধি কার্য্য প্রবলভাবে অগ্রসর হইয়াছে, ইহাই প্রকাশ পায়। এইরূপ বিশুদ্ধি লাভ যে সৌভাগ্য তাহা বলাই নিস্প্রয়োজন।

তীব্র বিপদ চলিতে চলিতে যদি বন্ধ হয়, তখন গুণসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে শোধণ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। চিত্তে মালিন্য থাকার সময় বিপদের নিবৃত্তি হইলে মানব মলিন চিত্ত লইয়া সংসারেই আবদ্ধ থাকে না নানা কষ্ট ভোগ করে। অতএব বিপদের নিবৃত্তি হওয়া সৌভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য।

কিন্তু তীব্র বিপদ চলিতে চলিতে বন্ধ না হইয়া যদি উগ্র হইতে উগ্রতর মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন দেখা যায় যে, আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতেছি, অর্থাৎ অবিরাম বিপদ যে অবিরাম উন্নতিরই লক্ষণ, এই তত্ত্বটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। Crossই যিশুর triumphএর চিহ্ন, তাই বাইবেলের ভাষায় বলি,

You must bear the cross if you would wear the crown

সত্য বটে যে, ঐ সময়ে ঐহিক সুখের ব্যাঘাত হয়, কিন্তু অখণ্ড অনন্ত পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখের তুলনায় ঐহিক সুখ কি তুচ্ছ বস্তু নয়? যে সুখ স্বর্গেও পাওয়া যায় না তাহা লাভের জন্য কি বছর কতক দৈহিক যাতনাকে 'বিপদ', অর্থাৎ দুর্ভাগ্যের বিষয়, বলিয়া গণ্য করা উচিত? তাই ভাগবতের ভাষায় বলি,

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্য্যধঃ
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীর রংহসা

(খ) উক্ত সৌভাগ্যকে কেন 'অসাধারণ' বলা হইল

অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিপদ ভোগের যোগ্যতা অতি অল্প লোকেই লাভ করেন। চিত্তে প্রকাশ শক্তির, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের, আধিক্য না হইলে বিপদ তীব্র হয় না, এবং সত্ত্বগুণের যে আধিক্য হইতে বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে, বিপদ চলার সময় তাহা ক্রমশঃ না বাড়িলে তীব্র বিপদ অবিরাম গতিতে চলে না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন সাত্ত্বিক সংস্কার প্রবল হওয়াতে কেবল মাঝে মধ্যেই লোকের তীব্র বিপদ হয়। তীব্র বিপদ হওয়ার পরে আবরক শক্তি সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তিকে কতক পরিমাণে আচ্ছন্ন করে, তখন বিপদের তীব্রতার হ্রাস হইয়া মাঝামাঝি রকমের বিপদই চলিতে থাকে; এই ভাবেই অধিকাংশ লোকের জীবদ্দশা অতিবাহিত হয়। এই জন্যই তীব্র বিপদ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলাকে 'অসাধারণ' সৌভাগ্য বলা হইল।

কখন বিপৎকালে যাতনা থাকে না

লোকে সুখই চায়,তাই 'পান থেকে চূণ টুকু খসিলে' তাহারা মনে করে যে,'তীব্র' বিপদ হইয়াছে। ঐ রকম বিপদের কথা বলা হইতেছে না। যদিও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে Scourging এবং crucifixion তুল্য পীড়নের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা প্রভাবে অপর একটী ব্যবস্থাও দেখা যায়। তাহা এই—মানবের অন্তরে যত অবিদ্যার হ্রাস হইতে থাকে, তত 'মমত্ব' ভাবেরও হ্রাস হয়। যাতনা 'মমত্ব' ভাব হইতে জন্মায়; অতএব মমত্ব ভাবের হ্রাস হওয়াতে বিপৎকালে তীব্র যাতনা থাকে না।

গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে

লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়ার পরে, তীব্র বিপৎকালে যে যাতনা থাকে না, ইহা হইতে শ্রীভগবানের করুণার পরিচয়ই পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম।

'স্বরূপ-শক্তি'তে কি কি বস্তু আছে।

'স্বরূপ-শক্তি' পদটীর অর্থ এবং এই পদ দ্বারা কি বুঝায় তাহা এই পুস্তকের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্ম অরূপ হইলেও অনন্ত শক্তি তাঁহার রূপের তুল্য; কোন বস্তুর 'রূপ' দেখিলে তাহা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়; যে শক্তির তত্ত্ব অনুভব করিলে,যেন ব্রহ্মের 'রূপ' দেখা হইয়াছে, সেই প্রকার সুস্পষ্ট ভাবে ব্রহ্ম 'স্বরূপের' প্রতীতি হয়, সেই শক্তিকে ব্রহ্মের 'স্বরূপশক্তি' বলা হয় এই শক্তির অপর নাম 'কালশক্তি'। কালশক্তিকে সর্ব্ব নিয়ন্তা বলা যায়।

দর্শনাদি যে সকল শাস্ত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাহাতে ব্রহ্মকে নির্গুণ নিরুপাধিক এবং নিষ্ক্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও তাঁহার শক্তি যে সর্ব্বকার্য্য করিতেছেন, এই কথাও বলা হয়। পূর্ব্বে (৫ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার (অর্থাৎ aspect এর) অলোচনার সুবিধার জন্য, দর্শন শাস্ত্রে ঐ সকল অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। পুরুষ, প্রকৃতি, গুণ, স্বরূপশক্তি, এবং বাসুদেব, প্রভৃতি পদ দ্বারা কেবল ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাই বুঝায়। এই নাম সকল দ্বারা আখ্যাত বস্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নয়।

ব্রহ্মকে 'সৎ' 'চিৎ' এবং 'আনন্দ' স্বরূপ বলা হয়। এই সংজ্ঞা তিনটী দ্বারা কি বুঝায় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ ও ১০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। কেহ যদি বলেন যে, ব্রহ্ম এবং স্বরূপশক্তি একই বস্তু, তখন চুলচেরা ভাবে সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে হয়ত এই বাক্যে একটু অসঙ্গতি থাকিতে পারে। কিন্তু বিষয়টীকে মোটামুটি ভাবে দেখিলে, এই কথায় যে ভুল আছে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, 'চিৎ' নামক সংজ্ঞায় যে সকল উপাদান আছে স্বরূপ-শক্তিতে সেই সকল উপাদান আছে। স্বরূপ-শক্তির কার্য্যের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে :—

(ক) অনন্ত বল, অর্থাৎ **energy**.

(খ) অনন্ত জীবনীশক্তি, অর্থাৎ **vitality**.

(গ) অনন্ত জ্ঞান, অর্থাৎ **intelligence**.

(ঘ) অনন্ত উৎকর্ষ, অর্থাৎ **excellence**

এবং (ঙ) অনন্ত সুখ, অর্থাৎ **biiss**

স্বরূপ শক্তিতে এই পাঁচটী বস্তুর একাধারে সংযোগ হইয়াছে। ব্রহ্মেও ঐ সকল বস্তু আছে, অতএব স্বরূপ শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা যাইতে পারে। সংসারের সৃষ্টি পালন এবং সংহার কার্য্য কি ভাবে চলিতেছে, সেই বিষয়গুলি পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের আলোকে

পর্য্যালোচনা করিলে, বিজ্ঞান হইতে স্বরূপ শক্তির প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই এখন দেখা যাক্।

বিজ্ঞান হইতে ব্রহ্মের পরিচয়

উপরে ব্রহ্মের অঙ্গীভূত যে পাঁচটী বস্তুর উল্লেখ করা হইল, সংসারে তাহাদের অস্তিত্ব উপলক্ষে কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

(ক) অনন্ত **Energy** অর্থাৎ শক্তি—বিশ্বের সর্ব্বত্র যে অনন্ত শক্তি পরিব্যাপ্ত আছে, বিজ্ঞান হইতে তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে 'আকর্ষনী' এবং বিকর্ষণী' নামক শক্তিদ্বয়ের আলোচনা করা হইয়াছে (৪২-৪৪ পৃষ্ঠা), তাহা অনন্ত শক্তির অঙ্গ মাত্র। পৃথিবীর সর্ব্বত্র উত্তাপ এবং অলোক বর্ত্তমান আছে; বিজ্ঞান বলেন যে, Energy is converted into heat and light, অর্থাৎ শক্তিই রূপান্তরিত হইয়া উত্তাপ এবং আলোকে পরিণত হয়। অতএব বলিতে হয় যে, উত্তাপ এবং আলোকরূপে পরিণত হইয়া অনন্ত শক্তিই বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। যে বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যেও ঐ অনন্ত শক্তির বিদ্যমানতা দেখা যায়।

বিশ্বের সমষ্টিভাব ছাড়িয়া, যদি আমরা ব্যষ্টিভাবে বিশ্বে স্থিত বস্তু নিচয়ের পর্য্যালোচনা করি,তখন দেখিতে পাই যে, ঐ অনন্তশক্তির অংশ দ্বারা জীবদেহে রক্তের এবং উদ্ভিদের মধ্যে রসের চলাচল হইতেছে, ঐ শক্তির অংশ দ্বারাই আমাদের ইন্দ্রিয় সকল পরিচালিত হইতেছে এবং ঐ শক্তি প্রভাবে আমরা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছি। ঐ শক্তিই নানা রূপ ধারণ করিয়া সংসারে নানা কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

অতএব 'চিৎ' সংজ্ঞা দ্বারা যে অনন্ত শক্তির উল্লেখ হয়, তাহা যে দার্শনিকদিগের কল্পনা প্রসূত বাক্য মাত্র নয়, তাহা এতই বাস্তব যে,

নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্রই ঐ শক্তির নিদর্শন প্যাওয়া যায়, এই তত্ত্বটী বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। 'প্রণব' এবং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' নামক পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এই বিষয়টীকে আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

(খ) অনন্ত **Vitality**, অর্থাৎ জীবনীশক্তি—উপরে যে অনন্ত শক্তির বিষয় আলোচিত হইল তাহা কেবল Energy অর্থাৎ বলই নয়, তাহার সহিত অনন্ত Vitality, অর্থাৎ জীবনীশক্তিরও সংযোগ দেখা যায়। বিজ্ঞান আবিস্কার করিয়াছেন যে, **Electron** 'ইলেকট্রোন' নামক বস্তুর Evolution, অর্থাৎ রূপান্তর, দ্বারা স্থুল দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। Electron নামক বস্তুটী শক্তিরই মূর্ত্তি। ঐ শক্তি দ্বারা, **cells** অর্থাৎ বস্তুর সূক্ষ্ম অংশ সকলের সৃষ্টি হয়।

Pathology অর্থাৎ বীজাণু শাস্ত্র, সম্প্রতি আবিস্কার করিয়াছেন যে বস্তু নিচয়ের প্রতি **cell**, অর্থাৎ সূক্ষ্ম অংশ, কোটী কোটী বীজাণুর সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়; সেই বীজাণুদিগের প্রত্যেকটীর মধ্যেই জীবনীশক্তি বিদ্যমান আছে। অধুনা আরও আবিস্কৃত হইয়াছে যে, এক একটী বীজাণুর মধ্যেও অসংখ্য ক্ষুদ্রতর বীজাণু, এবং ঐ ক্ষুদ্রতর বীজাণুদিগের এক একটীর মধ্যেও অসংখ্য ক্ষুদ্রতম বীজাণু আছে; এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বীজাণু সকলের প্রত্যেকটীর মধ্যেই জীবনীশক্তি কার্য্য করিতেছে।

Electron নামে আখ্যাত শক্তির রূপান্তর হইতে যখন বীজাণুদিগের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রকাশ হইয়াছে, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। মোট প্রতিপাদন এই যে,যে Energy অর্থাৎ যে শক্তি সর্ব্বব্যাপী হইয়া বিশ্বে বিরাজ করিতেছেন, ঐ শক্তির সঙ্গে জীবনীশক্তির সংযোগ আছে। শক্তির সঙ্গে যে অনন্ত intelligence অর্থাৎ জ্ঞানের, সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইবে।

অতএব পরিদৃশ্যমান বস্তু সকলের বিশ্লেষণ করিতে করিতে আমরা দেখিতে পাই যে, যে শক্তির বিকার দ্বারা বস্তু সকলের প্রকাশ

হইয়াছে সেই শক্তির সহিত জীবনীশক্তিরও নিত্য সংযোগ আছে।

অনন্ত জীবনীশক্তি যে কেবল জঙ্গম বস্তুতে আবদ্ধ নাই, বৃক্ষ লতা প্রস্তরাদি স্থাবর বস্তুতেও যে ঐ শক্তির কার্য্য চলিতেছে, বিজ্ঞান এই তত্ত্বটীরও প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব 'চিৎ' সংজ্ঞা দ্বারা যে অনন্ত শক্তি বুঝায়, তাহার সহিত অনন্ত জীবনীশক্তির সংযোগও যে আছে, এই তত্ত্বটীকে বৈজ্ঞানিক সত্য ভাবে গ্রহণ করিতে হয়।

Energy অর্থাৎ শক্তির রূপান্তর হইতে যে, আলোক এবং উত্তাপের প্রকাশ হয়, বৈজ্ঞানিকগণ এই কথা স্বীকার করেন। অনন্ত জীবনও যে কেবল অনন্ত শক্তিরই অন্যবিধ রূপান্তর, এই অনুমান বোধ হয় সুসঙ্গত।

(গ) অনন্ত **intelligence**, অর্থাৎ জ্ঞান—'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ অনুভব করা; অতএব 'জ্ঞান' পদ দ্বারা perception (অনুভূতি) বুঝায়। দেখা যায় যে, যতক্ষণ আমাদের জীবন থাকে, ততক্ষণই অনুভব শক্তি থাকে, এবং দেহ হইতে জীবনীশক্তির অপগমে অনুভব শক্তিও অপগত হয়। অতএব 'জ্ঞান'যে কেবল জীবনীশক্তিরই অবস্থান্তর, অর্থাৎ জীবনীশক্তির অবস্থাবিশেষ বা কার্য্যবিশেষই যে 'জ্ঞান' নামে আখ্যাত হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে।

যে বীজাণু সকলের সমষ্টি হইতে দৃশ্যমান বস্তু সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই বীজাণুদিগের প্রত্যেকটীরই যে অনুভব শক্তি আছে, এই তত্ত্বটী Pathology শাস্ত্র দ্বারা সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অনন্ত শক্তির সহিত যেমন অনন্ত জীবনের সংযোগ আছে, তেমনি অনন্ত জ্ঞানেরও সংযোগ আছে। ইংরাজী ভাষায়, knowledge intelligence, wisdom প্রভৃতি নামে আখ্যাত বস্তু সকল জ্ঞানেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার নাম মাত্র।

বিশ্বের কার্য্যে অনন্ত জ্ঞানের পরিচয়

পূর্ব্বে অনন্ত শক্তির আলোচনা করার সময় দেখিয়াছি যে, বিশ্বে যে অনন্ত শক্তি কার্য্য করিতেছে, সেই কার্য্যের সমষ্টি ভাবের কার্য্যের সহিত শক্তির ব্যষ্টি ভাবের কার্য্যের co-ordination, অর্থাৎ একতানতা, নিয়ত বিদ্যমান থাকে।

একতানতা থাকাতেই, যখন আমাদের মস্তিস্কের nerve centre হইতে শক্তি বাহির হইয়া কোন অঙ্গের পরিচালনা করে, তখন ঐ অঙ্গের প্রতি অণু পরমাণু সেই পরিচালনে যোগদান করে। যখন সমষ্টি ভাবে দেহে উত্তাপ-বৃদ্ধি হয়, তখন দেহের প্রতি অণু পরমাণুর উত্তাপও বেশী হয়। এই একতানতা বস্তুটীই সৃষ্টিতে harmony অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান উপায়।

জীবনী শক্তির কার্য্যেও একতানতা বিদ্যমান থাকায় সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যে জীবনীশক্তি আমাদের দেহের ক্ষুদ্রতম বীজাণুতে অধিষ্ঠিত আছে, তাহা মোট দেহের জীবনী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, মোট শক্তির সহিত একতান ভাবে কার্য্য করে; এবং যখন 'প্রাণ' নামক জীবনীশক্তি দেহকে পরিত্যাগ করেন, তখন বীজাণু সকলের দেহ হইতে জীবনীশক্তিও অপগত হয়। অতএব দেখা যায় যে, **Energy** শক্তি যেমন অনন্ত, তাহার সহিত সংযুক্ত জ্ঞান এবং জীবনীশক্তি উভয়ই তেমনি অনন্ত। বিশ্বের সৃষ্টি রক্ষণ এবং পালন কার্য্যে যে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞানের অনন্তত্বেরই পরিচয় প্রদান করে।

(ঘ) অনন্ত **excellence** অর্থাৎ উৎকর্ষ—'উৎকর্ষ' পদটী দ্বারা যে নৈতিক (moral) বা মানসিক শ্রেষ্ঠতা কিম্বা **graces** প্রভৃতি বুঝায়, সেই সকল বিষয় জড় বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূত নহে; অতএব তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান কিছুই বলেন না। তবে জড় বিজ্ঞান যে সকল বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাতেও আমরা শক্তির যে বিরাটরূপ এবং অসীম প্রভাব দেখিতে পাই, তাহাও উৎ-

কর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। বিশ্বে অনন্ত শক্তির এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের যে majesty প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই আমরা স্তম্ভিত হই।

পুরাণাদিতে ভগবানের যে অতুল মহিমা, যে অনন্ত দয়া এবং যে অপার করুণ-গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সকল বিষয় জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও, পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান হইতে ভগবানের মহিমা এবং কারুণ্য প্রভৃতির পরিচায়ক বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে, ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল না।

(৩) অনন্ত Bliss অর্থাৎ 'সুখ'—সুখ বস্তুটী জড়-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুর্ত নয়, অতএব তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান বেশী কিছু বলেন না। প্রকৃতপক্ষে 'সুখ' কি বস্তু, তাহাই বিবেচনা করা যাক্।

সুখ জ্ঞানেরই রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ চিত্তে 'জ্ঞানের' কার্য্যের অবস্থা বিশেষকে আমরা 'সুখ' বলি। সেই অবস্থাটী কিরূপ ? উত্তরে বলি যে, চিত্তে 'জ্ঞান' অর্থাৎ অনুভব শক্তি কার্য্য করার সময়ে, চিত্ত যখন সেই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় মনে ন্যূনাধিক আনন্দের স্ফূরণ হইয়া প্রীতি অনুভূত হয়, সেই প্রীতির অবস্থাকে আমরা 'সুখ' বলি। Perception অর্থাৎ জ্ঞান শক্তির 'পরিণাম' (অর্থাৎ রূপান্তর) হইতে 'সুখ' জন্মায়; অর্থাৎ জ্ঞানের অবস্থান্তর প্রাপ্তির ফলই 'সুখ'। শক্তির (energy) বিকার অর্থাৎ রূপান্তর হইতে আলোক ও উত্তাপ প্রকাশ হয়, সেইরূপ জ্ঞানের রূপান্তর হইতে সুখ প্রকাশ হয়। অতএব অনন্ত সুখও অনন্ত শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য

পুরাণ এবং দর্শন শাস্ত্র 'সচ্চিদানন্দ' ব্রহ্ম স্বরূপ উপলক্ষে যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারএবং প্রতিপাদন সকল পর্য্যবেক্ষণ

করিলে আমরা সেই শাস্ত্রীয় মতের সারবত্তাই দেখিতে পাই। তখন আমাদের মস্তক সসম্ভ্রমে প্রাচীন ঋষিগণের পাদমূলে অবনত হয়।

আস্তিক বা নাস্তিক উভয়ের পক্ষেই বিজ্ঞান 'প্রকৃষ্ট' জ্ঞানের ভাণ্ডার

যে জ্ঞানে ভ্রমের লেশ মাত্র নাই, যে জ্ঞান বিশুদ্ধ জ্ঞানের আধারভুত ব্রহ্মের অংশ, সেই জ্ঞানই 'প্রকৃষ্ট' পদবাচ্য। কেবল যে পারমার্থিক বিষয় উপলক্ষেই 'প্রকৃষ্ট' জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহাই নয়। বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষেও এইরূপ জ্ঞানের নিয়ত প্রয়োজন হয়। 'জ্ঞানং জ্ঞানবতামস্মি', স্বয়ং ভগবানই এই কথা বলিয়াছেন। সংসারে Secular অর্থাৎ বৈষয়িক কার্য্য-ক্ষেত্রে যাঁহারা কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহারা যে জ্ঞানের প্রভাবে কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সেই 'বিষয়বুদ্ধি' বিশুদ্ধ জ্ঞানেরই অন্তর্ভুত। ষোড়শ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে **command over worldly success** নামক প্রবন্ধে, দেখান হইয়াছে যে, চাকুরি, বাণিজ্য, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বিষয়কার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শক্তি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু।

এই যুক্তিবাদের দিনে, লোকের অন্তরে আপ্তবাক্যের উপর আস্থা নাই, যাহাকে **mathematical demonstration** বলে, সেইরূপ প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রতিপাদন হউক, অনেকে ইহাই চান; এবং ঐরূপ প্রমাণ না পাইলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন।

বিগত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে **Electricity, Electron**, 'আইয়োন' প্রভৃতি বস্তু উপলক্ষে যত নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে, ঐ আবিষ্কার দ্বারা অনন্ত শক্তির লীলা অধিকতর সুস্পষ্ট হইতেছে। কতক বিষয়, যাহা পূর্ব্বে একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত, তাহা এখন অভ্রান্ত সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাঁহাদের অন্তরে ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই, তাঁহারাও বিজ্ঞানের প্রভা দ্বারা উদভাষিত বিশ্বব্যাপী বিরাট শক্তির **majesty** দেখিয়া স্তম্ভিত হন। **Ether** নামক যে সর্ব্বব্যাপী এবং সূক্ষ্ম বস্তুটীর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা সম্প্রতি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অনন্ত শক্তির কার্য্য এবং স্বরূপ উপলক্ষে আমাদের জ্ঞানের এতই সম্প্রসারণ হইতেছে যে আশা হয় যে, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা যে সকল তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকগণের **Research** কার্য্য দ্বারা ঐ তত্ত্ব সকল অভ্রান্ত সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

পূর্ব্বে যখন শুনিতাম যে, যোগবলে ঋষিগণ নিজের মানসিক শক্তিকে অপরের অন্তরে প্রবেশ করাইতে পারিতেন, তখন ঐ কথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এখন দেখি যে **Ether** নামক medium দ্বারা শব্দ এক স্থান হইতে বহুদূরে প্রেরণ করা যায়; কাহারও মনের ভাব অথবা শক্তিকে দেহ হইতে দেহান্তরে পরিচালন করার জন্য Etherএর তূল্য অপর কোন সূক্ষ্ম **medium** হয়ত আবিস্কৃত হইবে, এই আশা স্বতঃই চিন্তাশীল মানবের চিত্তে উদিত হয়।

যে **Ether**এর প্রভাবে আমরা wireless set নামক বাক্সটীর দ্বারা নিজের বাড়ী বসিয়া সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের সঙ্গীত শ্রবণ করি, ঐ 'ইথর' কি অনন্ত 'চিৎ' নামক বস্তুটীরই অঙ্গ নয়? ঐ সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও যে সূক্ষ্মতর বস্তু থাকিতে পারে, এই কথাটীকে এখন আর অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

পাশ্চাত্য মহাদেশে **research** কার্য্য যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইতে আশা হয় যে, মনীষিগণ দ্বারা এমন কোন প্রকার সূক্ষ্মতর বস্তুর আবিস্কার হইবে,যে বস্তুটীর উপলক্ষে, আমাদের চিত্তই আধুনিক wireless setএর স্থান অধিকার করিবে; এবং তখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই দেহ হইতে দেহান্তরে মানসিক শক্তি এবং ভাবের প্রেরণ (অর্থাৎ transmission) এবং গ্রহণ (অর্থাৎ reception) কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

পাশ্চাত্য মহাদেশের বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাবধি ঐরূপ কোন সূক্ষ্মতর বস্তুর আবিষ্কার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞান যেরূপ প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা হইতে আশা হয় যে, **physics** এবং **metaphysics**এর মধ্যে এখন যে ব্যবধানের প্রাচীর দেখা যায়, ঐ প্রাচীর অচিরে ভূমিসাৎ হইবে। বহু দার্শনিক তত্ত্বই যে বৈজ্ঞানিকের experiment দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে, এই আশা এখন আর দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদন

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের অভিধানে 'ব্রহ্ম' এই কথাটী নাই বটে, কিন্তু যে সচ্চিদানন্দ সংজ্ঞক বস্তু ব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত হন, তাঁহাতে যে অনন্ত শক্তি,এবং অনন্ত জীবন প্রভৃতি বিভূতি আছে,ঐ সকল বস্তুর বিদ্যমানতা এবং উহাদের অনন্তত্ব বিজ্ঞানই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

স্বরূপশক্তির আলোচনা উপলক্ষে এই সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ; এবং 'প্রণব' ও 'গায়ত্রী' উপলক্ষে এই বিষয়ে আরও অনেক কথা নিম্নে বলা হইবে। আপাততঃ সংক্ষেপে ইহাই বলি যে, লোকে দার্শনিকের যুক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন হাতে কলমে ঐ যুক্তির সারবত্তা প্রতিপাদন করেন, তখন আর উপহাস করা চলে না। বৈজ্ঞানিকের **mathematical demonstration**কে উপহাস করিলে লোকে নিজেরই অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নিজে উপহাস্যাস্পদ হন। বিজ্ঞানের আবিষ্কার দ্বারা, ব্রহ্ম প্রতিপাদন উপলক্ষে, পরোক্ষভাবে যে অশেষ সাহায্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'ব্রহ্ম' পদটীর ব্যবহার না করিয়া, বৈজ্ঞানিক যদি **Infinite Energy** এই বাক্যটীর ব্যবহার করেন, তাহাতে ক্ষতি কি আছে? গোলাপ ফুলের নাম যাহাই দাও, তদ্দ্বারা গন্ধের হ্রাস বৃদ্ধি হয়না ; বৈজ্ঞানিক দ্বারা অপর নামকরণ হওয়াতে, ব্রহ্মের মাহাত্ম্যের হ্রাস হয় না।

বৈজ্ঞানিক 'ব্রহ্মের' অস্তিত্ব স্বীকার করুন বা নাই করুন, যে অনন্ত শক্তি ব্রহ্মেরই স্বরূপ তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করার সাধ্য বৈজ্ঞানিকেরও নাই। বিজ্ঞান ঐ শক্তির বিবিধ কার্য্যের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা Research কার্য্যকে আপন জীবনের মহাব্রত ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের লীলারহস্য উদ্ভেদ কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন। দেশ কাল এবং পাত্র ভেদে, তাঁহাদের কার্য্য যোগশাস্ত্রে বর্ণিত ধ্যান ধারণাদি কার্য্যেরই রূপান্তর।

বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল বিষয়ের গবেষণা করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী অনন্ত শক্তিরই লীলা। ঐ শক্তি এবং স্বরূপশক্তি একই বস্তু। জ্ঞানমার্গের সাধক দার্শনিকগণ ঐ শক্তির নাম দিয়াছেন 'ব্রহ্ম', যোগীগণ তাঁহাকে বলেন 'পরমাত্মা' এবং ভক্তগণ বলেন 'ভগবান'।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ অনন্তশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু বস্তুটী সর্ব্ব ধর্ম্মেই এক।

মুখের কথাতেই 'নাস্তিক' হওয়া যায় না।

যিনি কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তিনিও ঐ শক্তির 'ইলাকার' বাহিরে যাইতে পারেন না। 'নাস্তিক' বলিলেই লোকে নাস্তিক হয় না। ঐ 'অদ্বয় জ্ঞান' অনন্ত কাল হইতে আছেন, তাই ভাগবত বলেন যে তিনি 'জ্ঞানমাত্রং পরাচীনং'। এই বিষয়ে গীতার উক্তি অধিকতর সুস্পষ্ট। গীতা বলেন যে, অনন্ত শক্তি,

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্যধিষ্ঠিতং

যিনি আপনাকে 'নাস্তিক' বলেন, তাঁহার অন্তরেও ঐ অনন্ত শক্তি বিদ্যমান আছেন। ঐ শক্তিই তাঁহার দেহে রক্তের পরিচালনা

করিতেছেন, তাঁহার দেহের অস্থি মাংস মেদ মজ্জা ঐ শক্তিরই রূপান্তর; এবং নিজের অন্তরে যে অজ্ঞানতা থাকাতে তিনি নাস্তিকতার অভিমান করেন, ঐ অজ্ঞানও সেই অনন্ত জ্ঞানময় শক্তির বিকার। অতএব ছাড়িতে চাহিলেও ঐ শক্তিকে ছাড়ার সাধ্য কাহারও নাই।

প্রণবের উপর বিজ্ঞানের প্রভা

তিনটী অক্ষরের সংযোগে প্রণব উৎপন্ন হইয়াছে, একটী দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা, আর একটী দ্বারা পালনকর্ত্তা এবং তৃতীয়টী দ্বারা সংহার কর্ত্তা বুঝায়। অতএব প্রণব উচ্চারণ করিলে যে ব্রহ্ম আপন অনন্ত শক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং সংহার করিতেছেন তাঁহারই আবাহন করা যায়।

অনন্ত শক্তিই যে সৃষ্টি পালন এবং সংহার কার্য্য সাধন করেন, সে বিষয়ে বিজ্ঞান হইতে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। Science অর্থাৎ বিজ্ঞানের নানা বিভাগের (যথা Physiology, Biology, Geology Pathology ইত্যাদি শাস্ত্রের) আলোচনা করিলে, সংসারে কিভাবে সৃষ্টি এবং পালন এবং সংহার কার্য্য চলিতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাই।

সৃষ্টি—প্রথমতঃ ত দেখিতে পাই যে, স্থূল বস্তু সকল electron নামে আখ্যাত Energy অর্থাৎ শক্তিরই বিকার; অতএব প্রণব দ্বারা সাধক যে অনন্ত শক্তির আবাহন করেন, সেই শক্তির evolution অর্থাৎ বিকার দ্বারা যে সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, এই তত্ত্বটী বিজ্ঞান হইতে প্রতিপাদিত হয়। Geology, Physiology এবং Biology প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে আমরা পুনশ্চ দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির প্রতি স্তরেই শক্তির কার্য্য চলিতেছে। অতএব কেবল সৃষ্ট বস্তু নিচয়ের উপাদান সকলই যে শক্তির বিকার, তাহাই নয়। ঐ উপাদান সমষ্টি দ্বারা বস্তু সকলের প্রকটন (Evolution) উপলক্ষেও শক্তিই কার্য্য করেন।

সুতরাং যে শক্তিকে আমরা ব্রহ্মের স্বরূপভূত বস্তু বলি, তাঁহা দ্বারা যে সৃষ্টিলীলা সম্পাদিত হইতেছে, বিজ্ঞান তাহা প্রতিপাদন করেন।

পালন—ঐ শক্তি দ্বারা যে পালন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে বিজ্ঞান হইতে আমরা তাহারও ভূরি ভূরি পরিচয় পাই। মানব দেহের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ, হৃদয় দ্বারা রক্তের পরিচালন, পাক যন্ত্র এবং অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন, এই সকল কার্য্যই শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। সংসারে স্বরূপশক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় শক্তি নাই। অতএব যে শক্তি ইন্দ্রিয়ের পরিচালন করে, তাহা স্বরূপ-শক্তিরই অংশ।

যে উত্তাপ দেহের এবং জগতের রক্ষা করিতেছে, তাহা শক্তিরই বিকার, যে বারি জগতের 'জীবন' তাহাও পরোক্ষভাবে উত্তাপের শক্তির বিকার, এবং যে শস্যাদি মানবাদির জীবন রক্ষা করে, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে electron নামক শক্তির বিকার, এবং পরোক্ষ-ভাবে উত্তাপ এবং বারি ও ভূমি রূপে পরিণত অনন্ত শক্তিই আহার্য্য বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া আমাদের দেহের পোষণ করেন। অতএব দেখিলাম যে, জীবের দেহ অনন্ত শক্তির বিকার, দেহের পোষণকারী খাদ্য ঐ শক্তির বিকার এবং পোষণ কার্য্য ঐ শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়।

অতএব অনন্ত শক্তি যে বিশ্বের পালন করিতেছেন, বিজ্ঞান এই তত্ত্বটীকেও অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপাদন করেন।

সংহার—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৩০ পৃষ্ঠায় স্বরূপ শক্তির আলোচনা উপলক্ষে বলা হইয়াছে যে, অনন্ত শক্তির সহিত জীবনীশক্তির নিত্য সংযোগ আছে। স্বরূপশক্তি যখন জীবের দেহ হইতে আপন জীবনী শক্তির প্রত্যাহার করেন, তখন জীবের দেহ পঞ্চ-মহাভূতে মিশাইয়া যায়। এই অবস্থাকে আমরা 'সংহার' বলি। অতএব দেখা গেল

যে, যে অনন্ত শক্তি সৃষ্টি এবং পালন কার্য্য করিতেছেন, সংহার কার্য্য তাঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে।

পুনশ্চ দেখা যায়, বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বহু রোগই বীজাণু দ্বারা সৃষ্ট হয়; এক একটী বীজাণুর মধ্যেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু থাকে, এবং তাহাদের এক একটীর মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রতম বীজাণু থাকে। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বীজাণুর প্রত্যেকটীই electron নামক শক্তিরই সমষ্টি। অতএব আমরা যাহাকে ধ্বংশকারী শক্তি বলি, তাহাই রোগের বীজানুর রূপ ধারণ করিয়া সংহার কার্য্য সম্পাদন করেন।

প্রণব দ্বারা বৈজ্ঞানিক সত্যের ঘোষণা

অতএব বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদন হইতে দেখিলাম যে, 'স্বরূপশক্তি' পদ দ্বারা যে ব্রহ্মকে বুঝায় তাঁহারই অনন্ত শক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি রক্ষণ ও সংহার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রণব উচ্চারণের সময় বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপাদিত সত্যই উদ্ঘোষিত হয়।

প্রণব ফাঁকা আওয়াজ নয়

গ্রামোফোন নামক যন্ত্র হইতে mechanical ভাবে শব্দ বাহির হওয়ার ন্যায়, লোকে মর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং আপন চিত্তকে প্রণবের ভাব দ্বারা 'ভাবিত' না করিয়া, প্রাণহীন ভাবে প্রণব উচ্চারণ করেন। যে ব্রহ্ম নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিতেছেন, আপন চিত্তে তাঁহাকে আবাহন করাই প্রণব উচ্চারণের উদ্দেশ্য। আবাহন দূরে থাক, অনেকে ঐ বিষয় চিন্তা না করিয়া কলের পুতুলের মত প্রণব উচ্চারণ করেন। অনেক স্থলে গায়ত্রীর ধ্যানও ঐরূপ হৃদয়হীন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গায়ত্রীর মাহাত্ম্য নিম্নে বিবৃত হইল। কতক্ষণে এই উপাসনা নামক ভণ্ডামি (mockery) শেষ করিয়া বিষয়কর্ম্ম করিতে পারিব, উপাসনার সময় অনেকে তাহারই প্রতীক্ষায় থাকেন।

মানবের দোষ নাই, মানব যখন কোন রাজা রাজড়ার দরবারে গমন করেন, তখন সম্ভ্রমে রোমাঞ্চিত হন ; আর যিনি নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা, তাঁহার যথার্থ স্বরূপ উপলক্ষে মানবের যদি বিন্দুমাত্র জ্ঞানও থাকে, তাহলে উপাসনাকালে কখনই উপরোক্ত শৈথিল্য হইতে পারে না।

যদি বল যে, প্রণবের অর্থ ত অনেকেই জানেন, তাহা কি জ্ঞান নয় ? উত্তরে বলি যে, শব্দের অর্থ যতক্ষণ অন্তরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির উপর আধিপত্য স্থাপন না করে, ততক্ষণ প্রকৃত অর্থ-জ্ঞান হয় না। তখন কেবল বাক্ সম্পদ্‌ই থাকে। আমরা এই সম্পদকে জ্ঞান মনে করি। ইহা আমাদের ভ্রম। উপাসনার সময় অবিদ্যা কোন রকমেই প্রণবের গূঢ় তত্ত্বকে আমাদের অন্তরে প্রবেশ বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দেয় না বলিয়াই, বহু লোকের কাছে প্রণব 'ফাঁকা আওয়াজ' তুল্য হইয়াছে, এবং উপাসনাও কেবল কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ রূপ 'ঝক-মারি' ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দোষ প্রণবের নাই কিম্বা মন্ত্রেও নাই। দোষ আমাদেরই দুর্ভাগ্যের !

বিজ্ঞান সত্য-ধর্ম্মের পরম সহায়

বস্তুতঃ প্রণব দ্বারা আমরা যাঁহার আবাহন করি, তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন এবং অগ্নি দহন করেন ও মৃত্যু সংহার করেন।

মত্তয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মত্তয়াৎ
বর্ষতীন্দ্র দহত্যগ্নিঃ মৃত্যুশ্চরতি মত্তয়াৎ

এই কথাগুলি যে অভ্রান্ত সত্য, বিজ্ঞান তাহা পদে পদে প্রতি-পাদন করিয়াছেন। অতএব বিজ্ঞান যে সত্য ধর্ম্মের পরম সহায় এই কথা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

বিজ্ঞানই দেখান যে জগৎ ব্রহ্মময় ?

বিজ্ঞান 'ব্রহ্ম' পদটীর ব্যবহার করেন নাই এবং ব্রহ্ম-প্রতিপাদন

বিজ্ঞানের আলোচনার সীমার বাহিরে,এ কথা শতবার স্বীকার করি। কিন্তু উপরে যে অনন্ত শক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানই প্রদান করেন। যে অনন্ত শক্তিকে আমরা 'ব্রহ্ম' বলি, তাহার Evolution অর্থাৎ রূপান্তর দ্বারা যে, বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুর প্রকাশ হইয়াছে, এই বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ বিজ্ঞান হইতে লব্ধ হয়।

অতএব জগৎ যে উপরোক্ত অনন্ত 'শক্তিময়' (অর্থাৎ শক্তির 'বিকার'—রূপান্তর হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে), এই বাক্য ভাষার আড়ম্বর নয়। ইহার যাথার্থ্য যে Research দ্বারা অভ্রান্তভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই বিষয় আমরা বিজ্ঞান হইতে উপলব্ধি করি। বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় হয়, অতএব Evolution কার্য্য উপলক্ষে 'ময়ট্' প্রত্যয়ের ব্যবহার করা সুসঙ্গত। অনন্ত শক্তি যে ব্রহ্মের বিভূতি এই কথাটী স্মরণ রাখিলে, 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান হইতে লব্ধ হয়।

'ব্রহ্ম' কথাটীর ব্যবহার বিজ্ঞানে দেখা যায় না বলিয়া ক্ষতি নাই; অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বস্তু ব্রহ্মের মুখ্য বিভূতি বলিয়া পরিচালিত হয়, তাহাদের mathematical demonstration, অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ বিজ্ঞান হইতেই লব্ধ হয়। লোকে আপ্ত বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারেন, দর্শন শাস্ত্রের সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারা কাহারও কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়াতে ঐ সকল যুক্তিকে তাঁহারা হয়ত অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতিপাদনকে অগ্রাহ্য করা কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। তাই আবার বলি যে, কালক্রমে বিজ্ঞান দ্বারাই প্রকৃত সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, লেখকের ইহাই আশা হয়।

বিজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্ত্তক

অনন্ত শক্তির কার্য্যের যে পরিচয় বিজ্ঞান হইতে লব্ধ হয়, তাহা হইতে যে সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং পরোক্ষ inference হয়, তাহা

প্রকাশ করে যে, জগতের সকল কার্য্য ঐ শক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঐ শক্তি হইতে স্বতন্ত্র অপর কোন শক্তি যে নাই, এই অবধারণাটীও বিজ্ঞানের প্রতিপাদন হইতে reasonable deduction (সঙ্গত অনুমান) ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল অবধারণা ও inference হইতে দাঁড়ায় এই যে, যাহাকে আমরা 'আমার কার্য্য' বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে অনন্ত শক্তিরই কার্য্য। এই ধারণা জন্মিলে আর কাহারও অন্তরে 'অহং কর্ত্তৃ' ভাবের আধিপত্য থাকিতে পারে না।

পুনশ্চ, বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আমার দেহ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ অনন্ত শক্তির বিকার। আমরা এই মীমাংসা গ্রহণ করার পরে চিত্তে আর 'দেহাত্মভাব' থাকে না। অনন্ত শক্তির সহিত জীবনী শক্তির সংযোগও যে আছে, এই তত্ত্বটী বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপাদিত অভ্রান্ত সত্য।

আমার দেহ অনন্ত শক্তির বিকার, এবং ঐ শক্তিই আমার জীবন, বিজ্ঞানের এই প্রতিপাদন দুইটীকে গ্রহণ করিলে, অবিদ্যা যে 'আমি' নামক বস্তুটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বস্তুটী বস্তুকে কিসের উপর রাখিব, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। দেহের উপর ঐ 'আমিত্ব'কে রাখিতে গেলে দেখি যে, উহা অনন্ত শক্তির বিকার। যদি 'জীবনের' উপর রাখিতে যাই, তখনও দেখি যে উহাও ব্রহ্মের শক্তি। 'অহং' ভাবকে স্থাপনের জন্য ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন আধারই না পাইয়া 'অহং'কে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে বাধ্য হই। তখন অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।

Secular এবং Sacred এই উভয়বিধ বস্তু উপলক্ষে জ্ঞান 'বিশুদ্ধ' জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত। অতএব বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাসৃষ্ট 'আমিত্ব' ভাব ও 'দেহাত্মভাব' এবং 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাবের নিবর্ত্তন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এই বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে স্বতঃই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়। অতএব বিজ্ঞানের প্রতিপাদন গুলিকে প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা করিলে অবিদ্যার নিবৃত্তি সুসাধ্য হয়।

বৈজ্ঞানিক কেন দার্শনিক হন না

উপরোক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া কেহ হয়ত উপহাসচ্ছলে লেখককে বলিতে পারেন যে, যদি বিজ্ঞান যথার্থই সত্য ধর্ম্মের এত প্রকৃষ্ট সহায়, তাহলে বৈজ্ঞানিকগণ কেন দার্শনিক হন না ? উত্তরে বলি যে, ঐ মনীষিগণ যে Research কার্য্যে নিরত আছেন, তাহাতে তাঁহারা যে আনন্দ লাভ করেন, ঐ আনন্দ ব্রহ্মানন্দের সহিত সমজাতীয় বস্তু। ঐ আনন্দ ছাড়িয়া তাঁহাদের চিত্ত অপর সাধন মার্গে যাইতে চায় না। ভারতক্ষেত্রেও যোগমার্গের সাধকগণ স্বীয় পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি বা জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করেন না, কিম্বা জ্ঞান মার্গের সাধকগণ স্বীয় পন্থা ছাড়িয়া সাধনার অপর পন্থা অবলম্বন করেন না।

যিনি অনন্ত আনন্দের মহাম্বুধি তাঁহার কাছে Sacred ও Secular বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই, তিনিই সব এবং সবই তাঁহার বস্তু। অতএব যিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যোগীর ন্যায় একাগ্র ভাবে নিরত থাকেন, তিনি যদি গোপীদিগের ন্যায়

তন্মনস্কাঃ তদালাপাঃ তদ্বিচেষ্টা তদাত্মিকাঃ
তদ্‌গুণান্যেব গায়ন্ত্যঃ নাত্মাগারানি সস্মরুঃ

তাঁহারা যদি গবেষণা কার্য্যেই বিভোর হইতে পারেন, তাহলে দর্শনশাস্ত্র না পড়িয়াও তাঁহারা যে জ্ঞানলাভ করেন, Secular হইয়াও ঐ জ্ঞান বিশুদ্ধ বস্তু। এবং ঐ জ্ঞানলাভ করাই 'ব্রহ্মদর্শন' লাভ। কংস এবং শিশুপালের বৈরীভাব হইতেও ব্রহ্মদর্শন লব্ধ হইয়াছিল। আর জগতের হিতসাধনে নিরত বৈজ্ঞানিক গণের চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইবে না !!

গায়ত্রীর মর্য্যাদা

গায়ত্রী বেদমাতা, অতএব অতি পবিত্র বস্তু। দ্বিজ ব্যতীত অপরের গায়ত্রীতে অধিকার না থাকাতে, ব্যাস যখন বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র

প্রণয়ন করেন, ঐ দর্শন শাস্ত্র দ্বিজ ছাড়া অপরেও অধ্যয়ন করা সম্ভব ছিল; অতএব ব্যাস তাহাতে প্রণবের অক্ষরত্রয় ব্যবহার না করিয়া 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', এই প্রণব বাচক শব্দত্রয়ের ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, 'পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং', বেদের তুল্য পবিত্র বস্তু। শুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় ভাগবত কীর্ত্তন করেন ঐ সময়ে বিলোমজ সূতকে সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে দেওয়া উপলক্ষে, আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিত; কারণ, দ্বিজ ভিন্ন অপর কাহারও বেদে অধিকার নাই। কিন্তু 'ভূরিতেজাঃ' শুকদেব নিজেই সূতকে ভাগবত শুনিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। শুকদেব বেদতুল্য শ্রীমদ্ভাগবত উপলক্ষে এই উদারতা দেখাইলেও, বেদমাতা গায়ত্রীর মর্য্যাদা তিনিও অখণ্ডিত রাখিয়াছেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে গায়ত্রীর পদগুলির ব্যবহার না করিয়া গায়ত্রীবাচক অপর পদের ব্যবহার দেখা যায়।

ব্যাসদেব এবং শুকদেবের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া লেখক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে গায়ত্রীর আলোচনা করায় সময়, মূল বাক্যগুলি না লিখিয়া মঙ্গলাচরণে ব্যবহৃত গায়ত্রীবাচক কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিবেন।

গায়ত্রীর অভিপ্রায়

'প্রণব' প্রকৃতপক্ষে একাক্ষর ব্রহ্মেরই মূর্ত্তি। প্রণবের শক্তি 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'; সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, প্রণবও তেমনি আপন শক্তি প্রভাবে অবিদ্যার (অর্থাৎ আবরক শক্তির) অন্ধকার বিনাশ করেন, এবং মানব তখন গূঢ় তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করার সামর্থ্য লাভ করেন। অতএব ব্যবস্থা হইয়াছে যে, গায়ত্রী ধ্যানের পূর্ব্বে একাগ্রচিত্তে প্রণব উচ্চারণ করিয়া চিত্তে সেই ব্রহ্ম শক্তির আবাহন করিতে হয়। প্রণবের অক্ষরত্রয় উচ্চারণ

কালে একাগ্রতা প্রভাবে সাধক স্মরণ করেন যে, ব্রহ্মেরই শক্তি দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং সংহার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, অতএব ঐ শক্তির **majesty** অর্থাৎ মাহাত্ম্য যেমন অনন্ত, ক্ষমতাও তেমনি অসীম। অতএব ঐ শক্তির অসাধ্য কিছুই নাই।

কাহারও অন্তরে এই বিশ্বাস যদি বদ্ধমূল হয়, তিনি তখন সর্ব্বান্তঃকরণে অনন্ত শক্তির শরণাগত হইতে পারেন। লোকে কার্য্যসিদ্ধির জন্য বলবানের আশ্রয় লইয়া থাকে; অতএব গায়ত্রী ধ্যান ও আবৃত্তি করিতে করিতে সাধক ব্রহ্মের শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি সাধকের 'ধী' শক্তিকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে 'প্রচোদয়াৎ'; অর্থাৎ বুদ্ধিকে তুচ্ছ বিষয়াদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'প্র' = প্রকৃষ্টভাবে পরিচালিত করুণ।

'প্রকৃষ্ট' ভাবে পরিচালন কাহাকে বলে? এবং 'প্রকৃষ্ট' বস্তুই বা কি? স্বয়ং ব্রহ্মই 'মহতো মহীয়ান্' অতএব তিনিই প্রকৃষ্ট বস্তু। এই প্রার্থনার প্রয়োজনই বা কি ছিল? সাধক নিজেই কি আপন মতিকে উচ্চগামী করিতে পারেন না?

অবিদ্যা আমাদের 'ধী' অর্থাৎ মনোবৃত্তি সকলকে এমন সুদৃঢ়ভাবে সংসারের ক্ষুদ্র ভোগ্য বস্তুতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন যে, সেই বস্তু হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া আপন মতিকে উচ্চতর কোন বস্তুতে লওয়ার সামর্থ্য আমাদের নাই। কিন্তু ব্রহ্ম যদি আমাদের বুদ্ধির উপর আপন প্রেরণাশক্তিকে প্রয়োগ করেন, তাহলে ঐ শক্তিকে নিরোধ করার সাধ্য অবিদ্যারও নাই। অবিদ্যা নিজেই ব্রহ্মের সম্মুখীনা হইতে পারেন না, 'বিলজ্জমানা' হন। অতএব ব্রহ্মের শক্তি প্রভাবে অবিদ্যার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সাধকের মতি অনায়াসেই উচ্চগামী হয়

কেহ হয়ত বলিবেন যে, সংসারে লভ্য ভোগসুখ ছাড়িয়া আমাদের মতি যদি প্রকৃষ্ট বস্তুতে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) গমন করে, তাহলে

আমাদের কি লাভ হইবে? এখন সংসারে সুখভোগ করিতেছি, ঐ সুখ ছাড়িয়া আমাদের কি শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু লাভ হইবে?

গায়ত্রীই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। গায়ত্রীই বলেন যে, ঐ 'প্রকৃষ্ট' বস্তুকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) ভূরাদি লোকত্রয় এবং সবিতা ও স্বয়ং ভর্গোদেবও আরাধনা করেন। ভোগ সুখ লাভের জন্য আমরা দেবগণের আরাধনা করি; দেবগণ ভর্গোদেবের আরাধনা করেন। অতএব যে ব্রহ্ম স্বয়ং ভর্গোদেবেরও আরাধ্য, তিনি সকল ভোগসুখই দিতে পারেন।

সবিতা প্রভৃতির বিষয় ভোগ হইতে লভ্য সুখের অভাব নাই, তথাপিও তাঁহারা কেন ব্রহ্মের আরাধনা করেন? কারণ এই যে, ভোগসুখের অন্ত আছে এবং ঐ সুখের সঙ্গে দুঃখের সংযোগও আছে; কিন্তু ব্রহ্মের আরাধনা দ্বারা সাধকের অন্তরে যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন যে বিশুদ্ধ সুখ ঐ জ্ঞানের সহিত নিত্যভাবে সম্বন্ধ, সাধকের অন্তরে সেই সুখেরও উদয় হয়। ঐ সুখ অখণ্ড অনন্ত পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন। ঐ সুখ লাভ করাই জীবনের পরম পুরুষার্থ। গায়ত্রী ধ্যান করিয়া কি লাভ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে জানিলাম যে, যে সুখ সর্ব্ববিধ বিষয় ভোগের সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং যাহা জীবনের পুরুষার্থ তাহাই লব্ধ হয়।

অতএব যাহাতে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া চিত্তে সত্ত্বস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, এবং সেই সঙ্গে জীবনের পুরুষার্থভূত অনন্ত সুখও লব্ধ হয়, সেই জন্য প্রণব উচ্চারণ দ্বারা ব্রহ্মকে আবাহন করিয়া গায়ত্রী ধ্যান দ্বারা সাধক ব্রহ্মের শরণাগত হন। বলা বাহুল্য যে, এই কার্য্য আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর এবং গায়ত্রীর অভিপ্রায়ও আমাদের পক্ষে হিতকর।

গায়ত্রীর উপর বিজ্ঞানের প্রভা

দ্রষ্টব্য:—গায়ত্রীর পদগুলি না লিখিয়া গায়ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার দ্বারা এই বিষয়টীর আলোচনা করা হইতেছে।

ভূমিকা

মঙ্গলাচরণের প্রধান কথা হইল 'সত্যং পরং ধীমহি', যে ব্রহ্ম 'সত্য' অর্থাৎ ক্ষয় লয় রহিত এবং যিনি 'পরং' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহাকে 'ধীমহি' অর্থাৎ ধ্যান করিতেছি। যোগীগণ যেরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান অর্থাৎ 'একাগ্রভাবে' চিন্তা করেন, আমিও সেইভাবে সেই 'সত্যং' ও 'পরংকে' চিন্তা করিতেছি। তিনি আমার চিত্তে আপন বিশুদ্ধ জ্ঞানকে প্রতিভাত করুন; 'স্বেন ধাম্না' = তাঁহার নিজের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা, 'কুহক' = অবিদ্যার ভ্রম, আমার মন হইতে দূর হইবে।

যাহাতে আবরক শক্তির অপগম হইয়া চিত্তে বিশুদ্ধ প্রকাশ শক্তির স্ফুরণ হয়, সেই জন্য কবি শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ রচনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণে যে 'সত্যং পরং'কে আবাহন করিলেন তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ উপলক্ষ্যে কবি অপর যে কএকটী বাক্যের ব্যবহার করিয়াছেন, সেই কথাগুলিতে বিশেষ অর্থগৌরব আছে; ঐ বাক্য সকল 'গায়ত্রীবাচক', অর্থাৎ শব্দান্তর দ্বারা গায়ত্রীর অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব মঙ্গলাচরণের কথাগুলির উল্লেখ করিয়া তাহাদের ভাবার্থ বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করা যাক্।

(ক) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'

কথা কয়টীর অর্থ, 'যাহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং প্রলয় হয়'। প্রণবের অক্ষরত্রয় দ্বারা যাহা বুঝায়, এই কথা কয়টীও সেই ভাব প্রকাশ করে। 'প্রণবের উপর বিজ্ঞানের প্রভা' নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, বিজ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে এই কথাগুলির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৩৩৮ পৃষ্ঠা)

(খ) 'অন্বয়াদিতরতঃ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ'

কথা কয়টী দ্বারা প্রকাশ হয় যে, ব্রহ্মের অনন্তশক্তি সর্ব্ব বস্তুর অণু এবং পরমাণুতে ব্যাপ্ত আছে; 'অন্বয়' — অণু = মধ্যে + ই = যাওয়া;

বস্তুর অন্তরে থাকিয়াও অনন্তশক্তি তাহাতে আবদ্ধ থাকেন না, বস্তুর বাহিরেও থাকেন। সুতরাং ব্রহ্ম দেশ বা কালের ব্যবচ্ছেদের অধীন নহেন, এবং কোন বস্তুর নাশ হইলে এই শক্তি বিনষ্ট হন না।

Energy is indestructible অর্থাৎ শক্তি অনশ্বর, এই তত্ত্ব একটী অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য। এইজন্য ব্রহ্মকে 'সৎ' বলা যায়। 'অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।'

অত এব ঐ শক্তি 'অভিজ্ঞ,' অর্থাৎ এই জ্ঞানময় শক্তির অবিদিত কিছুই নাই। উহা অবিদ্যাসৃষ্ট দেশ বা কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে, এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন ও আছেন। আচার্য্যগণ বলেন যে, সৃজ্য ও অসৃজ্য সকল বস্তুই ব্রহ্মের জ্ঞানের অন্তর্ভুত।

বিজ্ঞান কি বলেন তাহা এখন দেখা যাক্। অনন্ত শক্তি যে বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে ইহা বিজ্ঞানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঐ শক্তির সহিত জীবনীশক্তি এবং জ্ঞানও যে নিত্য সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, বিজ্ঞান এই বাক্যেরও পোষকতা করেন। **infinite energy** (অর্থাৎ অনন্ত শক্তি) কোন দেশে বা কোন কালে আবদ্ধ নাই, এবং ঐ শক্তি যে অবিনাশী তাহাও উপরে বলা হইয়াছে। অতএব যে জ্ঞান অনন্ত **energy**র সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আছে, তাহা যে দেশ বা কালের ব্যবধান দ্বারা আবদ্ধ থাকেন না, এই তত্ত্ব বিজ্ঞান দ্বারাই প্রতিপাদিত হয়।

(গ) স্বরাট্

স্বেন এব স্বরূপেন রাজতে যঃ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং-প্রকাশ। যে অনন্ত শক্তিকে আমরা ব্রহ্ম বলি ঐ শক্তি নিজেই নিজের উৎপাদক। **Energy is indestructible**, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হইতে দেখা যায় যে, ব্রহ্ম 'সৎ' অর্থাৎ চিরকালই আছেন তিনি জন্ম মৃত্যু ক্ষয় লয় রহিত। ব্রহ্ম অপর কাহারও নিকট হইতে অনন্ত শক্তিকে

ভূমিকা

মঙ্গলাচরণের প্রধান কথা হইল 'সত্যং পরং ধীমহি', যে ব্রহ্ম 'সত্য' অর্থাৎ ক্ষয় লয় রহিত এবং যিনি 'পরং' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহাকে 'ধীমহি' অর্থাৎ ধ্যান করিতেছি। যোগীগণ যেরূপ পরমাত্মাকে ধ্যান অর্থাৎ 'একাগ্রভাবে' চিন্তা করেন, অমিও সেইভাবে সেই 'সত্যং' ও 'পরংকে' চিন্তা করিতেছি। তিনি আমার চিত্তে আপন বিশুদ্ধ জ্ঞানকে প্রতিভাত করুন; 'স্বেন ধাম্না' = তাঁহার নিজের স্বরূপভুত বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা, 'কুহক' = অবিদ্যার ভ্রম, আমার মন হইতে দূর হইবে।

যাহাতে আবরক শক্তির অপগম হইয়া চিত্তে বিশুদ্ধ প্রকাশ শক্তির স্ফুরণ হয়, সেই জন্য কবি শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ রচনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণে যে 'সত্যং পরং'কে আবাহন করিলেন তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ উপলক্ষ্যে কবি অপর যে কএকটী বাক্যের ব্যবহার করিয়াছেন, সেই কথাগুলিতে বিশেষ অর্থগৌরব আছে; ঐ বাক্য সকল 'গায়ত্রীবাচক', অর্থাৎ শব্দান্তর দ্বারা গায়ত্রীর অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব মঙ্গলাচরণের কথাগুলির উল্লেখ করিয়া তাহাদের ভাবার্থ বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করা যাক্।

(ক) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'

কথা কয়টীর অর্থ, 'যাহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং প্রলয় হয়'। প্রণবের অক্ষরত্রয় দ্বারা যাহা বুঝায়, এই কথা কয়টীও সেই ভাব প্রকাশ করে। 'প্রণবের উপর বিজ্ঞানের প্রভা' নামক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, বিজ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে এই কথাগুলির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৩৩৮ পৃষ্ঠা)

(খ) 'অন্বয়াদিতরতঃ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ'

কথা কয়টী দ্বারা প্রকাশ হয় যে, ব্রহ্মের অনন্তশক্তি সর্ব্ব বস্তুর অণু এবং পরমাণুতে ব্যাপ্ত আছে; ('অন্বয়' — অণু = মধ্যে + ই = যাওয়া,

বস্তুর অন্তরে থাকিয়াও অনন্তশক্তি তাহাতে আবদ্ধ থাকেন না, বস্তুর বাহিরেও থাকেন। সুতরাং ব্রহ্ম দেশ বা কালের ব্যবচ্ছেদের অধীন নহেন, এবং কোন বস্তুর নাশ হইলে এই শক্তি বিনষ্ট হন না।

Energy is indestructible অর্থাৎ শক্তি অনশ্বর, এই তত্ত্ব একটী অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য। এইজন্য ব্রহ্মকে 'সৎ' বলা যায়। 'অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।'

অতএব ঐ শক্তি 'অভিজ্ঞ,' অর্থাৎ এই জ্ঞানময় শক্তির অবিদিত কিছুই নাই। উহা অবিদ্যাসৃষ্ট দেশ বা কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে, এবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন ও আছেন। আচার্য্যগণ বলেন যে, সৃজ্য ও অসৃজ্য সকল বস্তুই ব্রহ্মের জ্ঞানের অন্তর্ভুত।

বিজ্ঞান কি বলেন তাহা এখন দেখা যাক্। অনন্ত শক্তি যে বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে ইহা বিজ্ঞানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ঐ শক্তির সহিত জীবনীশক্তি এবং জ্ঞানও যে নিত্য সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, বিজ্ঞান এই বাক্যেরও পোষকতা করেন। infinite energy (অর্থাৎ অনন্ত শক্তি) কোন দেশে বা কোন কালে আবদ্ধ নাই, এবং ঐ শক্তি যে অবিনাশী তাহাও উপরে বলা হইয়াছে। অতএব যে জ্ঞান অনন্ত energyর সহিত সম্বন্ধ হইয়া আছে, তাহা যে দেশ বা কালের ব্যবধান দ্বারা আবদ্ধ থাকেন না, এই তত্ত্ব বিজ্ঞান দ্বারাই প্রতিপাদিত হয়।

(গ) স্বরাট্

স্বেন এব স্বরূপেন রাজতে যঃ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং-প্রকাশ। যে অনন্ত শক্তিকে আমরা ব্রহ্ম বলি ঐ শক্তি নিজেই নিজের উৎপাদক। Energy is indestructible, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হইতে দেখা যায় যে, ব্রহ্ম 'সৎ' অর্থাৎ চিরকালই আছেন তিনি জন্ম মৃত্যু ক্ষয় লয় রহিত। ব্রহ্ম অপর কাহারও নিকট হইতে অনন্ত শক্তিকে

এবং জ্ঞান প্রভৃতি আপন বিভূতি নিচয়কে লাভ করেন নাই। ঐ বিভূতি সকলও তাঁহার সঙ্গেই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। একটী ছাড়া যে দ্বিতীয় অনন্ত শক্তি নাই এই কথাটীও বিজ্ঞান সম্মত।

(ঘ) তেনে ব্রহ্ম...সূরয়ঃ

এই কথাগুলির মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত শক্তি হইতেই দেবগণ প্রভৃতি সকলেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন। এই ব্যাকটীও পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান সম্মত। যে বস্তুর evolution দ্বারা অপর কোন বস্তুর সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্ট বস্তু যে উৎপাদনকারী বস্তুর গুণ পায়, **Biology** প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে আমরা এই তত্ত্বের বহু পরিচয় প্রাপ্ত হই। দেবগণ প্রভৃতি যে সকল জীব এবং যে সকল বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্ভব অনন্ত শক্তি হইতেই হইয়াছে; অতএব তাঁহারা ঐ শক্তির 'গুণ' অর্থাৎ জ্ঞান নামক 'গুণ' লাভ করিয়াছেন।

(ঙ) 'ধাম্না স্বেন......কুহকং'

আলোক যে অন্ধকার দূর করে, এই কথা সকলেই জানেন। অতএব জ্ঞানের নিরোধ হওয়াতে যে অজ্ঞানের সৃষ্টি হয়, সেই অজ্ঞান জ্ঞানের প্রভা দ্বারা দূর হয়। 'স্বেন' পদ প্রকাশ করে যে, ঐ জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিশুদ্ধ জ্ঞান, অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের সংস্পর্শ নাই।

(চ) 'সত্যং পরং ধীমহি'

উপরের ভূমিকার এই কথা কয়টীর আলোচনা করা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বকালে আছেন, ছিলেন এবং থাকিবেন, তিনিই কেবল 'সত্য' পদবাচ্য। উপরে **infinite energy** উপলক্ষে এই তত্ত্বটীকে বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করা হইয়াছে। 'পরং' পদের অর্থ সর্ব্বনিয়ন্তা। প্রণব এবং স্বরূপশক্তির আলোচনায় যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় বলা হইয়াছে তাহা হইতে ব্রহ্মের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

গায়ত্রীর Elevating power.

আমাদের অমূল্য সম্পদ

উপরোক্ত ইংরাজী কথা দুইটী ব্যবহার না করিয়া 'উন্নয়ন শক্তি' বলিলেও চলিত। ইংরাজী কথা দুইটী নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে বলিয়া, বাঙ্গলার বদলে এই কথা দুইটী ব্যবহার করা হইল।

একাগ্রভাবে প্রণব উচ্চারণ এবং গায়ত্রী ধ্যান করিতে করিতে, যাঁহাদের চিত্ত অন্ততঃ কতক পরিমাণেও গায়ত্রীর সহিত একাগ্রতা লাভ করে, তাঁহাদের চিত্তে গায়ত্রী হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভা পতিত হয়; অতএব তাঁহাদের জ্ঞানের সম্প্রসারণ হয় এবং অবিদ্যা তখন ঐ প্রভাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, বরঞ্চ ঐ জ্ঞানই অবিদ্যার মোহ নাশ করে। তাই মঙ্গলাচরণে 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং' বাক্য কয়টীর ব্যবহার হইয়াছে। মূল গায়ত্রীতে 'প্রচোদয়াৎ' পদটীর ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৪৬ পৃষ্ঠায় এই বাক্যটীর আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান ঋষিগণের দ্বারা প্রণব এবং গায়ত্রী এই দুইটী বস্তু আমাদিগকে প্রদান করিয়া যে কি অমূল্য সম্পদ দিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, দেখিয়াও দেখি না। এই বস্তু দুইটীর সাহায্যে আমরা রোগ শোক, জ্বালা যন্ত্রণা, অন্নবস্ত্রের অভাব ইত্যাদি সকল দুঃখই দূর করিতে পারি।

মানবের নেশার ঘোর

কিন্তু আমরা এমনই নেশার ঘোরে আছি যে, অবিদ্যাই হইয়াছেন আমাদের উপাস্য দেবতা, দুঃখই হইয়াছে আমাদের অঙ্গের আভরণ। সেই সঙ্গে আছে বড় বড় বাক্যের তুবড়ি। আমাদের মুখ হইতে

বাহির হয় এক ভাবের কথা, কিন্তু অন্তরে থাকে অপর ভাব। অবিদ্যাই, তমোগুণের প্রভাব দ্বারা এই মিথ্যাচারের উৎপাদন করায়। অতএব কিসে অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারিব, ইহাই সকল মানবের জীবনের মহাব্রত হওয়া উচিত। যাঁহার 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং', প্রণব এবং গায়ত্রী দ্বারা তাঁহার আবাহন করিলে, তিনি স্বয়ংই আমাদের চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভা ও প্রভাব প্রকটন করিয়া অবিদ্যার নিবৃত্তি করান। তাই বলি যে গায়ত্রীর **Elevating** শক্তির সীমা নাই।

ষোড়শ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

মেকী বস্তুকেও ভগবান খাটী করেন

প্রণব এবং গায়ত্রী মোক্ষলাভের সহায়

প্রণব উচ্চারণ এবং গায়ত্রী ধ্যান আরম্ভ করার সময়ে অনেকের অন্তরেই একনিষ্ঠা প্রবল ভাবে থাকে না। কিন্তু যদি কতক পরিমাণেও একনিষ্ঠা থাকে, তাহার দ্বারাও আমাদের মঙ্গল হয়। আংশিক একনিষ্ঠা দ্বারা প্রণবের শক্তি কতক পরিমাণে সাধকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি করিতে থাকে। চিত্তশুদ্ধি বেশী হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রগাঢ় একনিষ্ঠা জন্মায়।

'মোক্ষ' কাহাকে বলে

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫ পৃষ্ঠায় এবং অপর নানাস্থানে বলা হইয়াছে যে, আবরক শক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ঠ বহু সংস্কার আমাদিগকে ভোগ লোকত্রয়ে আবদ্ধ রাখিয়াছে, তাই আমরা 'সংসার' অতিক্রম করিয়া উচ্চলোকে গমন করিতে পারি না। যে অখণ্ড অনন্ত পূর্ণ এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ করাই মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ (৬৭ পৃষ্ঠা), সংসারে থাকার সময় আমরা সেই সুখ পাই না।

কেন পাই না ? ইহার কারণ এই যে, ঐ অনন্ত সুখ ভূ-লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে নাই, যে 'অক্ষয়'-স্বর্গকামঃ হইয়া আমরা যাগযজ্ঞাদি করি, সেই স্বর্গেও ঐ অখণ্ড অনন্ত সুখ নাই। 'ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ'।

আমাদের অনেকের মনে একটা ধারণার 'আবছায়া' থাকে যে, 'মোক্ষ' লাভ করিলে আমাদের **extinction**, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। এইটী ভ্রান্ত ধারণা। বৌদ্ধ দর্শনের অভিপ্রায়কে বিকৃত রূপে বুঝিয়া, লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে। 'মোক্ষ' পদ দ্বারা **annihilation**, অর্থাৎ আত্মস্বরূপের সম্পূর্ণ বিলোপ, বুঝায় না। এই পদ দ্বারা দুঃখময় সংসার অতিক্রম করিয়া অনন্ত সুখময় নবজীবন লাভ করাই বুঝায়।

মোক্ষ লাভের উপায়

যে আসক্তির বহু বন্ধন আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ছেদন হয় কিসে ? ভাগবত এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ব্রহ্মদর্শন লব্ধ হইলে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্দন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টে এবাত্মনীশ্বরে

অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন লব্ধ হইলে সকল কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। ব্রহ্ম ত নাম-রূপ-বর্জ্জিত ; যিনি অরূপ, তাঁহার 'দর্শন' কিরূপে লব্ধ হইবে ? উত্তরে ভাগবত বলেন যে, যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ (অর্থাৎ যে জ্ঞানই স্বয়ং ব্রহ্ম), সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-লাভ করাকে ব্রহ্মদর্শনলাভ করা বলে। যে আসক্তির বন্ধন আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ রাখে তাহা 'অজ্ঞান' হইতে জন্মায়। বিশুদ্ধ জ্ঞান লব্ধ হইলে 'অজ্ঞান' দূর হয়, এবং সেই সঙ্গে আশক্তির বন্ধন সকলও দূর হয়। গীতাও বলেন যে, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে'।

যে বিশুদ্ধ জ্ঞান এত মূল্যবান বস্তু, তাহা লাভের জন্য বহুবিধ

উপায় আছে। বিহিত উপায় সকলের মধ্যে প্রণব এবং গায়ত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। প্রগাঢ়ভাবে প্রণব উচ্চারণ এবং গায়ত্রী ধ্যান করিতে করিতে, অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্ফুরণ হয়; এই অবস্থা প্রাপ্তিকে ব্রহ্ম-দর্শন লাভ করা বলে। এই জন্যই বলি যে, গায়ত্রীর প্রভাবে মানব সংসার দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত সুখ লাভ করেন। এই অবস্থা প্রাপ্তিকে 'মোক্ষ' লাভ করা বলে।

যাঁহারা ভোগ সুখে আসক্ত, তাঁহাদের কাছে হয়ত এই কথাগুলি ভাল লাগিবে না। তাঁহারা সংসারে বিত্ত চান, তাঁহারা ভোগ সুখ এবং প্রতিষ্ঠাও চান। বিশুদ্ধ সুখ যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন; যদিও সংসারে লভ্য সুখের সঙ্গে দুঃখের সংযোগ থাকে, তথাপিও ঐ সুখ পাইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। এই **'wise and prudent'** শ্রেণীর মানবের চোখের উপর যে সাংসারিক সুখ থাকে তাহা ছাড়িয়া, শাস্ত্রে বর্ণিত (যাহা, তাঁহারা ভাবেন, 'কল্পনা-প্রসূত') সুখের অন্বেষণ করিতে তাঁহারা রাজী হন না। তাঁহারা চান যে, বিষয়-ভোগ হইতে লভ্য সুখই বেশী হউক এবং যদি উহা বেশী নাও হয়, তথাপি যে সুখ আয়ত্তে আছে, অন্ততঃ তাহাও বজায় থাকুক।

তাঁহাদিগের সন্তোষের জন্য নিম্নে দেখাইতেছি যে, প্রণবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিষয়কর্ম্মেও সুবিধা হয়। অতএব সংসারের মাপকাঠির দ্বারা লাভ লোকসানের হিসাব করিলেও দেখা যায় যে, প্রণব এবং গায়ত্রীর সাধনা বাজে কাজ নয়।

বিষয়-কার্য্যে প্রণব ও গায়ত্রীর প্রভাব

যে জ্ঞানের প্রভাবে বৈষয়িক কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়, সেই জ্ঞান 'বিশুদ্ধ' জ্ঞানেরই অংশ; ঐ জ্ঞান আপন আধারভূত ব্রহ্ম হইতে আগমন করিয়া মানবের চিত্তে প্রতিফলিত হয়। আমরা 'অহঙ্কারের' প্রভাবে এই তত্ত্বটীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বৈষয়িক জ্ঞানকে নিজের বুদ্ধির উপরে আরোপ করি। এই মোহ অত্যন্ত প্রবল হইলে যে

বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা কার্য্যে সিদ্ধি লব্ধ হয়, তাহা বুদ্ধিতে স্ফুরিত হয় না, এবং মতিবিভ্রমই প্রবল হয়। মতিবিভ্রম দ্বারা কার্য্য-হানি হয়।

(ক) প্রবল আকাঙ্ক্ষা কেন কার্য্য হানি করে

আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি সাত্ত্বিক 'অহঙ্কার' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে জ্ঞান দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা সত্ত্বগুণ (অর্থাৎ ব্রহ্ম) হইতে নিঃসৃত হইয়া যখন আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, তখনই আমরা কার্য্যপ্রণালীতে ভ্রম না করিয়া 'ঠিক পথে চলি'। তখন আমাদের চেষ্টা সফল হয়। এই সাফল্যের নাম বিষয়কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ। প্রবল আশা এবং আকাঙ্ক্ষা আবরক শক্তি হইতেই জন্মায়। তাহাদের দ্বারা প্রকাশ শক্তির নিরোধ হওয়াতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে কার্য্যহানি হয়।

(খ) অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা

মতি যতকাল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, ততকাল কেহ 'প্রকৃষ্টভাবে' গায়ত্রী ধ্যান বা প্রণব উচ্চারণ করিতে পারেন না। তাই বলিয়া যদি সংসারে ব্যবস্থা থাকিত যে, 'প্রকৃষ্ট' ভাবে গায়ত্রী ধ্যান বা প্রণব উচ্চারণ না করিলে কোন উপকারই হইবে না, অর্থাৎ যদি ব্যবস্থা থাকিত যে, যতকাল মানবের মতি বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন না হইবে, ততকাল প্রণব ও গায়ত্রীর সাধনা দ্বারা কোন উপকারই হইবে না, তাহলে সংসারী মানব প্রণব এবং গায়ত্রী এই দুইটী বস্তুকে নিষ্প্রয়োজনীয় বাজে জিনিষ মনে করিয়া অবহেলা করিত। ভোগরত মানবও যাহাতে প্রণব এবং গায়ত্রী হইতে বিষয় কর্ম্মেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য ভগবান কি সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

A feeble reed he will not break.

করুণাময় ভগবান আমাদের দুর্ব্বলতার কথা বিদিত আছেন। গুণত্রয়ের সংঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন বিপদ স্রোতের লক্ষই হইল, চরমে

আমাদিগকে সবল করা। আরাধনা সকাম হউক অথবা নিষ্কাম হউক, তাহাতে যদি অত্যল্প পরিমাণেও শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে ঐ আরাধনাই সুফল প্রসব করে।

কএক বৎসর পূর্ব্বে লেখক যখন বরিশাল জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটীর টাইফয়েড জ্বর হয়। বালকটীর রোগমুক্তির জন্য লেখকের একটী বৃদ্ধ মুসলমান চাপরাশী যে প্রকার শ্রদ্ধার সহিত স্বধর্ম্ম-অনুযায়ী প্রার্থনা করিতেন, তাহা দেখিবার জিনিষ ছিল; সেই দরিদ্র ভক্তটী এখন ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার শ্রদ্ধার সুমধুর স্মৃতি লেখকের নিকট মূল্যবান বস্তু হইয়া আছে।

যে ভগবান আমাদের 'হৃদ্যন্তস্থঃ' হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যদি তাঁহার উপর আমাদের কিয়ৎ পরিমাণ শ্রদ্ধাও থাকে, তাহলে তিনিই 'অভদ্রানি বিধুনোতি', অর্থাৎ অবিদ্যাসৃষ্ট কামলোভাদি উপসর্গ সকলের হ্রাস করিয়া, যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহার সুযোগ উৎপাদন করেন।

প্রণব উচ্চারণ বা গায়ত্রী ধ্যানের সময় যদি অল্প মাত্রায়ও শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে ঐ কার্য্য নিরর্থক হয় না। ভগবান ক্রমশঃ ঐ মেকী বস্তুকেই খাঁটি করিয়া লন। শ্রদ্ধা ক্রমশঃ যত খাঁটি হইতে থাকে, প্রণবও তত বেশী বেশী বলের সহিত আমাদের চিত্তের উপর আপন শক্তি প্রকাশ করে। অতএব চিত্তশুদ্ধিও অধিকতর বেগে অগ্রসর হয়।

ষোড়শ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

Command over worldly success

সাধকের ইচ্ছাশক্তির বলবৃদ্ধি

প্রণব ও গায়ত্রীর আশ্রয়ে থাকার সময়, কিম্বা অপর ভাবে সাধনা করার সময়ে, আমাদের মতি যত সুদৃঢ়ভাবে শ্রীভগবানে নিবদ্ধ হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তি তত শ্রীভগবানের যোগমায়া নাম্নী ইচ্ছাশক্তির সহিত সমভাবাপন্ন হইতে থাকে। অতএব আমাদের শক্তি ক্রমশঃ ভগবৎ শক্তির সহিত এতই ঘনিষ্টভাবে মিলিত হয় যে, আমাদের ইচ্ছা প্রায় স্বয়ং শ্রীভগবানের ইচ্ছার তুল্য অমোঘ হয়। তখন আমাদের অসাধ্য কিছুই থাকে না। যিশুও বলিয়াছেন যে, 'Faith' অর্থাৎ পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকিলে আমাদের আদেশে পর্ব্বতও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব এত অধিক, বৈষয়িক কার্য্যে সিদ্ধি উৎপাদন করা তাহার পক্ষে মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয় না।

সংসারে 'বাজীমাৎ' করার জন্য সাধনা

আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে, সাধকের ইচ্ছার 'শক্তি' অত্যন্ত প্রবল হয় বটে, কিন্তু তখন বিত্তলাভ, সম্ভ্রম লাভ বা অপর কোন রকমের বৈষয়িক সুখ-লাভ এত তুচ্ছ বস্তু হইয়া দাঁড়ায় যে, মানব ঐ সকল বস্তু সংগ্রহ করার জন্য, অথবা অপর কোন প্রকার ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আপন বিরাট শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছাই করেন না।

তখন চিত্তে অবিদ্যা সৃষ্ট 'অহঙ্কারের' উপশম হওয়াতে বিত্তাদি লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষারও উপশম হয়। ধ্রুব যখন শ্রীহরির দর্শন লাভ করিলেন, তখন অবিদ্যার আধিপত্য ছিল, অতএব আকাঙ্ক্ষার বশে ধ্রুব শ্রীহরির নিকট হইতে বর লইয়াছিলেন। শ্রীহরির দর্শন প্রাপ্তিই প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মদর্শন লাভ; অতএব বরলাভের পরে ধ্রুবের

চিত্তে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া 'বিশুদ্ধ' জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে ধ্রুব বুঝিতে পারিলেন যে,যে শ্রীহরি 'ভববন্ধন' ছেদন করিতে পারেন, তাঁহার নিকট সংসার হইতে মুক্তি লাভের জন্য 'বর' প্রার্থনা না করিয়া রাজ্য কামনা করাতে নির্ব্বুদ্ধিতাই দেখাইয়াছেন। যাহাতে নূতন করিয়া সংসার-বন্ধনের সৃষ্টি হয়, বুদ্ধির দোষে তিনি তাহাই করিয়াছেন!! অহো! আমি কি ভাগ্যহীন! আত্মগ্লানির আবেগে ধ্রুব বলিলেন

ভবচ্ছিদমযাচেহং ভবং ভাগ্য বিবর্জ্জিতঃ
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণ-পুণ্যেন ফলীকারা নিবাধনঃ

যতক্ষণ আমাদের মনে সাংসারিক 'বাজীমাৎ' করার বাসনা থাকে, ততক্ষণ মতি 'বিষয়'কে (অর্থাৎ সাংসারিক বস্তু সকলকে) আশ্রয় করিয়া থাকে। ভগবানকে আশ্রয় না করিলে 'যোগমায়া' শক্তি লব্ধ হয় না; অতএব বিষয়কামী সাধক যোগমায়া শক্তি লাভ করিতে পারেন না। ঐ সকল লোকের কাছে ঐহিক সুখদ মুখ্য বস্তু ভাবে সমাদৃত হয়। অমুক অমুক বস্তু আমার সুখের উপকরণ, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা যখন নানাবিধ বস্তু কামনা করেন, তখন তাঁহাদের সাধনায় যদি একনিষ্ঠ ভাব থাকে, তাহা হইলে প্রণব এবং গায়ত্রীর প্রভাবে তাঁহারা সেই কাম্য বস্তু সকল লাভ করেন। ঐ সাধকের 'গুণযুক্ কামাক্ত' চিত্তে গুণের স্বভাবিক ক্রিয়া চলিতে থাকে। অতএব গুণের কার্য্যপ্রভাবে কাম্য-বস্তু লাভের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে বিপদের উপাদানও সঞ্চিত হয়।

(ক) ভূতের ব্যাগার খাটা

কেহ যদি বলেন যে, যদি সাংসারিক স্বার্থসিদ্ধিই না হইল, তবে প্রণব ধ্যান নামক 'ভূতের ব্যাগার' খাটিয়া লাভ কি? উত্তরে বলি যে, যদি সাংসারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেহ প্রণব ও গায়ত্রীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন সেই কার্য্যে নিষ্ঠা অর্থাৎ দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধা থাকিলে ঐ ভাবের সাধনাও নিরর্থক হয় না। সাধনা প্রভাবে তিনি কাম্য-ফল লাভ করেন।

উপরন্তু যাহাতে তাঁহার স্থায়ীভাবে মঙ্গল হয় প্রণব ও গায়ত্রী তাহারও ব্যবস্থা করেন। প্রণব এবং গায়ত্রী ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তের উপর আপন প্রভাশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যে বিশুদ্ধ সুখ ব্রহ্মের স্বরূপভূত বস্তু, তাঁহাকে ঐ সুখের আস্বাদ প্রদান করেন। ঐ সুখ যে ভোগসুখ অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাহা অনুভব করার পরে, যিনি আগে ছিলেন সকাম সাধক তিনি সকাম ভাব পরিত্যাগ করেন; তখন 'ধনং দেহি ধান্যং দেহি, যশো দেহি' এই 'দেহি' 'দেহি' ভাবের প্রার্থনা দূর হয়। তখন "প্রভো আমি কেবল তোমাকেই চাই', সাধকের অন্তরে এই কামনাই রাজত্ব করে।

এই শ্রেষ্ঠতর কামনার সঞ্চার হওয়ার পরে, সাধক যদি আপনাকে প্রণব এবং গায়ত্রীর আশ্রয়ে রাখিয়া ভগবানকে লাভের জন্য প্রগাঢ়ভাবে সাধনা করেন, ভগবান তাঁহার ঐ কামনাও পুরণ করেন। এ স্থলে বলিয়া রাখি যে, দিন দিন সাধনা যত প্রগাঢ় হইতে থাকে, তখন সাধন-কার্য্যে কষ্ট না হইয়া বরং বেশী বেশী আনন্দই হয়। 'আত্মানমপি যচ্ছতি' যিনি ভক্তের কাছে নিজেকেই বিলাইয়া দেন, সেই সুমহান্ দাতার কাছে অদেয় কিছুই নাই। যিনি দয়ার সাগর, প্রেমের মহাম্বুধি, যিনি 'অসম্ভবঃ সন্ প্রভবঃ সঃ সম্পদাম্', তাঁহাকে লাভ করা অপেক্ষা অপর কি শ্রেষ্ঠতর লাভ আছে? বিপদ মুক্তি উপলক্ষে এই বিষয়ের আরও আলোচনা করা হইয়াছে।

অবিদ্যার প্রলোভন নিরোধ

তপস্যায় সিদ্ধিলাভের পরে Satan যখন স্বার্থসিদ্ধির লোভ দেখাইয়া যিশুকে নিজের যোগমায়া শক্তি প্রকাশের জন্য প্রলোভিত করিয়াছিল, যিশু তখন Satanকে তিরস্কারই করিয়াছিলেন। যদি যিশু ঐ প্রলোভনের দ্বারা মুগ্ধ হইতেন, তাহলে আপন দৈবী শক্তি দ্বারা অবিদ্যার আরাধনা করাই হইত।

সমুন্নত হওয়ার পরেও আমাদের যে পুনরায় পদস্খলনের আশঙ্কা

থাকে, এই কথাটী যেন নিয়ত মনে থাকে ; যিশু যখন মর্ত্ত্যলোকে ছিলেন তখন তাঁহার চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বের অভাব ছিল না। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত হন, তথাপিও Satan সারাজীবনই তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রলোভিত করিয়াছে, এই কথাটীও যেন আমরা না ভুলি। আমাদের যতই আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক না কেন, অবিদ্যা সারাজীবনই আমাদের অনুসরণ করে। যতকাল আমাদের সংসার-মুক্তি না হয়, ততকাল আমরা অবিদ্যার রাজ্যে বাস করি, এই অবস্থায় শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অবিদ্যার প্রভাব হইতে উদ্ধার লাভের আশা নাই। 'আমার আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং আমার ভয় কি,' মানব যেন ইহা ভাবিয়া শ্রীভগবানের পদাশ্রয় পরিত্যাগ না করেন; ইহা ব্যতীত আত্মরক্ষার অপর উপায় নাই।

চঞ্চলা লক্ষ্মীকে অচঞ্চলা করার উপায়।

ব্রহ্মাদি দেবগণ লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করেন। স্বয়ং শ্রীভগবান লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করেন না, দেবী নিজেই শ্রীহরির আরাধনা করেন। ভক্তকে ভগবান নিজের অপেক্ষাও উচ্চস্থান দিয়াছেন। অতএব যে ভক্ত একান্তমনে শ্রীভগবানের শরণাগত হন, তাঁহার আর ধনমানাদি বস্তু সকল খুঁজিতে হয় না, ধন-মান নিজেই তাঁহাকে খুঁজিয়া লয় ; এবং চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার নিকট অচঞ্চলা হইয়া থাকেন।

চলাপি যা শ্রীর্নজহাতি তৎপদম্

ভগবানকে ছাড়িয়া লোকে যখন ভোগবাসনার আরাধনা করে তখন লক্ষ্মীদেবী যে তাহাদের গৃহ পরিত্যাগ করেন, এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত আর খুঁজিতে হয় না। দুরাচারী ধনীর অধঃপতন এবং দারিদ্র্য কে না দেখিয়াছেন।

কামিনী-কাঞ্চনের নামে জলাতঙ্ক

যদি বল যে, সংসারে ভক্তের মধ্যেও দারিদ্র্যের বহু দৃষ্টান্ত কেন দেখা যায় ? উত্তরে বলি যে, ধন কতক লোকের পক্ষে চিত্তবিক্ষেপের কারণ হইয়া থাকে। ঐ প্রকার লোকের মতি যখন সন্মার্গে অবস্থান করে, তখন তাঁহাদিগকে ধন দ্বারা প্রলোভিত না করিয়া, দারিদ্র্যের প্রভাব দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্মার্গে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থাকে ভগবানের অনুগ্রহই বলিতে হয়।

ধনের 'কদর' (অর্থাৎ অত্যধিক মর্য্যাদা) বিষয়াসক্ত লোকের চক্ষেই থাকে। যিনি যথার্থ ভক্ত, তাঁহার চক্ষে ধন অবজ্ঞার বস্তু নয় কিম্বা বিশেষ আদরের বস্তুও নয়। ঐ ভক্ত অপর বস্তুতে বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের যে রূপ দেখেন, ধনের মধ্যেও সেই রূপ দেখেন।

অবিদ্যার প্রভাবে লোকে দুই রকমে বড়াবাড়ি করে। (ক) একদল 'টাকা টাকা' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া অবিদ্যাসৃষ্ট আসক্তির মোহে বাড়াবাড়ি করেন। (খ) আর একদল ধনকে'কাকবিষ্ঠা' বলিয়া (অন্ততঃ মুখে) অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা কামিনী-কাঞ্চনের নামে শিহরিয়া উঠেন। কতক লোকের মনে প্রকৃতই 'কামিনী-কাঞ্চনের' প্রতি অনাদর থাকে, কিন্তু অনেকেই অনাদরের অভিনয় করেন মাত্র। যাঁহারা প্রকৃতই কামিনী-কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা উহাদের মধ্যে বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানের রূপ দেখিতে পান না। তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। অতএব অজ্ঞানই ঐ অবজ্ঞার কারণ।

কামিনী-কাঞ্চন কি ভগবান ছাড়া !! তবে এত ভয় কেন ? যাহা যথার্থ 'আমি' তিনি যে 'পরা-প্রকৃতি' এবং তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যে কামিনী-কাঞ্চন আমারই বিভূতি, আমারই রূপভেদ যে বস্তুদ্বয় আমা হইতে ভিন্ন নয়, তাহাদের কেন ভয় করিব ? তাদের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতাই নাই, তবে এত ভয় কেন ?

শ্রীল রূপসনাতন গোস্বামী মহোদয় মহাজ্ঞানী হইয়াও তাঁহার মনে কামিনীর প্রতি আতঙ্ক ছিল। মীরাবাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

প্রার্থনা করিলে, ঐ আতঙ্ক বশতঃ গোস্বামী প্রভু দেখা করিতে অস্বীকার করেন। মীরা উত্তরে বলিয়া পাঠান যে, কেবল শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সংসারে 'পুরুষ' পদবাচ্য অপর কেহ নাই। গোঁসাই নিজেও যে প্রকৃতি। প্রকৃতি-রূপা নারীকে (অর্থাৎ মীরাকে) তাঁহার এত ভয় কেন! নিজে প্রকৃতি হইয়াও প্রকৃতি রূপিণী নারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গোঁসাই কেন ভয় করিতেছেন। এই পরম জ্ঞানের কথা শুনিয়া গোস্বামী প্রভু প্রীত হইয়া মীরার সমাদর করেন।

ষোড়শ অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)।

বিজ্ঞানের আলোকে ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য

ভূমিকা

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভক্তি প্রভৃতি করুণগুণ বিজ্ঞানের সীমার বহির্ভূত। কিন্তু বিজ্ঞান ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা হইতে, পরোক্ষভাবে **Personal** God এবং তাঁহার কারুণ্য ও উৎকর্ষাদির পরিচায়ক বহু উপাদান পাওয়া যায়। ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রভৃতি মধুর বস্তু সকল যে ব্রহ্মেরই বিভূতি, তাহাও পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, এই সকল বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হইতেছে।

ব্রহ্ম কি নীরস বস্তু?

এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বিজ্ঞানের প্রমাণাদি দ্বারা যে **infinite energy**র পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, দার্শনিকগণ তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলেন। ঐ বস্তুর সহিত অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত জ্ঞান প্রভৃতি অপর যে সকল বিভূতির সংযোগ থাকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলেও, যদি দয়া প্রেম প্রভৃতি কোমল বস্তু তাহাতে না থাকে তাহলে ব্রহ্ম অতি নীরস বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

Jehovah the great chastiser ইহুদিদিগের নিকট ব্রহ্ম এই নামে পরিচিত ছিলেন ঐ করালরূপ দ্বারা তিনি অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিতেন বটে, কিন্তু প্রেমের সঞ্চার করিতেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। প্রেম এবং ভক্তি ব্যতীত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে **Personal relation** অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। কেবল ঐশ্বর্য্য দেখিলে ভয় বা (বড় জোর) সম্ভ্রমই হয়, ভক্তি হয় না। এবং ঐ প্রকার ব্রহ্ম জীবের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারেন না।

অতএব এই প্রশ্ন উঠে যে, যে স্নেহ বাৎসল্য কারুণ্য প্রভৃতি কোমল বস্তু চিত্তকে আকর্ষণ করে, সেই সকল উপাদান ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকার পরিচয় বিজ্ঞান হইতে পাওয়া যায় কি না। এই প্রশ্নটার উত্তর নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

বিজ্ঞানে ব্রহ্মের কারুণ্যের পরিচয়

Bible বলেন, God made man after his own image, ভাগবতেও দেখিতে পাই যে, স্বয়ং ভগবান যখন ব্রহ্মারূপে রজোগুণের অবতার হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রতিভাময় দেহ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া নর এবং নারী রূপ ধারণ করিয়াছিল। অতএব শাস্ত্র হইতে দেখা যায় যে, মানব দেহে বহু পরিমাণে ভগবদ্‌বিভূতি বিদ্যমান আছে।

শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল বিজ্ঞানের প্রতিপাদনের প্রতিই লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাই যে, মানবের দেহ infinite energy অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তির বিকার, মানবের চিত্তও ঐ শক্তির বিকার এবং মোটের উপর মানবদেহের স্থূল বা সূক্ষ্ম অংশে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা উপরোক্ত infinite energyর (অর্থাৎ ব্রহ্মের) রূপান্তর নয়। মানবদেহে এমন কোন বস্তুই নাই যাহাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলা যাইতে পারে; (৩৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)।

অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, মানবের আচরণে যে যে ভাবের

অর্থাৎ যে কোমল বা কঠোর গুণের প্রকাশ হয়, ঐ সকল বস্তু এবং সকল ভাবই ব্রহ্মশক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট ; ঐ সকল ভাবই সেই অনন্ত শক্তির বিকার ভিন্ন স্বতন্ত্র বস্তু নয়।

মানবের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা দয়া, কারুণ্য বাৎসল্য প্রভৃতির ভূরি ভূরি পরিচয় পাই ; যে মানব নিজ যোনির নিম্নতম স্তরে অধিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার আচরণেও আমরা কিছু না কিছু করুণ গুণের পরিচয় নাই।

যেহেতু ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুই মানবের চিত্তে নাই, অতএব deductive reasoning (অর্থাৎ অনুমান নামক প্রমাণ বৃত্তি) দ্বারা) ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, স্নেহ বাৎসল্যাদি যে সকল করুণভাব মানবের আচরণে প্রকাশ হয়, সেই সকল বস্তু ব্রহ্মেও বিদ্যমান আছে। তবে মানব সসীম এবং ব্রহ্ম অসীম। অতএব যে কারুণ্যাদির ক্ষীণরশ্মি মানবের আচরণ দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই সকল মধুর বস্তু অসীম পরিমাণে ব্রহ্মসত্তায় অবস্থান করে।

অতএব দেখা গেল যে, বিজ্ঞান যে ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করেন, তিনি নীরস নহেন ; শ্রেষ্ঠতম মানবের আচরণে যে মাধুর্য্যাদির পরিচয় পাইয়া আমরা সংসারে অমৃতস্রোতের প্রবাহ অনুভব করি, যে প্রেম থাকাতে সংসার পবিত্র হইয়াছে বলি, ব্রহ্ম সেই মধুর রসের মহাম্বুধি।

Personal God

উপরে ব্রহ্মের যে মাধুর্য্যাদির উল্লেখ করা হইল, সেই সকল বস্তুই জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে personal relation, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই রসের মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইয়া জীব কখন তাঁহাকে পিতা ভাবে, কখন বা প্রভুভাবে, অথবা সখা ভাবে, কিম্বা (মা যশোদার ন্যায়) সন্তান ভাবে, কামনা করিয়া সেই পরম-প্রেমিক পুরুষের প্রেমের আস্বাদ লাভ করেন।

ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য

জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে বলিয়াছি। উপরে যে প্রেমের উল্লেখ করা হইল সেই প্রেমই (সম্বন্ধ ভেদে) ভক্তি স্নেহ বা বাৎসল্যাদির রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করে। ঐ প্রেম এতই মধুর এবং এতই অপার্থিব বস্তু যে, তাহার সহিত ভোগ-সুখের তুলনাই হয় না। ভোগসুখকে বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত করা হইতেও দেখা যায় যে, ব্রহ্ম মেকি বস্তুকেও খাঁটী করেন।

ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করার পূর্ব্বে যাঁহারা ভোগ সুখে বিভোর ছিলেন,তাঁহাদের অন্তরে যখন ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের অনুভূতির প্রকাশ হয়, তখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, সেই infinite energy নামে আখ্যাত ব্রহ্মই রূপান্তরিত হইয়া ভোগ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছেন; তিনিই আপন সুখ-স্বরূপের বিকার দ্বারা ভোগসুখের রূপ ধারণ করিয়া জীবকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন। জীব তখন ভোগ্য বস্তুর মধ্যেও সেই **infinite energy** অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ দর্শন করেন, এবং তাঁহার বাৎসল্যের পরিচয়ও পান। আমাদের চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত হইলে জ্ঞানের সম্প্রসারণ হইয়া অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে থাকে। লোকের এই অবস্থাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির অবস্থা বলে। তখন আমরা দেখিতে পাই যে,পূর্ব্বে যাহা ছিল সঙ্কীর্ণ ভোগসুখ তাহাই বিশুদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

মীমাংসা

অতএব দেখা গেল যে, আমরা যদি স্থির চিত্তে বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদন গুলিকে অনুধাবন করি, তাহা হইলে কেবল যে ব্রহ্মদর্শন লব্ধ হয় তাহাই নয়, ঐ অনুধাবন দ্বারা আমাদিগের চিত্তে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ার সুযোগও জন্মায়। তখন দেখা যায় যে, যে অনন্ত সুখ লাভ করা মানব জীবনের পরম পুরুষার্থ, সেই সুখও বৈজ্ঞানিকের নিকট দুর্লভ হয় না।

একটী আপত্তি খণ্ডন

কেহ হয়ত বলিবেন যে, মানব যে ক্রুরতা কঠোরতা প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত ভাব সকল প্রদর্শন করে, তাহাও কি infinite energyর, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্ত্বার অংশ ? উত্তরে বলি যে, হাঁ ঐ সকল বস্তুও ব্রহ্ম সত্ত্বার অংশ , তবে তাহারা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের প্রচ্ছন্নবেশ মাত্র। তাই ভাগবত কতক জীবকে ব্রহ্মের 'শান্ত' রূপ এবং কতককে 'অশান্ত' রূপ, এই আখ্যা দ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আবরক শক্তি দ্বারা আপন উৎকর্ষকে প্রচ্ছন্ন করিয়া বিভু যে সৃষ্টি লীলা সম্পাদন করিতেছেন,সেই লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, evolution শক্তির প্রভাবে ক্রমোন্নতি সম্পাদিত হইয়া আবরক শক্তির আচ্ছাদন দূর হউক ; এবং জীব ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষ প্রকাশ করুক।

বিজ্ঞানের আলোকে 'অবিদ্যার' তত্ত্ব

Geology Biology প্রভৃতি শাস্ত্র Evolution কার্য্যের পরিচয় প্রদান করে। ঐ কার্য্য প্রভাবে species, অর্থাৎ বস্তু নিচয়ের, বিবিধ শ্রেণীর যে রূপান্তর হয়, তাহা সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বস্তু সকলের কতক কতক গুণ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা যখন বস্তুর বিকার হয় তখন যেমন 'প্রচ্ছন্ন' গুণের 'প্রকটন হয় ; তেমনি সজীব বস্তু সকলের মধ্যেও Biological action নামক কার্য্য দ্বারা কতক গুণ প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ করিয়া 'প্রকটন' ভাব প্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞানের এই সকল প্রতিপাদন হইতে আমরা অতি সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই যে কতক Characteristics (অর্থাৎ গুণ) প্রচ্ছন্ন থাকে Evolution কার্য্য চলার সময় ঐ প্রচ্ছন্নভাবের হ্রাস হইয়া গুণের প্রকটন হয় ; আরও দেখিতে পাই যে কতক গুণ যাহা প্রকটিত ভাবে ছিল, সেই প্রকটিত ভাবের হ্রাস হইয়া তাহা প্রচ্ছন্ন হয় এবং পুনরায় ঐ গুণের প্রকটন হয়।

মোটের উপর দেখা যায় যে দর্শন যে আবরক-বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত অবিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন তাহা একটী কাল্পনিক বস্তু নয়। অবিদ্যার কার্য্যের পদ্ধতির সহিত বহির্জগতের Evolution কার্য্যের ঐক্যভাব দেখা যায়।

সপ্তদশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

বিপদ মুক্তির জন্য ঔষধ ব্যবস্থার পূর্ব্বে রোগের পরিচয়

অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহঙ্কারই' সকল বিপদের মূল

গুণত্রয়ের পরস্পরের সহিত সংঘর্ষন দ্বারা যে বিপদ জন্মায়, এই কথা বারম্বার নানা বিষয় উপলক্ষে বলা হইয়াছে। ঐ সংঘর্ষণের গূঢ় কারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে একটু পুনরুক্তি করিতে হইল। যদিও 'বহু স্যাম' অর্থাৎ নিজের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত বহু মূর্ত্তি প্রকটনের জন্য ভগবান সৃষ্টি লীলা করিতেছেন, তথাপিও সংসারে (অর্থাৎ ভূবাদি লোকত্রয়ে) ভগবান যে সকল মূর্ত্তির প্রকটন করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে আপন বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনন্ত উৎকর্ষকে স্থাপন করিয়াও, সেই উৎকর্ষকে আবরক শক্তি দ্বারা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

জীব নিজে যে পরা প্রকৃতি, এবং জীবের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ বাসুদেব (অর্থাৎ ব্রহ্ম) যে জীবন রূপে দেহে অবস্থান করিতেছেন, দেহ যে স্বরূপ-শক্তির সহিত সংযুক্ত প্রকৃতির বিকার, দেহের কার্য্য সকল যে স্বরূপশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়, এই সকল তত্ত্বের জ্ঞান আবরক শক্তি দ্বারা নিরুদ্ধ হয়। আবরক শক্তির সঙ্গে বিক্ষেপ শক্তির সংযোগ থাকে। ঐ বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে জীবের মতি বাসুদেব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেহের উপর স্থাপিত হয়, এবং জীব যখন যে স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহকে আশ্রয় করেন, সেই দেহের উপর 'অহং' জ্ঞান জন্মায় ;

অর্থাৎ দেহই 'আমি', দেহই আমার যথার্থ স্বরূপ, এই প্রতীতি জন্মায়।

আবরক-বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে দেহের উপর যে 'অহং' জ্ঞান জন্মায় তাহার নামই 'অহঙ্কার'। গীতায় অপরা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট যে অষ্ট বস্তুর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'অহঙ্কার' নামক বস্তুটীর উল্লেখও দেখা যায়। ভাগবতেও সৃষ্টি প্রকরণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, পঞ্চ মহাভুত সৃষ্টি হওয়ার পরে, এবং জীব সৃষ্টির পূর্ব্বে, অপরা প্রকৃতি হইতে 'অহঙ্কারের' সৃষ্টি হইয়াছিল।

'অহঙ্কার' হইতে আত্মগর্ব্ব ও 'মমত্ব' ভাব জন্মায়, এবং ঐ সকল উপসর্গ দ্বারা সংসারে স্থিত জীব নূতন নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জীবের অন্তরে স্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উপর আবরক-বিক্ষেপ শক্তি যে আচ্ছাদন স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে তাহা দূর হইয়া জীবের বিশুদ্ধ রূপ প্রকটিত হয়, অর্থাৎ জীব যাহাতে স্বয়ং ব্রহ্মের ন্যায় ঐশ্বর্য্য সমন্বিত হইতে পারেন, সেই জন্য সংসারে গুণত্রয়ের মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষণ চলিতেছে। অবিদ্যার দ্বারা সৃষ্ট আচ্ছাদনকে পাতলা করিতে করিতে, তাহা যাহাতে সম্পুর্ণরূপে দূর হয়, এই ব্যবস্থা করাই হইল গুণত্রয়ের দ্বন্দের মূখ্য অভিপ্রায়।

'অহঙ্কার' হইতে উৎপন্ন কামলোভাদি উপসর্গ সকল সংঘর্ষণের বলবৃদ্ধি করে। সেই জন্যই বলি যে, অহঙ্কারই আমাদের সকল বিপদের মূল।

অহঙ্কার হইতে বিবিধ উপসর্গের সৃষ্টি

প্রথমে 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাবের কথাই ধরা যাক্। গীতা বলেন—

> প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
> অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে

অর্থাৎ প্রকৃতির 'গুণত্রয়'ই, সর্ব্বশঃ = সর্ব্ববিধ ভাবে, সকল কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহঙ্কার' নামক বস্তুটী দ্বারা লোকের 'আত্মা' = চিত্ত, বিমূঢ় = বিশেষরূপে মূঢ় (অর্থাৎ বিবেক শক্তি রহিত) হওয়াতে, লোকে ভাবে যে তাহারা নিজে কার্য্য করিতেছে।

'সর্ব্বশঃ' পদটীর অর্থ অতি গভীর, এই পদে 'সর্ব্ব' কথাটী দ্বারা বুঝায় যে, যে দেহ কার্য্য করিতেছে তাহা গুণত্রয়ের বিকার, যে মন ও বুদ্ধির প্রেরণা বলে অপর ইন্দ্রিয় সকল কার্য্য করিতেছে, সেই ইন্দ্রিয়দ্বয়ও গুণের বিকার, যে প্রেরণা শক্তি প্রভাবে মন ও বুদ্ধি কার্য্য করে, সেই শক্তি গুণেরই (প্রেরণা নামক) শক্তি, এবং যে শক্তি দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা হইতেছে তাহা গুণত্রয়েরই শক্তি, কারণ ব্রহ্মের স্বরূপশক্তিই গুণত্রয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রেরণার আকারে কার্য্য করেন।

অহঙ্কার সৃষ্ট এই মোহের নিবৃত্তি কিরূপে হয়? এই প্রশ্নটীর উত্তর গীতার ভাষায় দিই। গীতা বলেন,

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে

অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাবাহো! যিনি গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ রহস্য অবগত আছেন, অর্থাৎ গুণের কার্য্য কি এবং কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং তাহা কি ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, এই বিষয়ের প্রকৃত রহস্য অবগত আছেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে গুণত্রয়ই 'গুণেষু বর্ত্তন্তে' = গুণত্রয়ের নিজের বিকার দ্বারা সৃষ্ট স্থূল-দেহ এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে। ঐ জ্ঞানী মানব বুঝিতে পারেন যে যাহাকে লোকে নিজের কার্য্য বলে সেই কার্য্য আমাদের দেহেরই কার্য্য, কিন্তু জীব নিজে 'গুণাতীত ও দেহাতীত' হওয়াতে ঐ সকল কার্য্য জীব স্বয়ং করিতেছেন না। অতএব যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা আপন দেহের কার্য্যের প্রতি 'নসজ্জতে' = মমত্ব ভাব করেন না। 'আমি' অমুক কার্য্য করিলাম, ইহা ভাবেন না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, সুতরাং 'অহঙ্কারও' দূর হয়।

'অহং-কর্ত্তৃ' ভাব ছাড়া অপর কি কি উপসর্গ অহঙ্কার হইতে জন্মায় তাহা দেখা যাক।

(ক) কাম, লোভ, চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি

কাম—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ক তত্ত্বকথার আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের পুনরুক্তি না করিয়া, সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলি যে, মানব যখন কোন বস্তু ভোগ করিয়া সুখলাভ করে, তখন 'আমি' ভোগ করিতেছি এই 'অভিমান' জন্মায়। এই অভিমান 'মমত্ব' ভাব উৎপাদন করে এবং মমত্ব ভাব হইতে কাম অর্থাৎ ঐ সুখকে পুনরায় পাওয়ার জন্য বাসনা জন্মায়। ঐ বাসনার নামই 'কাম'।

লোভ—পরদ্রব্যগ্রহণ প্রবৃত্তিকে 'লোভ' বলে। যখন আমরা দেখি যে, যে বস্তুকে আমরা লাভ করিতে বাসনা করি তাহা অপরের কাছে আছে, তখন সেই বস্তু প্রাপ্তির বাসনা প্রবল হইয়া 'লোভ' উৎপাদন করে।

চৌর্য্য—'লোভ' প্রবল হইয়া বিবেক শক্তিকে অভিভুত করাতে, অপরের অধিকার হইতে কাম্য বস্তু অপহরণ করার প্রবৃত্তি জন্মায়। এই প্রবৃত্তির নাম চৌর্য্য।

লাম্পট্য ও পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি—নারী-সঙ্গ সুখের বাসনা প্রবল হইয়া 'লাম্পট্য' ভাব জন্মায়; এবং ঐ বাসনা যখন বিবেক শক্তিকে অভিভূত করে, তখন অপরের স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক বা প্রতারণা করিয়া আপন আয়ত্তে আনার জন্য বাসনাও জন্মায়।

২৯ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠায় আলোচনায় দেখাইয়াছি যে অহঙ্কার হইতে বাসনা জন্মায় এবং বাসনা হইতে কাম লোভাদির প্রকাশ হয়। অতএব 'অহঙ্কারই' এই সকল উপসর্গের মূল কারণ।

(খ) 'আত্মগর্ব্ব' হিংসা দ্বেষ এবং পরপীড়ন

আত্মগর্ব্ব—'অহঙ্কার' হইতে আমি ধনী, আমি বলবান, আমি সুখী, এই আমিত্ব ভাব নামক অভিমান উৎপন্ন হইয়া তাহা 'আত্ম-গর্ব্বের' রূপ ধারণ করে। পূর্ব্বে ১৪৪ হইতে ১৫৮ পৃষ্ঠায় অহঙ্কারের

যে ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে, 'আত্মগর্ব্ব' ঐ গৌরবের বিকৃতমূর্ত্তি।

দ্বেষ—আমরা যখন অপরকে নিজের অপেক্ষা ধনী, মানী বা সুখী দেখি, তখন আত্মগর্ব্বে আঘাত পড়ে, অতএব মনঃপীড়া হয়, মনঃপীড়ার মূলে অহঙ্কারই থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অপরের বস্তু গ্রহণের কামনা করাতে লোভ ও চৌর্য্যে প্রবৃত্তি হয়; কাম্য বস্তুটী কোনরূপেই না পাইলে যে মনঃপীড়া হয়, তাহার উপশমের জন্য লোকে কামনা করে যে ঐ জিনিষ আমি যদি একান্তই না পাই, তাহলে অন্ততঃ অপরের বস্তুটী বিনষ্ট হউক। বিনষ্ট হইলে সে আর আমার অপেক্ষা বড় থাকিবে না। মনের এই ভাবের নাম 'দ্বেষ'।

হিংসা—'দ্বেষ' প্রবল হইলে লোকে নিজেই অপরের দ্রব্যকে বিনষ্ট করিতে চায়। অর্থাৎ কিসে অপরের বিত্তনাশ, সম্ভ্রম নাশ বা সুখনাশ হয় তাহার চেষ্টা করে। 'হিংসা' দ্বেষেরই রূপান্তর।

নিজের কোন লাভ না থাকিলেও ধনী ব্যক্তি দারিদ্র্য দশায় পড়িলে যে কতক লোকে তৃপ্তিলাভ করে, অন্যের মানহানিতে নিজের কোন সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলেও লোকে মানীর নামে কুৎসা রটনা করে, ইহার কারণ কি? উত্তরে বলি যে, আত্মগর্ব্ব এবং দ্বেষই এইরূপ আচরণের কারণ। 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' করার রীতি বহুকাল থেকেই সংসারে চলিত আছে। কোন জাতির moral standard, অর্থাৎ নৈতিক আদর্শ, যত অবনত হয়, তাহাদের মধ্যে এই দোষ তত বাড়িতে থাকে।

পরপীড়ন—হিংসা ও দ্বেষের প্রভাবে কতক লোক অপরকে যাতনা দিয়াও তৃপ্তিলাভ করে। অপরের পীড়ন দ্বারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, লোকে অপরের যন্ত্রণায় সুখলাভ করে।

অপরে সুখে আছে, ইহা দেখিলেও কতক মানবের আত্মগর্ব্বে আঘাত পড়াতে যাতনা হয়। তাহারা চায় যে, সংসারে কেবল

তাহারাই সুখী থাকুক এবং অপরে কষ্টে আছে ইহা দেখিয়া আপনার অবস্থার সহিত তাহাদের অবস্থার তুলনা করিয়া পরপীড়ক মানব সুখী হয়। আমি শক্তিমান তাই অমুককে 'জব্দ করিয়াছি' ইহা ভাবিয়াও অনেকের আত্মগর্ব্বের তৃপ্তি হয়। 'অহঙ্কার' হইতে উৎপন্ন এইরূপ কোন না কোন কারণে লোকে অপরকে পীড়া দেয়।

(গ) পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা।

পরশ্রীকাতরতা—এই দোষের অপর নাম 'মাৎসর্য্য'। মনে আত্মগর্ব্ব প্রবল ভাবে থাকাতে, অপরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অনেক লোকেরই মনের ঐ ভাবের উপর আঘাত পড়ে; তাইতে তাহারা যাতনা অনুভব করে। তখন বিদ্বেষভাব প্রবল হয়, এবং ঐ ভাব হইতে অপরের প্রতি 'হিংসা'রও উদ্দীপনা হয়। আপন মনঃপীড়ার উপশমের জন্য কিসে অপরের শ্রী বিনষ্ট হইবে লোকে তাহাই কামনা করে, এবং সেইজন্য চেষ্টাও করে।

পরনিন্দা—অপরকে 'খাট' অর্থাৎ দশের কাছে হেয় করিবার জন্য তাহার নামে অখ্যাতি রটনা করিবার প্রবৃত্তি অনেকের থাকে; অপরের সুখ্যাতি শ্রবণ করিলে বহু লোকেই যেন কশাঘাতের যাতনা অনুভব করে। সেই যাতনা উপশমের জন্য অখ্যাতি রটনা করে। অপরের দোষ কীর্ত্তণ করিয়া তাহারা কল্পনায়ও তৃপ্তি পায়।

পরচর্চ্চা—অপরের বিষয় আলোচনা উপলক্ষে তাহাদের নিন্দা করার প্রবৃত্তিকে এই আখ্যা দেওয়া হয়। এই কার্য্যের সময় সমালোচনার ছল করিয়া অপরের উপর বিষ উদ্গীরণের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, নিরপেক্ষতার মুখোস পরিয়া লোকে অপরের নিন্দা করে, এবং তাহাদিগকে খাট করিয়া নিজে তৃপ্তি অনুভব করে।

অহঙ্কারই হিংসা প্রভৃতি দোষের মূল

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অহঙ্কার হইতে কাম লোভাদি উৎপন্ন

হইয়া বিবিধ আসক্তির বন্ধন দ্বারা জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। যদি জীব কেবল নিজেই আবদ্ধ হইত, তাহলে ঐ অবস্থাকে বরং মন্দের ভাল বলিতে পারিতাম। কিন্তু 'আত্মগর্ব্ব' নামক যে বস্তুটীও অহঙ্কার হইতে জন্মায় তাহা হইতে হিংসা এবং দ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া সংসারের অপর জীবেরও দুঃখ উৎপাদন করে। কামনার পীড়নে জীব নিজেও অস্থির হয়।

(ক) পরশ্রীকাতরতা বিষ দ্বারা জীব নিজেই যাতনা পায়

পরশ্রীকাতরতা দ্বারা অপরের অনিষ্ট যত হউক বা না হউক, যাহার অন্তরে এই বিষ থাকে, সেই ব্যক্তি নিজেই ঐ বিষ দ্বারা জর্জ্জরিত হয়। সংসারে পরশ্রীকাতরতার যে নানাবিধ বীভৎস মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা চিন্তা করিলে মনে হয় যে, সমুদ্রমন্থনকালে যে হলাহল উঠিয়াছিল তাহাই কি এই মূর্ত্তিতে সংসারে অবস্থান করিয়া মানবকে দগ্ধ করিতেছে।

অবিদ্যার মধ্যেই অবিদ্যা-নাশের ঔষধ

অবিদ্যা হইতে যখন 'অহঙ্কার' নামক বস্তুটীর সৃষ্টি হয়, তখন ঐ বস্তুটীর মধ্যে যে অশান্তির হলাহল স্থাপিত হইয়াছে, ঐ অশান্তি দ্বারাই যাহাতে চরমে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে। অহঙ্কার হইতে 'কাম' নামক যে বস্তুটী জন্মায়, তাহার নিবৃত্তি কখনই হয় না। বাসনা পুরণের জন্য কাম্য বস্তু যত বেশী পরিমানেই পাওয়া যাক না কেন, ঐ সকল বস্তু দ্বারা নিবৃত্তি না হইয়া, কামনা আরও বেশী বেশী তেজে জীবকে অস্থির করে,(৬১-৬৩ পৃষ্ঠা)। কামনা হইতে ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া জীবের অন্তরে আরও বেশী অশান্তি উৎপাদন করে। আত্মগর্ব্ব বস্তুটী অশান্তির আকর, এবং আত্মগর্ব্ব হইতে যে পরশ্রীকাতরতা জন্মায়, তাহা জীবকে যেন বিষজর্জ্জরিত করে।

অতএব অবিদ্যার অনুসরণ করিয়া তৃপ্তি না পাওয়াতে কেহ কেহ যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য শান্তিময়ের শরণাগত হন। অবিদ্যার মধ্যে যে অশান্তির বিষ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে অবিদ্যা-নাশের ঔষধ বলা বোধ হয় সুসঙ্গত। অবিদ্যা যখন বিদ্যারূপে পরিণত হন, তখন ঐ বিষও অমৃতে (অর্থাৎ অনন্ত সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে) পরিণত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

অবিদ্যা রোগের সৃষ্টি করেন, উপশমও করেন

পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির বিষ হইতে সংসার রক্ষা

হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির বিষ যদি সংসারে অক্ষুণ্ণভাবে কার্য্য করিতে পারিত, তাহলে মানব এবং অপর জীবগণ সংসারকে ছারখার করিয়া শ্মশানে পরিণত করিত। মানবদেহের যখন স্নায়ু সকলের উত্তেজনা বেশী হইয়া মানবকে অস্থির করে, তখন ডাক্তাররা morphia injection দিয়া রোগীকে অচেতন করেন। জীবের অন্তরে কামনা, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির মাত্রা যখন অত্যন্ত বেশী হয়, তখন আবরক শক্তিও পরিপুষ্ট হইয়া, 'প্রকাশ' এবং ক্রিয়াশক্তি, এই উভয় শক্তিকেই আচ্ছন্ন করে, ঐ অবস্থায় জড়ত্বভাবের বৃদ্ধি হয়।

জড়ত্ব ভাব প্রবল হইলে ঐ সকল বিষ ঢাকা পড়ে, সুতরাং জীবের নিজেরও জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। প্রকাশের সঙ্গে ক্রিয়াশক্তিও আচ্ছন্ন হওয়াতে তখন অন্তরে অপরের অনিষ্ট করার জন্য প্রবৃত্তি অথবা ক্ষমতা থাকে না। আবরক শক্তি দ্বারা সিংহ সর্পাদির হিংসা প্রবৃত্তি সকল আচ্ছন্ন থাকাতে সংসারের রক্ষা হইতেছে। আবরক শক্তি তখন স্নেহময়ী মাতার ন্যায় জীবকে বাসনার পীড়ন হইতে রক্ষা করেন এবং

সংসারকে মারামারি কাটাকাটি হইতে এবং শান্ত জীবকে উগ্র জীবের উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন।

কুৎসিৎ প্রবৃত্তিগুলি তখন সুপ্ত সংস্কারের আকারে জীবের চিত্তে অবস্থান করে। পশু ও স্থাবরদিগের চিত্তে সংস্কার সকল এই ভাবে থাকে। প্রকাশ শক্তির উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গে বিষ প্রকাশ হইয়া জীবকে বাসনার যাতনা এবং তারপর বিপদের যাতনা দেয় ইতিপূর্ব্বে বিপদের কার্য্য আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে বিপদ হইতে ক্রমশঃ লোকে সাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং সাধনা দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া যাতনা-মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। বিভুর বিচিত্র ব্যবস্থা যত চিন্তা করা যায় মন তত বিস্ময়ে পূর্ণ হয়।

বাঙ্গালীর ভিটেমাটি রক্ষা

গত মহাসমরের পরে কলিকাতার এক বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে বিপুল ধনাগম হয়। তখন একটা কথা উঠিয়াছিল যে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে বহু কারখানা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাইতে ঐ বণিকগণ ভাবিলেন যে কলিকাতার জমির মূল্য অনেক বেশী হইবে।

লোকের হাতে টাকা আসিলে আশার প্রভাবে কল্পনা শক্তি তীব্র হয়, ঐ বণিকগণের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট অনেক বাড়ী ভাঙ্গাতে তখন বাড়ীর ভাড়া বাড়িয়াছিল এবং লাভের আশাও সেই সঙ্গে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার জমি কিনিয়া রাখিলে পরে অনেক টাকা লাভ হইবে, এই আশায় ঐ বণিকগণ কলিকাতার জমি কিনিতে আরম্ভ করিলেন, এবং জমির দরও তর তর করিয়া বাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধির স্রোত নৈহাটী, শ্রীরামপুর এবং বারুইপুর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল।

লেখক বসত বাটী করার জন্য ১৯১৬ সালে যে জমি ৭০০৲ দরে কাঠা কিনিয়াছিলেন ১৯২০ সালে তাহার নিকটের জমি প্রতি

কাঠার দর হইয়াছিল ৩৫০০৲ টাকা। টাকার লোভে অনেক বাঙ্গালী বাস্তুভিটা বিক্রয় করিতে লাগিল। মসীজীবী বাঙ্গালী চাকরিতে দাস-খত সহি করিলেও এতাবৎকাল বাসের পৈতৃক ভিটেটা বজায় ছিল, কিন্তু এখন টাকার লোভে তাহাও অবিরত গতিতে অপরের হাতে যাইতে লাগিল। এই স্রোত যেমন চলিতেছিল, সেই বেগ যদি আর ২।৪ বছর চলিত তাহলে

নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,

কবির এই কথা কয়টী কলিকাতার বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্ণে বর্ণে প্রতিপাদিত হইত।

অর্থের লোভে বাঙ্গালী যখন বাস্তুভিটা বেচিতেছিল, তখন অবিদ্যা অপর এক মূর্ত্তিতে আসরে নামিয়া বাঙ্গালীকে রক্ষা করিলেন। অবিদ্যার প্রেরণায় কতক 'ফটকাওয়ালা' (speculator) পাট, হেসিয়ান, তুলা ও মিলের সেয়ার এবং সুতার কাপড়ের 'খেলা' আরম্ভ করিলেন।

এই শ্রেণীর প্রকৃতিরই বৈশিষ্ট এই যে কোন না কোন একটা বিষয়ে 'খেলা' না করিলে তাঁহারা অস্বস্তি বোধ করেন। ধনাকাঙ্ক্ষা এই চিত্তবিকার উৎপাদন করিয়াছে। লক্ষ্যের উপর দশলক্ষ্য তাহার উপর কোটী টাকা পাইলেও তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। এই 'খেলার' উত্তেজনা তাঁহাদের কাছে প্রাণবায়ুর তূল্য অত্যাবশ্যকীয় বস্তু।

লেখক কল্পনা হইতে এই কথাগুলি লিখিতেছেন না, এই দলের সহিত লেখক সুপরিচিত এবং তাঁহারা কি ভাবে কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধেও লেখকের দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভিজ্ঞতা আছে। অতএব তাঁহাদের মনের অবস্থা লেখকের সুবিদিত। মাতালের যেমন মদ না হইলে জীবন যাপন দুর্বিবসহ হয়, 'খেলা' না হইলে ইঁহাদেরও তেমনি যাতনা হয়। বাঙ্গালীর ভিটে রক্ষার জন্য, এই 'মা মনসার' নিকট 'ধুনার গন্ধ' আসিল, **Exchange** এর বাজার হইতে।

তখন **Money market** এ যে speculation চলিতে আরম্ভ হইল, তাহাতে সমস্ত ইউরোপ ইংলণ্ড ও আমেরিকা যোগদান করাতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দর উপলক্ষ্যে যেন সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী মহাসমরের দ্বিতীয় অভিনয় আরম্ভ হইল। কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীট বড়বাজার প্রভৃতি স্থানের বাজারেও তখন যেন আগুণ ছুটিয়াছিল। 'বিল', Draft এবং তাহার সঙ্গে নানা মাল খরিদ বিক্রয়ের 'ফটকা' পুরা দমে চলিল।

রাতারাতি বড়মানুষ হওয়ার আশায় লোকে এত মাল কিনিয়া ফেলিল যে জাহাজ হইতে মাল নামাইয়া, পোর্ট কমিশনারদের গুদামে স্থানাভাব বশতঃ, ঐ সকল মাল গাদা করিয়া গঙ্গার ধারে রাখিতে হইয়াছিল। [অর্থ-লালসা কিরূপ উন্মাদ ভাবের সৃষ্টি করে তাহার বাস্তব চিত্র অঙ্কনের অভিপ্রায়ে এত কথা লিখিতেছি। বাক্যের বাহুল্য অপেক্ষা এইরূপ চিত্রের মূল্য অনেক বেশী]।

'ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য ক্ষত্রিয় বীর'

১৯২০ সালে রাতারাতি ধনকুবের হওয়ার এই সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে, বণিক সম্প্রদায় গরীব বাঙ্গালীর বাস্তুভিটা খরিদের অভিপ্রায় স্থগিত রাখিয়া, লক্ষের উপর দশলক্ষ, দশলক্ষের উপর কোটী কোটী টাকা রোজগারের জন্য, ঐ খেলার দিকে ছুটিল। আগে থেকেই ছিল তাঁহাদের মাথায় টাকার গরম, তার উপর উপস্থিত হইল এক এক contract দ্বারাই লাখ লাখ পাওয়ার সম্ভাবনা!! এমন সুযোগও কি রক্তমাংসের শরীরধারী মানব ছাড়িতে পারে! 'খেলা', অর্থাৎ speculationই, ছিল যাঁহাদের breath of life (অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের ন্যায় স্বাভাবিক কার্য্য,'বৃত্তি স্বাভাবিকী তু যা'), তাঁহারা কি এমন সুযোগ ছাড়িতে পারেন!! কলিকাতার নানাস্থানে ফটকার কাজ পুরাদমে চলিল। যাঁহারা বাজারের 'রুই কাতলা' বলিয়া পরিচিত, কেবল তাঁহারাই যে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাই নয়, 'চুনো পুটি' গুলিও 'ফটকায়' উন্মত্ত হইলেন।

কলিকাতার **stock exchange**এ অপর অপর বাজারের ন্যায় 'ঝড়' না বহিলেও ঐ সময় বেশ গরম হাওয়া চলিয়াছিল। 'ফটকা-ওয়ালার' এই তীর্থক্ষেত্রেও, অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন।

বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায়, অকস্মাৎ Exchange বাজারের চঞ্চলতা দূর হইয়া, স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে যেন যাদুমন্ত্র বলে সকল রকমের 'ফটকার' বাজারই একেবারে 'দমে' গেল। যে বণিক সম্প্রদায় কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীর বাস্তু ভিটা টুকুর উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি-পাত করিতেছিলেন, 'লড়াই-লব্ধ' কোটি কোটি টাকা হাত থেকে বাহির হইয়া যাওয়াতে তাঁহাদের মাথাও ঠাণ্ডা হইল।

ঐ বণিকগণের অনেকে ফটকায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া টাকা দিতে বাধ্য হইলেন। হাতের টাকা আগেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, এখন ঋণ-শোধ করিবেন কিরূপে ? এই সঙ্কটে পড়িয়া অনেকে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। বাঙ্গালীর নিকট হইতে বণিকগণ যে জমি খরিদ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক জমি আধা দরে বা আরও কমে, বিক্রয় করিয়া তাঁহারা আপন আপন ঋণশোধ করিলেন। গরীব বাঙ্গালী তাহার ভিটাটুকু ফেরত পাইল, উপরন্তু মায়াদেবীর কৃপায় কিছু অর্থাগমও হইল। [পাঠক মনে করিবেন না যে ফটকা বাজারের 'খেলার' উপরোক্ত বর্ণনায় অতিরঞ্জিত ভাব বা অত্যুক্তি আছে। তখন ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ও বড়বাজারে আগুণ ছুটিয়াছিল।]

প্রলয়ও সংসারের হিতসাধন করে

পূর্ব্বে ৪৭ হইতে ৪৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 'বহু স্যাম', অর্থাৎ ভগবানের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত বহু মূর্ত্তির প্রকটন করাই হইল বিভুর সৃষ্টিলীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। তমোগুণের অত্যাধিক্য হওয়াতে সংসার যখন ঐ উদ্দেশ্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তখন ব্রহ্ম সংসারকে আপন প্রকৃতিতে লীন করান। এই অবস্থার নামই 'প্রলয়' (প্র = প্রকৃষ্ট ভাবে + লয় =

লীন অবস্থা)। প্রলয়ের নিশায় নব শক্তির সঞ্চার হইতে থাকে (৪৯ পৃষ্ঠা); ঐ শক্তি প্রভাবে সংসার যখন পুনরায় ব্রহ্মের সৃষ্টিলীলা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তখন নূতন কল্প উপস্থিত হইয়া নূতন সৃষ্টি হয়।

অতএব প্রলয়ের উদ্দেশ্যই হইল সংসারে নব শক্তি সঞ্চার করিয়া সংসারকে বিভুর সৃষ্টিলীলা সম্পাদনের উপযোগী করা ; অর্থাৎ জীব যাহাতে ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত হইতে পারে তাহার সুযোগ উৎপাদনের জন্য প্রলয় হয়। এই কার্য্য যে হিতসাধক তাহা কে না স্বীকার করিবেন।

মৃত্যুও মানবের পক্ষে মঙ্গলকর

পূর্ব্বে ১১৬ ও ১১৭ পৃষ্ঠায় জন্ম ও মৃত্যু উপলক্ষে তত্ত্বকথার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রারব্ধের সংস্কারের যে শক্তি দ্বারা দেহ-নির্ম্মাণ হইয়াছিল, তাহার বলের অবসান হইলে দেহ 'গতস্বার্থ' হয়, অর্থাৎ দেহের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাই সেই নিষ্প্রয়োজন দেহের লয় হয়। তখন আমাদের লিঙ্গদেহে অপর অপর যে সকল সংস্কার থাকে, তাহাদের মধ্যে ব্যুঢ়-ভাবাপন্ন সংস্কার দ্বারা যোনি নির্দ্ধারণ এবং নূতন দেহ নির্ম্মিত হয়, এবং জীব সেই দেহকে আশ্রয় করে, (১১২-১৩ পৃষ্ঠা)।

সংসারে যে বিরাট Evolution শক্তির কার্য্য চলিতেছে, সংস্কার সকল ঐ শক্তির রূপান্তর মাত্র ; সংস্কার সকলের শক্তির প্রভাবে জীব ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু নামক ঘটনাদ্বয় উপরোক্ত শক্তির necessary incident অর্থাৎ অনিবার্য্য ক্রিয়া এবং অঙ্গ মাত্র। যদি মৃত্যু না হইত, তাহলে উচ্চ যোনিতে গমন করিয়া প্রকৃষ্ট ভাবে সাধনা দ্বারা কেহ আপনাকে উন্নত করার সুযোগ পাইত না। যদি স্বীকার করা যায় যে, জীবের উন্নতি সাধন করাই বিভুর সৃষ্টিলীলার চরম লক্ষ্য, তাহা

হইলে মৃত্যু যে ঐ উন্নতির উপায়ভূত বস্তু, একথা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। অতএব মৃত্যুকে মঙ্গলকর না বলিয়া থাকা যায় না।

যদি বল যে, তবে লোকে কেন মৃত্যুতে কাতর হয়? উত্তরে বলি যে, অবিদ্যাসৃষ্ট দেহাত্মভাবই কাতরতার কারণ। জীব স্বয়ং যে অনশ্বর, যাহাকে আমরা মৃত্যুকাল বলি তখন কেবল পাঞ্চভৌতিক দেহই বিনষ্ট হয়, যাহা জীবের প্রকৃত স্বরূপ তাহা যে জীবের নশ্বর দেহ হইতে পৃথক বস্তু, যে পরা প্রকৃতি জীব হইয়া আছেন তিনি কখনই যে মরেন না, এই তত্ত্ব কথাগুলি জীবের মনে স্থান পায় না।

লোকে কেন মরিতে কাতর হয়

অবিদ্যার আবরক শক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞানকে নিরোধ করাতে জীব এই তত্ত্বকথা শুনিয়াও বিস্মৃত হয়। তাইতে জীব দেহের সুখই খোঁজে, এবং মরণ কালে দেহের ধ্বংশ আসন্ন দেখিয়া কাতর হয়। অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে জীব দেহকেই আপনার যথার্থ স্বরূপ বলিয়া ধারণা করে ও সেই ধারণাই জীবের চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। স্থূল দেহও যে বিনষ্ট হয় না, তাহাও যে কেবল পঞ্চ মহাভূতে লীন হয়, এই তত্ত্বও জীবের চিত্তে স্থান পায় না। স্থূল দেহকেই জীব আপনার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করাতে তখন 'আমি' মরিলাম, এই কথা ভাবিয়া কাতর হয়।

'Royal bounty'

পূর্ব্বে ৪৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, যখন নূতন কল্প আরম্ভ হয়, তখন [শ্রীভগবান সংসারের উপর বহু পরিমাণে আপন সত্ত্বগুণের সংস্থাপন করেন। এই শুভশক্তির প্রভাবে নূতন কল্পে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। ঐ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণের স্বাভাবিক সম্প্রসারণ প্রভাবে প্রলয়ের নিশায় সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়। এই পুষ্টিসাধন শ্রীভগবানের কৃপার পরিচয় প্রদান করে।

সংসারের উপর প্রচুর পরিমাণে সত্ত্বগুণের সংস্থাপনকে ভগবানের

'কৃপা' বলা অপেক্ষা, Royal bounty বলাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কাহার প্রতি 'কৃপা' প্রদর্শন করার সময় তাহার যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার করা হয়; এবং জীবের প্রকৃতিতে গুণত্রয়ের শক্তির তারতম্য অনুসারে,প্রলয়ের নিশায় সত্ত্বগুণের পুষ্টির পরিমাণেও ন্যূনাধিক্য দেখা যায়; অর্থাৎ সকল জীবের চিত্তে একই পরিমাণে যে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়, তাহা নয়। কিন্তু বরাহাবতারের পরে ভগবান যখন সংসারের উপর সত্ত্বগুণের সংস্থাপন করেন, তখন কে যোগ্য কে অযোগ্য তাহার বাচ বিচার না করিয়া, রাজা রাজড়া যেমন সকলকেই আপন bounty অর্থাৎ উপহার প্রদান করেন, ভগবানও সর্ব্বজীবকে আপন শুদ্ধসত্ত্বের উপহার প্রদান করেন।

এই উদারতা দ্বারা হীনতর জীবও আপনাকে সমুন্নত করার সুযোগ পায়। তাই ইহাকে Royal bounty বলা হইল।

অবিদ্যার বিষই অমৃতের প্রচ্ছন্ন রূপ।

আমরা অবিদ্যার বিষ দ্বারা জর্জ্জরিত হইতেছি বটে; কিন্তু ঐ বিষের মধ্যে শোধনের জন্য ঔষধ থাকে (৩৭৩ পৃষ্ঠা)। বিদ্যা এবং অবিদ্যার সংঘর্ষণ চলিতে চলিতে যখন আবরক শক্তির আচ্ছাদন দূর হয়, তখন ঐ বিষই অমৃতে পরিণত হয়। তাই ভাগবত বলেন যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা একই বস্তুর দুই রূপ মাত্র. 'তাং বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাষঃ যথা তমঃ'।

অষ্টাদশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

রোগের চিকিৎসা প্রণালীর প্রথম স্তর।

গায়ের জোরে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না।

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রথম অংশের (৩৬৭-৭৪ পৃষ্ঠা) আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, 'অহঙ্কার' নামক যে বস্তুটী আছেন, তাহার নিবৃত্তি হইলেই সংসারে সকল বিপদের নিবৃত্তি হয়। গায়ের জোরে

উহার নিবৃত্তি হয় না। যে অবিদ্যা আবরক-বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ঐ বস্তুটীর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলে অহঙ্কারের এবং তৎসৃষ্ট কাম লোভাদির নিবৃত্তি হয় না। মানবের দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির প্রতি অণু পরমাণুতে অবিদ্যার গুণত্রয় বিদ্যমান আছে ; অতএব মানবের সাধ্য নাই যে, গায়ের জোরে অবিদ্যার নিবৃত্তি করে।

ধূর্ত্ততায় অবিদ্যা অদ্বিতীয়

ধূর্ত্ততায় অবিদ্যার দোসর নাই, মানব যদি 'বেড়ান ডালে ডালে' তখন অবিদ্যা 'বেড়ান পাতায় পাতায়'। যিনি ভাবেন আমি আপন পবিত্রতা দ্বারা অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছি, তাঁহার অন্তরে 'আমি পবিত্র' এই আকারের আত্মগর্ব্ব সৃষ্টি করিয়া, অবিদ্যা তাঁহার উপর নিজ প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখে।

মানব তবে কি অনন্ত কাল যাবৎ সংসারে থাকিয়া কেবল যাতনা ভোগই করিবে ? উত্তরে বলি যে, না তাহা নয় ; অবিদ্যার মধ্যেই অবিদ্যার উপর জয়লাভ করার উপাদান আছে। সেই উপাদান কি বস্তু, তাহাই দেখা যাক্।

The still small voice, ও তাহার পুষ্টি সাধন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে 'নিছক' (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের সংস্রব রহিত) তমোগুণ কুত্রাপি নাই। ব্রহ্ম আপন বিশুদ্ধ সত্ত্বকে আবরক-বিক্ষেপ শক্তি সংযুক্ত করিয়া, প্রকৃতির গুণত্রয়ে পরিণত করিয়াছেন। অতএব যিনি যতই অধঃপতিত হউন না কেন,তাঁহার অন্তরে কিছু না কিছু পরিমাণে সত্ত্বগুণ থাকে (১৪৬ পৃষ্ঠা)। 'ধিক ধিকে' আগুনকে ধীরে ধীরে বাতাস দিতে দিতে উহা হইতে ক্রমশঃ উজ্জ্বল প্রভা প্রকাশিত হয়। আমাদের অন্তরে স্থিত সত্ত্বগুণ ক্ষীণবল হইলেও, সাধনা দ্বারা উহাই পুষ্ট হইতে থাকে, পুষ্ট হওয়ার সঙ্গে উহার প্রভাও ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া অবিদ্যার অন্ধকার দূর করে।

এই সময়ে বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষণ হইয়া ভয়ঙ্কর বিপদ, প্রথমে পুনঃ পুনঃ হয়, এবং তার পরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে। অবিরাম বিপদ হওয়াও মহা সৌভাগ্যের পরিচায়ক। সাধনা করিতে করিতে যখন জ্ঞানের (অর্থাৎ বিদ্যাশক্তির) প্রভা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অজ্ঞানের (অর্থাৎ অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়।

অতএব সাধনা ব্যতীত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না, এবং প্রগাঢ়ভাবে সাধনা করাই হইল অবিদ্যাকে অভিভবের অর্থাৎ বিপদ মুক্তির উপায়।

সাধন-প্রবৃত্তি সঞ্চারের উপায়

যে সাধনার সহিত কোন রকম ভোগ-সুখের সংস্রবই নাই, সেই প্রকার সাধনা করার জন্য যে আমাদের মতি হয় না, এই কথাটী স্মরণ রাখা উচিত। যে সকল লোকের অন্তরে সত্ত্বগুণ অত্যধিক প্রবল, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না ; জন-সাধারণের কথাই বলিতেছি। যখন রোগের প্রভাবে কাহারও এত রুচি বিকার হয় যে, দুই একটী বস্তু ছাড়া অপর সকল রকম খাদ্য দ্রব্যের কোনটীর প্রতিই রুচি থাকে না, তখন ঐ রোগীর যে খাদ্যে রুচি থাকে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক তাঁহাকে সেই বস্তুই খাওয়ান।

তিনি সেই খাদ্যের সঙ্গে অপর কোন না কোন দ্রব্য মিশাইয়া দেন, যাহা দ্বারা রোগীর দেহের পুষ্টিসাধন হইবে। এইরূপ আহারের ব্যবস্থা দ্বারা ক্রমশঃ রোগীর দেহে বলাধান হয়। পথ্যের সঙ্গে ঔষধ প্রদান করিয়া চিকিৎসক যখন রোগীর স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনেন, তখন দেখা যায় যে, পূর্ব্বে যে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি রোগীর অরুচি ছিল তাহাতেও রুচি হইয়াছে। অবিদ্যাও একটী রোগ ; এই রোগ প্রবল থাকার সময়ে সাধনায় অরুচি থাকে বটে, কিন্তু রোগের প্রভাব যত কমিতে থাকে, অর্থাৎ যত অবিদ্যার উপশম হইতে থাকে, তত সাধনার প্রতি অরুচিও কমিয়া যায়।

ভোগরত মানবকে নিষ্কাম সাধনার উপদেশ নিরর্থক।

যে মানবের মন ভোগ সুখলাভের জন্য লালায়িত, তাঁহাকে নিষ্কাম ভাবে যোগ সাধনা বা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে বলা ভস্মে ঘি ঢালার তুল্য নিরর্থক। অনেকেই ঐ উপদেশে কর্ণপাত করেন না; যাঁহারা উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারাও ঝোঁকের বশে ২।৪ দিন নিষ্কাম ভাবে সাধনার চেষ্টা করিয়া, উহা ভাল না লাগাতে, ছাড়িয়া দেন। যে বালক পাটীগণিত পড়িতেছে, তাহাকে Calculus পড়িতে বলা, কিম্বা যে ব্যক্তি 'নর' শব্দ রূপ করিতে পারে না তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতে বলা নিরর্থক। ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনের আনা, কিম্বা তাহারও বেশীর ভাগ, মানব কেবল ভোগ-সুখই চান। কি উপায়ে তাহাদিগকে সাধনায় নিরত করা যায়, তাহাই হইল সংসারের একটী প্রধান সমস্যা। ঐ উপলক্ষে লেখক কএকটী কথা বলার দুঃসাহস করিতেছেন।

ভোগ রত মানবের পক্ষে সাধনার প্রথম স্তর।

এই শ্রেণীর মানবের অন্তরে যে সকল কামনা থাকে, তাহাতে অত্যন্ত প্রবল প্রেরণার শক্তি নিহিত আছে। ঐ শক্তিকে যদি সাধন কার্য্যে প্রযোজিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই এই সকল মানব সুদৃঢ় ভাবে সাধনা করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ, যদি ঐ সকল লোকের মনে এই ধারণা উৎপাদন করা যায় যে, অমুক অমুক ভাবে সাধনা করিলে তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইবে, তাহলে বাসনার প্রেরণা শক্তির প্রভাবে তাহাদের মনে সাধনায় নিষ্ঠা হইতে পারে। সুতরাং সকাম সাধনার হিতকারিতা প্রতিপাদন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ কামনা পুরণের জন্যই ভোগরত মানবকে সাধনায় প্রবৃত্ত করার চেষ্টাই হইল সমীচীন উপায়; ইহাই হইল চিকিৎসা প্রণালীর প্রথম স্তর। ইহার পরবর্ত্তী স্তরের বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

সাধনায় প্রথম স্তর অর্থাৎ সকাম সাধনা।

সকাম বা নিষ্কাম সাধনায় 'অধিকারী'।

'সকাম' সাধনার নামে অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করেন এবং তাঁহারা চান 'নিষ্কাম' সাধনা, যাহা দ্বারা বিপদ হইতে চিরমুক্তি লব্ধ হইবে। নিষ্কাম সাধনা যে উত্তম বস্তু একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু অনেক সময়ই লোকে ভুলে যান যে, যে কার্য্যে আমরা 'অধিকারী' হই নাই, অর্থাৎ যে কার্য্য করার জন্য আমরা যোগ্যতা লাভ করি নাই, সেই কার্য্য করিতে গিয়া চিত্তে কেবল কতকগুলো যুক্তি, তর্ক এবং বাক্যের আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয় মাত্র, চিত্তের উন্নতি হয় না অর্থাৎ চিত্ত ভগবন্মুখী হয় না। এক সময়ে লেখক নিজেও সকাম সাধনার নামে নাসিকা কুঞ্চনকারীদিগের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন; একুশ বৎসর বয়স হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে 'নিষ্কাম' সাধনার চেষ্টা করিয়া গত ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা প্রভাবে লেখক এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে এইরূপ সাধনার 'অধিকারী' হওয়ার পূর্ব্বে যদি কেবল ঐ সাধনার চেষ্টা করা যায় তাহলে ঐ চেষ্টায় বিশেষ কোন ফললাভ হয় না, কেবল সময়ই নষ্ট হয়।

নিষ্কাম সাধনার 'অধিকার' কাহাকে বলে? এই বিষয়টীকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়, তাহার জন্য আপাততঃ স্থানাভাব; তবু একটা কথা বলি। সাধনার প্রধান অঙ্গ হইল আপন মতিকে ধ্যেয় বা উপাস্য বস্তুতে নিবদ্ধ করা, অন্ততঃ মতিকে ঐ বস্তুর দিকে ধাবিত করা। স্বীকার করি যে, গোড়াতে মনেরই এই অবস্থা হয় না। কিন্তু যদি কিছু কাল সাধনার পরেও দেখা যায় যে, সাধনকারী মানবের মন পূর্ব্বের মতই 'বিষয়ে' অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুতে, নিবদ্ধ আছে, তাহলে ধরিতে হইবে

যে, সাধক তখনও নিষ্কাম ভাবে সাধনা করার যোগ্যতা লাভ করেন নাই, অর্থাৎ তিনি তখনও নিষ্কাম ভাবে সাধনা করিতে 'অধিকারী' হন নাই। নিজের মনের অবস্থা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে কেহ ঐরূপ সাধনায় 'অধিকারী' হইয়াছেন কিনা তাহা নিজেই বুঝিতে পারিবেন। মনের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই বিষয় উপলক্ষে 'অধিকার' বা অনধিকার অবধারণা করিতে হয়। বাগ্‌ বাহুল্য লাভ অথবা যোগাভ্যাসে তৎপরতা লাভের মুল্য বড়ই অল্প।

এই দোষ দূর করার জন্য সকাম সাধনা দ্বারা চিত্তকে কতক পরিমাণে প্রেম ভক্তির রসে সিক্ত করিয়া ঐ নরম বস্তুটীকে নিষ্কাম সাধনার দিকে লইয়া যাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত নয়? Idealism এর বশে, অর্থাৎ কেবল যুক্তির অনুসরণ করিয়া, নিষ্কাম সাধনার উদ্যমে সময় ব্যয় করিয়াও যাঁহার অন্তরে 'অহৈতুকী' ভক্তির সঞ্চার হইল না, অপর কেহ সকাম সাধনা দ্বারা যদি আপন অন্তরে 'রাজসিক' ভক্তিরও সঞ্চার করিতে পারেন, তাহলে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজসিক সাধক কি হইয়াও বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন না?

তাই বলি যে, নিষ্কাম সাধনার 'অধিকারী' হওয়ার জন্য গোড়ায় সকাম সাধনা দ্বারা আপনাকে প্রস্তুত করিয়া ক্রমে সাধনার সম্প্রসারণ দ্বারা সেই সকাম প্রেম ভক্তির সহিত যে ভোগবাসনার সংযোগ থাকে সেই ভোগবাসনকে দূর করা দুঃসাধ্য হয় না।

ভোগবাসনার সংযোগই সকাম সাধকের অন্তরে স্থিত প্রেমভক্তির মালিণ্য বলিয়া বর্ণিত হয়। কিন্তু ভাগবত বলেন যে আমাদের 'অন্তঃস্থ' ভগবান ঐ 'অভদ্র'কে 'অর্থাৎ অহিতকর মালিণ্যকে', ক্রমশঃ দুর করেন। অতএব 'অহং-কর্ত্তৃ' ভাবের মোহের প্রভাবে বাসনা পুরণের জন্য আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকা অপেক্ষা, কাম্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানের আশ্রয় লওয়া (অর্থাৎ 'সকাম' সাধনা করাও) শ্রেয়স্কর হয়। যদি বল, কেন শ্রেয়স্কর হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, যদি আমরা যথার্থই নিষ্কাম ভাবে সাধনা করিতে চাই

তাহলে পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত সকাম সাধনাই ক্রমশঃ আমাদিগকে নিষ্কাম সাধনার উপযোগী করে। অতএব আমাদের চিত্তের অধুনাতন দুর্ব্বল অবস্থায় সকাম সাধনার অনুষ্ঠানই আমাদের অনেকের পক্ষে উপযোগী। নিষ্কাম সাধনার জন্য যোগ্যতা আমাদের অনেকেরই নাই। লেখকের এই অনুমান ভ্রান্ত কি না তাহা বলা তাঁহার সাধ্যাতীত।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা নিষ্কাম সাধনার 'অধিকারী' হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা 'অধিকারী' হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা ঐ ভাবে সাধনা করুন।

Catchwords এর উপদ্রব

চল্‌তি কথার উপদ্রব সাধনার পক্ষে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করে। লেখক কতক লোক দেখিয়াছেন যাহারা বলেন যে, অবিদ্যাস্পৃষ্ট মানব কখনই 'অহৈতুকী' ভক্তি করিতে পারে না; তাঁহারা বলেন যে,সসীম বুদ্ধিতে অসীমের উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব; ভগবৎ-কৃপায় 'সসীম' বুদ্ধি সমাধির অবস্থায় যে 'অসীমের' শক্তিলাভ করিতে পারে, এই তত্ত্বটী ঐ 'সমজদার' গণের আমলে আসে না। তাঁহাদের মতে 'বিশুদ্ধ' জ্ঞান বা অনিমিত্তা ভক্তিলাভের জন্য নিষ্কাম উপাসনা করা কেবল পণ্ডশ্রম। তাঁহারা নিজে নিষ্কাম উপাসনায় অক্ষম বলিয়া আত্মাভিমান বশতঃ অপর সকলকেই নিজের তুল্য অক্ষম মনে করেন। নিজেরা যাহা পারেন না, অপর কেহ তাহা করিতে পারিবে না, আত্মাভিমানের প্রভাবে এই ধারণাই তাঁহাদিগের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

অপর এক দল 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি' চান। প্রহ্লাদের ভাষা ব্যবহার করিয়া তাঁহারা সকাম উপাসনাকে দোকানদারি দেনা পাওনার ব্যাপার, বলিয়া অবজ্ঞা করেন। 'ন সঃ ভক্তঃ স বৈ বণিক্'; কটকে থাকার সময়ে লেখক নিজেও এই দলের একজন চাঁই ছিলেন।

রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ব্যবসাক্ষেত্র অথবা অপর কোন স্থলেই Catchwords এর অর্থাৎ 'চলতি কথায়' মূল্য অতি অল্প। তরকারীতে গরম মসলা দিলে তাহা যেরূপ মুখরোচক হয়, সমাজে চলিত কতক কথাও অভিমতকে শ্রুতিমধুর করিয়া, ভ্রান্ত মন্তব্যকে অভ্রান্ত উক্তির আভরণ পরাইয়া সুসজ্জিত করে, যাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে ঐ সকল বাক্য নিঃসৃত হয় তাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন।

লেখকের সবিনয় নিবেদন এই যে, আপন আপন 'অধিকারের' প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, অর্থাৎ আমার যতটুকু মানসিক শক্তি আছে তাহা নিষ্কাম সাধনার উপযোগী হইয়াছে কি না এই বিষয়টীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যিনি আপনাকে নিস্কাম সাধনার জন্য অসমর্থ জ্ঞান করেন তিনি ঐরূপ কার্য্যে সময় নষ্ট না করিয়া, সকাম ভাবে সাধনা করুন। তাঁহার মানসিক সামর্থ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার পরে যখন তিনি অধিকারী হইবেন, তখন নিষ্কাম সাধনা করিবেন।

নিষ্কাম সাধনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিলে যে বিপদ হইতে চির-মুক্তি লব্ধ হয় না, এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

সকাম সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

(ক) সকাম সাধনায় 'অধিকার'।

নিষ্কাম সাধনায় 'অধিকার' উপলক্ষে নানা কথা বলা হইল দেখিয়া কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, সকাম সাধনায় কি সকলেই 'অধিকারী' হয়?

উত্তরে বলি যে, সকলেই যে অধিকারী হন, অর্থাৎ সকলের চিত্তই যে কামনা সিদ্ধির জন্য ভগবানের শরণাগত হইয়া উপাসনায় নিরত হইতে পারেন, তাহা নয়। কতক লোক আছেন যাঁহারা মোটেই ভগবানের 'ধার ধারেন না'। ইঁহাদের কতকের মতি তামসিক জড়তায় আচ্ছন্ন থাকাতে মনের এই অবস্থা হইয়াছে; কতকের মতি

রাজসিক 'অহং-কর্তৃ' ভাবে বিভোর হইয়া থাকাতে তাঁহাদের মনে 'অহং' ভাবেরই রাজত্ব চলে। তথায় ভগবানের স্থান নাই পুনঃ পুনঃ বিপদের ঘাত প্রতিঘাতে এই দুই শ্রেণীর মানবগণের মধ্যে কাহার কাহারও মতি ভগবানের শরণাগত হয়।

এই দুই শ্রেণী ছাড়াও পর অনেক মানব আছেন, যাঁহাদের মনে ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা থাকাতে তাঁহারা সকাম আরাধনা করেন।

(খ) সকাম সাধনায় 'অধিকারের অনুকূল' অবস্থা।

প্রায় সকল মানবই ভোগসুখ চায়। অতএব ভোগসুখের আশাই মতিকে ভগবানের দিকে ধাবিত করে।

'অহং-কর্তৃ' ভাবের উপশমের সুযোগ।

যাঁহারা ভগবানের সঙ্গে প্রায় কোন সংস্রবই রাখেন না, তাঁহারাও যখন 'কারে পড়েন', অর্থাৎ যখন তাঁহাদের অন্তরে স্থিত প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষণ হওয়াতে, হয়ত কেহ মরণাপন্ন দশায় পড়েন, কাহারও বা সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার উপক্রম হয়, কাহারও বা মান-সম্ভ্রম বিনষ্ট-প্রায় হয়, অথবা কাহারও স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয় ব্যক্তির জীবন-সংশয়-কারী পীড়া হয়, এই রকম কোন না কোন দুরাবস্থায় পতিত হওয়ার পরে ঐ শ্রেণীর মানবের অনেকের অন্তরে 'অহং কর্তৃ' ভাব আপন উন্নত মস্তককে অবনত করে। অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট 'অহঙ্কার' হইতে 'অহংকর্তৃ' ভাব উৎপন্ন হয়। লোকের সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্যোগ করিয়া বিপদ যখন তাহার 'মমত্ব' ভাবের উপর আঘাত প্রদান করে, সেই আঘাত 'অহঙ্কার' এবং 'অহং-কর্তৃ' ভাব, এই উভয় বস্তুর উপরই পতিত হয়। আঘাত পড়িবা মাত্র অবিদ্যা দূর হয় না, অবিদ্যা দূর করার জন্য আরও অনেক 'কাঠ খড়' প্রয়োজন হয়। তাহলেও পরোক্ষ ভাবে ঐ আঘাত মঙ্গলকর, কারণ উহা হইতে 'অহং-কর্তৃ' ভাব উপ-শমের সুযোগ জন্মায়।

অসহায় অবস্থায় সাধনা আরম্ভ।

যখন উদ্ধারে কোন উপায়ই থাকে না, তখন যে মানবগণ ভগবানের 'ধার ধারিতেন না' তাঁহাদের কেহ কেহ সাধনা আরম্ভ করেন। বলিতেছি না যে,সকলেই আরম্ভ করেন, তাহা করিলে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিত। যাঁহারা আরম্ভ করেন না, তাঁহারা গুণত্রয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রভাবে পুনঃ পুনঃ বিপদের ঘা খাইতে থাকেন। দুই দশ জন হয়ত সাধনা না করিয়াও গুণের স্বাভাবিক কার্য্য প্রভাবে উন্নত হন, কেহ কেহ বার বার ঘা খাইতে খাওয়ার পরে সাধনায় প্রবৃত্ত হন, অনেকের অন্তরে আবরক শক্তি এতই প্রবল যে যতই বিপদের ঘা খাউক না কেন, তাঁহাদের মতি কিছুতেই সাধনার দিকে যায় না। গুণত্রয়ের স্বাভাবিক কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হয়, এবং যাঁহাদের অন্তরে তমোগুণের অধ্যধিক পুষ্টি হয়, তাঁহারা নরযোনি হইতে কোন নীচ যোনিতে গমন করেন।

সাধনার কি প্রয়োজন আছে?

বিপদের উপশমের জন্য সাধনার প্রয়োজন হয়, এই কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; ইহা ছাড়াও অপর প্রয়োজন আছে। সংসারে গুণত্রয় যখন আপন আপন স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে কার্য্য করিতে থাকে তখন,আবরক শক্তি যদি প্রকাশ শক্তিকে অভিভূত করিতে পারে তাহা হইলে 'জীবের গতি নিম্নগামী' এবং যদি প্রকাশ শক্তি আবরককে অভিভূত করিতে পারে, তাহলে জীবের গতি উচ্চগামী হয়।

যাহাকে আমরা 'সাধনা' বলি সেই কার্য্যের মধ্যে কতক অনুষ্ঠান আছে যাহা তামসিক ভাবাপন্ন এবং তাহা দ্বারা অধোগতি হয়। মারণ যারণ বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য এই শ্রেণীভুক্ত; 'পিশাচ-সাধনা ও এই শ্রেণীভূক্ত। অতএব যিনি আপন নিম্নগতির নিরোধ এবং উচ্চগতি হওয়ার সুযোগ লাভ করিতে চান, তাঁহার সেই প্রকার সাধনা করা কর্ত্তব্য, যে প্রকার সাধনা দ্বারা প্রকাশ শক্তিতে বল সঞ্চার হইতে পারে।

দেখা গেল যে কেবল উপস্থিত বিপদের উপশমের জন্যই নয়, আপনাকে উন্নত (elevate) করার জন্যও সাধনার প্রয়োজন হয়।

সকাম সাধনা দ্বারা প্রকাশ শক্তিতে বল সঞ্চার।

(ক) সাধনা দ্বারা বিপদ উপশমে কোন বৈচিত্র্যই নাই

লোকে নাচারে পড়িয়া সাধনা আরম্ভ করিলেও সে সাধনা দ্বারাও মঙ্গল হয়। গোড়ায় গোড়ায় সকাম সাধনা একটা mechanical অর্থাৎ বাহ্যিক অনুষ্ঠান আকারে থাকে বটে, কিন্তু তবুও তাহা ছাড়া উচিত নয়। যত দিন চিত্তের অবস্থায় কোন ভাবান্তর দেখা না যায়, তখন কেবল ইহাই প্রকাশ হয় যে, লোকে সাধনা করিতেছেন বটে, কিন্তু সেই সাধনা দ্বারা তখনও চিত্তেস্থিত প্রকাশ এবং আবরক শক্তি দ্বয়ের বলের বিশেষ কোন তারতম্য হয় নাই।

ঐ অবস্থায় গুণত্রয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রায় পূর্ব্ববৎ ভাবেই চলিতে থাকে এবং বিপদের তেজ ও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু শ্রদ্ধা বিরহিত ভাবে, mechanical, অর্থাৎ কলের পুতুলের মত সকাম সাধনা করিতে করিতে মনের মধ্যে ধীরে ধীরে সাধনার প্রতি একাগ্রতার সঞ্চার হইতে থাকে। একাগ্রতা অতি ক্ষীণ-বল হইলেও, ঐ অমূল্য বস্তুটী দ্বারা অন্তরে প্রকাশ শক্তির পুষ্টি এবং আবরক শক্তির পরিমাণ হ্রাস হয়। আবরক শক্তির যত কমিতে থাকে, তাহার বল (অর্থাৎ ক্রিয়াপটুতা) তত বাড়িতে থাকে (২৭৭ পৃষ্ঠা)। এই বল-বৃদ্ধির ফল ইহাই দাঁড়ায় যে, বিপদ উৎপত্তির সময়ে প্রকাশ এবং আবরক শক্তির বলের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল কাহার কাহারও চিত্তে অল্পমাত্রায় ঐ বৈষম্যের হ্রাস হয়। তাইতে বিপদের তেজের হ্রাস হয়।

আমরা বলিয়া থাকি যে, ভগবান আপন করুণা দ্বারা দুর্ব্বল সাধকের বিপদের উপশম করেন। প্রকৃত পক্ষে গুণের শক্তিতে যে পরিবর্ত্তন হওয়াতে বিপদের হ্রাস হয় সেই পরিবর্ত্তন 'ভগবানের যোগমায়া'

নাম্নী ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব পরোক্ষভাবে ভগবানের কৃপার প্রভাবেই দুর্ব্বল মানবের পক্ষে বিপদের উপশম হয় এই কথা বলা অসঙ্গত নয়। তবে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, গুণের শক্তির তারতম্য হওয়াতে বিপদের উপশম হয়, এবং ঐ তারতম্য ভগবানের কৃপারই ফল। অতএব গুণই যে বিপদের নিবৃত্তি করে এই কথাও বলা যাইতে পারে (২৯৬ পৃষ্ঠা)।

এস্থলে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি যে, বিপদের উৎপত্তি কিম্বা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি গুণের যে শক্তির উপর নির্ভর করে, সেই শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি সাধনা দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেহেতু সাধনা আমাদের উদ্যম সাপেক্ষ, অতএব বলা যাইতে পারে যে, লোকে নিজেই আপন আপন বিপদের জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। কাহারও জীবনে বিপদ হওয়া বা না হওয়া উপলক্ষ্যে দুর্ভেদ্য রহস্য কিছুই নাই। প্রকাশ এবং আবরক শক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বশে বিপদের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হইতে থাকে। লোকে অনেক সময়ে **Inscrutable are the ways of Providence,** এই কথা বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন, এবং যাঁহাদের বাগ্‌বিভব অল্প, তাঁহারা 'বরাতের' দোহাই দিয়া চুপ করিয়া থাকেন। বিনা সাধনায় বিপদ মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র। এক ভাবে দেখিলে, মানবের সুখ দুঃখের জন্য মানব নিজেই দায়ী। সাধনা দ্বারা অহঙ্কারের উপশমে সুখ, এবং ভোগবাসনা অনুসরণ দ্বারা 'অহঙ্কারের' আরাধনা করাতে মানবের দুঃখই হয়। দুঃখের উপলক্ষে আপন দোষের বোঝা ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া, মানব ভগবানের উপর অত্যাচার ই করেন।

(খ) সকাম সাধনা দ্বারা ক্রমোন্নতি আরম্ভ।

পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা বিরহিত সাধনার কথা বলিলাম, তাহা কিরূপে দূর হয় তাহাই দেখা যাক্। বিপন্ন অবস্থায় মানব যখন দেখেন যে তিনি নিজে ছাড়া অপর একজন আছেন, যাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে

পারিলে বিপদের উপশম হয়, এই ধারণার বশে সকাম আরাধনা করিয়া যখন সত্য সত্যই বিপদের উপশম হয়, মানব তখন বিশ্বাস করেন যে, তাঁহা অপেক্ষাও অধিকতর 'কর্ম্মঠ' অপর একজন আছেন, যাঁহার প্রভাবে তদানীন্তন ভয়ঙ্কর বিপদের উপশম হইল। এই বিষয়টীকে সুনিশ্চিত ভাবে অনুভব করার পরে, মানব আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ক্রমশঃ শ্রদ্ধার সহিত ঐ 'কর্ম্মঠ' শক্তির আরাধনা করেন। এই ভাবে সকাম আরাধনা করিতে করিতে অভীষ্ট ফললাভ করিয়া, পূর্ব্বের 'শ্রদ্ধা' হইতে কৃতজ্ঞতার, এবং কৃতজ্ঞতা হইতে ভক্তির, সঞ্চার হয়। যিনি পূর্ব্বে সাধনা-বিরহিত ছিলেন, সেই মানবের পক্ষেও সকাম সাধনা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সোপান হয়। তাঁহার উন্নতির পরবর্ত্তী স্তর সকল নিম্নে বলা হইতেছে।

সকাম সাধনা দ্বারা ক্রমোন্নতির স্তর

(ক) আগ্রহ হইতে কিরূপে একাগ্রতা জন্মায়।

স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আদিতে সাধনার প্রতি যে একাগ্রতা দেখা যায়, তাহা ভোগসুখের প্রতি আসক্তি হইতেই জন্মায়। আকাঙ্ক্ষায় মধ্যে যে প্রেরণাশক্তি থাকে, তাহাই মানবের চিত্তকে সাধন কার্য্যে নিবদ্ধ রাখে, অতএব ভোগবাসনাই একাগ্রতার কারণ।

(খ) সকাম ভাব হইতে শ্রদ্ধা, তৃপ্তি এবং ভক্তি সঞ্চার

সকাম আরাধনার সময়ে সাধকের চিত্ত যত বেশী বেশী সুদৃঢ় ভাবে ভগবচ্চিন্তায় নিবদ্ধ হইতে থাকে, পাতঞ্জল সুত্রের 'বৃত্তিসারূপ্য' এই নিয়মটীর কার্য্যও সাধকের চিত্তের উপর তত বেশী বেশী প্রবল ভাবে চলে। অর্থাৎ সাধক যে দেব বা দেবীমূর্ত্তির উপাসনা করেন, সাধকের চিত্ত তাঁহার সহিত বেশী বেশী 'সমানরূপতা' প্রাপ্ত হয়। যে দেব বা দেবীই উপাসিত হউন না কেন, তাঁহার প্রকাশ শক্তি না থাকিলেও সাধক তাঁহাকে শক্তিমান বলিয়া বিশ্বাস করেন। উপাস্য বস্তুর সহিত সমানরূপতা যত বেশী হয়, সেই বস্তুর গুণ বা দোষগুলিও

তত বেশী বেশী পরিমাণে সাধকের অন্তরে প্রতিফলিত হয়। ইহাই হইল 'সমানরূপতার' স্বাভাবিক ফল। অতএব ধ্যেয় বস্তুতে যে শক্তি আছে বলিয়া সাধক বিশ্বাস করেন, আরাধনায় একাগ্রতা বৃদ্ধি হওয়ার সময় তাহা বেশী বেশী পরিমাণে, সাধকের চিত্ত স্ফূরিত হয়। ইহার শুভফল এই হয় যে—

(১) ইহা হইতে 'শ্রদ্ধার' সঞ্চার হয়, অর্থাৎ ধ্যেয় দেব দেবী বা ভগবান যে আপন শক্তি বলে কাম্যবস্তু প্রদান করিতে পারেন, সাধকের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মায়।

(২) সাধনা দ্বারা কাম্য বস্তু লাভ হওয়ার পরে চিত্তে সন্তোষ জন্মায়। সন্তোষ এবং সুখকামনার সমন্বয় হইতে সাধনায় 'রুচি' হয়; অর্থাৎ সাধনা ভাল লাগে।

(৩) 'রুচি' হইতে 'রতি' হয়। পূর্ব্বে কেবল অনুষ্ঠানই ভাল লাগিত; ঐ অনুষ্ঠানে যিনি কর্ম্মফল প্রদান করেন তাঁহাকেও এখন ভাল লাগে। অর্থাৎ পূর্ব্বে আরাধ্য দেবতার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ (Personal relation) ছিল না; কিন্তু এখন ঐ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

(৪) 'রতি' হইতে রাজসিক 'ভক্তি' জন্মায়; অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুর প্রতি তখনও আসক্তি থাকে বটে, কিন্তু যিনি কর্ম্মফল প্রদান করেন, 'রতি'র সঞ্চার হওয়ার সময়ে তাঁহার উপর যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাহা প্রগাঢ় হয়। সকাম ভাবযুক্ত হইলেও এই প্রেম অমূল্য বস্তু।

চিত্তের এই পরিবর্ত্তনকে ক্রমোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর বলা যাইতে পারে।

সকাম সাধনায় মতি হওয়াও দুঃসাধ্য

উপরের মন্তব্য হইতে পাঠক মনে করিবেন না যে, সকল সকাম সাধকের মনেই একাগ্রতা এবং তাহা হইতে শ্রদ্ধা, রুচি, রতি এবং ভক্তি জন্মায়। অবিদ্যার সংস্কার সকল আমাদের চিত্তের উপর এতই আধিপত্য স্থাপন করিয়া আছে যে, বিপদের কশাঘাতে দেহ রুধিরাপ্লুত

হইলেও, অবিদ্যার মোহিকা শক্তি মতিকে নিবদ্ধ রাখে। তাই সাধনার জন্য মোটেই প্রবৃত্তি হয় না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, একটী লোক ১৩ হইতে ৪৩ এই তিরিশ বৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ বিপদের বহু কশাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন তবুও ৪৩এর পূর্ব্বে তাঁহার মতি সাধনার দিকে যায় নাই বলিলেও চলে। এই আচরণ হইতে অবিদ্যার বিরাট শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তিকে অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ়ভাবে সকাম সাধনাও সুসাধ্য নয়।

সাধনা আরম্ভ করার পরেও পদস্খলনের খুবই সম্ভাবনা থাকে। পদস্খলন নিবারণের জন্য সেই লোকটী পরবর্ত্তী দশ বছর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বেশী বিপদ ভোগ করিয়াছিলেন এবং প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ বিপদ ভোগের পরে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের জন্য 'অধিকার' অর্থাৎ যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন; (২৬৬-৬৯ পৃষ্ঠা)।

তখন অধ্যয়ণ আকারে সাধনা ত্যাগের আশঙ্কা ছিল বলিয়াই, ভগবানের 'যোগমায়া' নাম্নী ইচ্ছাশক্তি, আপন মধুর মূর্ত্তিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া,বিপদের করাল রূপ প্রকটন দ্বারা সেই লোকটীকে সাত বৎসর যাবৎ যেন অগ্নির তুল্য বিপদের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। অবিরতই ঘোর বিপদ বজায় ছিল বলিয়াই, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ নামক সাধনা কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; (২৩২ পৃষ্ঠা)।

অতএব কেহ যেন মনে না করেন যে, লোকে ইচ্ছা করিলেই সকাম বা নিস্কাম সাধনা করিতে পারে।

'অবসর মত' সাধনা

'অবসর' মত সাধনা ছেলেখেলার ব্যাপার মাত্র। উহা হইতে একাগ্রতা জন্মায় না; সুতরাং উহা দ্বারা যে কোন উপকারই হয় না এই কথা বলিলেও চলে

বিপদ এবং শাস্ত্রপাঠ উভয়েই পরস্পরের কারণ এবং ফল

একটানা ভাবে ঐ সাত বৎসর বিপদ চলিয়াছিল বলিয়াই লোকটী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ পরিত্যাগ করেন নাই। যখনই পাঠে অল্পমাত্র শৈথিল্য হইয়াছে, বিপদ তখনই তাঁহাকে গ্রাস করিতে মুখ-ব্যাদন করিয়াছে। কিন্তু পাঠে নিরত থাকার সময় তাঁহার কোন যাতনাই থাকিত না। এই জন্য বিপদকে কারণ, এবং ভাগবতপাঠ কার্য্যকে ঐ কারণের ফল বলা যাইতে পারে।

অপর দিকে আবার দেখিতে পাই যে, তাঁহার মতি যত সুদৃঢ় ভাবে অধ্যয়ন কার্য্যে নিরত হইয়াছে, তিনি (ক) তত সুস্পষ্ট ভাবে শ্লোকের বাক্যে নিহিত গূঢ় তত্ত্বকথা বুঝিতে পারিতেন, এবং, (খ) তত অধিক হইতে অধিকতর মাত্রায় ভাগবতের সুমধুর রসের আস্বাদ লাভও করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সাত্ত্বিক ভাব সকল মন ও বুদ্ধিতে প্রবেশ করাতে তাঁহার অন্তরে সত্ত্বগুণের পুষ্টি এবং তমোগুণের হ্রাস হইতেছিল। গুণদ্বয়ের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের শক্তির, অর্থাৎগুণ-সাম্যের, ব্যতিক্রম হইতেছিল।

গুণসাম্যের ব্যতিক্রম নিয়তই চলিতেছিল বলিয়াই সাত বছর যাবৎ বিপদের বিরাম হয় নাই; (২৯৪ পৃষ্ঠা)। অতএব আদিতে বিপদ শাস্ত্র অধ্যয়ন কার্য্যের 'হেতু' হইলেও, পরবর্ত্তী সাত বৎসরে অধ্যয়ন কার্য্যকেই বিপদের 'কারণ' বলা যাইতে পারে, যেহেতু ঐ কার্য্য দ্বারা গুণসাম্যের ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

অন্তর্জগতে বিপদ এবং সাধনার মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠভাবের 'কার্য্য' এবং 'কারণ' সম্বন্ধ থাকে। আজ যাহা 'কারণ' এবং যাহা ঐ কারণের ফল, আগামী কল্য হয়ত ঐ ফলই 'কারণে' পরিণত হয়; এবং পূর্ব্বে যাহা 'কারণ' ছিল তাহাই 'কার্য্যের' (অর্থাৎ ফলের) রূপ ধারণ করে। জড় জগতেও এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। লেখক যখন শ্বাসরোগে

ভুগিতেন তখন অজীর্ণ হইতে হাঁপানি হইত, এবং হাঁপানিও পরিপাক শক্তির ব্যতিক্রম, অর্থাৎ অজীর্ণ সৃষ্টি করিত।

বিপদ সাধন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে, এবং সাধনাও বিপদের সৃষ্টি করে

পাঠক উপরোক্ত কথাগুলি পড়িয়া বিস্মিত হইবেন না। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮৭ হইতে ২৯৪ পৃষ্ঠায় এই উপলক্ষে অপর কতক তত্ত্বকথায় আলোচনা করা হইয়াছে। সাধনা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধির ফলে আপনিই বিপদের সৃষ্টি হয়। এবং বিপদ দ্বারা মতি সাধন কার্য্যে যত সুদৃঢ় হয়, তত বেশী বেশী চিত্তশুদ্ধি হওয়াতে বিপদ বাড়িতে থাকে। এই বিচিত্র ব্যবস্থাটী দ্বারা automatic ভাবে, অর্থাৎ যেন কলের কার্য্যের মত স্বাভাবিক নিয়মে, জীবের উন্নতির সুযোগ জন্মায়।

'খোসমেজাজি' ভাবের সাধনা

তাই বলি, সকলেই যেন মনে রাখেন যে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে 'অবসর মত' সাধনা করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হওয়ার আশা নাই। বাইবেলের ভাষায় বলি যে, roaring loin, অর্থাৎ সিংহ যেমন ক্ষুধায় তাড়নায় অস্থির হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে শিকার অন্বেষণ করে, অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট সংস্কার সকলও যেন সিংহের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া কখন্ মানবকে আপন আয়ত্তে আনিবে তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে।

অতএব নিয়তই আমাদের বিপদের আশঙ্কা আছে, এই, বিষয়টী স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা সতর্ক ভাবে সাধনা করিতে পারিলে মানবের মঙ্গল হয়। সাধনার জন্য 'অবসর' থাকা চাই, এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া, সাধনাই যে জীবনের মুখ্য কার্য্য, এবং অপর অপর কাজের ভিড় যতই থাকুক না কেন, সাধনা করিতেই হইবে, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া যিনি সকাম ভাবেও সাধনা করেন, তিনি ক্রমশঃ নিস্কাম সাধনায় অধিকারী হন।

যদি ভোগ্যবস্তুই চাও, উহা লাভের জন্য আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, যাহাতে তোমার দেহে ঐ বস্তু সংগ্রহের জন্য শক্তি-সঞ্চার হয়, সে জন্য ভগবানের আশ্রয় লও। তিনি কাম্যবস্তু দিবেন এবং পরে মোক্ষও দিবেন।

ঊনবিংশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

সাধনায় দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ নিষ্কাম সাধনা

'সাধনা' কাহাকে বলে

শিক্ষা বিস্তারের প্রভাবে আমাদের মধ্যে মার্জ্জিত ভাষার চলন বেশী হইয়াছে, অতএব ছেলে বুড়ো অনেকের মুখেই 'সাধনা' কথাটীর ব্যবহার খুবই দেখা যায়। 'সাধনা' কথাটী দ্বারা কি বুঝায় তাই দেখা যাক্। এই কথাটী 'সাধি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ধাতুটীর অর্থ সম্পাদন করা। অতএব কোন কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়, আমরা যদি ঐ উপায় অবলম্বন করি, সেই অবলম্বন কার্য্যকে অভীষ্ট বিষয়ের জন্য 'সাধনা' করা বলে। মোক্ষলাভের উপায় অবলম্বন কার্য্য যেরূপ 'সাধনা' পদ-বাচ্য, বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনের বিহিত অনুষ্ঠানও সেইরূপ 'সাধনা' নামের যোগ্য।

(ক) সকাম সাধনায় 'অভীষ্ট'

যাঁহারা 'সকাম সাধনা' করেন, তাঁহাদের অভীষ্ট থাকে ধনপুত্রাদি কাম্য বস্তু লাভ করা। বিপন্নদশায় সকাম সাধকের নিকট, বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করাই, সাধনার অভীষ্ট বস্তু হইয়া থাকে।

যে সাধকের নিকট যাহা অভীষ্ট বস্তু থাকে তাহা প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করাকে সেই বিষয়ের জন্য 'সাধনা' করা বলে। এই সকল উপায় কখন **sacred** অর্থাৎ পারমার্থিক, এবং কখন বা **secular**,

অর্থাৎ বৈষয়িক ভাবযুক্ত হয়। বিদ্যালয়ে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পুস্তক অধ্যয়ণ বা আবশ্যকীয় কার্য্য করাকেও 'সাধনা' বলা যাইতে পারে। ইহা secular শ্রেণীর সাধনা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ঐ সাধনার অভীষ্ট বস্তু।

(খ) 'নিষ্কাম' সাধনায়ও অভীষ্ট থাকে

যদিও ধনপুত্রাদি লাভ, কিম্বা কোন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা, 'নিষ্কাম' সাধকগণের পক্ষে অভীষ্ট না হইলেও বিশুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান বা বৈরাগ্য লাভ করা তাঁহাদের স্ব স্ব সাধনার 'অভীষ্ট' ভাবে থাকে।

'অভীষ্ট' সত্ত্বেও সাধনা 'নিষ্কাম' হয়

'যাহাতে 'আত্মতৃপ্তি' অর্থাৎ অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহঙ্কারের' তৃপ্তি হয়, তাহাকেই 'কাম' বলা যায়। অতএব 'কাম' পদ 'বিষয়' অর্থাঃ ভোগের বস্তুকেই লক্ষ্য করে। যে সাধনায় কোন ভোগের বস্তুর প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তাহাই 'নিষ্কাম' সাধনা। বস্তুতঃ অভীষ্টবর্জ্জিত কোন প্রকার সাধনাই হইতে পারে না। যিনি 'আত্মারামঃ পূর্ণকামঃ' তিনিও ব্রহ্মের সুখস্বরূপের সংস্পর্শে থাকিতে অভীষ্ট করেন।

অভীষ্ট বস্তুর পার্থক্য অনুসারে সাধকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

জ্ঞানমার্গের সাধক

কেহ কেহ ব্রহ্ম-তত্ত্ব উপলক্ষে জ্ঞান লাভের জন্য, অর্থাৎ যে 'বিশুদ্ধ' (=আবরক শক্তির সংস্রব রহিত) জ্ঞানই ব্রহ্ম, সেই জ্ঞানকে লাভ করার জন্য, দর্শন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন এবং অপর উপায় দ্বারা সাধনা করেন। যে বিশুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম, যখন তাঁহাদিগের চিত্তে সেই জ্ঞানের সঞ্চার হয়, অর্থাৎ যখন তাঁহারা ব্রহ্মের চিদাত্মক স্বরূপকে (পঞ্চদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অনুভব করেন, তখন ঐ জ্ঞান অর্থাৎ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ, ভক্তি এবং বৈরাগ্যও জন্মায়।

এই তিন বস্তু জ্ঞানের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ হইয়া আছে; অতএব

বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে ভক্তি, বৈরাগ্য ও আনন্দও প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তখন ঐ জ্ঞানই এত মধুর বোধ হয় যে, যিনি সেই জ্ঞানের আধার, তাঁহার প্রতি 'পরা অনুরক্তি' জন্মায়; এই অনুরাগ বশতঃ মতি ঐ বস্তুকে ছাড়িতে চাহে না। ইহাকেই ব্রহ্মের প্রতি 'একমনাঃ' ভাব বলে। এই অনুরক্তির নামই 'ভক্তি'। এই আনন্দের তুলনায় স্রকচন্দন-বণিতাদি সর্ব্ববিধ ভোগ্য-বস্তু এত নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় যে, সাধকের মতি ঐ সকল বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। চিত্তের এই অবস্থার নাম 'বৈরাগ্য'।

এই অবস্থায় চিত্ত কেবল ঐ 'আনন্দ'-স্বরূপের সংস্পর্শে থাকিয়াই তৃপ্তি পায়। অতএব উপরোক্ত 'একমনাঃ' অবস্থায় সাধক 'আত্মারাম' হন। 'সচ্চিদানন্দ' সংজ্ঞাত্রয় দ্বারা যে 'অদ্বয় জ্ঞান' বুঝায়, তাহা এই শ্রেণীর সাধকগণের নিকট 'ব্রহ্ম' নামে আখ্যাত হন।

যোগ-মার্গের সাধক

ব্রহ্ম যে নাম-রূপ-বহির্জ্জিত, এই তত্ত্বকথা যোগমার্গের সাধকগণের নিকট সুবিদিত। স্বয়ং নাম-রূপ-বর্জ্জিত হইয়াও, ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের আধার, এবং যে ভক্ত ব্রহ্মকে যে রূপের আধারভূত ভাবে দর্শন করিতে বাসনা করেন, ব্রহ্ম সেই প্রকার সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনাকে সেই ভক্তের অন্তরে প্রকটন করেন।

সাধক এই তত্ত্বকথাগুলি জানেন। ঐ রূপ দর্শন করিয়া ভক্তের তৃপ্তি হয় এবং ভক্তের তৃপ্তিতে স্বয়ং ব্রহ্মেরও তৃপ্তি হয়, কারণ তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের সীমা নাই। যোগমার্গের সাধকগণ আপন আপন রুচি অনুসারে ব্রহ্মের রূপমাধুরী দর্শনের জন্য সাধনা করেন।

সাধক ব্রহ্মকে যে রূপে দেখিতে চান ব্রহ্ম তাঁহার তৃপ্তির জন্য সেই রূপের প্রকটন করিয়া তাঁহাদের হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত হন। এই পন্থার অনুসরণ করিয়াও সাধকের অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। এই শ্রেণীর সাধকগণের নিকট ব্রহ্ম 'পরমাত্মা' নাম পাইয়াছেন।

'ভক্তি'-মার্গের সাধক

ভক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে 'ভগবান' এই নাম দিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত নিজেদের দাস্য সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া, ভগবান যে মধুর রসের আধার, সেই রসের আস্বাদ গ্রহণের জন্য সাধনা করেন। ঐ প্রকৃষ্ট মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভের পরে সাধকের অন্তরে ভগবানের প্রতি যে 'পরা অনুরক্তি', অর্থাৎ 'প্রিয়াৎ প্রিয়তমাঃ' ভাব জন্মায়, সেই অনুরাগকে 'ভক্তি' বলে।

প্রকৃত 'ভক্তির' সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যেরও সঞ্চার হয়। অর্থাৎ অনুরাগের প্রভাবে ভক্তের চিত্ত নিয়ত ব্রহ্মে নিবদ্ধ থাকার সময়ে, যে বিশুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম সেই 'জ্ঞান' সাধকের চিত্তে প্রতিভাত হয়; ব্রহ্মের মাধুর্য্যের তুলনায় ভোগসুখ তুচ্ছ বোধ হওয়াতে তখন ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়। এই 'নিবৃত্তির' অবস্থাকে দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় 'বৈরাগ্য' বলে।

তখন যে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মায়, তাহাও ভোগবাসনা নিবৃত্তির অন্যতম কারণ। ঐ জ্ঞানের প্রভাবে সাধক অনুভব করেন যে, তিনি পূর্ব্বে যে সকল-বস্তু কামনা করিতেন, ঐ সকল বস্তু ব্রহ্মে নিহিত আছে। কারণ তাহারা ব্রহ্মের 'চিৎ' নামক অনন্ত শক্তিরই 'বিকার', অর্থাৎ স্থূলভাবে রূপান্তর। অতএব ব্রহ্মকে লাভ করিলে কোন বস্তুই অলব্ধ থাকে না। এই কারণেই ব্রহ্মদর্শনের সময় সাধকের অন্তরে যে সুখের সঞ্চার হয়, সেই সুখ 'পূর্ণ অর্থাৎ লব্ধ বা অলব্ধ সকল প্রকার সুখই ঐ সুখের মধ্যে থাকে। ঐ 'পূর্ণ' সুখ লাভের পরে অপর কোন সুখের কামনাই থাকে না।

ত্রিবিধ সাধন মার্গের ফল একই দাঁড়ায়

উপরোক্ত ত্রিবিধ সাধনার 'পন্থা', অর্থাৎ অনুষ্ঠান পদ্ধতি, পৃথক হইলেও, তাহাদের লক্ষ্য একই বস্তু। কারণ ঐ তিন শ্রেণীর

সাধকই ব্রহ্মের সংস্পর্শে থাকিতে চান। অর্থাৎ (ক) যে বিশুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম কেহ বা ঐ জ্ঞানরূপী ব্রহ্মকে লাভের চেষ্টা করেন; কিম্বা (খ) যে আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু সংসারে নাই, কেহ বা সেই আনন্দের আধার পরমাত্মার দর্শন লাভের জন্য সাধনা করেন। (গ) অথবা কেহ বা প্রেমের, অর্থাৎ ভক্তির আধার ভগবানকে লাভের চেষ্টা করেন।

এই তিন শ্রেণীর সাধকগণের কেহবা আপন আপন রুচিভেদে বিশুদ্ধা অহৈতুকী 'ভক্তি', অর্থাৎ love of God for his own sake, লাভের জন্য সাধনা করেন। কেহবা 'বিশুদ্ধ' জ্ঞান (=অর্থাৎ যে জ্ঞানে আবরক বিক্ষেপ শক্তির (=অবিদ্যার) লেশমাত্র সংযোগ নাই সেই 'জ্ঞান') লাভের জন্য সাধনা করেন। এবং কেহবা 'প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য' লাভের জন্য সাধনা করেন।

অতএব, নিজ নিজ প্রকৃতি এবং যোগ্যতা অনুসারে, যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনা করুন না কেন, ফল একই দাঁড়ায়। সাধনা সফল হইলে সকলেই ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন, এবং তখন সকলের অন্তরে ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য জন্মায়।

জ্ঞানসঞ্চারের ফল।

চিত্তে যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন সাধক উপলব্ধি করেন যে,—

(ক) ব্রহ্মই বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন।

(খ) ব্রহ্মেরই 'পরা' প্রকৃতি নাম্নী অবস্থা সাধকের স্থূল দেহে 'জীব' নামে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং

(গ) ব্রহ্মের জীবনীশক্তি নামক অপর অবস্থা, 'বাসুদেব' নামে, সাধকের দেহে 'জীবন' রূপে অবস্থান করিতেছেন।

(ঘ) সাধক যে দেহ ধারণ করিয়াছেন তাহা, এবং সাধকের মন ও বুদ্ধি, 'অপরা' প্রকৃতির বিকার। 'পরা' প্রকৃতিই আবরক-বিক্ষেপ

শক্তিযুক্ত প্রচ্ছন্ন বেশ ধারণ করিয়া 'অপরা' নামে আখ্যাতা হইয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে সাধক এই বিষয়টীও অনুভব করেন।

(ঙ) বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে সাধক আরও অনুভব করেন যে, 'পরা' বা 'অপরা' প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষেরই এই নাম-করণ হইয়াছে।

(চ) সাধক তখন আরও অনুভব করেন যে, তাঁহার দেহের সর্ব্বকার্য্য ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তির দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। অতএব তাঁহার পক্ষে নিজস্ব বলার যোগ্য কোন বস্তুই থাকে না। এই জ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যাসৃষ্ট 'ভেদভাব' (৩৭ পৃষ্ঠা) দূর হইয়া সাধক ও ব্রহ্মের মধ্যে 'একীভাব' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্ম-স্বরূপের জ্ঞানের সঙ্গে আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান

মোট কথা এই যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে সাধক 'ত্বং' বস্তুর, অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপের, অনুভব লাভ করেন, অর্থাৎ সাধক নিজে কি বস্তু, সাধক যাহাকে 'আমি' ভাবেন, সেই 'আমি' প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু, তাহাও অনুভব করেন। আত্ম-স্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে যে কোন ভেদই নাই, এই তত্ত্বও তখন সাধক দ্বারা অনুভূত হয়।

'তত্ত্বমসি'

সাধক তখন উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' বাক্যের গভীর ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দ বিভোর হন।

যদি বল যে, জীবকে ত 'পরা' প্রকৃতি বলা হইল ; এবং যিনি আমাদের জীবনীশক্তি তাঁহাকে 'বাসুদেব' অর্থাৎ 'পুরুষ' বলা হইল, এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 'প্রকৃতি' এবং 'পুরুষের' মধ্যে কি কোন ভেদ নাই ?

উত্তরে বলি যে, না, ভেদ নাই। প্রকৃতি পুরুষ হইতে পৃথক নহেন, তাঁহারা নিত্য সম্বদ্ধ। ব্রহ্ম আপন ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপকে 'পুরুষ'

এবং 'প্রকৃতি' এই দুই নামে আখ্যাত করিয়া প্রকটিত করিয়াছেন। ঐ সংজ্ঞা দুইটী কেবল নামের, অর্থাৎ কেবল কথার পার্থক্য প্রকাশ করে। কিন্তু তত্ত্বের আলোকে দেখিলে 'পুরুষ' এবং 'প্রকৃতির' মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না।

ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানের সঙ্গে 'আত্মা' স্বরূপের জ্ঞান

যখন ব্রহ্ম স্বরূপের ও সেইসঙ্গে আত্মস্বরূপের জ্ঞান লব্ধ হয়, সাধক তখন আত্মতত্ত্ব অনুভবের সঙ্গে 'পরা' এবং 'অপরা' প্রকৃতির স্বরূপও অনুভব করেন। বিদ্যা শক্তির সহিত আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সংযোগ করিয়া, বিভূ আপন 'যোগমায়া' নাম্নী শক্তি দ্বারা কিরূপে সৃষ্টিলীলা সম্পাদন করিতেছেন. সেই 'রহস্য'ও তখন আর নিগূঢ় থাকে না। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোক দ্বারা পরিস্ফুট হইয়া এই রহস্য তখন সাধকের চিত্তে এতই সুস্পষ্ট হয় যে, মায়াদেবী যেন সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধকের সম্মুখে আপনাকে, অর্থাৎ আপন লীলা রহস্যের প্রকটন করেন।

মহামায়ার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, ক্রমশঃ শুম্ভের চিত্তে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল। জীবন সংগ্রামে আমাদেরও চিত্তেও জ্ঞানের সঞ্চার হয়। শুম্ভ তখন মায়াদেবীর যে ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা উপলক্ষে গ্রন্থকারের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অমরবালা দেবী, তাঁহার 'দেবী মাহাত্ম্য' নামক নাটকে, যে চিত্তাকর্ষক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন সেই কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। জ্ঞাননেত্র দ্বারা প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তিকে দর্শন করিয়া শুম্ভ বলিলেন,—

> আহা! আহা! কিবা রূপ অনন্ত 'প্রকৃতি'!
> —শঙ্খচক্র গদা পদ্ম শোভে চতুর্ভূজে,
> নাহি হিংসা শোক তাপ—প্রফুল্ল আনন,
> অধরে মধুর হাসি।—'লীলা'-খেলা ছল!
> —নয়ন আনন্দময় 'আত্ম-দরশনে'।

সৃষ্টি, স্থিতি,—প্রলয় কারিণী,
'চিন্ময়ী' 'মৃন্ময়ী-রূপা'—সর্ব্ববীজভূতা।
—সুরাসুর, যক্ষ রক্ষ—আনন্দে পূজিতা,
বিরাজিতা সর্ব্ব 'ভূত' মাঝে!

নারদ হইতে দীক্ষালাভের পরে,'ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রের [মন্ত্রটী ২২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য] সাধনা করিতে করিতে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হওয়ার পরে, ব্যাস যখন 'পূর্ণ' ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে মায়াদেবীর দর্শন-লাভও করিয়াছিলেন :—

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াদেবীং অপাশ্রয়াং

অবিদ্যার নিবৃত্তির সঙ্গে তিন গুণই সত্ত্বগুণে পরিণত হয়

বলা বাহুল্য যে, চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে আবরক-বিক্ষেপ শক্তি আপনিই তিরোভূত হয়। সুতরাং আপনিই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। ঐ জন্য অপর কোন চেষ্টা করিতে হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত আবরক-বিক্ষেপে শক্তির সংযোগ দ্বারা ঐ এক গুণই প্রকৃতির গুণত্রয় নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। ঐ আবরণ দূর হওয়া মাত্র, প্রকৃতির গুণত্রয়ের অভ্যন্তর হইতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আপন মনোহর মূর্ত্তি প্রকটন করেন। তখন কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণেরই একচ্ছত্র রাজত্ব চলিতে থাকে।

যে বস্তুটি সকল বিপদের মূল তাহার ছেদন

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে কাম লোভ প্রভৃতি 'রিপু' হইতে আমাদের অনন্ত দুঃখ জন্মায় তাহাদের সকলেই 'অহঙ্কার' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; (২৯-৩০ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ, অবিদ্যার প্রভাবে জীবের চিত্তে 'ভেদভাব' (৩৩ পৃষ্ঠা) উৎপন্ন হওয়ার সময়, যে 'অহঙ্কার নামক বস্তুটি জন্মায়, সেই 'অহঙ্কার'ই আমাদের সকল দুঃখের মূল (২৯ পৃষ্ঠা)।

একটি আলপিনের উপর কোন সুবৃহৎ অট্টালিকাকে স্থাপন

করা মানবের পক্ষে অসম্ভব হয় বটে,কিন্তু মায়া দেবী ইহা অপেক্ষাও অসাধ্য নিত্যই সাধন করিতেছেন। আমরা সবই দেখি, কিন্তু চোখের উপর মোহের ঠুলি থাকাতে দেবীর এই অদ্ভুত লীলা দেখিয়াও দেখিতে পাই না। তাই আমরা অনুভব করিতে পারি না যে, মায়া দেবীরই প্রভাবে ঐ অহঙ্কার নামক বস্তুটীর উপর অবিদ্যার সুবিশাল রাজত্ব স্থাপিত আছে।

তখন মায়াদেবী নিজেকেও প্রচ্ছন্ন রাখেন! যে ভাগ্যবান সাধক মায়াদেবীর 'দর্শন' লাভ করেন (অর্থাৎ মায়ার স্বরূপ অনুভব করেন), তাঁহার পক্ষে ঐ 'অহঙ্কার' নামক আলপিনটি সরিয়া যায়। তখন তাঁহার পক্ষে ঐ আলপিনের উপর প্রতিষ্ঠিত 'সংসার' নামক সুবিশাল অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয়। অতএব বিশুদ্ধ জ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহঙ্কারের'ও তিরোভাব হইয়া কাম-লোভাদির নিবৃত্তি হয়। তখন সকল বিপদের মূল ছিন্ন হয়।

(ক) দীনবেশ ছাড়িয়া 'অহঙ্কারের' ঐশ্বর্য্যময় বেশ।

পূর্ব্বে ১৪৮ হইতে ১৫০ পৃষ্ঠায়, যাহা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ যাহা প্রকৃত 'অহং', তাহা কি অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়, এবং অবিদ্যা আপন আবরক শক্তি দ্বারা ঐ ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে, অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী 'পরা' প্রকৃতিকে, কি দীনবেশ পরাইয়া রাখিয়াছেন, এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে 'অহং'এর উপর হইতে ঐ আচ্ছাদন বিক্ষিপ্ত হয়; তাহার পর জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে ১৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বৈকুণ্ঠের রাসোৎসব অবিরত চলিতে থাকে।

বিশুদ্ধ ভক্তি এবং প্রকৃষ্ট বৈরাগ্যের ফল

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভক্তি বা যোগমার্গের সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধা ভক্তি বা প্রকৃষ্ট বৈরাগ্য সঞ্জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্ফূরণ হয়। ভক্তি জ্ঞান. এবং বৈরাগ্য একই সময়ে এবং একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। অতএব যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াই সাধনা করুন না কেন, ফল একই দাঁড়ায় ও অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।

বিপদের চির অবসান

সকাম সাধনা দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না, কারণ মতি তখন ভোগরত থাকে এবং সকাম সাধকের অন্তরে কোন না কোন প্রকার সাংসারিক সুখের কামনা প্রবল ভাবে থাকে। যে গুণত্রয় বিপদের মূল,তখন তাহারা আমাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া আধিপত্য করে। সুতরাং সকাম সাধক যখন 'সিদ্ধি', অর্থাৎ কোন বিপদ হইতে মুক্তি বা অপর কোন কাম্যবস্তু, লাভ করেন, তখন যে বিপদের নিবৃত্তি হয় তাহা ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র। যে অবিদ্যা বিপদের আকর তাহার প্রভুত্ব বজায় থাকাতে গুণত্রয় স্বধর্ম্মবশে কার্য্য করিতে করিতে আবার নূতন বিপদের সৃষ্টি করে।

নিষ্কাম সাধনা দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে গুণত্রয়েরও নিবৃত্তি হয়। তখন তিনগুণের বদলে কেবল এক গুণই অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই অবশিষ্ট থাকে। মাথা না থাকিলে ত আর শিরঃপীড়া হইতে পারে না। অতএব যখন কাহারও অন্তরে দ্বন্দ্বের উপাদান, অর্থাৎ পরস্পরের সহিত বিরোধী গুণ, না থাকে তখন দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব নিষ্কাম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, সকল বিপদের চির অবসান হয়।

কথার-মার পেঁচে আসল বস্তু হারাণ

পূর্ব্বে ৩৯৮-৯৯ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, যাহাকে আমরা 'নিস্কাম' সাধনা বলি, তাহাতেও হয় জ্ঞান নতুবা ভক্তি অথবা বৈরাগ্য লাভ করাই অভীষ্ট ভাবে থাকে। অভীষ্ট ব্যতীত কোন রকম 'সাধনাই হইতে পারে না। স্বয়ং ব্রহ্ম যে সৃষ্টিলীলা নামক 'সাধনা' করিতেছেন, তাহাতেও 'বহু স্যাম' (অর্থাৎ নিজের তুল্য বহু মূর্ত্তির প্রকটন করিব) এই অভীষ্ট থাকে। ব্রহ্মের কার্য্য উপলক্ষে 'সাধনা' পদটীর ব্যবহার দেখিয়া পাঠক লেখকের প্রতি বিরক্ত হইবেন না। 'সাধি' ধাতুর অর্থ নিস্পাদন করা, কোন ইষ্ট বস্তু লাভের জন্য যে কার্য্য করা যায় তাহাই 'সাধনা' পদবাচ্য।

সকাম সাধনা নিষ্কামের সোপান হয়। কিন্তু 'সকাম' ও 'নিষ্কাম' এই দুই প্রকার সাধনার মধ্যে কোনটী ভাল, কোনটী প্রকৃত সকাম, কোনটী বা নিষ্কাম এবং তাহাদের ভেদ ও অঙ্গ প্রভৃতি উপলক্ষে আমরা এত চুলচেরা তর্ক এবং কথার কাটাকাটি করি যে,প্রকৃত সাধনা তখন 'চুলোয় যায়' এবং এই সকল বিষয়ে বিতণ্ডাই তখন মুখ্য বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। উপলক্ষে তর্কশক্তির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভের কামনা অবিদ্যার সৃষ্টি। এই সময়েও অবিদ্যা আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যাহা প্রকৃত সাধনা তাহা এই বিতণ্ডাস্রোতে ডুবিয়া যায়। 'অসৎ তর্কৈঃ তিরোধীয়তে বিপ্লুতঃ।

ঊনবিংশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)।

শ্রদ্ধার অভাব এবং ঐ দোষ দূর করার উপায়

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে।

লেখকের ধারণা এই যে, লোকের চিত্তে শ্রদ্ধার অভাব থাকে বলিয়াই তাহারা সাধনা করিতে চায় না। 'শ্রদ্ধা' কাহাকে বলে? শ্রদ্ধা বস্তুটীর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয়, এবং তদ্দ্বারা পুঁথি বেড়ে যায়; অতএব সংক্ষেপে ইহাই বলি যে, বিশ্বাস বস্তুটী শ্রদ্ধার একটী মুখ্য উপাদান।

Faith.

বিপদ্ হইতে মুক্তি, কিম্বা অপর কোন কাম্য বস্তু লাভের জন্য যখন আমরা সকাম ভাবে ভগবানের বা কোন দেবদেবীর আরাধনা অর্থাৎ সাধনা করি, তখন যদি আমাদের অন্তরে বিশ্বাস থাকে যে, আমরা যাঁহারা আরাধনা করিতেছি তাঁহার এমন শক্তি আছে আছে যে, সেই শক্তিবলে তিনি আমাদের অভীষ্ট পুরণ করিতে পারেন, তাহলেই আমরা আগ্রহের সহিত আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করি।

আমাদের মনে কোন কামনা না থাকিলেও, ব্রহ্মসংস্পর্শে আসার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়নাদি আকারে যখন আমরা নিষ্কাম সাধনা করি, তখনও, শাস্ত্র বাক্য যে সত্য, এই বিশ্বাসটী আমাদের অন্তরে থাকা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ, যে অনন্ত শক্তি এবং অপর অপর বিভূতি ভগবানে আছে বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে, ঐ সকল বস্তু সত্য সত্যই যে ভগবানে আছে, এই বিশ্বাসটী পাঠকের অন্তরে থাকা চাই। ঐ বিশ্বাস না থাকিলে শাস্ত্র অধ্যয়ন কার্য্য উপন্যাস পড়ার তুল্য অলীক বস্তুর আলোচনা হইয়া পড়ে।

ভগবান বলিয়া অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় যে একজন আছেন, সকাম বা নিষ্কাম এই উভয়বিধ সাধনার সময়ই এই বিশ্বাসও থাকা আবশ্যক; সাধকের চিত্তে আপন মধুর রূপের প্রকটন করার সামর্থ্য যে ভগবানের আছে; যোগ সাধনার সময় সাধনকারীর চিত্তে এই বিশ্বাস থাকাও আবশ্যক হয়।

নাম-জপ উপলক্ষ্যে বলি যে, জপের নামধারী দেব-দেবী যে সত্য সত্যই আছেন, এই বিশ্বাসটী জপকারীর অন্তরে থাকা আবশ্যক।

মোট কথা এই যে, (ক) সাধক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমান এবং অধিকতর ঐশ্বর্য্যময় যে অপর একজন আছেন, (খ) এবং তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন, (গ) এবং তিনি আমাদের শ্রেয়ঃ-সাধন করিতে সমর্থ, এই বিষয় তিনটীতে বিশ্বাস থাকা সর্ব্ববিধ সাধনা উপলক্ষেই প্রয়োজন হয়। এই বিশ্বাসই শ্রদ্ধার সার বস্তু। যাঁহাদের এই বিশ্বাস নাই, তাঁহারা সকাম বা নিষ্কাম, যে ভাবেই সাধনা করুণ না কেন, ঐ সাধনা অন্তঃসারশূন্য প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র। আপন আপন সাধনায় এই প্রকার অবনতি হইয়াছে কি না, তাহা সকল সাধকেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রদ্ধার মাত্রা কেন অল্প হয়

সংসারে লোকের মনে শ্রদ্ধা যে আদৌ নাই, তাহা বলি না;

ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা অনেকের অন্তরেই আছে; কিন্তু জনসাধারণের অন্তরে যে প্রকার শ্রদ্ধা আছে, তাহা যে সুদৃঢ় নয়, এবং তাহার সঙ্গে যে কতকটা ঝোঁকের সংযোগও থাকে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি?

লেখক দুইটী কারণ অনুমান করেন। (ক) অবিদ্যা দ্বারা লোকের বিবেক শক্তি খর্ব্ব হওয়াতেই শ্রদ্ধা শিথিল হয়। এবং (খ) অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহঙ্কার' হইতে লোকের মনে যে আত্মগর্ব্ব জন্মায়, তাহা দ্বারাও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হয়। কথাটীকে একটু বিশদ করা যাক্।

আমা অপেক্ষা বড় অপর একজন আছেন, এই কথা স্বীকার করার সময়ে লোকের আত্মগর্ব্বে আঘাত পড়ে, তাই লোকে স্বভাবতঃই অপরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। গোড়ায় গোড়ায় লোকের আচরণে, কেবল অপর মানবের শ্রেষ্ঠত্ব উপলক্ষ্যেই, ঐরূপ অসহিষ্ণুতা দেখা যায়, তখন তাঁহাদের ভগবানকে বড় বলিয়া মানেন।

ক্রমে অবিদ্যার প্রভাবে চিত্তের যত অবনতি হয়, সেই সঙ্গে অপরের উৎকর্ষের প্রতি অসহিষ্ণুভাবের বল এবং কার্য্যক্ষেত্র উভয়ই বাড়ে। গীতার ভাষায় বলি যে, মানব তখন ভাবে যে, 'ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী'। অর্থাৎ, আমিই সর্ব্বনিয়ন্তা, আমার মত সৌখীন অপর কে আছে, আমার জন্ম সার্থক, কাহার সাধ্য আমাকে বাধা দেয়। আমার তুল্য সুখীই বা অপর কে আছে। তখন ভগবান বিলুপ্ত হন।

লোকের চিত্তে পুনঃ পুনঃ এই ভাবের সঞ্চার হইতে হইতে, বহু সংস্কার উৎপন্ন হয়; ঐ সংস্কার সকল অশ্রদ্ধার মূলের তুল্য। 'লিঙ্গদেহ' নামে আখ্যাত হইয়া ঐ সংস্কার সকল জীবের সঙ্গে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে, অনুসরণ করে। তাহাদের প্রভাবে বুদ্ধি এত বিকৃত হয় যে, যখন সর্ব্বপ্রথমে আমরা সংসারে জন্মগ্রহণ করি তখন ভগবানের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল, সেই শ্রদ্ধার বিনষ্টপ্রায় হইয়া পড়ে।

মাঝে মধ্যে লিঙ্গদেহস্থিত কোন সাত্ত্বিক সংস্কার প্রবল হওয়াতে

শ্রদ্ধা একটু বাড়ে, তার পর তামসিক সংস্কার প্রবল হইয়া আবার সেই শ্রদ্ধাকে খর্ব্ব করে। জোয়ার এবং ভাঁটার সময় নদীর জলের ন্যায় তামসিক সংস্কারের বলের হ্রাসবৃদ্ধির অনুসারে শ্রদ্ধারও ন্যূনাধিক্য হয়।

সাধনায় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নাই বলিয়া মানবকে দোষ দেওয়া বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। যে 'অবিদ্যা' নামক রোগটী হইতে জীব সংসারে নানা যাতনা পাইতেছে, শ্রদ্ধার স্বল্পতা ঐ রোগেরই একটী উপসর্গ মাত্র।

যদি বল যে,এতকাল অবিদ্যার দাসত্ব করিয়াও মানবের মন সম্পূর্ণ-রূপে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে নাই কেন ? উত্তরে বলি যে, অবিদ্যা প্রবল হইয়া 'সত্ত্ব'-গুণকে যতই আচ্ছাদন করুক না কেন, তখন লোকের অন্তরে ধিকি ধিকি ভাবে ঐ গুণের প্রভা বজায় থাকে। সত্ত্বগুণের প্রকাশ শক্তি হইতে শ্রদ্ধা জন্মায়। অতএব সৃষ্টির অধস্তম স্তরে পতিত অবস্থায়ও, জীবের অন্তরে শ্রদ্ধার বীজ সুপ্তভাবে থাকে। প্রকাশ শক্তি কতকটা পুষ্ট হওয়াতে জীব যখন নিম্নযোনি হইতে নরযোনিতে উন্নত হয়, তখন শ্রদ্ধাও কতকটা প্রবোধিত হয়। স্বয়ং ব্রহ্ম যেরূপ অবিনাশী, সত্ত্বগুণের অমৃতময় ফল শ্রদ্ধা নামক বস্তুটীও তেমনি অবিনাশী। অবিদ্যা ইহাকে আচ্ছাদন করে মাত্র, কিন্তু বিনষ্ট করিতে পারে না। যদি কোন কারণে অতি অল্প কালের জন্যও আবরক শক্তির হ্রাস হয়, তখন অধঃপতিত মানবের আচরণে শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিষ্কাম সাধনায় শ্রদ্ধার স্বল্পতা

নিষ্কাম ভাবে সাধনা করার সময়ে যাঁহাদের অন্তরে ঐ কার্য্যের প্রতি অতি অল্প পরিমাণ শ্রদ্ধাও থাকে,তাঁহাদের নিষ্কাম সাধনা হইতে শুভফল লব্ধ হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকার লোকের সংখ্যাও বেশী নয়। তাই দেখা যায় যে, অনেকে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি আকারে সাধনার অনুষ্ঠান সকল যথানিয়মে সম্পাদন করিলেও, শুভফল লাভে

বিলম্ব হয়। শ্রদ্ধার অভাবই ঐ বিলম্বের কারণ। সকাম সাধনার সময় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দীপনা থাকে; ইহা শ্রদ্ধা সঞ্চারের অনুকূল; নিস্কাম সাধনায় ঐ উদ্দীপনা থাকে না, তাইতেই নিস্কাম সাধনায় শ্রদ্ধা সঞ্চার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

সকাম শ্রদ্ধার নিস্কামে পরিণতি

বিপদ যে আমাদের কত হিতকর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিপদের তাড়না হইতে মুক্তি অথবা অপর কোন অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য সকাম সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তারপর অনেক সাধকের মনে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, রুচি, রতি ও ভক্তির সঞ্চার হয়। 'কারে' পড়িয়া অনেকে ভগবানের আশ্রয় লয়। ঐ অবস্থায় যাঁহাদের চিত্ত সুদৃঢ়ভাবে ভগবানে নিবদ্ধ হয়, সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে 'বৃত্তিসারূপ্য' নামক নিয়মটীর কার্য্য চলে। তখন ভগবান (অথবা ধ্যেয় দেব-দেবী) হইতে প্রকাশ শক্তি নিঃসৃত হইয়া সাধকের অন্তরে প্রবেশ করে, এবং ঐ শক্তিই শ্রদ্ধা সঞ্চারের অনুকূল হয়; (২৯৩ পৃষ্ঠা)।

অবিদ্যার প্রতাপ এতই বেশী যে, একটী লোক ১৩ হইতে ৪৩ এই তিরিশ বছর বয়স্কাল বিপদভোগ করিয়াছিলেন তথাপিও তাঁহার অহঙ্কার অক্ষুণ্ণ ছিল, তার পর যখন তিনি অকূল পাথারে পড়িলেন; তখনও সকাম বা নিস্কাম কোন রকম সাধনা করিতেই তাঁহার মতি হয় নাই। বরঞ্চ তিনি আত্মগর্ব্বের মোহে উন্মাদদের তুল্য হইয়াছিলেন; ঐ উন্মাদকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া, ভগবান যখন তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় 'ইজ্জতের' উপর আঘাত দিতে উদ্যত হইলেন, তখন সাধনা করিতে তাঁহার মতি হইল। এই দুর্ভাগার (?) অন্তরে অপর অপর সাত্ত্বিক ভাবের যে নিতান্ত স্বল্পতা ছিল, তাহা নয়। অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহঙ্কার'ই সকাম সাধনা করিতে দেয় নাই, এবং নিস্কাম সাধনাকেও আমল দেয় নাই (২১৭-১৯ পৃষ্ঠা)

সকাম সাধনা হইতে যে শ্রদ্ধা জন্মায় তাহা বিশুদ্ধ না হইলেও,

অর্থাৎ তাহার সহিত কামনার সংস্পর্শ থাকিলেও, উহার মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের আকর্ষণী শক্তি থাকে, সেই শক্তি দ্বারা শ্রদ্ধা হইতে রুচি, রতি এবং ভক্তি উৎপন্ন হয়। সকাম ভাবের হইলেও ভগবদ্ভক্তিতে প্রবল আকর্ষণী শক্তি থাকে, ঐ শক্তি সাধকের মতিকে ভগবানের দিকে টানে। ঐ আকর্ষণ প্রভাবে ভগবানের সংস্পর্শে আসিয়া সাধক যত ভগবানের মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভ করেন, তাঁহার অন্তরে 'কামনার', অর্থাৎ ভোগবাসনার, বলও তত কমিতে থাকে ; অর্থাৎ তখন ভোগের বস্তু অপেক্ষা ভগবানকে বেশী বেশী পরিমাণে ভাল লাগে।

সকাম ভক্তির self-purifying শক্তি

'সকাম' ভক্তি নিজেই আপনার ভিতর থেকে 'কাম' ভাবটীকে দূর করে। এই অদ্ভুত কার্য্যের প্রণালী এই যে, ভক্তি এবং জ্ঞান পরস্পরের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ ; অতএব যখন রাজসিক, অর্থাৎ সকাম, ভক্তিরও সঞ্চার হয়, তখন অলক্ষিত ভাবে জ্ঞানের সঞ্চারও হইতে থাকে ; এবং সেই জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হইতে থাকে। অবিদ্যা হইতেই কামনার সৃষ্টি এবং সংরক্ষণ হয়, অতএব অবিদ্যার হ্রাসের সঙ্গে কামনারও ক্ষয় হইয়া 'বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে থাকে। তাই শাস্ত্র বলেন যে, ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই তিনটী বস্তুর যে কোন একটী সঞ্চার হইলে অপর দুইটী আপনিই সেই সঙ্গে জন্মায়।

সকাম সাধনা নিস্কামে পরিণত হয়

অতএব মোট ফল দাঁড়ায় এই যে, সকাম সাধনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে হইতে ক্রমশঃ ভোগবাসনা খুবই কম হয়, এবং, ভগবানের স্বরূপভূত মাধুর্য্যের লোভেই, সাধকের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন আর পূর্ব্বের মত সাধনার জন্য ভোগবাসনার প্রেরণাশক্তির প্রয়োজন হয় না, সাধনা কার্য্য হইতে সুখ পায় বলিয়াই লোকে সাধনা করে। যিনি পূর্ব্বে ছিলেন সকাম সাধক তিনিই এখন নিস্কাম ভাবে সাধনা করেন। ত্রিবিধ সাধনমার্গের যে পন্থা যাঁহার পক্ষে রুচিকর হয়, তিনি সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন।

(ক) যাঁহার অন্তরে জ্ঞান পিপাসা প্রবল হয়, তিনি জ্ঞান-পন্থা অবলম্বন করিয়া, উপনিষদ দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা দ্বারা, বিশুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মের সঙ্গসুখ লাভের জন্য যত্ন করেন। এই সকল সাধকের নিকট তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় শাস্ত্র সাতিশয় প্রীতিকর হয়।

(খ) যাঁহার অন্তরে ভগবানের কথা শ্রবন কীর্ত্তন ও তাঁহার গুণ-গান করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়, তিনি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন। তাঁহার নিকট ভগবানের আরাধনা, তাঁহার লীলা শ্রবণ ও অনুকীর্ত্তন এবং দাস্য সখ্য প্রভৃতি রসের আস্বাদ গ্রহণ অত্যন্ত প্রীতিকর হয়। এই শ্রেণীর সাধকদিগের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র উপাদেয় বস্তু ভাবে আদৃত হয়।

(গ) কাহার কাহারও অন্তরে ধ্যান ধারণাদি দ্বারা ভগবানের মাধুর্য্য রসের আস্বাদ গ্রহণ করার বাসনা প্রবল হয়, তিনি যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন।

নিষ্কাম সাধনায় সময় নষ্ট

আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই গোড়া থেকে নিষ্কাম ভাবে সাধনা করার সামর্থ্য থাকে। ঐ অনধিকারী অবস্থায় নিষ্কাম সাধনার চেষ্টা দ্বারা কোন শুভফল লব্ধ হয় না, কেবল সময়ই নষ্ট হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে লোকটীর দুর্দ্দশার চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে, তিনি যদি 'গোড়া থেকে 'সকাম' সাধনা করিতেন, তাহলে শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি প্রভৃতি উৎপাদন করার জন্য তাঁহাকে ১৩ হইতে ৫৩ এই ৪০ বৎসর যাবৎ [এবং তাহার পরেও আবার ৭ বছর] 'হাড়ির হালে' থাকার কষ্ট ভোগের প্রয়োজন হইত না।

যাঁহাদের অন্তরে রাজসিক 'অহঙ্কার' সাতিশয় প্রবল ভাবে থাকে, তাঁহারা স্বভাবতঃই সকাম সাধনা করিতে অক্ষম, অন্ততঃ ইহাই লেখকের অনুমান। আমি 'আত্মশক্তি প্রভাবে কাম্যবস্তু লাভ করিতে

পারিব না। সেজন্য আমার মত কর্ম্মঠ লোকও ভগবানের সাহায্য চাহিবে!—এই প্রকার চিন্তাই তাঁহাদের নিকট অপ্রীতিকর হয়। কারণ, উহা তাঁহাদের আত্মগর্ব্বে আঘাত করে। তাঁহারা সকাম আরাধনার কতক অনুষ্ঠান করিলেও ঐ কার্য্যে আন্তরিক আগ্রহ থাকে না।

ঐ 'অহঙ্কার' নামক 'বুনো ওলের' জন্য ভীষণমূর্ত্তি বিপদ নামক 'তেঁতুলের' প্রয়োজন হওয়াতে ব্যবস্থাও হইয়াছে।

যদি বল যে,আমাদের যে মোটেই শ্রদ্ধা নাই অতএব সকাম সাধনা করিব কিরূপে ? উত্তরে বলি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮৯-৯০ পৃষ্ঠায়, এবং এই পুস্তকের নানা স্থানে দেখাইয়াছি যে, গুণত্রয়ের কার্য্য প্রভাবে বিপদের সৃষ্টি দ্বারা 'শ্রদ্ধা' উৎপাদনের ব্যবস্থা সংসারে আছে। এই ব্যবস্থাটী কি অদ্ভুত তাহা দেখাইবার জন্য একখানি বাস্তব জীবনের চিত্র এই পুস্তকের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অঙ্কিত হইয়াছে।

বিপদের তাড়না হইতে মুক্তিলাভের জন্য, লোকে যদি সকাম ভাবেও সাধনা আরম্ভ করেন, তাহা হইতেও ক্রমশঃ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। তার পর রতি রুচি ও ভক্তি জন্মায় ; এবং সকাম সাধনা হইতেই নিষ্কাম সাধনায় 'অধিকার' অর্থাৎ উপযোগিতা জন্মায়।

ঊনবিংশ অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)।

সাধনার বিবিধ উপায়

ভূমিকা

সকাম এবং নিষ্কাম সাধনার জন্য যে বিবিধ উপায় সকলের ব্যবস্থা আছে তাহাই এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। কতক অনুষ্ঠান সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ সাধনারই উপযোগী, অতএব এই একই অধ্যায়ে সর্ব্ববিধ উপায়ের আলোচনা করা হইল। ঋষিগণ এমন দূরদর্শী ভাবে উপায় গুলির ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, সচরাচর সকাম

সাধনা উপলক্ষে যে সকল অনুষ্ঠানাদি করা যায়, সেইগুলিই নিষ্কাম সাধনার সময়েও প্রকৃষ্ট ফলপ্রদান করে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

যদিও অনেকে সকাম ভাবেই এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তখনও ঐ সকল কার্য্যের মূলে একটী সারতত্ত্ব অবস্থান করে। সেই তত্ত্বটী এই যে, অনন্ত শক্তিমান অপর একজন আছেন, যিনি ঐ সকল অনুষ্ঠানের এবং আমাদের অপর সকল কার্য্যের শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। এই তত্ত্বটী অহংকর্ত্তৃ ভাবের এবং 'অহঙ্কারের' নিবর্ত্তক। অর্থাৎ সকাম সাধনা অবিদ্যার নিবর্ত্তনের অনুকূল হয়।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করার সময়ে লোকে যদি আপন মুখ হইতে উচ্চারিত মন্ত্রগুলির মর্ম্ম কতক পরিমাণেও আপন অন্তরে প্রবেশ করাইতে পারেন, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রে নিহিত শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার নিবর্ত্তন হইতে বেশী দেরী হয় না।

কিন্তু আমরা এমনই মন্দভাগ্য যে,ঐ সকল অনুষ্ঠান করার সময়ে, ঐ কার্য্যে প্রায়ই আমাদের আন্তরিকতা থাকে না। তখন আমাদের অনেকের লক্ষ্যই, আরাধ্য দেবতাকে ছাড়িয়া, কোন না কোন কাম্য-বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে। অনেকে দায়ে পড়িয়া ঔষধ সেবনের মত, ঐ সকল অনুষ্ঠান করেন। মন্ত্রের অর্থ কি, আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি না। 'তদ্‌ভাবভাবিতঃ' না হইয়া পুরোহিত মহাশয়গণের অনেকেও কলের পুতুলের মত, মন্ত্র পাঠ করান। মোটের উপর অনুষ্ঠানগুলি যেন একটা বিরাট farceএ পরিণত হয়।

আপাততঃ সকাম হইলেও এই সকল অনুষ্ঠানকেই আমরা নিষ্কাম সাধনার উপযোগী করিতে পারিতাম ; কিন্তু আমরা আপন দোষে কাঞ্চনকে কেবল কাচ অপেক্ষা নয়, অঙ্গারের অপেক্ষাও হীন বস্তু করিয়াছি। যে ভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারাই বিপদ হইতে ক্ষণিক মুক্তি ত হইতেই পারে,

চিরমুক্তির দ্বারও উন্মুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃষ্ট ভাবে আমরা ঐ সকল অনুষ্ঠান করি না।

সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম

আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকল যেমন অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যও সেইরূপ 'মেকি' ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হায়! হায়! শিক্ষিত হিন্দুগণ এই অনুষ্ঠান সকলে ব্যবহৃত মন্ত্রের গূঢ় ভাব গ্রহণ করার পরে, যদি সেই গূঢ় তত্ত্ব গুলিকে প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা করার অভ্যাস করিতেন, তাহলে কি আর এখনকার মত নারকীয় আবর্জ্জনা আমাদের অন্তরে থাকিত! হিন্দু সম্প্রদায়ের আধুনিক দৈন্য এবং দুর্দ্দশাও কি তাহলে থাকিত! তখন ভগবানে 'ন্যস্তধীঃ' হওয়াতে সকল দুর্দ্দশারই অবসান হইত।

গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে 'হাড়-হাবাতে' বলে, ভণ্ডতা এবং মিথ্যাচারের প্রভাবে আমাদের সেই দশা হইয়াছে। যিশুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইহুদিগণের দশা অনেকটা আমাদের মতই হইয়াছিল। কেবল ঠাটই বজায় ছিল, তাহাতে সার ছিল না।

প্রণব ও গায়ত্রী ধ্যান

এই দুইটী বস্তুর মাহাত্ম্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে, (৩৩৮ হইতে ৩৫০ পৃষ্ঠায়) আলোচিত হইয়াছে; অতএব ঐ বিষয়ের পুনরুক্তি করা হইল না।

যোগ-সাধনা

যাঁহারা যোগমার্গের অনুসরণ করিয়া 'পরমাত্মার' মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেহ গুণত্রয় দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেইজন্য দৈহিক বৃত্তি সকল চিত্তকে অন্তর্ম্মুখী হইতে দেয় না, বিষয়ের দিকেই টানে। অতএব যোগসাধনায় যে আটটী অঙ্গের (অর্থাৎ অনুষ্ঠানের) ব্যবস্থা আছে, তাহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটী (অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং

প্রত্যাহার) 'অঙ্গের' অভিপ্রায় হইল, দেহ এবং চিত্তকে সংযত করা। সংযমের অবস্থায় 'ধ্যান', 'ধারণা' এবং 'সমাধি' নামক অনুষ্ঠানত্রয় দ্বারা যোগী পরমাত্মার মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভ করেন। ধ্যান এবং ধারণা দ্বারা যদি চিত্তে প্রগাঢ় একাগ্রতা জন্মায়, কেবল তখনই যোগী 'ব্রহ্মানন্দ' উপভোগে 'অধিকারী' হন, নতুবা হন না।

অতএব দেখা গেল যে, কোনপ্রকার সাধনা দ্বারাই বিনা আয়াসে সুখলাভ সম্ভবপর হয় না—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেও হয় না, কিম্বা যোগ-সাধনাতেও হয় না। আমরা দেহের 'তকলিফ্' না করিয়া পরমার্থভূত সুখ চাই, কিন্তু সুখের বদলে পাই কেবল অশেষ দুঃখ।

কেহ হয়ত বলিবেন যে, পরমাত্মা ত অরূপ, তিনি আবার রূপ প্রকাশ করিবেন কিরূপে? উত্তরে বলি যে, পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে অরূপ হইলেও, তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার। তিনি নিজে 'রূপ' বর্জ্জিত হইলেও, তাঁহার যে অদ্ভুত শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা তিনি যে কোন রকম সৌন্দর্যকে প্রকটন করিতে পারেন। যে বিশ্ব বহুরূপের আধার তাহা, ঐ শক্তি প্রভাবে, সেই 'অরূপ' হইতেই প্রকটিত হইয়াছে।

যে রূপ দর্শন করিলে সাধকের তৃপ্তি হইবে, পরমাত্মা সেই রূপ ধারণ করিয়া আপন মূর্ত্তিকে যোগীর হৃৎপদ্মে প্রকটিত করেন, 'যোগেশ্বরাস্থাপিত পাদপল্লবং'। সমাধির অবস্থায় উপনীত যোগী তখন আপন চিত্তকে 'আনন্দ-সংপ্লবে লীন' করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দে আত্মহারা হন।

অদীন লীলাহসিতেক্ষণোল্লসৎ ভ্রূভঙ্গসংসূচিতভূর্য্যনুগ্রহম্
ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরং যাবন্মনোধারণয়াবতিষ্ঠতে

নাম-জপ

গোড়ায় গোড়ায় নাম-জপ কার্য্য অনেকের পক্ষেই, যেন কলের পুতুলের কার্য্যের ন্যায়, কেবল একরকম mechanical ব্যাপারের

তুল্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ জপে শ্রদ্ধাও থাকে না বা আগ্রহও থাকে না। কিন্তু প্রতিদিন একাসনে বহু সংখ্যক নাম জপ করিতে করিতে, ক্রমশঃ সাধকের চিত্ত নামের সহিত একাগ্রতা ভাব প্রাপ্ত হয়। নাম এবং নামীয়ের মধ্যে ভেদ নাই। নামীয়ের সহিত চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে, নামের (অর্থাৎ নামধারীর) যে আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া জপকারীর চিত্তকে নিজের সহিত আবদ্ধ করে। তিনি আনন্দময়, অতএব জপ করিতে আনন্দ হয়, তাই তখন লোকে আগ্রহের সহিত নাম-জপ করেন। জপে একাগ্রতাও বেশী হয়। গোড়ায় নীরস হইলেও পরে এই সাধনাই আনন্দের আকর হয়, এবং ইহা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধও হয়।

নাম এবং নামীয়ের মধ্যে ভেদ নাই; সুতরাং 'নামের' সঙ্গে কাহারও 'তদাত্ম-ভাব' হইলে (অর্থাৎ সাধক যখন নাম জপ করিতে করিতে নামে এতই বিভোর হন যে নিজেকেও ভুলে যান, ঐ অবস্থা হইলে) 'নামীয়ের' অর্থাৎ ঐ নামধারী দেব-দেবীর, সহিতও তদাত্মভাব জন্মায়। এই তদাত্মভাব দ্বারা নামীয়ের শক্তি (অর্থাৎ ভগবৎশক্তি) সাধকের চিত্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবিদ্যার নিবৃত্তি করে। নামের মাহাত্ম্য কত বিরাট, তাহা অজামিল উপাখ্যানে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্তিম কালে নাম শ্রবণ করিতে করিতে যিনি ঐ নামে বিভোর হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন, নামই সেই মানবকে উচ্চ লোকে লইয়া যান। নামের মহিমা জ্ঞাপক একটী শ্লোক ভাগবত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবধ্যবত্যপি
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ

এই সাধনায় বিদ্যার দরকার হয় না, ধনের অথবা কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না, কেবল একটীমাত্র বস্তুর প্রয়োজন হয়।

সেই বস্তুটীর নাম 'আগ্রহ'। লোকের ইচ্ছা থাকিলেই এই সাধনা করিতে পারেন। ইহার ফল অপর কোন কোন সাধনার ফল অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। যে ভগবান—ধনী ও নির্ধন এবং পণ্ডিত ও মুর্খ—সকলের পক্ষেই এই মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নামের মহিমা বর্ণনা করার সাধ্য এই অধম লেখকের নাই। গীতা বলেন যে, নাম-জপ কার্য্যটী নিজেই স্বয়ং শ্রীভগবানের মূর্ত্তির তুল্য।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি

শাস্ত্র অধ্যয়ন, এবং শ্রবণ কীর্ত্তন

পূর্ব্বে ২৭০ হইতে ২৭৬ পৃষ্ঠায় শাস্ত্র অধ্যয়নের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে অতএব পুনরায় আলোচনা অনাবশ্যক। অধ্যয়ন উপলক্ষে যাহা বলা হইয়াছে সেই কথাগুলি যথাসম্ভব শ্রবণ কীর্ত্তন উপলক্ষেও খাটে। পাঠক কিম্বা শ্রোতা বা কীর্ত্তনকারীর চিত্ত যে পরিমাণে শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত একাগ্রতা লাভ করে, পূর্ব্বে আলোচিত পাতঞ্জল সূত্রের 'বৃত্তিসারূপ্য' নিয়মের কার্য্য প্রভাবে শ্রোতা প্রভৃতির চিত্তে, অধীত বা শ্রুত বিষয়ের শক্তি সেই পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হয়। অধীত শাস্ত্র যদি সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত হয়, তাহলে তাহা দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টি এবং অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অবিদ্যার প্রভাবে কতক কলুষদোষ দূষিত রচনাও, কোন কোন সমাজে, 'শাস্ত্র' নামে চলে। ঐরূপ শাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ণ করিলে চিত্তের অবনতিই হয়। তাই বলি যে, শাস্ত্র নির্ব্বাচনেও সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

Meditation অর্থাৎ 'অনুচিন্তন' ও 'অনুকীর্ত্তন'

'অনু' পদ দ্বারা পৌনপুন্য বুঝায়। এবং কোন বিষয়ের মধ্যে যে সার কথা থাকে, 'অনু' পদ দ্বারা, তাহাই চিন্তা বা কীর্ত্তন করা বুঝায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কি ভাবে আমরা তত্ত্ববিষয় গুলির 'অনুচিন্তন' করিব?

উত্তরে বলি যে, শ্রীভগবান গুণত্রয়ের দ্বারা কি ভাবে সৃষ্টিলীলা

সম্পাদন করিতেছেন, আমাদের চারিদিকে কি ভাবে গুণত্রয়ের কার্য্য চলিতেছে, আমাদের চিত্তের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, এই সকল সার তত্ত্বকথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া, 'অনুকীর্ত্তন' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অপরের সহিত আলোচনা করিলে, মন ও বুদ্ধি ক্রমশঃ 'বিষয়' ছাড়িয়া ঐ সকল তত্ত্ববিষয়ে নিবদ্ধ হইতে থাকে।

তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভা দ্বারা তত্ত্ববিষয়ক রহস্য বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়, এবং অবিদ্যার বলও সেই সঙ্গে কমিতে থাকে। যাঁহারা প্রগাঢ় ভাবে এই বিষয়ের চিন্তা করেন, তাঁহাদের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলেও উপকার হয়।

শাস্ত্রীয় তত্ত্ব এবং শিক্ষা গুলিকে আত্মজীবনে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা না করিয়া, যাঁহারা কেবল শাস্ত্র হইতে কতকগুলি কথা শিখিয়া পাণ্ডিত্যের প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই প্রতিষ্ঠার মুল্য কত, তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। 'অনুচিন্তন' করিতে করিতে, ক্রমশঃ তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের শক্তি আমাদের চিত্তে আধিপত্য লাভ করে। তখন মন এবং বুদ্ধি ঐ বিশুদ্ধ শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। তখন শাস্ত্রের ছাঁচে আপন আপন চরিত্রের গঠন, লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয় না।

সাধনা কিরূপে সফল বা নিস্ফল হয়

সাধনায় আন্তরিকতা থাকিলে তাহা হইতে একাগ্রতা জন্মায়, তখন সাধকের চিত্ত অপর দিকে ধাবিত হয় না, সুতরাং যে মানসিক শক্তি অপর অপর বস্তুতে প্রযুক্ত হইয়া ক্ষয় হইত,তাহার ক্ষয় না হইয়া conservation, অর্থাৎ সঞ্চয় হয়। এইরূপ সঞ্চয় দ্বারা সাধন শক্তি পুষ্ট হওয়াতে, সাধনায় তীব্রতা বাড়িতে থাকে, অতএব সিদ্ধিলাভে সাহায্য হয়। যে সাধনাতে মোটেই আন্তরিকতা থাকে না, তাহা ভস্মে ঘি ঢালার তুল্য নিরর্থক।

সাত্ত্বিক ভাবে সাধনা করার সময়ে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তখন

সাধকের সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সকল তাঁহার অন্তরে স্থিত রাজসিক বা তামসিক সংস্কার সকলের প্রতিকূল হয়, অতএব সাধন কার্য্যের সময় ঐ সকল সংস্কারের সহিত সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির সংঘর্ষণ হয়। তখন যদি অবিদ্যা সাধন প্রবৃত্তিকে অভিভূত করে, তাহলে সাধন কার্য্য বন্ধ হয়।

যখন অবিদ্যা এইরূপ সোজাসুজি উপায়ে সাধনার নিরোধ করিতে না পারে, তখনও যদি উপরোক্ত সংঘর্ষণ সময়ে গুণসাম্যের ব্যতিক্রম হয়, তাহলে ঐ ব্যতিক্রম হইতে কখন ব্যাধি, কখন বা বিত্তনাশ, কিম্বা অপর কোন না কোন বিঘ্ন জন্মায়। গুণত্রয়দ্বারা এইরূপ বিঘ্ন উৎপাদন যে অসম্ভব নয়, তাহা ২৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লেখায় বিঘ্ন

লেখক শ্রীমদ্ভাগবতকে বোধগম্য করার জন্য টীকা প্রণয়নের সময়ে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ কার্য্যটী ছাড়েন নাই। এই 'বিপদ-রহস্য ও বিপদ-মুক্তি' নামক পুস্তকখানি রচনা ও ছাপার সময়ে আরও ঘোরতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে তাহার পরিচয় পরে দেওয়া হইল। তথাপিও লেখক বইখানি লেখা ও মুদ্রিত করার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই।

শুভ কার্য্যে বিঘ্ন হওয়াই স্বাভাবিক

শুভকার্য্য করার সময় সত্ত্বগুণের সহিত তমোগুণের সংঘর্ষণ হওয়াই স্বাভাবিক, সুতরাং বিঘ্ন হওয়ারই কথা। যদি বিঘ্ন না হয়, তাহলে অনুমান করিতে হবে যে, ঐ কার্য্য দ্বারা সত্ত্বগুণের উদ্দীপন হয় নাই তাইতেই বিঘ্ন হইল না। অতএব যখন বিঘ্ন না হয় তখন ধরিয়া লওয়া ভাল হয় যে, কর্ম্মকর্ত্তার অন্তরে যথার্থ সত্ত্বগুণের উদ্দীপন হয় নাই, কেবল কতকগুলি সাত্ত্বিক ঠাট মাত্র আছে।

কোন শুভকার্য্য করার সময় বিঘ্ন হইল না দেখিয়া অনেকে চিত্তপ্রসাদ অনুভব করেন। এই বিষয়ে একটু সতর্ক হওয়া ভাল।

শতবার স্বীকার করি যে,ভগবান আপন যোগমায়া নাম্নী ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে কোন প্রতিকূল গুণের কার্য্য নিরোধ করিয়া, কার্য্য উপলক্ষে

বিঘ্ন নিবারণ করিতে পারেন। তবে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, গুণের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইল প্রতিকূল গুণকে বাধা দেওয়া। আমি এমন কি পুণ্যবান যে,আমার সুবিধার জন্য গুণের ঐ স্বাভাবিক ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়টীও ঐ সময়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

বিঘ্ন হইল না দেখিয়া যদি আমরা ভাবি যে, তবে কি আমার সাধনার কোন ত্রুটী হইয়াছে, অর্থাৎ আমার সাধনায় আন্তরিকতা নাই বলিয়া কি সত্ত্বগুণের উদ্দীপন হয় নাই ? তাইতেই কি বিঘ্ন হইল না ? এইরূপ দীনভাবে চিন্তাও মঙ্গলকর।

'রোজ সই' ভাবের সাধনা

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রণব ও গায়ত্রী ধ্যান, এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি করার সময় অবিদ্যার রাজসিক বা তামসিক সংস্কার সকল আমাদের মতির উপর আত্মপ্রভাব স্থাপন করাতে মতি কিছুতেই ঐ কার্য্যে নিবিষ্ট হইতে চায় না। অলস রাজ মজুর যেমন মালিককে ফাঁকি দিয়া 'রোজ সই' করিতে চায়, সাধকের মনেও সেইরূপ সাধনা নামক 'রোজসই' করার প্রবৃত্তি জন্মায়। এই ভাবের সাধনা দ্বারা কোন ফলই হয় না।

Spiritual Gymnastics

যোগ-মার্গের সাধনা করার সময় অবিদ্যা কখন কখন প্রবল হইয়া মতিকে বিক্ষিপ্ত করে,সেইজন্য ধ্যান ধারণাদির সময় মতি ব্রহ্মের উপর স্থাপিত না হইয়া অপর বস্তুর উপরে নিবদ্ধ হয়। এই ভাবে যোগ-সাধনা 'বুজরুকী' মাত্র। প্রাণায়াম কার্য্য যখন 'ধ্যান' 'ধারণার' সহায় হয়, তখনই তাহাতে মাহাত্ম্য থাকে। প্রাণায়াম করার সময় মতি যদি বহির্ম্মুখী ভাবে থাকে, তাহলে এই কার্য্য এক রকম 'ব্যায়ামের' তুল্য হয়। তখন প্রাণায়ামে কোন মাহাত্ম্যই থাকে না।

Intellectual dissipation

বিপদ যে সর্ব্বত্র থাকে, এই কথাটী প্রকাশ করার জন্য একটী চলিত প্রবাদ আছে যে, 'মাথায় থুই উকুনে খায়, মাটিতে থুই

পিঁপড়েয় খায়।' প্রবাদটী অবিদ্যার পক্ষেও খাটে। কেবল বিষয়-ভোগ উপলক্ষেই যে অবিদ্যার প্রভূত্ব চলে তাহাই নয়, শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময়ও অবিদ্যা ঐ কার্য্যকে পণ্ড করেন।

তখন আত্মাভিমানের মোহের বশে সাধক 'পাণ্ডিত্যের' প্রতিষ্ঠা লাভ করাকেই, আদরের বস্তু বলিয়া মনে করেন। 'জ্ঞানের' কথাটা অধ্যয়নকারীর মুখে থাকে মাত্র। অবিদ্যার মোহের বশে তিনি তখন কথার রাশিকেই 'জ্ঞান' মনে করিয়া, বাগ্‌বাহুল্য লাভের জন্য ব্যস্ত হন। চুলচেরা তর্ক শক্তি লাভই তাঁহার কাছে আদরের বস্তু হয়।

ভগবান বাঞ্ছা কল্পতরু, যিনি বাক্-সম্পদ চান, প্রভু তাঁহাকে তাহাই দেন, যিনি চুলচেরা তর্ক করিতে ভাল বাসেন ভগবানের কৃপায় তিনি 'চরিতামৃতে' সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বভৌম পণ্ডিতের ন্যায় তার্কিক হন। তবে সর্ব্বভৌম পণ্ডিত মহাভাগ্যবান ছিলেন, তাই মহাপ্রভুর দর্শনলাভ করার পরে তাঁহার কৃপায় তিনি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সৌভাগ্য দুর্ল্ভ।

অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিব কিরূপে? উত্তরে বলি যিনি যে, শাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ও এই প্রকার বিঘ্ন হয়, এই কথাটী না ভুলিয়া যদি কেহ তখনও ভগবানের শরণাগত হন, তাহলে ভগবান তাঁহাকে এই সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়া শ্রেয়ঃ লাভের পথ উন্মুক্ত করেন।

'Rejoice, and shout for joy'

কেহ সাধনা করার সময়ে যদি তাঁহার ঘন ঘন বিপদ হইতে থাকে তাহলে উহাতে দুঃখের কারণ কিছুই নাই বরঞ্চ উহা প্রবল উৎসাহ এবং আনন্দের কারণই হওয়া উচিত। মানব অবিদ্যার নেশায় মশগুল হইয়া আছে, তাই ভোগ সুখই চায়। অতএব কথাগুলি পড়িয়া কোন কোন পাঠক হয়ত এই 'বুড়ো বাতুল' লেখকের উপর খড়্গহস্ত হইবেন। রাগ করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে লেখকের নিবেদনটা একটু স্থিরভাবে শুনুন।

Short and simple annals of the poor

গুণত্রয়ের এবং সংস্কারের ক্রিয়া দ্বারা সংসারে কিভাবে বিপদ হয়, তাহার বাস্তব পরিচয় দেওয়ার জন্য, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আত্মজীবনের চিত্রই অঙ্কন করিয়াছি। কেহ হয়ত বলিবেন যে, বাস্তব চিত্র অঙ্কনের কি প্রয়োজন ছিল? উত্তরে বলি যে, তত্ত্বকথা উপলক্ষে academic ভাবে আলোচনা রাশি রাশি আছে। পুস্তক লিখিয়া ঐ আলোচনার স্তূপ বেশী করার কোন প্রয়োজনই দেখা যায় না। ডাক্তারি পড়ার সময় শবচ্ছেদ দ্বারা যেমন anatomy শাস্ত্রের শিক্ষা বিশদ হয়, তেমনি শাস্ত্রের আলোকে বাস্তব ঘটনার আলোচনা করিয়া, গুণত্রয়ের কার্য্যপ্রণালী উপলক্ষে শাস্ত্র যাহা বলেন, সেই কথাগুলি যে সত্য, ইহা সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইলে শাস্ত্রের কথা অন্তরে প্রবেশ করে। এই জন্যই বাস্তব জগতে গুণত্রয়ের কার্য্যের চিত্র-অঙ্কনের প্রয়োজন হইয়াছিল।

অপর কোন লোকের জীবনের ঘটনা আলোচনা না করিয়া নিজ-জীবনের ঘটনাগুলির আলোচনা কেন করিলাম? ঐ প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, দুইটী কারণে নিজের জীবনের ঘটনাগুলিকে পাঠকের সমক্ষে আনিতে হইয়াছে।

প্রথম কারণটী এই যে, বাস্তব ঘটনা (real fact) সকলের বর্ণনায় যেন ভ্রম বা অত্যুক্তি না থাকে, ইহা নিতান্ত দরকার। নিজ-জীবনের ঘটনা সকল লোকের নিকট যত সুবিদিত থাকে, অপরের জীবনের ঘটনা সেরূপ থাকে না। অতএব নিজ-জীবনের ঘটনা বর্ণনায় ভ্রম বা অত্যুক্তির সম্ভাবনা থাকে না, তাই ঐ সকল ঘটনার আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয় কারণটী এই যে, কেবল ঘটনাগুলির বর্ণনা করিলেই হয় না, ঐ সকল ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তত্ত্বের কার্য্য অবধারণ করিতে পারিলে তত্ত্বগুলি সুস্পষ্ট হয়। এই আলোচনা করার সময় জানা আবশ্যক হয় যে, যখন বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন বিপন্ন ব্যক্তির

চিত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল। চিত্তের তদানীন্তন অবস্থা নির্ভুলভাবে না জানিলে, কোন্ গুণ কি ভাবে ছিল, এবং তাহা কিরূপ কার্য্য করিয়া বিপদের সৃষ্টি করিল, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় না।

যদি অপর কাহারও জীবদ্দশায় সংঘটিত বিপদের আলোচনা করিতাম, তাহতে অসুবিধা এই হইত যে, বিপদ উপস্থিত হওয়ার সময় তাঁহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা অবিদিত থাকাতে, (ক) কোন্ গুণের সংস্কার কি ভাবে কার্য্য করিয়াছে, এবং (খ) ঐ সংস্কারের সহিত কোন্ গুণের সংস্কারের সংঘর্ষণ হইয়াছে বলিয়াই বিপদ হইল, এই সকল বিষয় অবধারণ করিতে অক্ষম হইতাম।

এই সকল বিষয় এত জটিল যে, আত্মজীবনের ঘটনা সকলের বিশ্লেষণ করিয়া স্থির মীমাংসা করাই দুঃসাধ্য, অপরের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া কোন মীমাসাই করা যায়:না। বিপদের সময় নিজের চিত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল, লোকে তাহা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারেন না। কেবল একটী শুভযোগ (accident) বশতঃ আমি নিজের বিষয় আলোচনা করিতে পারিয়াছি।

সেই শুভযোগটী এই যে, বিগত ২০ বৎসর যাবৎ যখন যে বিপদে পড়িয়াছি তখনই সেই সকল বিপদের কারণ অবধারণের চেষ্টা করিয়াছি। ঐ সময় আলোচনা করিয়াছি যে,(ক) কি কার্য্য করাতে আমার বিপদ হইল এবং (খ) তখন আমার চিত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল, (গ) আমার আচরণে কোন গুণের আধিপত্য প্রকাশ হইত।

এই সকল বিষয়ের উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ বহু আলোচনা করিয়া নোট রাখিয়াছিলাম। সেই সমসাময়িক লেখাগুলি ছিল বলিয়াই,তাহা দেখিয়া ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নিজের বিপদ সকলের আলোচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। ঐ নোট হইতে তখনকার মনের অবস্থা অবধারণ করিতে পারিয়াছি, কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া এই সুগভীর বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব হইত।

এই পুস্তক রচনা উপলক্ষে বিঘ্ন

এই অধম লেখক দ্বারাও প্রভু যে, এই পুস্তকে গভীর তত্ত্বকথার

এবং গুণের কার্য্যের আলোচনা করাইয়াছেন, তাহা হইতেই দেখিতে পাই যে তাঁহার কৃপা হইলে মুকও বাচাল হয় পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে।

লেখক ভাগবতের যে সংস্করণ বাহির করিতেছেন তাহা ছাপা হওয়ার সময়, ঐ পুস্তকে মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ নামক বিপদের রহস্য কি, এই উপলক্ষে ৭।৮ পৃষ্ঠা লেখা অভিপ্রায় ছিল। লিখিতে লিখিতে বিষয়টীর সম্প্রসারণ হইয়া,ঐ ৮ পৃষ্ঠাই প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা হইয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকের আকার ধারণ করিয়াছে। বইখানি এত বড় হইলেও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। এখনও স্থানাভাবে অনেকগুলি প্রশ্নের আলোচনা করিতে পারিলাম না।

এই পুস্তকের উত্থাপিত প্রশ্ন গুলির মীমাংসা করা যে কত সুকঠিন, এবং তদুপলক্ষে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরে, ঐ সকল সিদ্ধান্তের সাপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি থাকে,সেই যুক্তিগুলিকে যথাযথ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যে কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ উপলক্ষে নানা বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

যুক্তি স্থির করার পরে ভাষা উপলক্ষেও নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। একেই ত বিষয়টী নীরস,তার উপর যুক্তিগুলি যদি শুষ্ক দার্শনিক ভাষায় লেখা যায়, তাহলে হয়ত কেহ বইখানি ছুঁইবেনও না। এখনও কেহ পড়িবেন কি না তাহাও জানি না। অতএব যাহাতে নীরস যুক্তিও কতকটা সরস হয়, সেইরূপ ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি। আমার মত অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষে, ঐ প্রকার প্রাঞ্জল ভাষা আয়ত্ত করা যে অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা বলাই বাহুল্য।

আমার বিদ্যা নাই, অথচ বামন হইয়া চাঁদ ধরার আকাঙ্ক্ষা আছে। অতএব এই বইখানিকে আপন মনের মত করার জন্য কোন কোন অংশের পাণ্ডুলিপি পাঁচ ছয় বার লেখা ও পুনঃ পুনঃ ছেঁড়ার পরে, পুস্তকখানি ছাপাখানায় যাওয়ার উপযোগী হইল।

তখনও বিঘ্নের অবসান হয় নাই। কোন কোন ফর্ম্মা কম্পোজ

হওয়ার পরে, লেখা বদলাইয়াছি, সুতরাং নূতন কম্পোজ করিতে হইয়াছে। প্রুফ পরিবর্ত্তনের অত্যাচার দ্বারাও ছাপাখানাকে উত্যক্ত করিয়াছি। এই ভাবে, পাঁচ ছয় কিস্তিতে একটু একটু করিয়া সংযোগ দ্বারা, ছাপার সময়ে বইখানির এক তৃতীয়াংশ এই পুস্তকে সংযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ, পুস্তকখানির দুইভাগ আদিতে লেখা হইয়াছিল, এবং ছাপার সময় একটু একটু করিয়া অবশিষ্টাংশ পুস্তক যোজিত হইয়াছে। যদি প্রথম প্রুফেই এই নূতন অংশ যোগ করিতে পারিতাম, তাহলে ছাপাখানার উপর অত অত্যাচার হইত না।

কোন্ কোন্ নূতন বিষয়ের সংযোগ করিব, তাহা স্থির করিতে না পারাতে, প্রথম প্রুফেই নূতন বিষয় সংযোগ করা আমার সাধ্যাতীত ছিল। এই জন্য কম্পোজিটারেরা ৮ পেজী ফর্ম্মার ৬ পেজ মাত্র কম্পোজ করিত, এবং ৫।৬ বার নূতন নূতন প্রুফ হাত ফের হওয়ার সময় নানাস্থানে যে নূতন বিষয় বসাইতাম, সেই সংযোগ দ্বারাই পূর্ব্বের ৬ পৃষ্ঠা হইতে ৮ পেজী ফর্ম্মা পুরিয়া যাইত।

কাত্যায়নী প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল সরকার এবং তুলসী চরণ সরকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ধৈর্য্যের সীমা নাই, তাই তাঁহারা আমার এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও এই বইখানি ছাপিয়াছেন। এই কার্য্যে ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের উৎসাহ না পাইলে, হয়ত আমি শ্রান্তি ও নৈরাশ্যবশতঃ ছাপা বন্ধ করিতাম। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন। কৃতজ্ঞতার আবেগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে ভাষা ব্যবহার করিয়া গোপী-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, প্রভূর শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেই ভাষায় শ্রীমান্ রাজেন্দ্র ও তুলসী বাবুকে বলি,

'তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধনা'

সাধুতাই আপনাদের সাধুতার পুরস্কার হউক। আমার নিজের শরীরের উপরও কম বিঘ্ন হয় নাই। চক্ষু দুইটীতে প্রদাহ হওয়াতে ২।৩ বার কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছিল। পাছে অপর এক গরীবের

চক্ষেরও হানি হয়, সেজন্য আমার এবং আমার সহধর্ম্মিনীর খুবই আশঙ্কা ছিল। যে ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রুফে পরিবর্ত্তন এবং নূতন বিষয়ের সংযোগ করিয়াছি, তাহা দেখিয়া নিজেই লজ্জিত হইতাম। কিন্তু কি করিব! আমি যে নিতান্ত অসহায়। ভগবানের কৃপা ব্যতীত তত্ত্ব-বিষয়ক যুক্তি ও ভাষা লব্ধ হয় না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করার পরে প্রভুর কৃপায় লিখিতে পারিয়াছি; নিজের দোষে প্রুফ সংশোধনকারী শ্রীমান রাখহরির উপর বড়ই অত্যাচার হইয়াছে। এত অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি যেভাবে আপন কার্য্য করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারও মঙ্গল কামনা করি।

এই পুস্তকের প্রুফ 'সারা' অর্থাৎ সংশোধন কার্য্যের ভার পড়িয়াছিল ঐ প্রেসের কম্পোজিটর শ্রীমান্ রাখহরি সরকারে উপর। তাঁহারই কথা উপরে বলিলাম, ঐ শরীরের চক্ষু দুইটীর যে কোন অনিষ্ট হয় নাই, ইহাও লেখকের পরম সৌভাগ্য এবং লেখকের প্রতি ভগবানের অশেষ কৃপার পরিচায়ক।

এই বইখানিতে পাঠক অনেকগুলি ছাপার ভূল দেখিতে পাইবেন। ঐ জন্য আমি নিজেই সম্পূর্ণ দোষী। যে বইতে এক তৃতীয়াংশ 'ম্যাটার' একটু একটু করিয়া ৫।৬ বারে প্রুফে সংযুক্ত হয়, সেরূপ বই নির্ভূল ভাবে ছাপা সুসাধ্য নয়—বিশেষতঃ যখন লেখক স্বয়ংই প্রুফ সংশোধন করার ভার গ্রহণ করেন। অপর কাহারও দ্বারা প্রুফ সংশোধন করাইলে হয়ত এত বেশী ছাপার ভূল থাকিত না, কিন্তু অপরে ত আর নূতন বিষয় সংযোগ করিতে পারিত না।

যতক্ষণ 'ফাইনেল' অর্থাৎ শেষ ছাপা না হইয়াছে, ততক্ষণ আমার তৃপ্তি হয় নাই, ততক্ষণই প্রুফে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দ্বারা বইখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছি। গত ২০ বছর চেষ্টা করিয়াও যে তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারি নাই, সেই বিষয়ের আলোচনা লেখকের নিকট বড়ই প্রিয়বস্তু। তাইতেই এইভাবে শোধনের চেষ্টা করিয়াছি। পরের সংস্করণে ছাপার দোষ দূর করিতে চেষ্টা করিব।

যাঁহার লীলাতে এই পুস্তকখানির রচনা, এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও, শেষ করিতে পারিলাম,তাঁহারই কৃপাতে যে, নিজের বা অপর কাহারও স্থায়ী অনিষ্ট না হইয়া, বইখানির ছাপাও সমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে, ইহাই লেখকের পরম সৌভাগ্য।

বিংশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

বিপদ হইতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্তি এবং চির-মুক্তি।

বিপদ হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ হয়।

প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষণ হইতেই বিপদের উৎপত্তি হয় এবং যখন শক্তিদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ চলিতে চলিতে তাহা বন্ধ হয়, তখন বিপদ থাকে না। এই নিবৃত্তির অবস্থাকে আমরা বিপদ-মুক্তির অবস্থা বলি। এই নিবৃত্তি, অর্থাৎ বিপদ মুক্তিকে, দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—

(ক) অর্থাৎ কখন কখন অল্পকালের জন্য বিপদের নিবৃত্তি হওয়ার পরে, আবার প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষণ আরম্ভ হয়। সংঘর্ষণ বন্ধ হওয়ার সময় যে বিপদের নিবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা পুনরায় আরম্ভ হয়।

(খ) কখন বা, শক্তিদ্বয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষণ হওয়াই সৃষ্টির নিয়ম, তাহার নিবৃত্তি স্থায়ীভাবে হয়, তখন বিপদের নিবৃত্তিও স্থায়ীভাবে হয়।

যতকাল চিত্তের উপর অবিদ্যার শক্তি বজায় থাকে, ততকালই গুণত্রয় পরস্পরকে প্রতিরোধ করিতে চায়, কারণ ইহাই গুণত্রয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কেবল যখন 'গুণসাম্য' প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই

বিপদের নিবৃত্তি হয়, এবং গুণসাম্যের ব্যতিক্রম হইলে পুনরায় বিপদ উপস্থিত হয়।

কিরূপে গুণসাম্যের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিপদের নিবৃত্তি এবং ঐ সাম্যের ব্যতিক্রম হইলে পুনরায় নূতন বিপদের উৎপত্তি হয়, তাহা ২৮৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, যতকাল আমাদের চিত্তের সহিত অবিদ্যার সংযোগ থাকে ততকালই বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যখন আমাদের চিত্ত হইতে অবিদ্যার, অর্থাৎ আবরক-বিক্ষেপ শক্তির, সংস্রব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়, তখন যে শক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই তিনগুণ নামে পরিচিত হইয়াছে (২৮-২৯ পৃষ্ঠা), সেই শক্তির প্রভাবও দূর হয়। অতএব তখন আর গুণত্রয় থাকে না, তখন কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই থাকে। বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতিকূল, গুণ থাকিলেই তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন কেবল একটীমাত্র গুণই থাকে, তখন কাহারও চিত্তে আর সংঘর্ষণের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, লোকে বিপদ হইতে চির-মুক্তি লাভ করেন।

বিপদ হইতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্তি।

উপারে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ 'গুণসাম্য' বজায় থাকে, সেই সময়ে বিপদ থাকে না, এবং যখন কেহ ঐ অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারেন, তখনও বিপদ থাকে না। এখন প্রশ্ন উঠে যে, গুণসাম্য কিভাবে জন্মায় ?

উত্তরে বলি যে, যখন গুণত্রয়ের শক্তির আপেক্ষিক বলের অর্থাৎ relative strength এর হ্রাসবৃদ্ধি হয় তখন তাহাদের মধ্যে resultant নামক যে সাম্যাবস্থা (equilibrium) ছিল, তাহা বিনষ্ট হয়। এই অবস্থাকে দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় গুণসাম্যের ব্যতিক্রমের অবস্থা বলে। গুণের শক্তি পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ জীবের আচরণ দ্বারা

শক্তির হ্রাস এবং বৃদ্ধি হয়। অতএব বিপৎকালে কেহ যদি যথাযথ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন, তাহলে ঐ সাধনা দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টি হওয়াতে সত্ত্বের বলবৃদ্ধি হয়, ও রজো এবং তমোগুণের হ্রাস হইয়া তাহাদেরও বলবৃদ্ধি হয়। বলের এইরূপ ব্যতিক্রমের দ্বারা গুণত্রয়ের আপেক্ষিক বলের মাত্রায় (relative strength-তে) যদি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিপদের নিবৃত্তি হয়।

(ক) সাধনা না করিয়াও বিপদের উপশম

কোন রকম সাধনা না করিয়াও, গুণত্রয়ের স্বাভাবিক কার্য্য চলিতে চলিতে কখন কখন এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, কিছুদিন যাবৎ প্রকাশ এবং আবরক এই উভয় শক্তির বলে বিশেষ কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। ঐ অবস্থার নাম 'গুণসাম্যের' অবস্থা। ঐ সময়ে বিপদ থাকে না। অতএব সাধনা না করিয়া বিপদের উপশম হইল দেখিয়া, বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

আমরা সাধনা করি, বা না করি, গুণত্রয়ের কার্য্য অবিরাম গতিতেই চলিতে থাকে, এবং সেই স্বাভাবিক কার্য্যবশে যখন গুণ-সাম্যের ব্যতিক্রম হয়, তখন বিপদের উৎপত্তি হয়, এবং বিপদ চলিতে চলিতে যখন আবার গুণসাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় বিপদের নিবৃত্তি হয়।

বিপৎকালে সাধনার প্রয়োজন কি?

উপরে বলা হইল যে, গুণত্রয়ের স্বাভাবিক কার্য্যপ্রভাবে বিপদের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হয়। তবে আর সাধনার প্রয়োজন কি? বিপদ আপনিই যথাকালে নিবৃত্তি হইবে না কি? উত্তরে বলি যে, আমরা সাধনা করি বা না করি, তদ্দ্বারা গুণত্রয়ের কার্য্য বন্ধ হয় না। ঐ কার্য্য চলিতে চলিতে তমোগুণ বাড়িয়া লোকের অধঃপতন হয়। অতএব অধঃপতন প্রতিরোধের জন্য সাধনা করা প্রয়োজন হয়।

বিপৎকালে সাধনা করিলে দুইভাবে উপকার হয়। প্রথম উপকার এই যে, সাধনা করিলে বিপদ দ্বারা আমাদের অধঃপতনের

নিরোধ হয়। দ্বিতীয় উপকার এই যে, সাধনা দ্বারা আমরা আপনা আপনাকে এমনভাবে গুণত্রয়ের সহিত সাম্যভাবযুক্ত (adjusted) করি যে, ঐ অবস্থায় গুণত্রয়ের স্বাভাবিক কার্য্যই আমাদের অনুকুল হয়, অর্থাৎ তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্যই গুণসাম্য স্থাপন করিয়া বিপদের উপশম করায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে লোকটীর বিপদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তিনি ৪৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সাধনা না করিলেও, তাঁহার জীবদ্দশার ঐ সময়টা অল্প ঝনঝাটে কাটিয়াছে। ইহার কারণ কি? ইহা বোধ হয় প্রকাশ ও আবরক শক্তির স্বাভাবিক কার্য্যে সাম্যভাবের ফল। ঐ ভাব দূর হইয়া পরবর্ত্তী ১৬।১৭ বৎসর-ব্যাপী ঘোর ঝন্‌ঝাট ঐ শক্তিদ্বয়েরই তীব্র কার্য্যের ফল।

সকাম সাধনা দ্বারা বিপদের নিবৃত্তি

বিপদে পড়িয়া লোকে যখন বিপদ মুক্তির কামনায় সাধনা করেন, তখনও তাঁহাদের বিপদের উপশম হইতে দেখা যায়। কিরূপে উপশম হয় তাহার তত্ত্ব-অবধারণ করিতে হইলে, বিপদের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা প্রথমে দেখা আবশ্যক হয়।

বিপদের উৎপত্তি দুই কারণে হইতে পারে, যথা—

(ক) কাহার কাহারও চিত্তে সত্ত্বগুণের পুষ্টি হওয়াতে তাঁহাদের বিপদ হয়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, প্রকাশ এবং আবরক এই উভয় শক্তির বলের মধ্যে যে আপেক্ষিক তেজ পূর্ব্বে থাকাতে সাম্যাবস্থা ছিল, সত্ত্বগুণের পুষ্টি দ্বারা সেই আপেক্ষিক মাত্রায় ব্যতিক্রম হয়। ঐ ব্যতিক্রম দ্বারা গুণের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হইয়া বৈষম্য উৎপন্ন হয়, এবং বৈষম্য দ্বারা বিপদের সৃষ্টি হয়।

(খ) কাহারও চিত্তে হয়ত আবরক শক্তির পুষ্টি হওয়াতে, সত্ত্বগুণের ক্ষয় হইয়া তাহার বলের হ্রাস হয়। তখন প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে বলের বৈষম্য জন্মিয়া বিপদের সৃষ্টি হয়।

ঐ উভয় কারণের যে কোনটী দ্বারাই বিপদের সৃষ্টি হউক না কেন,

যখন কেহ বিপদ হইতে মুক্তি লাভের কামনা করিয়া সাধনা করেন, তখন সেই সকাম সাধকের মতি, ন্যূনাধিক প্রগাঢ় ভাবে ভগবানের, আশ্রয় গ্রহণ করাতে তাঁহার সকাম সাধনা দ্বারাও সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়। সেই সঙ্গে আবরক শক্তির পরিমাণ হ্রাস হওয়াতে তাহার বলেরও বৃদ্ধি হয়। আবরক শক্তির পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গের কিরূপে তাহার বলের বৃদ্ধি হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭৬ হইতে ২৭৮ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

মোট কথা এই যে, সকাম সাধনা দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয়, এবং তাহার বলের বৃদ্ধি হয়, এবং সেই সঙ্গে আবরক শক্তির পরিমাণের হ্রাস হইয়া তাহার বলেরও বৃদ্ধি হয়। প্রকাশ এবং আবরকের বল যে সমান মাত্রায় বাড়ে, তাহা নয়। ঐ শক্তিদ্বয়ের যে বল থাকাতে বৈষম্য জন্মিয়াছিল সেই বলের ব্যতিক্রম (অর্থাৎ তারতম্য) হয়। ঐ ব্যতিক্রম দ্বারা শক্তিদ্বয়ের বলের মধ্যে কখন বৈষম্যের হ্রাস হয়, এবং কখনই বা ঐ বৈষম্য দূর হয়। অতএব সাধনার মোট ফল দাড়ায় এই যে—

(ক) যদি গোড়াতে সত্ত্ব-গুণের বলবৃদ্ধি হওয়াতে আবরক শক্তির বলের সহিত বৈষম্য সৃষ্ট হইয়া বিপদ জন্মিয়া থাকে, তাহলে সাধনা প্রভাবে আবরক শক্তির পরিমাণ যত কমিতে থাকে, তাহার বলও তেমনি বাড়িতে থাকে। অর্থাৎ আবরক শক্তির বল বাড়িতে বাড়িতে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ শক্তির বলের তুল্য হইতে চায়।

অতএব বিপদের উৎপত্তি হওয়ার সময় প্রকাশ এবং আবরক শক্তির বলের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল, সাধনকালে আবরক শক্তির হ্রাসের ফলে তাহার বল বেশী হওয়াতে, সেই বৈষম্য কমিয়া যায়। তাইতে বিপদও কমিয়া যায় এবং যখন ঐ বৈষম্য দূর হয় তখন বিপদও দূর হয়।

(খ) কখন কখন গোড়াতে আবরক শক্তির পুষ্টির দ্বারা সত্ত্বগুণের শক্তি-হ্রাসের প্রভাবে গুণসাম্য বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বিপদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সাধনা দ্বারা, যেমন সত্ত্বগুণের পুষ্টি হয় তেমনি তাহার

বলও বাড়িতে থাকে। ঐ সময়ে তমোগুণের পরিমাণ কম হয় এবং তাহার বলও বাড়ে। কিন্তু সত্ত্ব ও তমোগুণের বল যে সমান মাত্রায়ই বাড়ে তাহা নয়। ঐ দুই গুণের মধ্যে বলের যে বৈষম্যবশতঃ বিপদ জন্মিয়াছিল, সাধনা দ্বারা বলের পরিবর্ত্তন হওয়াতে, যখন সেই বৈষম্যের হ্রাস হয়, তখন বিপদেরও হ্রাস হয়, এবং যখন বৈষম্য দূর হয় তখন বিপদেরও তিরোভাব হয়।

বিপদের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির সঙ্গে ভগবানের কি সংস্রব থাকে

গুণত্রয়ের শক্তির তারতম্যের উপরই যে বিপদের উৎপত্তি এবং নিবৃত্তি নির্ভর করে, এই কথাটী উপরে ও অপর নানা স্থানে বলা হইয়াছে। গুণই যখন মূল কারণ, তবে কেন আমরা বলি যে, বিপদের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি হওয়া বা না হওয়া, ভগবানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে ?

উত্তরে বলি এই যে, গুণত্রয়ের কার্য্য ভগবানের 'যোগমায়া' নাম্নী ইচ্ছা শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, অতএব গুণের কার্য্য প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই কার্য্য ; এবং গুণত্রয়ের শক্তিতে যে বৈষম্য হওয়াতে বিপদ হয়, তাহা হ্রাস করা অথবা তাহা দূর করিয়া 'গুণসাম্য' উৎপাদন করা, এই উভয় বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে ভগবানের যোগমায়া নাম্নী ইচ্ছাশক্তির কার্য্যের উপর নির্ভর করে। অতএব যাঁহারা ভগবানকে কর্ম্মফলদাতা বলেন, অথবা যাঁহারা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে—

তুমি বিশ্ব-বিপদ হন্তা, এসে দাঁড়াও রুধিয়ে পন্থা,
তব শ্রীচরণ তলে লয়ে যাও মোরে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।

তাঁহারা ঐ সঙ্গীতের সমধুর বাক্য দ্বারা অভ্রান্ত সত্যই প্রকাশ করেন। এই কথা কয়টীতে অসত্যের অথবা ভগবানের প্রতি চাটু-বাক্যের লেশমাত্র নাই। সঙ্গীতের বাক্য কয়টী বর্ণে বর্ণে সত্য।

বিপদ হইতে চিরমুক্তি।

যখন সাধনা দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, তখন চিত্তে কেবল সত্ত্বগুণই অবস্থান করেন এবং তখন আবরক শক্তি তিরোভূত হয়। কাহারও অন্তরে অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ার পরে যদি ঐ অবস্থা স্থায়ী হয়, সেই সাধক বিপদ হইতে 'চিরমুক্তি' লাভ করেন।

কিন্তু এই অবস্থা, অথবা ইহারই কাছাকাছি উন্নতির অবস্থা, প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহারা সংসারে অবস্থান করেন, তাঁহারা তখনও অবিদ্যার রাজত্বে বাস করেন। 'সংসার' অবিদ্যারই রাজত্ব। তাই বাইবেলে অবিদ্যাকে **satan** নাম দেওয়া হইয়াছে। সংসার অবিদ্যারই আজ্ঞাধীন, ইহা সুস্পষ্ট করার জন্য যিশু **satan**কে অপর একটী নাম দিয়াছেন, **The Prince of the World**, (**world**=সংসার তাহার Prince = রাজা)। যতকাল ঐ রাজার রাজ্যে থাকা যায়, ততকাল অবিদ্যার শক্তি পুনরায় আমাদের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অবিদ্যার নিবৃত্তির সময় বিপদ হইতে চিরমুক্তি লাভের সুযোগ পাইলেও আবার বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে গীতা শ্রবণ করিয়া এবং বিশ্বরূপ দর্শন দ্বারা দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াও অর্জ্জুন বার বার অবিদ্যার অধীন হইয়াছিলেন। অতএব সংসারে থাকার সময় ঘোর বিপদ হওয়ার পরে, যখন সাধনা দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয়, তখন কেহ যেন মনে না ভাবেন যে, তিনি বিপদ হইতে চিরমুক্ত হইলেন। যিনি সংসার হইতে চির-মুক্তির উপযোগী উৎকর্ষ লাভও করিয়াছেন, তিনি যতদিন ভোগলোকত্রয় হইতে কোন না কোন উচ্চ 'লোকে' গমন না করিতেছেন, ততদিন পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে, এই কথাটী কেহ যেন আমরা না ভুলি।

চির-মুক্তি লাভ করার সুযোগ প্রাপ্তিও সম্পূর্ণরূপে ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ।

বিংশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

সাধনকালে অবিদ্যার উপদ্রব

ভূমিকা।

আমরা যখন সাধনায় প্রবৃত্ত হই তখনও আমাদের অন্তরে ন্যূনাধিক পরিমাণে অবিদ্যার আধিপত্য থাকে, অতএব তমোগুণ (অর্থাৎ আবরক শক্তি) কতকগুলি বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আমাদের সাধনাকে নিরর্থক করিতে চায়। যাহাতে এই বিঘ্ন না হয়, সেজন্য সতর্কতার প্রয়োজন; অতএব এই বিষয়ে সংক্ষেপে গুটিকতক কথা লিখিতেছি।

যোগ-সাধনার সময় hallucination

যাঁহারা যোগ-সাধনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ সনাতনঃ' দর্শন করার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন। প্রকৃতপক্ষে যাহা যথার্থ ব্রহ্ম-'জ্যোতিঃ', তাহা না দেখিয়াও, উহা দর্শনের জন্য অত্যধিক আগ্রহ বশতঃ, আমি 'জ্যোতিঃ' দেখিয়াছি, এই ধারণাটী অনেকের অন্তরে উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে যোগভ্রষ্ট করে।

যাঁহারা 'জ্যোতিঃ' দর্শনের জন্য ব্যস্ত হন তাঁহাদের চিত্তে প্রায়ই 'জ্যোতিঃ' প্রিয়তা অত্যন্ত প্রবল ভাবে থাকে। তাঁহারা কেবল 'জ্যোতিঃই' দেখিতে চান, ঐ জ্যোতিঃ যে বস্তুর অঙ্গ মাত্র, অর্থাৎ উহা যে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভামাত্র, সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও তাহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ ভক্তি এবং বৈরাগ্য লাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে, সাধনকালে 'জ্যোতিঃ' দর্শনের আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া অবিদ্যাই লোককে যোগভ্রষ্ট করায়।

খাঁটি ও মেকি সাধনা চিনিবার উপায়

কে যথার্থ ব্রহ্মজ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছেন, এবং কে প্রকৃত বস্তু না দেখিয়াও অবিদ্যার খেয়ালের মোহে ভাবিতেছেন যে উহা দেখিয়াছি,

ইহা চিনিব কিরূপে ? এই প্রশ্নটীর উত্তরে বলি যে, যিনি যথার্থ ব্রহ্ম-দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকটন হইয়া অবশ্যই অবিদ্যা-স্থষ্ট কাম লোভাদির নিবৃত্তি হয়। আমি জ্যোতিঃ-দর্শন করিয়াছি, এই বিশ্বাস হওয়ার পরেও,যদি কোন সাধকের অন্তরে পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কুৎসিৎ ভাব সকল রাজত্বকরে, তাহলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে,অবিদ্যা কেবল একটা 'খেয়াল' অর্থাৎ ভ্রম উৎপাদন করিয়া ঐ সাধকের উত্তমকে পণ্ড করিতেছেল।

Miracle দর্শনের আশা করাই উচিত নয়

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২৭ এবং ৩১৩ হইতে ৩১৪ পৃষ্ঠায় লেখক দ্বারা দৃষ্ট একটী **vision**এর উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া লেখকের মনে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছিল। মহাপ্রভুর মুকুটের হীরকের উপর দীপ-শিখা পড়াতে কি এই জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে ? এত তেজ কোথা হইতে আসিল ? ঐ জ্যোতিঃ প্রকৃতপক্ষে কি বস্তু তাহা স্থির করার জন্য, লেখক তখন **optics** নামক বিজ্ঞান শাস্ত্রে উপদিষ্ট কএকটী পরীক্ষা (test) দ্বারা বিষয়টীকে প্রথমে যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন। অতি সাবধানে পরীক্ষা করার পরে যখন তাঁহার মনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, ঐ দৃশ্যটী **optical illusion** অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিভ্রম নয়, কিম্বা উহা হীরকের উপর পতিত আলোকরেখার প্রতিভাও নয়, তখন আমার অন্তরে বিস্ময়ের এবং 'সাধ্বস'-যুক্ত সম্ভ্রমের সীমা রহিল না।

মানব উভয় সঙ্কটের মধ্যে আছেন। একদিকে আছে **Disbelief** অর্থাৎ সব কথাতেই অবিশ্বাস করার প্রবৃত্তি, অপর দিকে আছে, **over-credulity** অর্থাৎ সব কথাকেই বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি। এই দুইটী দোষই আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় এবং এই দুই দোষের মধ্যে কোন্‌টী বড় তাহা বলা সুকঠিন।

ভগবানের অসাধ্য যে কিছুই নাই, একথা শতবার স্বীকার করি। ভগবান যে 'miracle' প্রভৃতির আকারে আপন অনন্ত শক্তি

প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু যে শ্রদ্ধা, বুদ্ধির বিবেকশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, কেবল বিস্ময় হইতে জন্মায়, তাহার ভিত্তি অতি দুর্ব্বল, তাহা চিত্তকে উন্মথিত করিয়া অন্তরের অধস্তম স্তরে প্রবেশ করে না, অতএব অল্প আঘাতেই উহা ভূমিসাৎ হয়। Miracle দর্শনের আশা করাই গর্হিত কার্য্য। ভগবান যে সাধনার গোড়া থেকেই, miracle প্রদর্শন করিয়া লোকের বিবেক শক্তিকে বিনষ্ট করেন না, যিশু পুনঃ পুনঃ ইহুদিগণকে এই তত্ত্বটী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহুদিগণ যখন miracle দেখাইবার জন্য যিশুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তিনি ঐ কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হন। তাঁহাকে ঐ কার্য্য করিতে প্রলোভিত করার অভিপ্রায়ে, satan যিশুর সত্যনিষ্ঠার উপর আঘাতও করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে 'আত্মাভিমানের' উদ্দীপনা করিতে পারেন নাই।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে মোটের উপর আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি। বিবেক শক্তি ভগবানের বিভূতি। ঐ শক্তি শুকাইয়া যাক্, এবং মানব কঠোর সাধনা না করিয়া, এবং নানাবিধ বিপদ দ্বারা নিষ্পেষিত না হইয়া, বিনা ঝণ্‌ঝাটে, কেবল miracle দেখিয়া সিদ্ধিলাভ করুক, ইহা বিভূর সৃষ্টির নিয়মের প্রতিকূল।

'সিদ্ধাই' লাভ করিয়া বুজরুকি

কতক সাধক 'সিদ্ধাই' অর্থাৎ অষ্টৈশ্বর্য্যের দুই একটী মাত্র ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া কৃতার্থ মনে করেন; এবং ঐ ক্ষমতা অপরকে দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেও যত্ন করেন। ঐ শ্রেণীর সাধক যাহা অর্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 'সিদ্ধাই'এর আকারে সেই শ্রমের 'মজুরি'ও পাইয়াছেন, অতএব ইহার পর ভগবানের উপর তাঁহাদের অপর কি দাবী থাকিতে পারে? তাঁহাদের সাধনা পণ্ডশ্রম মাত্র।

আচরণই সাধনার কষ্টি পাথর।

মানুষের আচরণেই তাঁহার মানসিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য কষ্টি

পাথরের তুল্য। সাধনা করার সময়ে লোকে যদি নিজের আচরণের প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহলে নিজের সাধনা ঠিক ভাবে চলিতেছে, কি পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

যদি সাধকের আচরণে কোন উন্নতি না হয়, তাহলে ইহাই দেখা যায় যে, সাধক যতই কঠোর ভাবে সাধনা করুণ না কেন, অবিদ্যা সেই কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। দেবস্থানে 'ধন্না' দেওয়ার সময় কেহ কেহ প্রত্যাদেশ লাভের পূর্ব্বেই মনে করেন যে, উহা লব্ধ হইয়াছে; তাঁহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই সাধনাকে নিরর্থক করে। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ব্রহ্ম সংস্পর্শে আসা যায় না। লোকের চিত্তশুদ্ধি হওয়া না হওয়ার বিষয়ে পরিচয় তাঁহাদের আচরণ হইতেই পাওয়া যায়।

ঝোঁকের বশে সাধনা।

ঝোঁকের বশে লোকে বহু বিষয়ে বিশ্বাসও করেন এবং সাধনাও করেন। এইপ্রকার বিশ্বাস বা সাধনার মুল যে তাঁহাদের বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, এই কথা বলিলেও চলে। তাইতে ঐ বিশ্বাস বা সাধনা সুদৃঢ় হয় না। যে গাছের শিকড় শক্ত মাটিতে প্রবেশ করিতে চায়,তাহা 'গজাইতে' দেরী লাগে বটে কিন্তু অল্প ঝড়ে তাহার উৎপাটন হয় না। যে বিশ্বাসকে সত্ত্বগুণযুক্ত বুদ্ধির 'বিজ্ঞান' শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, কিম্বা যে সাধন-প্রবৃত্তিকে বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত করিতে হয়, সেই বিশ্বাস বা সাধনপ্রবৃত্তি জন্মিতে বিঘ্ন এবং বিলম্ব হয়; কিন্তু বিপদের আঘাতে তাহা শীঘ্র উন্মুলিত হয় না। তাহাদের ভিত্তি যেন পাথরের উপর নির্ম্মিত অট্টালিকার ন্যায় সুদৃঢ় থাকে।

(ক) ঝোঁকের বশে কেন তত্ত্বজ্ঞান হয় না

লোকে যখন ঝোঁকের বশে বিশ্বাস বা সাধনা করেন, সেই সময়ে তাঁহাদের বুদ্ধির সহিত বহু পরিমাণে অবিদ্যার আবরক শক্তির সংযোগ থাকে। ঐ আবরক শক্তি তাঁহাদের অনুভব ক্ষমতাকে খর্ব্ব করে। অতএব যে মূল তত্ত্বের উপর সাধনা বা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত থাকে,

অনুভব শক্তির হ্রাস হওয়াতে, ঝোঁকের বশে সাধনা করিয়া লোকে তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে অক্ষম হন।

ঝোঁকের বশে সাধনা কেন অস্থায়ী হয়।

সত্ত্বগুণই কেবল নিত্য বস্তু, আবরক শক্তি অনিত্য বস্তু। যে সাধন প্রবৃত্তি বিবেক হইতে উৎপন্ন না হইয়া, কেবল ঝোঁক অর্থাৎ impulse বা emotion হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত বহুপরিমানে আবরক শক্তির সংযোগ থাকে। অতএব তাহা স্থায়ী হয় না।

আমাদের দেশে আবিষ্ঠার খুবই প্রাধান্য আছে, তাই লোকে অল্প চেষ্টা করিয়াই আমাদিগকে উত্তেজিত করিতে পারে, কারণ আমরা ভালমন্দ বিচার না করিয়া Emotion এর স্রোতে গা ঢালিয়া দিই। ঝোঁকের বশে সমাজের কেহ সন্ন্যাসী, কেহ বা রাজনৈতিক, কেহ বা সমাজসংস্কারক এবং কেহ বা সওদাগর অর্থাৎ merchant হন। কার্য্যকালে একটু বাধা পাইলেই বা অল্প অসুবিধা হইলেই আমরা ঐ কার্য্য ছাড়িয়া দিই। সেই জন্য মাঝে মাঝে সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা দ্বারা নূতন ঝোঁক অর্থাৎ উত্তেজনা সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয়। ঝোঁকের প্রাধান্য থাকে বলিয়া বাঙ্গালীর অনেক কার্য্যেরই শেষরক্ষা হয় না।

ঝোঁকের বশে কার্য্য করিয়া কেন সিদ্ধিলাভ হয় না

সত্ত্বগুণের যে প্রেরণাশক্তি থাকে তাহা নিত্য, এবং আমাদের বিবেক-শক্তি সত্ত্বগুণ হইতেই জন্মায়। বিবেক শক্তি দ্বারা বিচার করার পরে আমাদের অন্তরে যখন কোন কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মায়, সেই প্রবৃত্তি বজায় থাকে, এবং কাজ করিতে করিতে সত্ত্বগুণের প্রেরণা প্রভাবে, ঐ কার্য্যে উৎসাহও বাড়িতে থাকে।

আবরক শক্তি অনিত্য। অনিত্য বস্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় না। 'ঝোঁক' নামক বস্তুটী, ভালমন্দ বিচারের প্রতীক্ষা না করিয়া, অকস্মাৎ

উদ্দীপিত হয়। তখন emotionএর উত্তেজনা বুদ্ধির বিবেক শক্তিকে আচ্ছন্ন করে। অতএব কোন শুভকার্য্য উপলক্ষেও, যদি মানবের প্রবৃত্তি কেবল ঝোঁক হইতেই জন্মায়, তখনও যে আবরক শক্তিই সেই প্রবৃত্তির সঞ্চার করিয়াছে, ইহাই বলিতে হয়। কোন কার্য্য ভাল হউক বা মন্দ হউক, কেহ যদি ঝোঁকের বশে সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহলে তিনি বেশীদিন ঐ কার্য্যটী করিতে পারেন না, এবং কাজ করার সময়ে বাধাবিঘ্ন হইলে তিনি, কখন বা ভয়ে, এবং কখন বা বিঘ্ন দ্বারা ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়াতে, আরব্ধ কার্য্যটী ছাড়িয়া দেন। এই জন্যই ঝোঁকের বশে কাজ করিয়া প্রায়ই সিদ্ধিলাভ হয় না।

বিবেকশক্তির প্রেরণায় যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল অন্য প্রকার হয়। ঐ শক্তির প্রেরণা দ্বারা যাঁহারা কোন ঐহিক বা পারমার্থিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, বরঞ্চ বিঘ্নই তাঁহাদিগকে আরব্ধ কার্য্যে অধিকতর সুদৃঢ় করে।

লেখক আত্মজীবনে এই বিষয়ের বহু পরিচয়ই পাইয়াছেন। যে বিশুদ্ধ রজোগুণের প্রেরণায় লেখক এতাবৎকাল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, ঐ রজোগুণে বহুপরিমাণে সত্ত্বগুণের সংযোগ ছিল বলিয়াই, ১৭ বছর বয়স হইতে ৬০ বছর বয়স পর্য্যন্ত, কোন বাধাবিঘ্ন দ্বারাই এই হেঁপো রোগী অভীষ্ট কার্য্য হইতে নিরস্ত হন নাই। রোগ তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়াছে, বিপদ তাঁহাকে পাঁচবার নিপতিত এবং দুইবার সবংশে নিপাত করার উদ্যোগও করিয়াছে, কিন্তু ঐ অবস্থায়ও তিনি হাতের কাজ কখনই ছাড়েন নাই।

লেখক ১৮৯৬ সালে (২৮ বছর বয়সে) যখন চাকুরি করিতে করিতে একটী ব্যবসাকার্য্যের সহিত সংলিপ্ত হন, তখন হয়ত তাঁহার চিত্তে কতক পরিমাণে ঝোঁকের প্রেরণা ছিল। কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করার ২।৩ বৎসরের মধ্যে অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার বিবেকশক্তির উদ্দীপন হওয়াতে, বিবেকই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখে।

১৮৯৬ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৪ বছর), ঐ কার্য্য উপলক্ষে বিশেষ কোন অসুবিধা অথবা বিঘ্ন না হওয়াতে লোকটীর মতি ঐ কার্য্যে দৃঢ়নিবদ্ধ হয়। তার পর ১৯১১ হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তের বছর, দৈহিক পারিবারিক এবং সাংসারিক ব্যাপারে লোকটীর ভয়ঙ্কর বিপদ হইয়াছে (২০৭ পৃষ্ঠা)। ঐ সকল বিপদের সঙ্গে উপরোক্ত ব্যবসাকার্য্য উপলক্ষেও তাঁহার ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল (২১১ পৃষ্ঠা)। ব্যবসাক্ষেত্রের বিপদ পরে পরে পাঁচবার তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত এবং বিনষ্ট করার উদ্যোগ করিয়াছিল। তথাপিও তিনি ব্যবসাটীকে ছাড়েন নাই। এত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি যে এখন ঐ কার্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, উহা সত্ত্বগুণের দৃঢ়তারই ফল। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

ঝোঁকের বশে কিরূপে কার্য্যহানি হয়

'আমি মহাযোগী', 'আমি প্রকৃষ্ট সাধক', 'আমার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে', সাধনকালে এইরকম কোন না কোন আকারে আত্মগর্ব্ব জন্মিয়া সাধনাকে পঙ্গু করে। বিশ্বামিত্র ঋষি মহাশক্তিমান সাধক হইয়াও কেবল আত্মগর্ব্বের দোষে যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সাধনকালে যদি বিবেক শক্তি প্রবল থাকে, তাহলে এই সকল উপসর্গ জন্মিতে পারে না। ঝোঁকের কাজে লোকের বিবেক শক্তি নিদ্রিত অবস্থায় থাকাতে, এই সকল উপসর্গ জন্মিয়া কার্য্যে বিঘ্ন হয়।

বিষয়কর্ম্মের সময়ও 'আমি অভ্রান্ত', এই আকারে আত্মগর্ব্ব প্রবল হইয়া যে কত বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাহা নিজের জীবনে বহুবারই দেখিয়াছি। ঐ সঙ্গে যদি ধনাকাঙ্ক্ষার সংযোগ হয়, তখন ঐ দুই বস্তু মানবকে অকূল পাথারে নিক্ষিপ্ত করে।

বাঙ্গালী যে ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারেন নাই, তাহার জন্য যে কয়টী দোষ দায়ী, তন্মধ্যে চারিটী প্রধান দোষ হইল, (ক) বিবেকের বশে ব্যবসায় প্রবৃত্ত না হইয়া কতকপরিমাণ 'ঝোঁকের'

বশে ব্যবসা আরম্ভ করা, এবং (খ) এবং তাহার সঙ্গে উন্মাদের তুল্য ধনাকাঙ্ক্ষার সংযোগ ও, (গ) 'আমি বড় সমজদার' মনে এই ভাবের আধিপত্য, (ঘ) এবং অবিবেক।

এখন (১৯২৯ সাল) আবার ১৯০৮ সালের তুল্য coal boom আগতপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়লার কোম্পানীগুলি ১৯০৮ সালের পরে এমন মৃতপ্রায় অবস্থায় বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী ১৬।১৭ বছরেও তাহারা সামলাইতে পারে নাই। তখন যে বাঙ্গালীরা Managing agent ছিলেন, যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ সংযত ভাবেও চলিতেন, তাহলে এখন তাঁহাদের ইংরাজের তুল্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু, হায়! এখন তাঁহারা কোথায়! ঝোঁক, অর্থাৎ idealism, এবং ঐ সঙ্গে কাহার কাহারও অন্তরে রাতারাতি বড়মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া, নানাবিধ যৌথকারবারে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই সকল দোষ (তাহার মধ্যে প্রধান দোষ 'ঝোঁক') কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালীজাতির যে কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে, তাহা মনে করিলেও এই বৃদ্ধ লেখকের চোখে জল আসে। গত ২৫ বছরে অনেক দেখিয়াছি বলিয়াই, এই তেজের বাজারে, পূর্ব্বকথা মনে পড়ে।

Sir সুরেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, সংসারে emotion আছে বলিয়াই বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। বাগ্মীপ্রবরের কথার যাথার্থ্য শতবার অবনত মস্তকে স্বীকার করি। ইউরোপের বিবিধ সদনুষ্ঠান নিচয়ের পর্য্যবেক্ষন করিলে দেখা যায় যে, যদিও ঝোঁকই, বহু শুভ কার্য্যের সূচনা করিয়াছিল, কিন্তু অতি শীঘ্র বিবেকের উদ্দীপন করার পরে এবং বিবেকের হস্তে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়া ঝোঁক শীঘ্রই তিরোভূত হইয়াছে।

আমাদের দেশে অনেক স্থলেই, বিবেক শক্তির উদ্দীপনা হয় না বলিয়াই, বহু অনুষ্ঠানের শেষরক্ষা হয় না। যেস্থলে বুদ্ধির বিচার শক্তির উদ্দীপনা না হইয়া বরাবরই ঝোঁকের রাজত্ব চলে তথায় কার্য্য সাধনের

চেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং অল্প বিপদ দ্বারাই কার্য্যহানি হয়। চিত্তে ঝোঁকের প্রাধান্য থাকাতে যে, আমাদের দেশের কত ভাল ছেলের 'আখের' মাটী হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও মনে বড় কষ্ট হয়। সেইজন্যই পুস্তকে মন্তব্যগুলি লিখিলাম।

Save us from our নীতিশাস্ত্র

নীতি শাস্ত্রকার এবং ধর্ম্মচারক মহাশয়েরা বলেন যে, ভগবান সাধকের সাহায্য করেন। কিন্তু ভগবানের সাহায্য যে কি রকমের জিনিস, তাঁহারা যদি বক্তৃতাকালে তাহাও ভাল করিয়া লোককে বুঝাইয়া দিতেন, তাহলে লোকে তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রমের বশে পথহারা হইত না, তাহলে লোকে ভাবিত না যে, ভগবান সাধনার পথকে সুগম করেন।

যে সাধক যথার্থ্যই ভগবানের অনুগৃহীত হন, প্রভু যে সেই সাধককে নানাভাবে নাস্তা-নাবুদ করার পরে সিদ্ধি প্রদান করেন, নীতিশাস্ত্রকার এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণ যদি এই অমূল্য বিষয়টীকে অতি সুস্পষ্টভাবে বলিয়া, লোককে বিপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহলেই তাঁহাদের শাস্ত্র এবং উপদেশ লোকের কাজে লাগিত। এই কথা না বলাতে লোকে, তাঁহাদের লেখা পড়িয়া বা কথা শুনিয়া, ভাবে যে সাধনা আরম্ভ করা মাত্র বিপদ কেটে যাবে।

আবদেরে ছেলের হাতে মোয়া দিয়া তাহার স্নেহময়ী মাতা তাহাকে ঠাণ্ডা করেন বটে, কিন্তু তার পর সেই ছেলের পিতা বালককে জলবিছুটি লাগাইয়া এবং ঘরের মধ্যে অনাহারে আবদ্ধ করিয়া ছেলেটীর সংশোধন করেন। ভোগাসক্ত জীবকে 'ধনধান্য' নামক 'মোয়া' (অর্থাৎ 'বর') দিয়া প্রথমে পরিতৃপ্ত করিলেও, ভগবান কিছুদিন পরে বহু নির্য্যাতন দ্বারা ঐ সকল জীবের উন্নতিসাধন করেন। এই নির্য্যাতনের জন্য পাঠককে প্রস্তুত না করাই কতক শাস্ত্রের পক্ষে ত্রুটি বলিয়া লেখকের চক্ষে বোধ হয়।

বহু নীতিশাস্ত্রে এবং প্রচারকের দ্বারা উচ্চরবে 'বরদানের' কথাই ঘোষিত হয়। নির্য্যাতনও যে ভগবান কর্ত্তৃক প্রদত্ত অপর এক রকমের 'সাহায্য', এই তত্ত্বটীর বিষয়ে নীতিশাস্ত্র সম্পূর্ণ নির্ব্বাক না হইলেও, ঐ সকল শাস্ত্রে এই কথাগুলি যেন 'নিচু গলায়' কথিত হইয়াছে। ভোগরত মানবের পক্ষে সংসারে যে নির্য্যাতনের ব্যবস্থা আছে, তাহাই যে ভগবান দ্বারা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠতম সাহায্য—এই অমূল্য তত্ত্বকথা, নীতিশাস্ত্রে এবং সকল প্রচারকের উপদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করা উচিত।

বাক্য দ্বারা সাধনায় বিভ্রাট

বাগ্‌দেবী দুষ্ট সরস্বতীর রূপ ধারণ করিয়া যখন সাধকের অন্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন কেহ বা শাস্ত্রের পদলালিত্য দ্বারা, কেহ বা যুক্তির নৈপুণ্য দ্বারা, কেহ বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, মোহিত হইয়া বাস্তব বস্তুকে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি এবং বৈরাগ্য নামক বস্তুত্রয়কে, পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বস্তুকেই বরণ করেন। তখন কোন সাধক হয়ত তার্কিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন, কেহ বা সুবক্তা অথবা সুপণ্ডিত বলিয়া পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লাভ করাতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ঐ সকল সাধকের অন্তরে ঐহিক যশঃ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা নামক হলাহল লুক্কায়িত থাকে, সাধনা আরম্ভ করার পরে সেই বিষ বাহির হইয়া পড়ে। যতকাল ঐ বিষের ক্ষয় না হয়, ততকাল তাঁহারা সংসারে আবদ্ধ থাকেন, এবং বৈষয়িক সুখের সঙ্গে দুঃখও ভোগ করেন।

> উপলভ্যতে দুঃখদন্ততঃ সুখং
> কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা।

'এ স্বপন ঘোর হবে না কি ভোর'

এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা, মোক্ষ চান না, তাঁহারা কেবল বিষয় সুখই চান। স্বচক্ষে এমন লোকও দেখিয়াছি, যিনি

বার্দ্ধক্যের অন্তিম সীমায় উপনীত হইয়াও কেবল যে নিজে মোক্ষ কামনা করেন না তাহাই নয়, অপর কেহ যে মোক্ষকামী লইতে পারে, এই কথায় তিনি বিশ্বাসও করেন না। তিনি চান কেবল টাকা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা, তিনি যখন নানা আকারে কষ্ট পান, তখনও আত্মগর্ব্বে বিভোর হইয়া থাকেন। সংসারে যাঁহারা নিজে চোর, তাহাদের অনেকে অপর সকলকেই চোর চোর বলিয়া মনে করেন, লম্পটগণের মধ্যে কেহ কেহ সকল স্ত্রীলোককেই অসতী বলিয়া মনে করে। উপরে যে বিষয়কামী মানবের উল্লেখ করা হইল, তাঁহারা তেমনি সকলকেই নিজের তুল্য ভোগরত বলিয়া মনে করেন। কেহ যে বষয় ছাড়িয়া অপর কোন শ্রেষ্ঠত সুখের কামনা করিতে পারে, একথা তাঁহাদের মনে স্থানই পায় না। বিষয়সুখ ছাড়া অপর কোন রকম সুখ যে থাকিতে পারে, একথা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত।

আমি নিজেই যে কি মোহের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলাম এবং তাহা হইতে যে কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহার পরিচয় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দিয়াছি। যদি নানাবিধ কষ্ট পাইয়া কাহারও চিত্তে ঐ মোহ একটু কমও হয়, সেই হ্রাসের জন্য কষ্টভোগ তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

আর যদি ধনকড়ি এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিষয়-মোহ বাড়িয়া উঠে, তাহলে কি লাভ হইল ? এক কড়া কাণাকড়িও ত পরলোকে লইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ভগবানের এই ব্যবস্থা আছে যে, জীবের 'লিঙ্গ-দেহের' সঙ্গে অবিদ্যার মোহ সংযুক্ত হইয়া থাকিবে, এবং সেই লিঙ্গদেহ জীবের সঙ্গে জন্ম হইতে জন্মান্তরে অনুসরণ করিবে। অতএব আসক্ত জীব ধনকড়ি ছাড়িয়া ইহলোক পরিত্যাগ করার পরে, তাঁহার কি দশা হয় তাহা মনে করুন। তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, আপন সংস্কারের যোগ্য কোন নীচযোনিতে। ইহজন্মে ধন-কড়ির অনুসরণ করাতে এই শাস্তিই হয়, এবং কোন লাভই হয় না, এই কথাটী যেন মনে থাকে।

রক্ষার একমাত্র উপায়

তাই বলি যে,সাধন-কালে অবিদ্যা পদে পদে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চায়। আমাদের শক্তি অতি অল্প এবং সাধনমার্গও বিঘ্নসঙ্কুল, এই কথা মনে রাখিয়া যদি কখনই ভগবানের চরণাশ্রয়কে পরিত্যাগ না করা যায়, তাহলে ভগবানই আমাদিগকে রক্ষা করেন। যিনি মনে ভাবেন যে,আত্মশক্তি প্রভাবে সাধনা করিয়া অবিদ্যাকে অতিক্রম করিবেন, তাঁহার ঐ আশা কখনই পূর্ণ হইবে না। যদি তিনি সৌভাগ্যবান মানব হন, তাহলে বিশ্বামিত্র ঋষির ন্যায় তাঁহার 'হাড়ির হাল' হইবে। বিশ্বামিত্রের অসীম শক্তি ছিল বলিয়া, তিনি উদ্ধার পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের কয়জনের ঐরূপ শক্তি থাকে ? অতএব আমাদের ভাগ্যে কেবল যাতনাই হয়।

একবিংশ অধ্যায় (প্রথম অংশ)

'অবিদ্যা'র তুল্য একপ্রকার শক্তি জড়-জগতে কার্য্য করে

অন্তর্ ও বহির্জগতে Evolution শক্তির কার্য্য।

অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল গুণত্রয়ের কার্য্যের মুখ্য লক্ষ্য হইল,আবরক শক্তির আচ্ছাদন দূর করিয়া ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষের প্রকটন করা। Biology এবং Geology ও Botany হইতেও আমরা দেখিতে পাই যে, স্থূল বস্তু সকলের Development অর্থাৎ উন্নতি সম্পাদনই হইল Evolution শক্তির মুখ্য লক্ষ্য। দর্শন বলেন যে, গুণত্রয়ের মধ্যে যে ক্রিয়াশক্তি নিহিত থাকে, তাহার প্রভাবে অন্তর্জগতে ক্রমোন্নতি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ঐ ক্রিয়াশক্তিই Energy নামে আখ্যাত হইয়া জড়জগতে Evolution কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

অতএব সৃষ্টির (ক) অভিপ্রায়, (খ) কার্য্যপ্রণালী এবং (গ) কার্য্যের পরিচালক শক্তি, এই তিনটী বিষয়ের উপলক্ষ্যে অন্তর্ এবং বহির্জগতে অনন্ত শক্তির কার্য্যে ঐক্যভাবই দেখা যায়।

জড়জগতে যে Evolution শক্তির কার্য্য চলে, তাহার প্রভাবে জীবের স্থূল দেহ এবং স্থাবরের দেহ কখন বা উন্নত, এবং কখন বা অবনত, অবস্থায় উপগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তর, অর্থাৎ speciesকে আশ্রয় করে। আমাদের অন্তর্জগতে যে Evolution শক্তি ক্রিয়াশীল ভাবে আছে, তাহার আয়ত্তে থাকিয়া আমাদের চিত্তবৃত্তি সকলও কখন উন্নত এবং কখন বা অবনত হইতে হইতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপনীত হইতে থাকে। যে শক্তি দ্বারা শেষোক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহাকে আমরা গুণত্রয়ের ক্রিয়া বলি।

গুণত্রয়ের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিলে তাহাদের কার্য্য এবং জড়জগতে Evolution শক্তির কার্য্যের মধ্যে এত ঐক্যভাব দৃষ্ট হয় যে, তখন মনে হয় যে, ঐ উভয়বিধ কার্য্য একই Infinite energy নামক অনন্ত শক্তির কার্য্যের বিভিন্ন অবস্থা (phase) মাত্র। কার্য্যের ক্ষেত্রভেদে ঐ একই বস্তুকে আমরা 'গুণ' বা Evolution শক্তি এই দুই নাম দ্বারা আখ্যাত করি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ উভয় নাম একই বস্তুকে বুঝায়। বস্তু সকলের অন্তরে ও বাহিরে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং স্থূল, এই উভয় অবস্থায় একই শক্তির কার্য্য চলে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভাষায় উহার নাম Evolution শক্তি, এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ভাষায়, ঐ শক্তির নাম গুণত্রয়।

পুনরায় উন্নতির জন্য অবনতি।

যদি বল যে, যদি ক্রমোন্নতি সম্পাদনই Evolution শক্তির লক্ষ্য, হয়, তাহলে সেই বিরাট শক্তি কার্য্য করার সময়ে কেন অনেক জীবের চিত্তবৃত্তির উন্নতি না হইয়া অবনতি হয়? কেনই বা তাহাদের মধ্যে অনেক জীব উচ্চ যোনি হইতে নিম্ন যোনিতে গমন করে?

এই প্রশ্নটীর সন্তোষকর উত্তর প্রদানের জন্য, **Biology** প্রভৃতি শাস্ত্রে যতদূর প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা আবশ্যক, লেখকের সে জ্ঞান নাই। অতএব প্রশ্নটী উপলক্ষে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা করিতে লেখকের সাহস হয় না।

এই উপলক্ষে লেখক কেবল পাঠকের নিকট সসম্ভ্রমে ইহাই নিবেদন করিতেছেন যে, জীব-জগতের এবং জড়জগতের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে একই নীতির কার্য্য চলিতেছে। উভয় স্থলেই আমরা দেখিতে পাই যে, **nature breaks n order to re build**, অর্থাৎ নূতন করিয়া গঠনের জন্যই প্রকৃতি বস্তু সকলকে ভাঙ্গেন। Biology, Botany এবং Geology শাস্ত্রে প্রকৃতির দ্বারা এইরূপ কার্য্য সম্পাদনের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। দেখা যায় যে, কোন শ্রেণীর জীবের স্থূল দেহ কোন নিম্নস্তরে যাওয়ার পরে সেই অবনত অবস্থা হইতেই, ঐ জীব এমন ভাবে অপর কোন এক শ্রেষ্ঠতর অবস্থায় উন্নত হয় যে, পূর্ব্বের অবনতিই যেন সেই জীবের পক্ষে উন্নতির সোপানের তুল্য, ইহাই অনুমিত হয়।

Physiology নামক শাস্ত্র হইতেও দেখা যায় যে, রোগ দ্বারা মানবের দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার পরে, সেই ক্ষীণ দেহে নবশক্তির সঞ্চার হইয়া কান্তি এবং তেজযুক্ত নূতন কলেবরের গঠন হয়। টাইফয়েড জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করার পরে, রোগী যদি যথাকালে প্রদত্ত পুষ্টিকর আহার পায়, তাহলে ঐ খাদ্য দ্বারাই রোগীর নূতন কলেবর সৃষ্ট হয়।

ত্রিতাপের যাতনা দ্বারা দেহ নিষ্পেসিত হওয়ার পরে, যদি আমরা হিতকর শিক্ষার আকারে যথাকালে spiritual food পাই, তাহলে ঐ খাদ্য দ্বারা আমাদের নূতন চরিত্রের গঠন হয়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, লেখকের নিজের দেহও একসময়ে বিনষ্ট হওয়ার অবস্থায় আসিয়াছিল। মেদিনীপুরে অবস্থান কালে, ১৯১৯ সালের জুন মাস হইতে ঐ সঙ্কট দশার অবসান হইলে, চিত্তের অভিনব অবস্থা প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গে,লেখকের কঙ্কালগুলির উপর স্বাস্থ্যযুক্ত কলেবরের প্রকাশ হইল, আত্মীয় স্বজনের চক্ষে তাহা যেন নূতন বস্তু বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল ; (৩০৯-১৪ পৃষ্ঠা)। যাঁহারা লেখককে খরচের খাতায় ফেলিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার জমার খাতায় আনিলেন।

অন্তর্জগতেও গুণত্রয় এই নীতির অনুকরণ করিয়া কার্য্য করে। গুণত্রয় যখন 'ব্যূঢ়'-ভাবাপন্ন হয়, তখন তাহারা স্থূল বস্তুতে পরিণত হইয়া ঐ সকল বস্তুতে নানা পরিবর্ত্তন করে। গুণের এই পরিণতিকে Biologyর ভাষায় Evolution কার্য্য বলা হয়। অন্তর্জগতেও গুণত্রয় যে পরিবর্ত্তন সম্পাদন করে তাহাকেও Evolution নামে আখ্যাত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ যে Infiite energyই ব্রহ্ম, তাহা গুণত্রয় নামে পরিচিত হইয়া,একই পদ্ধতিতে যে অন্তর্ ও বহির্জগতে কার্য্য করিতেছে, অবিদ্যা দূর হইলে লোকে এই তত্ত্বটী অনুভব করেন। বিশুদ্ধজ্ঞানের সঞ্চার হইলে, বিশ্বের দৈনন্দিন কার্য্যেও আমরা 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই প্রসিদ্ধ বাক্যের পরিচয় পাই।

অন্তর্জগতে অবিদ্যার অনুরূপ বস্তু।

'বিজ্ঞানের আলোকে অবিদ্যায় তত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে, ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে (৩৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা)। ঐ সকল বিষয়ের পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন।

যাহাকে আমরা 'অবিদ্যা' বলি, তাহার কার্য্য হইল প্রকৃত জ্ঞানকে আবরণ করিয়া মতিকে ব্রহ্ম হইতে দূরে নিক্ষেপ করা। এই জন্য অবিদ্যার অপর একটী নাম হইল 'আবরক-বিক্ষেপ' শক্তি। এখন দেখা যাক্ যে,জড়-জগতে 'আবরক' শক্তির অনুরূপ কোন প্রবল শক্তি কার্য্য করিতেছে কি না। এই উপলক্ষে দেখা আবশ্যক যে, জড়জগতে কি এমন কোন শক্তি আছে, যাহা বস্তুর কতক গুণকে অর্থাৎ characteristicকে (ক) ঢাকিয়া রাখিতে পারে কি না, এবং (খ) ঐ গুণের বদলে অপর কোন গুণকে প্রকাশ করিতে পারে কি না।

আমরা দেখিতে পাই যে, যখন Evolution কার্য্য চলিতে থাকে, তখন বস্তুনিচয়ের গুণে বহু পরিবর্ত্তন হয়। দেখা যায় যে, (ক) কোন কোন বস্তুর শৈত্যভাব দূর হইয়া উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, (খ) যাহা পূর্ব্বে হয়ত কষায় রসযুক্ত ছিল তাহা মধুর হয়, (গ) যাহা অম্ল ছিল তাহা অপর রসযুক্ত হয়,(ঘ) এবং যাহা সুঘ্রাণযুক্ত ছিল তাহা পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

এই উপলক্ষে মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে, বস্তুতে এই সকল নূতন ভাব কোথা হইতে আসে? কোন ভাব ত বাহির হইতে উড়িয়া আসিতে পারে না। যাহা লীন ছিল তাহাই প্রকটিত হওয়া সম্ভব এবং যাহা প্রকট ভাবে থাকে তাহাই প্রচ্ছন্ন হয়, ইহাই হইল পরিবর্ত্তনের রহস্য। অতএব পরিবর্ত্তন কালে কোন বস্তুতে যে সকল নূতন গুণের প্রকাশ হয়, সেই গুণসকল অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই ঐ বস্তুতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, এবং কোন অনুকূল শক্তির সংযোগের দ্বারা আচ্ছাদক শক্তি দূর হওয়ার পরে, যে গুণ সকল প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, তাহাদের মধ্যে কতক গুণ যেন নূতন আকারে প্রকাশিত হয়। এই নব প্রকাশিত গুণকে আমরা ঐ বস্তুর নূতন ধর্ম্ম বলি।

Evolution কার্য্য দ্বারা যে, কেবল বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত কতক গুণের প্রকটনই হয়, তাহাই নয়। কতক গুণ (অর্থাৎ বস্তুর ধর্ম্ম) যাহা প্রকটিত অবস্থায় ছিল তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাহা আচ্ছাদিত হয়। আম কাঁচা অবস্থায় থাকার সময় তাহাতে যে অম্ল রস প্রকাশিত ভাবে থাকে, পক্ক অবস্থায় ঐ রস প্রচ্ছন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং যে মধুর রস প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তাহা প্রকাশিত হয়। জড়-জগতে আবরক এবং প্রকাশক এই উভয় শক্তি কার্য্য করে বলিয়াই এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়।

অন্তর্জগতে আবরক এবং প্রকাশ শক্তির কার্য্যও ঐ ভাবে চলে। আবরক শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়াতে, যখন অন্তরে কোন গুণ প্রচ্ছন্ন হইয়া অপর কোন গুণের বৃদ্ধি হয়, ঐ কার্য্য এবং এক রসের তিরোভাব

হইয়া অপর রসের প্রকাশ হওয়া, এই উভয় কার্য্যই শক্তির একই রকমের ক্রিয়া।

সংক্ষেপে বলি যে, অন্তর্জগতে কার্য্য করার সময়ে প্রকাশ শক্তি যেমন কতক লীন ভাবকে বাহির করে, জড়জগতেও তেমনি কতক লীন গুণ বাহির হয়। আবরক শক্তি অন্তর্জগতে কার্য্য করার সময়ে যেমন কতক প্রকটিত গুণকে আচ্ছাদিত করে,জড়জগতেও Evolution শক্তির কার্য্যের সময়ে তেমনি কতক গুণ আচ্ছাদিত হয়।

Chemistry অর্থাৎ রসায়ণ শাস্ত্রে জড় বস্তু সকলের compound প্রস্তুত, অর্থাৎ সংযোগ এবং বিয়োগ কার্য্য, উপলক্ষে কতক (ক) প্রচ্ছন্ন ভাবের প্রকটন এবং (খ) কতক প্রকটিত ভাবের আচ্ছাদনের, ভূরি ভূরি পরিচয় পাওয়া যায়।

জড়জগতেও বিপদ আছে

এক Evolution শক্তিই অন্তর্ এবং বহির্জগতে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। জড়-জগতে বস্তু সকলের মধ্যে যে ভাবে বিভিন্ন গুণের আচ্ছাদন ও প্রকটন চলিতেছে, তাহা অন্তর্জগতে বিদ্যা এবং অবিদ্যা নামক শক্তি দ্বয়ের কার্য্যের অনুরূপ। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য হই যে,স্থূল বস্তুর মধ্যেও বিদ্যা এবং অবিদ্যার তুল্য শক্তির কার্য্য চলিতেছে। ঐ শক্তির কার্য্যের প্রণালী অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল বিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য-প্রণালীর অনুরূপ। যাহাকে আমরা Evolution বলি, তাহা আবরক এবং প্রকাশ নামক শক্তিদ্বয়ের কার্য্যেরই নামান্তর মাত্র। আমাদের অন্তরে ও বাহিরে ঐ কার্য্য একইভাবে চলিতেছে।

আমাদের অন্তরে যখন প্রকাশ এবং আবরক শক্তির মধ্যে সংঘর্ষণ হয়, তখন আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য এবং মনঃপীড়া জন্মায়। ঐ অবস্থাকে আমরা বিপদ বলি। এইরূপ চাঞ্চল্যের নিদর্শন বহির্জগতেও দেখা যায়। নিম্নে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে।

Molecular disturbance

রসায়ণ শাস্ত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, একই বস্তুর উপর যখন দুইটী বা ততোধিক বিপরীত শক্তি কার্য্য করে, তখন তাহার অণু পরমাণুতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া অণু সকলের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিপৎকালে আমাদের অন্তরে যে চাঞ্চল্য হয়, সেই উত্তেজনা নামক বস্তুটী জড় বস্তু সকলের অণু পরমাণুর মধ্যে চাঞ্চল্যের তুল্য বস্তু। উত্তেজনার সময়ে জড়বস্তুর মধ্যেও যাতনার সঞ্চার হয় কি না, লেখক তাহা বলিতে অক্ষম। জড়বস্তুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিচার করিয়া কোন শাস্ত্র বাহির হইয়াছে কিনা, তাহা অবগত না থাকাতে, তাহাদের যাতনা হয় কিনা, লেখক তাহা বিদিত নহেন।

তবে মানব এবং তির্য্যকদিগের মধ্যে, মন ও বুদ্ধি নামক বৃত্তিদ্বয়ের সহিত, তাহাদের স্থূলদেহের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায়। এই সম্বন্ধ হইতে অনুমান হয় যে, যদি স্থাবর বস্তুর কোন প্রকার অনুভব শক্তিই থাকে, তাহলে সুখ এবং দুঃখ এই উভয়বিধ ভাবকেই অনুভব করার শক্তি তাহাদের আছে। বোধ হয় যে, সৃষ্টিতত্ত্ব এই মতেরই পোষণ করেন।

স্থাবর যোনিতে পতিত দশায়ও যদি জীবের সুখ ও দুঃখ অনুভব-শক্তি না থাকে, তাহলে সাধনার জন্য প্রেরণাও থাকে না এবং সাধনা করার শক্তিও থাকে না। ঐ পতিত দশা হইতে জীব কোন উচ্চতর যোনিতে উঠিবার সুযোগ পায় না। তাহলে 'বহু স্যাম', অর্থাৎ নিম্নস্তর হইতে উন্নত হইয়া সৃষ্টির উচ্চতম স্তরে গমন করিয়া স্বয়ং ভগবানের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত হওয়া, বিভূর সৃষ্টিলীলার এই মুখ্য অভিপ্রায়টী অসিদ্ধ হয়। ইহা হইতেই পারে না। 'অনুমান' নামক প্রমাণ পদ্ধতি দ্বারা এই বিষয়টীর বিচার করিলে বলিতে হয় যে, স্থাবরগণও যাতনা অনুভব করিতে পারে ও যাতনাভোগ করিয়াও থাকে।

সার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় উদ্ভিদগণের দ্বারা যাতনা অনুভব

শক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে আশা হয় যে, ভবিষ্যতে আরও কতক নূতন আবিস্কার দ্বারা, স্থাবরগণের অনুভব শক্তি উপলক্ষে যে সকল বিষয় অধুনা অনিশ্চিত ভাবে আছে, তাহা ক্রমশঃ সুনিশ্চিত হইবে।

The seed must die to grow again.

ভগবান অন্তর্ এবং বহির্জ্জগতে যে সৃষ্টিলীলা করিতেছেন, যিশুর মুখ হইতে নিঃসৃত উপরোক্ত বাক্য হইতে, সেই লীলার চরম উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাতনার অভিপ্রায়ও যে মঙ্গলময়, যিশুর উক্তিতে তাহারও ইঙ্গিত দেখা যায়। যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদিগের growth অর্থাৎ উন্নতি সংসাধিত হয়, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সংসারে ভাঙ্গা গড়া কার্য্য চলিতেছে।

বাইবেল বলেন যে, **the wages of sin is death**, অর্থাৎ পাপ হইতেই মৃত্যু হয়। লোকে অমরত্ব লাভ করার সুযোগ পাইবে বলিয়াই, সংসারে মৃত্যুর ব্যবস্থা আছে। অতএব যাতনা, এবং যে মৃত্যুকে আমরা যাতনার চরম অবস্থা বলি, সেই মৃত্যুর লক্ষ্যও যে জীবের হিতসাধন করা, এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।

একবিংশ অধ্যায় (দ্বিতীয় অংশ)

উন্নতির সঙ্গে বিপদ বাড়ে, ও বৃদ্ধি দ্বারা আরও উন্নতি হয়

গুণের সংঘর্ষণ ও তাহার শুভফল

প্রকাশ এবং আবরক শক্তিদ্বয় যে পরস্পরকে অবিভব করার জন্য চেষ্টা করে, ঐ কার্য্যটীকে প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই দ্বন্দ যে শুভ ফল প্রসব করে, তাহাও ২৮৪ হইতে ২৮৬ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে।

(ক) যখন আবরক শক্তি প্রকাশ শক্তির উপর আপন প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে, জীব তখন যদি স্থাবর বা তীর্য্যক যোনিতেও অবনত হয়, তথাপিও তাহার পুনরায় উন্নতি লাভের সুযোগ বিলুপ্ত হয় না, কারণ আবরক শক্তি কখনই সত্ত্বগুণকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিতে পারে না। তখনও যে সাত্ত্বিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহারই কার্য্য প্রভাবে জীবের আবার উন্নতি হয়।

(খ) যখন প্রকাশ শক্তি আবরকের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন আবরকের পরিমাণের ক্ষয় হওয়াতে তাহার বল বেশী হয়। অতএব তখন গুণত্রয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ আরও প্রবল ভাবে চলিয়া জীবের উন্নতি হয়।

Electricity শাস্ত্রের দ্বারা মুল্যবান প্রতিপাদন

জীবের যত উন্নতি হইতে থাকে, তাঁহার বিপদও যে তত বেশী বেশী তীব্র হয়, পূর্ব্বে নানা স্থানে এই কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ তীব্রতার কারণ কি? কারণ এই যে, জীবের যখন উন্নতি হয়, সেই উন্নতি দ্বারা বুঝায় এই যে, তাঁহার অন্তরে যে পরিমাণ আবরক শক্তি ছিল তাহার হ্রাস হইয়াছে। হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আবরক শক্তির বল, অর্থাৎ ক্রিয়াপটুতা, বৃদ্ধি হওয়াতে বিপদের তীব্রতার বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭৬ হইতে ২৮২ পৃষ্ঠায়, **Statics** শাস্ত্রের সহিত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, আবরক শক্তির ক্ষয়ের সঙ্গে তাহার ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধিই হয়।

Electricity, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির, কার্য্য উপলক্ষে সম্প্রতি যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা দ্বারা Statics এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদনটী পরিপুষ্ট হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অভ্রান্তভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, Resistance অর্থাৎ বাধা যত কম হয়, Electricityর শক্তি তত বেশী বেশী তেজের সহিত কার্য্য করে। দার্শনিক তত্ত্বের পোষণ উপলক্ষ্যে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটী একটী অমূল্য বস্তু।

প্রকৃতির গুণত্রয়ের অভ্যন্তরে যে energy, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি, নিহিত থাকে, তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণেরই ক্রিয়াশক্তি। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত আবরক-বিক্ষেপের সংযোগে ঐ গুণই প্রকৃতির গুণত্রয়ে পরিণত হইয়াছে; এবং ঐ গুণত্রয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের অভ্যন্তরে নিহিত শক্তির বলেই কার্য্য করে। আবরক শক্তি কখন বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ শক্তিকে, কখন বা ক্রিয়াশক্তিকে, এবং কখনও বা উভয় শক্তিকে খর্ব্ব করে। সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তির সহিত অবিদ্যার 'আবরক'-ধর্ম্মযুক্ত শক্তির সংযোগ হইলে কখন উহার বলের হ্রাস হয়, কখন বা বলের হ্রাস না হইয়া, 'বিক্ষেপ' অর্থাৎ বিপরীত ভাবে কার্য্য চলে।

তখন আবরক শক্তি দ্বারা 'জ্ঞানের' বদলে 'অজ্ঞানের' সৃষ্টি হয় মাত্র; কিন্তু সেই অজ্ঞানের জোর খর্ব্ব না হওয়াতে লোকে বলবৎ ভাবে সেই ভ্রমেরই অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে। অবিদ্যার মোহের প্রভাবে লেখকের নিজের বিচিত্র আচরণের পরিচয় পূর্ব্ববর্ত্তী ২১০ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। **Nonconductive medium,** অর্থাৎ যে আচ্ছাদন বৈদ্যুতিক শক্তির গতির প্রতিরোধ করে, সেই আচ্ছাদনকে অবিদ্যার 'আবরক' শক্তির সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। ঐ **medium** যত পাতলা হয়, বৈদ্যুতিক শক্তি তত বেশী বেশী প্রবল হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, ইহাই হইল বিজ্ঞানের প্রতিপাদন।

অবিদ্যা দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের উপর যে 'আবরক' নামক আচ্ছাদন স্থাপিত হইয়াছে, সেই আচ্ছাদন যত পাতলা হয়, অর্থাৎ যত অবিদ্যার হ্রাস হয়, ততই নিরোধের হ্রাস হওয়াতে সত্ত্বগুণের কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধি হইয়া বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়েরই বলবৃদ্ধি করে, কারণ অবিদ্যা সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশক্তির বলেই কার্য্য করে। সেইজন্য কাহারও অন্তরে তমোগুণের পরিমান যত কম হইতে থাকে, ঐ গুণের ক্রিয়াশক্তির বল তত বেশী হয়। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারা কাহারও চিত্তে তমোগুণের হ্রাস হওয়ার পরে তাঁহার অন্তরে যে সকল

তামসিক সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের ক্রিয়া-পটুতা অধিকতর প্রবল হয়। এইভাবে তমোগুণের বলবৃদ্ধি হওয়াতে, সেই গুণ এবং চিত্তস্থিত সত্ত্বগুণের মধ্যে সংঘর্ষণ চলে। এইরূপ সংঘর্ষণ হইতেই বিপদ জন্মায়। অতএব কাহারও যত আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, তাঁহার বিপদও তত বেশী বেশী তীব্র হয়।

বিপদের কারণ

বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের সহিত আবরক শক্তির সংযোগ হইয়া যে 'মিশ্র-সত্ত্ব' গুণ উৎপন্ন হয়, তাহাই অপরা প্রতির সত্ত্বগুণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রকাশ এবং আবরক উভয় শক্তির মধ্যেই ক্রিয়াশক্তি আছে, ঐ ক্রিয়াশক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে ঐ শক্তিদ্বয় পরস্পরের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে চায়। এইজন্যই গীতায় বলা হইয়াছে যে, গুণত্রয় পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ তাহারা পরস্পরের গতিরোধের চেষ্টা করে; সেই চেষ্টার ফলই সংঘর্ষণ। সংঘর্ষণ চলার সময়ে আমাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য এবং যাতনা হয় (২৮৮-৯২ পৃষ্ঠা)। এই বিক্ষোভের অবস্থাকে আমরা বিপদের অবস্থা বলি।

বিপদই সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম

অনেকে কামনা করেন যে, সংসারে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিষয়-সুখই ভোগ করিবেন, এবং বিষয়সুখ ভোগ করায় সময়ে যেন তাঁহার গায়ে আঁচড়টী না লাগে। তাঁহাদের কল্পনা মনেই থাকিয়া যায়, তাহা কখনই বাস্তবে পরিণত হয় না। 'সংসার' গুণত্রয়ের লীলাক্ষেত্র। গুণত্রয় স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ করিয়া বিপদের উৎপাদন করে।

কাহারও জীবদ্দশায় বিপদের মাত্রা যদি কম হয়, তাহা সৌভাগ্য নহে। কাহারও অন্তরে সত্ত্বগুণের যত হ্রাস হয়, তত প্রকাশ এবং আবরক উভয় শক্তিরই কার্য্যপটুতা কমিতে থাকে। বল কম হওয়াতে

শক্তিদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষণের তেজও প্রবল থাকে না, তাই ঐ সকল লোকের বিপদ তীব্রভাব ধারণ করে না। এবং ঐ সকল লোকের অন্তরে পুনঃ পুনঃ গুণসাম্যের ব্যতিক্রমও হয় না, এই কারণেই তাঁহাদের ঘন ঘন বিপদ হয় না. এবং বিপদ হওয়ার পরে প্রতিকূল গুণদ্বয়ের বলের মধ্যে শীঘ্র সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে শীঘ্র বিপদের নিবৃত্তি হয়। মোটের উপর তাঁহাদের দিনগুলি অনেকটা অল্প ঝনঝাটে কাটে।

অল্প বিপদ হওয়াই কি সৌভাগ্য?

জীবনটা নির্ঝনঝাটে কাটিল, বিপদ যখন হইল, তখন মৃদুভাবেই চলিল, এবং শীঘ্র উহার উপশমও হইল,—এই সব হইল দেখিয়া প্রীতি অনুভব করার সময় লোকে যেন না ভুলেন যে, এই অবস্থা সত্ত্বগুণের 'হ্রাস'ই প্রকাশ করে। এই অবস্থায় তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, অতএব তমোগুণের প্রভাবে তখন জীবের গতি পশুত্ব এবং জড়ত্বের দিকে চলে। অতএব পাঠক নিজেই বিবেচনা করিবেন যে, ইহজন্মে পুনঃ পুনঃ বিপদভোগ করিয়া যে অবস্থায় অনন্ত সুখ পাওয়া যায় সেই দিকে যাওয়া কি সৌভাগ্য নয়? আয়ুস্কালের কএক বৎসরমাত্র নির্ঝনঝাটে কাটাইয়া এই জন্ম এবং মৃত্যুময় সংসারে আবদ্ধ থাকিয়া পশুত্ব বা জড়ত্বের দিকে যাওয়া কি দুর্ভাগ্য নয়?

তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিপদ হওয়া কি দুর্ভাগ্য?

প্রথমে দেখা যাক যে, তীব্র ভাবে বিপদ হওয়ার কারণ কি? কারণ এই যে, সত্ত্বগুণের যত পুষ্টি হয়, তত তমোগুণের পরিমাণ কমিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে আবরক শক্তির বল, অর্থাৎ ক্রিয়াপটুতা, বাড়িতে থাকে। অতএব বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত গুণদ্বয়ের বলবৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষণ প্রবল ভাবে চলে, তাইতেই তখন লোকের বিপদের তেজও বাড়ে। যে ঘটনা (অর্থাৎ যে বিপদ) সত্ত্বগুণের পুষ্টিরই ফল, সেই তীব্র বিপদকে কিরূপে দুর্ভাগ্য বলিব?

নিরবচ্ছিন্ন বিপদ দুর্ভাগ্য কি না তাহা অবধারণ করিতে হইলে উহার কারণও দেখা আবশ্যক। কারণ এই যে, যখন কাহারও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলে, অর্থাৎ, যখন কাহারও চিত্তে অবিরাম গতিতে সত্ত্বগুণের পুষ্টি এবং তমোগুণের হ্রাস হইতে থাকে, তখন পুনঃ পুনঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণের বলের পরিবর্ত্তন হয়। বলের বৃদ্ধি হওয়াতে গুণদ্বয়ের মধ্যে, পুনঃ পুনঃ এবং অধিক হইতে অধিকতর তেজে, সংঘর্ষণ চলে।

অতএব যখন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, অর্থাৎ অবিরাম গতিতে, কাহারও উন্নতি হয়, তখন তাঁহার জীবদ্দশায় বিপদেরও বিরাম থাকে না। ইহাকে কি দুর্ভাগ্য বলা উচিত?

উন্নতি যত বাড়িতে থাকে, সত্ত্ব ও তমোগুণের বলও তত বাড়ে। অতএব ঐ শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষণে যে বিপদ হয় তাহাও যেন মানবকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। যে বস্তু (অর্থাৎ যে নিরবচ্ছিন্ন বিপদ) মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির অবিরাম বৃদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করে, এবং ঐ উন্নতির দশায় বিপদ যখন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে, সেই মূর্ত্তি হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, বিপন্ন মানব উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতেছেন। এই তীব্র বিপদকে কি 'দুর্ভাগ্য' বলা উচিত? ভোগরত মানব মনে করেন যে, ইহ জীবনেই সব শেষ হইল, এবং ইহ জন্মের দিনগুলি আরামে কাটিলেই পুরুষার্থ লব্ধ হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। অবিদ্যা মতিভ্রম উৎপাদন করিয়া সংসারী মানবের অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে।

কেবল আমাদের পুরাণ এবং দর্শন শাস্ত্রেই যে সাধুগণের তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিপদের উল্লেখ ও নিদর্শন দেখা যায়, তাহাই নয়, বাইবেলও বলেন যে, **Scourging** এবং **Crucifixion** ব্যতীত কেহ প্রকৃষ্ট রকমের সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন না। স্বয়ং শ্রীভগবান রামাবতারে তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিপদের আদর্শ দেখাইয়া গিয়া-

ছেন। যিশুর সারাজীবনই বিপদে কাটাতে তাঁহার নাম ছিল **The man of Sorrows.**

বিপদ-মুক্তির উপায়

সংসারে 'অবিদ্যা' আছে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সংযোগ হইয়াছে) বলিয়াই গুণত্রয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ হয়, এবং তাইতেই আমাদের বিপদ হয়। কেহ যদি আপন চিত্ত হইতে অবিদ্যাকে, অর্থাৎ আবরক-বিক্ষেপ শক্তির আচ্ছাদনকে, দূর করিতে পারেন, তাহলে যে বস্তুটী বিপদের মুল, সেই মূলটীরই উৎপাটন হয়। ঐ অবস্থায় উপনীত হইতে মানব বিপদ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হন। এই অবস্থাকেই গুণাতীত অবস্থা বলে। তখন প্রকৃতির গুণত্রয় হইতে আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সংযোগ দূর হওয়াতে সেই গুণত্রয় পুনরায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে পরিণত হয়।

তখন বিশুদ্ধ (অর্থাৎ 'আবরক' রহিত) জ্ঞানের আলোকে আমরা 'তৎ' পদার্থের অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং 'ত্বং' পদার্থের অর্থাৎ নিজের স্বরূপ (অর্থাৎ জীব নিজে যে দেহ হইতে পৃথক, যিনি 'পরা' প্রকৃতি তিনিই জীব হইয়া আছেন, এই তত্ত্বটী) এবং 'মায়া' অর্থাৎ 'অপরা' প্রকৃতির স্বরূপ, এই তিনটী তত্ত্বকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আমরা অনুভব করি।

ভাগবত বলেন যে, যখন অবিদ্যা দূর হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয়, জীব তখন 'স্বে মহিম্নি মহীয়তে', তখন এই সংসারেই জীব এবং ব্রহ্মের মিলনের সুধাময় এবং প্রেমময় উৎসব হয়। জীবকে এই অনন্ত সুখ প্রদানের জন্য প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্মবশে গুণত্রয়ের মধ্যে অবিরত দ্বন্দ চলিতেছে, বিপদ সেই দ্বন্দেরই ফল। এবং যাহাতে বিপদই বিপদ-মুক্তির উপায় হয়, সংসারে তাহারও ব্যবস্থা আছে। সাধনা দ্বারা সত্ত্বগুণের পুষ্টি এবং তাহাতে বলাধান হয়, এবং পুনঃ পুনঃ বিপদ দ্বারা সাধনায় দৃঢ়তা জন্মিলে সাধক সত্ত্বগুণের প্রভাবেই তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া বিপদ হইতে চির-মুক্তি লাভ করেন।

কি ভাবে সাধনা করিলে বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহা এই পুস্তকের পরবর্ত্তী অংশে আলোচনা করা হইয়াছে।

শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে সতর্কতা

অনেকে মনে করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ অথবা দর্শনাদি শাস্ত্র পড়িলেই 'সাধনা' করা হইল। 'সাধনা' পদটী 'সাধি' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ধাতুটীর অর্থ সম্পাদন করা। যে ভাবে শাস্ত্র পাঠ দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তির সাহায্য হয়, সেই প্রকার পাঠই 'অধ্যয়ণ' পদবাচ্য এবং ঐরূপ অধ্যয়ণ কার্য্যকে 'সাধনা' বলা যাইতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক যে, কেবল শাস্ত্র পড়িলেই জ্ঞানলাভ করা যায় না। 'অধ্যয়ণ' পদটীরও গভীর অর্থ আছে। 'অধি' (= অধিকৃত্য) উপসর্গের সহিত গমনার্থ 'ই' ধাতুর সংযোগ দ্বারা 'অধ্যয়ন' পদটীর উৎপত্তি হইয়াছে; অর্থাৎ যে ভাবে পাঠ করিলে মানব পঠিত বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া পঠিত বিষয়ে নিহিত ভাবকে 'অধিকার' অর্থাৎ আপন আয়ত্তে আনিতে পারেন, সেই ভাবে পাঠকেই 'অধ্যয়ন বলা যায়।

অতএব দেখা আবশ্যক যে, অধ্যয়ন কার্য্য দ্বারা শাস্ত্রের মর্ম্ম অন্তরে প্রবেশ করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছে কিনা, এবং বুদ্ধির উপর আপন প্রভাব ব্যাপ্ত করিতেছে কিনা। কেহ যদি কেবল শাস্ত্রের পদ-লালিত্য দ্বারা মুগ্ধ হন, অথবা সুললিত টীকা এবং ভাষ্যের বাক্-সম্পদ লাভ করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন, এবং শাস্ত্রের তত্ত্ব যদি তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আচরণকে পরিচালিত না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির শাস্ত্র পাঠ নিরর্থক হইয়াছে বলিলেও চলে। এই ভাবে শাস্ত্র পাঠ নভেল পাঠের তুল্য মনোরঞ্জনের বস্তু অথবা প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় মাত্র। শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল 'শাসন' করা, অর্থাৎ মানবকে শাস্ত্রের শিক্ষার অনুযায়ীভাবে সংযত করা। 'সংযম' না জন্মিলে শাস্ত্রপাঠ সার্থক হয় না।

কেবল কূট-তর্ক করার ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায়ে শাস্ত্র পাঠ করিলে, আমরা যাহাকে 'পাণ্ডিত্য' বলি, সেই বস্তুটী লব্ধ হয় বটে, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয় না, অর্থাৎ চিত্তে অবিদ্যার শক্তির হ্রাস হয় না এবং কামলোভাদি মলিন সংস্কার সকলও দূর হয় না। তাহাদের কার্য্যবশে 'পণ্ডিতেরও' পুনঃ পুনঃ বিপদ হয়।

শাস্ত্র ভগবানের বাঙ্‌ময় মূর্ত্তি,—এই ধারণার বশে যিনি শাস্ত্রের শরণাগত হন, সেই ভাগ্যবান সাধকের মতি ক্রমশঃ শাস্ত্রের সহিত একাগ্রতা লাভ করে। ঐ একাগ্রতা হইতে ক্রমশঃ 'তদাত্মতা' ভাব জন্মায়। তখন 'বৃত্তিসারূপ্য' নামক নিয়মের প্রভাবে শাস্ত্রের সাত্ত্বিক শক্তি অধ্যয়নকারীর অন্তরে প্রতিফলিত হয়, এবং মতি যদি শাস্ত্রে নিবদ্ধ থাকে, তাহা'লে ঐ শক্তি অন্তরে অবস্থান করিয়া আপন বিমল প্রভা দ্বারা অবিদ্যার হ্রাস করে। এইরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিলে চিত্ত হইতে অবিদ্যা-সৃষ্ট কামলোভাদির সংস্কার সকল দূর হইয়া অধ্যয়নকারীর চিত্ত-শুদ্ধি হয়। এইরূপে পাঠ করিয়া কেহ হয়ত পাণ্ডিত্য-লাভ করিতে না পারেন, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? পল্লবগ্রাহী ভাবে শাস্ত্র-অধ্যয়ণও কখন কখন চরমে হিতকর হয়।

'উপশাস্ত্র' ও শাস্ত্রের বয়ক্রম অনুসারে গুণাগুণ বিচার

আমাদের দেশে কতক উপশাস্ত্রও 'শাস্ত্র' নামে পরিচিত হয়। ঐ সকল শাস্ত্র পড়িয়া উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়। জন সাধারণের অবনতির পোষণ করাতে, উপশাস্ত্র সকল আদৃত হয়।

কেহ কেহ, কোন শাস্ত্র পাঠের পূর্ব্বে,ঐ গ্রন্থ প্রাচীন কি আধুনিক এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই ব্যস্ত হন। Old-wine অর্থাৎ মদ্যের ন্যায় প্রাচীনত্ব বা নবীনত্ব দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সংসারে বিদ্যা এবং অবিদ্যার প্রাদুর্ভাব অনাদিকাল হইতেই আছে,অতএব প্রাচীন হইলেও কোন কোন শাস্ত্র অবিদ্যার কালুস্য থাকাও যেমন বিচিত্র নয়, তেমনি কতক নবীন শাস্ত্রেও মূল্যবান শিক্ষার বস্তু থাকা বিচিত্র নয়। অতএব প্রাচীন বলিয়াই কোন

শাস্ত্রকে আপ্তবাক্য ভাবে সমাদর করিলে যেমন ভ্রমের আশঙ্কা থাকে তেমনি আধুনিক বলিয়া কোন শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করাও অনুচিত। মতি ভগবানের পাদমুলে নিবদ্ধ রাখিয়া শাস্ত্রপাঠ করিলে, ভগবানই শাস্ত্রের গুণাগুণ দেখাইয়া দেন।

একবিংশ অধ্যায় (তৃতীয় অংশ)

ধনাকাঙ্খা সাধনার পক্ষে Septic poison অর্থাৎ তীব্র বিষের তুল্য

ধনাকাঙ্ক্ষা দ্বারা সাধনায় বিঘ্ন

ইতিপূর্ব্বে ৮৬ হইতে ৮৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে কতক আলোচনা করিয়াছি। কাম্যবস্তু মাত্রেই ন্যূনাধিক পরিমানে মোহ উৎপাদন করে, ঐ মোহিকা শক্তিকে অতিক্রম করা প্রায়ই দুঃসাধ্য হয়। অপর বস্তু অপেক্ষা ধনের মোহিকা শক্তিকে অতিক্রম করা অধিকতর দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়। কোন প্রকার সাধন ব্যতীত অবিদ্যার মোহকে অতিক্রম করা যায় না। লোকে যখন ধনাকাঙ্ক্ষার মোহ অতিক্রম করার জন্য সাধনার চেষ্টা করেন; তখন ধন হইতে নানা উপসর্গ জন্মিয়া, মানবের মতিকে মোটেই সাধনমার্গে আসিতে দেয় না, এবং আসার পরেও তথায় থাকিতে দেয় না।

ভগবানের যোগমায়া শক্তির প্রেরণা দ্বারা, অবিদ্যা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে কখন কখন এমন কতকগুলি কার্য্য করার প্রবৃত্তি উৎপাদন করে যে, মানব ঐ কার্য্য করাতে, আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই ভয়ঙ্কর বিপদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। ঐ সকল বিপদ হইতেই কেহ কেহ সাধনা করিতে বাধ্য হন। যাঁহাদের অন্তরে তমোগুণ প্রবল তাঁহাদের মতি সাধনার দিকে না গিয়া আরও অধঃপতন হয়। সেই অধোগতিই পরে উন্নতির সোপান হয়। অতএব ধনাকাঙ্ক্ষা আপাততঃ বহু যাতনার মুল হইলেও এই বিষই পরে অমৃতে পরিণত হইবে বলিয়াই বোধ হয় যে, সংসারে ধনাকাঙ্ক্ষা বস্তুটী আছে।

ধনাকাঙ্ক্ষাই যে মানবের পক্ষে বহু বিপদের মূল কারণ হইয়াছে, ইহা দেখিয়াছি। ঐ কেল্লাটীতে অবস্থান করিয়া অবিদ্যা মানবকে নানাভাবে বিপন্ন করেন, এবং যোগমায়ার প্রেরণা দ্বারা অবিদ্যা লোকের অন্তরে মতিভ্রম উৎপাদন করাতে মতিভ্রমই ঐ আকাঙ্ক্ষাটীকে সুরক্ষিত করে।

ধনাকাঙ্খার অলক্ষিত কার্য্য

তাই দেখা গিয়াছে যে, অপর অনেক বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইলেও ধনাকাঙ্ক্ষা যেন অবিদ্যায় খাস-দখলি যায়গা হইয়া থাকে, তাই ঐ বিষয়ক মোহ অক্ষুণ্ণভাবে থাকে। ধনাকাঙ্ক্ষা যে কত গর্হিত বস্তু, উহা হইতে ঋণ-প্রবৃত্তি, লোভ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কত বিষ উৎপন্ন হইয়া মানবকে জর্জ্জরিত করে, উহা হইতে পুনঃ পুনঃ কত ভয়ঙ্কর বিপদ উৎপন্ন হয়—এই সকল বিষয়ের জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা-মুগ্ধ মানবের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না; এবং আকাঙ্ক্ষার বশে যখন বিপদে হয়, তখনও আশার মাদকতা বজায় থাকে এবং বিপৎকালেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। লোকে মুখে এই বিষয়ে নানাবিধ জ্ঞানের কথা বলে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞান বাক্যেই নিবদ্ধ থাকে; আকাঙ্ক্ষার আবরণ ভেদ করিয়া উহা অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং ধনের প্রতি বিতৃষ্ণাও জন্মায় না।

যখন অপর অনেক বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখনও এই একটী বিষয়ে (অর্থাৎ ধনকামনা উপলক্ষে) মোহ কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকে? উত্তরে বলি যে, যোগমায়ার প্রেরণাই জ্ঞানের আলোকের মধ্যেও অবিদ্যার খাসদখলি বিষয়টীতে অজ্ঞানের অন্ধকার বজায় রাখে। ঐ প্রেরণা দ্বারা বলীয়ান হইয়া আবরক শক্তি ঐ বিষয়ের উপলক্ষে আমাদের বুদ্ধিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, ধনাকাঙ্ক্ষা যে গর্হিত বস্তু, উহা হইতে যে বহু বিপদ জন্মায়, এই ধারণা মোটেই হয় না।

'ইহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, ভয়ঙ্কর বিপদের দ্বারা নিষ্পেষিত

হইয়া এবং বহু চেষ্টা করার পরে, যখন কাহারও মতি সাধন কার্য্যে নিরত থাকে, তখনও, ধনাকাঙ্ক্ষা কোন না কোন প্রচ্ছন্ন ভাব ধারণ করিয়া, এমন অলক্ষিত ভাবে সেই সাধকের মতিকে দখল করে যে, কএক মাস মাত্র সাধনা করার পরে তিনি সাধনা ছাড়িয়া পুনরায় ভোরপুর ভাবে বিষয় চর্চ্চায় নিরত হন। Septic poison নামক বিষ, রক্তের সহিত মিলিত থাকার সময় প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করিতে করিতে, অকস্মাৎ একদিন রোগের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হয়, ধনাকাঙ্ক্ষাও তেমনি অলক্ষিত ভাবে কার্য্য করিতে করিতে অকস্মাৎ একদিন ঘোর বিপদের মূর্ত্তিতে নিজের প্রভাপ প্রদর্শন করে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪৯ পৃষ্ঠায় আত্মজীবনের যে চিত্রের অঙ্কন করিয়াছি, পাঠক তাহাতে দেখিয়াছেন যে, প্রগাঢ় ভাবে সাধনায় নিরত থাকায় সময়ও ধনাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া সেই সাধনাকে পণ্ড করিয়াছিল। পুরাণাদিতেও সাধনকালে অবিদ্যার প্রতাপের নিদর্শন দেখা যায়। সমাধির দশার পরেই পার্ব্বতীর রূপ দেখিয়া মহাদেবের চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল। অবিদ্যার এই প্রতাপের নিরোধ কেবল প্রগাঢ় সাধনা দ্বারাই সম্ভবপর হয়। নিজেই দেখিয়াছি যে, আমি যখন প্রণব ও গায়ত্রী প্রভৃতির তত্ত্ব আলোচনা কার্য্যে এত বিভোর ছিলাম যে, আমার তদানীন্তন অবস্থাকে সমাধির তুল্য অবস্থা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখনও ধনাকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে কার্য্য করিয়া প্রথমে মতিভ্রম এবং ঐ ভ্রম হইতে ভয়ঙ্কর বিপদের সৃষ্টি করিয়াছে।

ধনাকাঙ্ক্ষাই চরমে শ্রেয়ঃ লাভের সোপান

লোকে যখন কতক গূঢ়তম তত্ত্ব চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন, তখনও ধনাকাঙ্ক্ষা গূঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যে বিপদের সৃষ্টি করে, সেই 'বিপদ' প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্য। কারণ, সেই বিপদের যাতনা ভুলিবার জন্য লোকে আরও বেশী দৃঢ়ভাবে সাধনা করে। লোকে প্রথমে will

power, অর্থাৎ মনের জোর, দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হইতে দেয় না; ক্রমশঃ সাধনা হইতেই অন্তরে শক্তি সঞ্চার দ্বারা চিত্তের যে অবস্থা হয়, তাহা 'সম্প্রজ্ঞাত' সমাধির দশার তুল্য। তখন 'বৃত্তিসারূপ্য' নিয়মের কার্য্যের প্রভাবে সাধক ক্রমশঃ আত্মস্বরূপ, ও ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ধনাকাঙ্ক্ষারূপিনী মায়াদেবীর স্বরূপ 'অনুভব' করেন। ইহার দৃষ্টান্তও সংসারে দেখিয়াছি।

দেখিয়াছি যে, একটী লোকের অন্তরে যে ধন এবং যশের কামনা প্রায় ৩৫ বৎসর যাবৎ নানা ভীষণ বিপদের মূল কারণ ছিল, সেই কামনারূপিনী অবিদ্যাই পরে আবরক শক্তির ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয় বিদ্যার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যে মানবকে তিনি সুদীর্ঘকাল যাতনা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরে তিনি আপন বিশুদ্ধ জ্ঞানময় রূপের প্রভা প্রকটন করার পরে, ধন এবং যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রশমিত হইয়াছেন। তাইতেই বলি যে, ধনাকাঙ্ক্ষা বহু বিপদের মূল হইলেও, চরমে মানবকে শ্রেয়ঃ প্রদানের জন্য মায়াদেবীই বাসনা নামক মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানবকে পুনঃ পুনঃ বিপন্ন করেন।

ধন দ্বারা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুখের উপকরণ লব্ধ হয় বলিয়া, জনসাধারণের পক্ষে, এই বিষের তুল্য প্রচণ্ড শক্তি অপর কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাতে আছে কিনা সন্দেহ করি। কামিনীর মোহিকা শক্তি কতক পরিমাণে বয়সের উপর নির্ভর করে, কিন্তু কাঞ্চনের মোহিকা শক্তি ছেলে বুড়ো সকলকেই মুগ্ধ করে।

বয়স যত বেশী হইতেছে ততই দেখিতেছি যে, চরমে অহিতকর, এরূপ কোন বস্তুই সংসারে নাই। এই অধ্যায়ে যে ধনাকাঙ্ক্ষাকে Septic poison অর্থাৎ তীব্র বিষ বলিয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, তাহাই যে পরে অমৃতে পরিণত হয় ইহা স্বচক্ষেই দেখিয়াছি

কৃপণ এবং অমিতব্যয়ী এই উভয়ের মধ্যে কে ভাল

ধন থাকিলেও, যে মানব ঐ ধনকে বিহিত কার্য্যে ব্যয় করিতে

কাতর হন, তাঁহাকে কৃপণ বলে। ভবিষ্যতে অভাব অনাটনের কথা না ভাবিয়া, যে ব্যক্তি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে, সঞ্চিত ধনকে ব্যয় করেন, তাঁহাকে Spendthrift বা অমিতব্যয়ী বলে। কৃপণ ব্যক্তিকে এক রকম 'সংযমী' বলাও যাইতে পারে, কারণ তিনি আপন অন্তরে সুখ কামনাকে দমন করিতে সমর্থ হউন না হউন, বাহ্যিক আচরণ দ্বারা অন্ততঃ সংযমের আদর্শ প্রদর্শন করেন। অমিতব্যয়ী মানব অপেক্ষা কৃপণ মানবের দ্বারা অপরের অনিষ্ট কম পরিমাণে হয়। অনেক সময়ে অমিতব্যয়ী ব্যক্তি আপন দুরাচার দ্বারা সমাজের যে অনিষ্ট করেন, কৃপণ তাহা করেন না।

কৃপণ মানব নিজেই ক্লেশ সহ্য করেন। টাকার অনটন হইলে, অমিতব্যয়ীদিগের কেহ কেহ শঠতা প্রতারণা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থসংগ্রহ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বাবুয়ানার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঋণ করিয়া অপরের টাকা গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ ঋণ অনেক সময়েই পরিশোধ হয় না, কারণ হাতে টাকা আসিলেই কোন না কোন ভোগ বিলাসের উপাদান সংগ্রহ উপলক্ষে তাহা ব্যয় হইয়া যায়, এবং মহাজনের ঋণ বাঁকীই থাকে। অতএব অমিতব্যয়ী ব্যক্তি নিজের অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিৎ আদর্শ প্রদর্শন এবং ঋণ প্রবৃত্তির প্রচার দ্বারা অপরেরও অনিষ্ট করেন। তাই এই শ্রেণীর মানব সমাজের পক্ষে কণ্টকতুল্য হন।

মানুষ কিরূপে কৃপণ হয়

Prudence, Caution প্রভৃতি নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া লোকে গোড়ায় মিতব্যায়ী হন। কিছু ধন সঞ্চয় হওয়ার পরে, ঐ সকল লোকের অন্তরে ক্রমশঃ ধনের উপর 'আসক্তি' অর্থাৎ মমত্বভাব প্রবল হইতে থাকে। মমত্ব ভাব প্রবল হওয়ার পরে, সঞ্চিত ধন হইতে যখন কিছু অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহাদের অন্তরে স্থিত মমত্বভাবের উপর আঘাত পড়ে, তাইতে তাঁহারা কাতর

হন। এই কাতরতা চিত্ত বিকারেরই ফল, অর্থাৎ ধনের উপর মমত্ব ভাবই তাঁহাদের চিত্তে আধিপত্য করাতেই এই কাতরতা জন্মায়।

চিত্তের এই বিকৃতভাব কাহার কাহারও পক্ষে ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কোন বিষয়ে টাকা খরচের আবশ্যক হইলে সেই ব্যয় ন্যায্য কি অন্যায্য, ঐ সকল লোক তাহা বিবেচনা করিতে চান না। ব্যয়ের কারণ সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, ব্যয় মাত্রই ধনের প্রতি মমত্বভাবের উপর আঘাত করিয়া যেন প্রিয় ব্যক্তি বিয়োগের শোক প্রদান করে। কৃপণ মানবের চিত্তের এই বিকার দেখিলে, মনে এই প্রশ্ন উঠে যে, ধন ত মানবের দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তথাপিও ধনের সহিত আমাদের মনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিরূপে জন্মায়?

এই প্রশ্নটীর উত্তরে বলি যে, কিছু ধনলাভের পরে ধনের প্রতি যে আসক্তি জন্মায়, ঐ আসক্তির প্রেরণায় মানব যত চিন্তা করে যে 'ইদমস্তি ইদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্' (অর্থাৎ আমার এত টাকা আছে, আরও এত টাকা হবে), ততই ঐ মানবের চিত্ত ধনের সহিত 'সমানরূপতা' প্রাপ্ত হয়। সমানরূপতা ভাবের শক্তি দ্বারা ধনের উপর মমত্ব ভাব অধিকতর প্রবল হওয়াতে, চিত্তের বিকার জন্মায়। সেই বিকারের বশে কৃপণ মানব ধনকে আপন দেহ, দৈহিক সুখ, এবং কখন কখন জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তু মনে করে। 'বৃত্তি-সারূপ্য' নিয়মের কার্য্যই ঐ চিত্তবিকারের কারণ।

লোকে আদিতে দৈহিক সুখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধন-সঞ্চয় আরম্ভ করে। কিন্তু যখন তাহাদের অন্তরে ধনের প্রতি মমত্ব ভাব সুদৃঢ় হয়, তাহার পরে দৈহিক সুখ আর ধনকামনার মুখ্য লক্ষ্য থাকে না। লোকে তখন ধনকেই সুখের উপাদান বলিয়া মনে করে, এবং ধনের নিজের খাতিরেই ধনলাভের কামনা করে। ক্রমশঃ যখন ধনের উপর মমত্বভাব আরও সুদৃঢ় হয়, তখন মানবের মতি ধনের দ্বারা লভ্য দৈহিক সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল ধনের উপরই নিবদ্ধ হয়। তখন ধনই হয় মুখ্য বস্তু, এবং টাকা খরচ করিয়া কি কি

ভোগের বস্তু সংগ্রহ করিব, মানব সে চিন্তাও করে না। বরঞ্চ ধন ব্যয় করিতে হইবে, এই চিন্তাই কৃপণ মানবের অন্তরে যেন কোন প্রিয়ব্যক্তি বিয়োগের শোক উৎপাদন করে।

চিত্তের এই বিকারের অবস্থায় টাকা খরচে যত মনঃপীড়া জন্মায়, কোন অপর ভোগ সুখ ছাড়িতে তত কষ্ট হয় না। তাই কিছু বেশী খরচ হইবে বলিয়া কৃপণ মানব ভাল 'খাইতে পরিতে' চায় না, নিজের বা প্রিয়জনের রোগ হইলে, কৃপণ ব্যক্তি ঔষধ পথ্য এবং চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হয়। এই বিকারের বশে কেহ কেহ একরকম উন্মাদের তুল্য অবস্থায় হইয়া উপনীত হয়।

এই অবস্থা সমাজে উন্মাদভাব বলিয়া পরিচিত না হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে কোনরকম উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কৃপণ মানব নিজেই চুপ করিয়া এই মোহের ঘোরে কালাতিপাত করেন, অপরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না, এবং তাঁহার উন্মাদভাব হইতে কোনরকম সামাজিক বিপ্লব জন্মায় না। অতএব সমাজ তাঁহার আচরণে হস্তক্ষেপ করে না।

কৃপণের চিত্ত-বিকারের কারণ কি ?

Prudence নামক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া মিতব্যয়িতা নামক অভ্যাসটী কিরূপে কার্পণ্যে পরিণত হয়, এই বিষয়ে কতক আলোচনা উপলক্ষে পাতঞ্জল দর্শনের 'বৃত্তিসারূপ্য' নামক সূত্রটীর উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা যে 'অহং' ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভাব আমাদের স্থূলদেহের সহিত সংযুক্ত হইয়া দেহত্বভাবের উৎপত্তি হয় ও দেহের উপর 'মমত্ব' বুদ্ধি জন্মায়। কিন্তু ধনের উপরে মমত্ব বুদ্ধি যত প্রবল হইতে থাকে, ততই দেহের প্রতি 'মমত্ব' ভাব কতকটা শিথিল হইয়া ধনের সহিত ঐ 'মমত্ব' ভাবের সংযোগ হইতে থাকে। এই বিকারের দশায় কাহার কাহারও নিকট ধন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। তাইতেই কেহ

কেহ নৌকা-ডুবি বা গৃহদাহের সময় ধনরক্ষা করিতে গিয়া প্রাণনাশ করিয়াছেন। প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে ইহা জানিয়াও, কেহ কেহ ঐ কার্য্য করাতে প্রকাশ হয় যে, তাঁহাদের চক্ষে ধন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু ছিল।

এই বিকারের অবস্থায় অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বুদ্ধির বিবেক শক্তি খর্ব্ব হয়, খর্ব্ব হইতে হইতে ঐ শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হয়, তখন অমুক বিষয়ে খরচটা করা উচিত কি অনুচিত, কৃপণ মানব তাহা বিচার করিতেই অক্ষম হন। তাঁহার চক্ষে খরচ মাত্রেই যাতনাপ্রদ হয় বলিয়া তাঁহারা অর্থ ব্যয়কে গর্হিত কার্য্যের ন্যায় বর্জ্জন করিতে চান। কেবল লোকলজ্জার খাতিরে কৃপণ মানব আপন মনের এই প্রকৃত ভাবটী মুখে প্রকাশ করেন না। এই বিকারের দশায় ধনসঞ্চয় করাই কৃপণের নিকট জীবনের পরম পুরুষার্থ হইয়া দাঁড়ায়। কৃপণের এইরূপ শোচনীয় অবস্থাও অবিদ্যার প্রতাপের অন্যতর দৃষ্টান্ত।

এই উন্মাদ ভাবটীকেও মানবের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপদই বলিতে হয়, কারণ ইহা দ্বারা বিশেষরূপে পারমার্থিক অনিষ্ট হয়। কিন্তু সমাজে আমাদের অনেকের মস্তকই এই একই ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডিত হইয়াছে, এবং পারমার্থিক বিপদ হইলেও ঘোর কার্পণ্যের উন্মাদ অবস্থায় লোকে ঐ বিপদের যাতনা বুঝিতে পারে না বলিয়া সমাজে কার্পণ্য দোষটী 'বিপদ' বলিয়া পরিগণিত হয় না।

কৃপণতার ঔষধ

কৃপণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই আপন দোষের শোধন করিতে পারেন না। অবিদ্যার অপর অপর প্রতাপকে জয় করার জন্য যেরূপ সাত্ত্বিক শক্তির প্রয়োজন হয়, এই প্রতাপটীকে জয় করার জন্যও সেই শক্তির প্রয়োজন হয়। অতএব ভগবানের পদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবিদ্যার এই প্রতাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধনা করাই এই রোগের একমাত্র ঔষধ।

কৃপণ অপরের অনিষ্ট করে না, নিজেরই সর্ব্বনাশ করে

আমরা অমিতব্যয়ীর দুরাচার চক্ষে দেখি বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করি, এবং তাহারা কিরূপে অধঃপাতে যায় তাহাও চক্ষে দেখিতে পাই। কিন্তু কার্পণ্য দোষটীও যে পারমার্থিক উন্নতির পক্ষে কত অনিষ্টকর, তাহা আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই না বলিয়াই সেই দোষটীর গুরুত্ব উপলব্ধি করি না।

যখন কাহারও অন্তরে কার্পণ্য দোষ প্রবল হয়, তখন তাঁহার মতি ধনচিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকে, এবং সাধনার দিকে যাইতে চায় না। কোন তীব্র বিপদ, অথবা অপর কোন অনুকূল ঘটনার প্রেরণা, দ্বারা কোন কোন কৃপণ ব্যক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও, অপর নানা ঘটনা হইতে প্রেরণা শক্তি আসিয়া তাঁহার চিত্তকে ঐ কার্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় ধনচিন্তায় ব্যাপৃত রাখিতে চায়। অনেকেই এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজের চিত্তকে বেশীদিন সাধনায় নিবদ্ধ রাখিতে পারেন না।

ধনই মানবের মতিকে ভগবান হইতে বিক্ষিপ্ত করে। বোধ হয় এই কারণেই যিশু বলিয়াছিলেন যে, ধনী ব্যক্তি কখনও মোক্ষলাভ করিতে পারে না। (৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, বিদ্যা নাই, কিম্বা সাধনার জন্য অবসরও নাই, তাঁহার মঙ্গলের উপায়

শাস্ত্র-বিহিত ভাবে সাধনা উপলক্ষে প্রতিবন্ধক

অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়ে সকাম ও নিস্কাম সাধনার জন্য বহুবিধ উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা অন্নবস্ত্র সংগ্রহে

ব্যস্ত, সেই গৃহী লোকের পক্ষে ঐ সকল উপায় অবলম্বনে নানা প্রতিবন্ধক থাকে।

যাগযজ্ঞে বিঘ্ন—যাগযজ্ঞ এবং বিবিধ পূজা কিম্বা ব্রতাদি করিবার জন্য টাকা চাই, লোকবল চাই এবং সময়ের ব্যয়ও করিতে হয়। অর্থাভাবে আমাদের অনেকেরই পেটের ভাত জোটে না, গৃহস্থালীর নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্যই অনেকের লোকাভাব থাকে, তাঁহারা পূজার জন্য টাকা কোথায় পাবেন? যাগ-যজ্ঞাদি করার সময় লোকবলই বা কোথায় পাবেন? যদি তাঁহারা প্রতিদিন দীর্ঘসময় ব্যয় করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও হিন্দুর দৈনিক কর্ম্ম করিতে চান, তাহলে আর চাকুরি ওকালতি বা বাণিজ্যাদি বৃত্তি দ্বারা উদরান্ন সংগ্রহ করার সময় কুলায় না। এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য কেহ যদি আপন বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহলে ঐ সকল লোক নিজে ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ অন্নাভাবে উপবাস করিতে বাধ্য হন। বোধ হয় যে, বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে হাজার করা ৯৯০ জনেরও অধিক লোকের এইরূপ দারিদ্র্য দশা। তাঁহাদের দ্বারা ঘনঘন যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না।

জপে বিঘ্ন—নাম-জপ অপর একটী প্রকৃষ্ট সাধনোপায়। এই উপায়ে সাধনা করা কতদূর সম্ভবপর তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, একাসনে বসিয়া লক্ষ নাম জপ করার জন্য যদি প্রবৃত্তিও হয়, তথাপিও সময়ে কুলায় না। প্রাতে জপে বসিলেও মধ্যাহ্নের পুর্ব্বে ঐ কার্য্য শেষ হয় না। তাহলে আর বেলা দশটার মধ্যে উদরান্ন সংস্থানের জন্য 'কাজে বাহির' হওয়া চলে না। অতএব হয় উদরান্ন সংগ্রহের চেষ্টা ছাড়িতে হয়, নতুবা নিত্য লক্ষ লক্ষ বার জপ ছাড়িতে হয়। ক্ষুধার নিবৃত্তি ত করা চাই, কাজেই লোকে একাসনে বসিয়া লক্ষ লক্ষ নাম জপের চেষ্টা পরিত্যাগ করে।

যোগে বিঘ্ন—যোগ-সাধনা অপর একটী প্রকৃষ্ট সাধনোপায়। এই কার্য্যে সদ্গুরুর প্রয়োজন হয়। এবং যাঁহাদের শ্বাস যন্ত্র দুর্ব্বল,

তাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধধ করিতে গেলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শাস্ত্রপাঠাদিতে বিঘ্ন—শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ সাধনা উপলক্ষেও নানা বিঘ্ন আছে। শাস্ত্র যে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে, সেই ভাষাজ্ঞান অনেকেরই নাই; এবং দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া যে ভাব সকল পুরণাদি শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত থাকে, ঐ ভাবের সহিত অভিজ্ঞতাও আমাদের অনেকের নাই। অতএব ভাষাজ্ঞানের অভাব এবং দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমাদের অনেকেরই ভাগবত গীতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করার শক্তি নাই।

এই ত হইল বিহিত উপায়ে বিবিধ সাধন কার্য্য করিতে গেলে সময় এবং বিদ্যার অভাব বশতঃ প্রতিবন্ধকের পরিচয়। এই সকল কার্য্যে শ্রদ্ধাই সার বস্তু। আমাদের প্রায় সকলের অন্তরেই ন্যূনাধিক পরিমানে শ্রদ্ধার অভাবও আছে। অতএব যাঁহারা অপর বাধা অতিক্রম করিয়া বিহিত উপায়ে সাধনা করেন, শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহাদের পক্ষেও ফললাভের পূর্ব্বে বহু বিঘ্ন ঘটে।

এতগুলি বিঘ্ন অতিক্রম করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। তাই প্রাচীন প্রথায় অনুসরণ করিয়া অনেকেই যথাযথ ভাবে সাধনা করিতে পারেন না। তবে কি মানবের মঙ্গল হইবে না? একেই ত এখন আমাদের দুর্দ্দিশার প্রায় চরম অবস্থা হইয়াছে, আমরা কি ইহা অপেক্ষাও হীনতর অবস্থায় অধিক্ষিপ্ত হইব? এই সঙ্কট দশায় কিসে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচিত হইতেছে।

বলা বাহুল্য যে,যাহার যতটুকু শক্তি ও সুযোগ আছে তাঁহার পক্ষে সেই পরিমানে শাস্ত্র-বিহিত উপায়ে সাধনা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। ঐ কার্য্যে কতকটা ত্রুটী হইলেও উহা হিতসাধক একথা বলা বাহুল্য। এই অধ্যায়ে শুকদেব দ্বারা উপদিষ্ট অপর একটী সাধনোপায়ের

আলোচনা করিতেছি বলিয়া কেহ যেন না ভাবেন যে, প্রাচীন উপায়গুলি পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই উপায়ে সাধনা করার জন্যই অনুরোধ করিতেছি। প্রাচীন ব্যবস্থার উপর লেখকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই তিনি গত ৯ বৎসর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

সাধনায় প্রতিবন্ধক অতিক্রম করার জন্য শুকদেবের ব্যবস্থা

শুকদেব অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট তিনি যখন ভাগবত কীর্ত্তন করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলির প্রভাবে জনসাধারণের অবনতি দ্রুতগতিতে চলিয়া আসিতেছিল, এবং ভবিষ্যতে যে আরও কত বেশী অবনতি হইবে, তাহাও ত্রিকালজ্ঞ শুকদেবের দূরদৃষ্টির অবিদিত ছিল না। বোধ হয় যে, শুকদেব বেশ ভালরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে যে সকল বহুআয়াস-সাধ্য Orthodox সাধনোপায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐ উপায়ে সাধনা করা এই কলিযুগের 'দুর্ম্মেধা', দরিদ্র, রুগ্নদেহ এবং ক্ষীণশক্তি ও অল্পায়ুঃ মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে। এই কারণেই করুণহৃদয় শুকদেব, আমাদের আধুনিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এমন একটী বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ঐ ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া সাধনা করা কোন মানবেরই সাধ্যাতীত হয় না; এবং ঐভাবে সাধনা করিলে শাস্ত্রে বিহিত উপায়ে সাধনার তুল্য শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। শুকদেব দ্বারা নির্দ্ধারিত ঐ বিশেষ ব্যবস্থাটীর আলোচনা করার অভিপ্রায়েই এই অধ্যায়টী পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

এই উপায়ে সাধনা দুঃসাধ্য নয়, এবং পণ্ডিত অথবা মূর্খ, বিশুদ্ধ কিম্বা অপবিত্রচেতাঃ, গৃহী অথবা সন্ন্যাসী, সকল শ্রেণীর মানবই এই শুকদেব দ্বারা নির্দ্ধারিত উপায়ে সাধনা করিতে পারেন। এই উপায়ে সাধনা করিতে হইলে লোকবল বা অর্থবলের প্রয়োজন হয় না,

অন্নবস্ত্র সংগ্রহের জন্য আমাদের যে কাজকর্ম্ম করিতে হয় তাহা ছাড়িয়া এই সাধন-কার্য্যে দীর্ঘ সময়ও অতিবাহিত করিতে হয় না।

আমাদের বঙ্গীয় হিন্দুগণের এখন যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত অপর উপায়গুলি অপেক্ষা এই উপায়টীই যে আমাদের পক্ষে কম উপযোগী, তাহা নয়। তাই শুকদেব দ্বারা উপদিষ্ট উপায়টীর বিষয় নিম্নে কতকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতেছি।

শুকদেবের নির্দ্ধারণ

শুকদেব বলিলেন যে, 'ক্রিয়াবসানে', অর্থাৎ লোকে যে শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করিয়াই সাধনা করুণ না কেন, সেই সাধনার অবসানে, সকলেই যেন 'প্রযতঃ' হইয়া, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট চিত্তে, 'পুরুষস্য স্থবীয়ঃ রূপং' শ্রীভগবানের স্থূলরূপ যে এই বিশ্ব সেই বিশ্বরূপকে, অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং সংহার কার্য্য সম্পাদন উপলক্ষে ভগবৎশক্তি যে অদ্ভুত ভাবে কার্য্য করিতেছে সেই কার্য্য প্রণালীকে চিন্তা করেন। শুকদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্লোকটীকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ
তাবৎ স্থবীযঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত।

শ্লোকটীতে শুকদেব বলিলেন যে,যতদিন ভগবানে 'ভক্তিযোগ' না হয়, ততদিন একাগ্রচিত্তে 'পুরুষের' স্থূলরূপ যে এই বিশ্ব, সেই বিশ্ব-মূর্ত্তিকে 'স্মরণ' অর্থাৎ চিন্তা করিবে। অর্থাৎ ঐ বিশ্ব মূর্ত্তিতে বিভুর সৃষ্টি পালন এবং সংহার লীলার গূঢ়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে, তৎ-সম্বন্ধে 'অনুভূতি' সঞ্জাত হইয়া, যাহাতে এই বিশ্বই যে বিভুর স্বরূপ, এই তত্ত্বটী অনুভূত হয়, এবং যে 'মায়া'-শক্তি দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে সেই 'মায়ার' স্বরূপ, এবং যে ব্রহ্মের ঈক্ষায় প্রেরণায় 'মায়া' শক্তি দ্বারা ঐ লীলা চলিতেছে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপের অনুভূতিও লব্ধ হয়, সেইজন্য 'প্রযতঃ' ভাবে চিন্তা করিবে।

শ্লোকে কএকটী গভীর অর্থযুক্ত কথায় ব্যবহার দেখা যায়। সেই কথা গুলির ভাবার্থের প্রতি পাঠক যেন অতি সাবধানে দৃষ্টি রাখেন। কথা কয়টী এই—'পর', 'অবর', 'বিশ্বেশ্বর', 'দ্রষ্টা', 'পুরুষ' এবং 'ভক্তিযোগ' ; এই কথা গুলির প্রত্যেক কথারই গভীর অর্থ আছে। শ্লোকটীর মোট ভাবার্থ আলোচনা করার পূর্ব্বে উপরোক্ত কথা কয়টির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আলোচনা করিলে, বোধ হয় মোট শ্লোকের ভাববোধে সাহায্য হইতে পারে, তাই প্রথমে ঐ কথা কয়টীর আলোচনা করিতেছি।

'ভক্তিযোগঃ'—প্রথমে 'ভক্তিযোগ' কথাটীর অর্থ কি, তাহাই দেখা যাক্। এই পদটীর উপলক্ষে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে, 'ভক্তি' কাহাকে বলে ? 'ভক্তি' বলিলেই ত চলিত, কিন্তু দেখিতে পাই যে শুকদেব 'ভক্তি' পদের সহিত আবার 'যোগ' কথাটীর মিলন করিয়াছেন। ইহার কারণ কি ? কারণ এই যে, যে অবস্থায় সাধকের মতি, অর্থাৎ মন এবং বুদ্ধি, ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয় সেই অবস্থায় প্রতি ইঙ্গিত করার অভিপ্রায়ে কেবল 'ভক্তি' পদের ব্যবহার না হইয়া, শ্লোকে 'ভক্তিযোগ' পদের ব্যবহার হইয়াছে।

'ভক্তিযোগঃ' বাক্যটীর এই অভিপ্রায় শুনিলে জানিতে বাসনা হয় যে, ভক্তির প্রভাবে যখন 'যোগের' অবস্থার স্ফুরণ হয়, সেই যোগের অবস্থাই বা কিরূপ, এবং ঐ অবস্থায় কি কেবল 'ভক্তিই' হয় অথবা সেই সঙ্গে কি 'জ্ঞানও' হয় ? এবং ঐ সময় ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে কি 'বৈরাগ্যের'ও সঞ্চার হয় ? যে ব্রহ্মের সহিত 'যোগে'র অর্থাৎ মিলনের, উল্লেখ করা হইল, তাঁহাতে একাধারে ভক্তি (প্রেম) জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই তিন বস্তুই বর্ত্তমান আছে, অতএব যখন ভক্তি দ্বারা কাহারও মতি তাঁহার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন 'ভক্তির' সঙ্গে যুগপৎ 'জ্ঞান' এবং বৈরাগ্যের উদয় হয় কি না তাহা জানিবার জন্যও মনে বাসনা হয়।

বিভুর সৃষ্টিলীলা চিন্তা দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার

'পরাবর ব্রহ্ম'—শ্লোকে 'পর', 'অবর' ও 'ব্রহ্ম' এই কথা তিনটীর ব্যবহার হইয়াছে। 'পর' ব্রহ্ম কাহাকে বলে এবং 'অবর' ব্রহ্মই বা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, ব্রহ্মের নামরূপবর্জ্জিত অবস্থাকে 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম অবস্থা বলে। যখন নূতন কল্প (অর্থাৎ সৃষ্টি) আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মের ঐ নামরূপবর্জ্জিত স্বরূপ হইতে অনন্তশক্তি বাহির হইয়া সৃষ্টিলীলা সম্পাদন করে। ভিন্ন ভিন্ন Function অর্থাৎ কার্য্য ভেদে ঐ একই শক্তির নাম হইয়াছে 'পুরুষ' ও 'কাল'।

ব্রহ্মের যে অনন্তশক্তি আছে তাহার সহিত আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সহযোগে তাঁহার বিশুদ্ধা 'পরা' প্রকৃতিই ত্রিগুণময়ী 'অপরা' প্রকৃতি নামে আখ্যাতা হন, এবং ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সংযোগে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের (এই গুণই ব্রহ্মের স্বরূপ) যে ত্রিবিধ রূপান্তর হয় তাহাদিগকে প্রকৃতির 'গুণ'-ত্রয় বলে। ব্রহ্মের ঈক্ষার প্রেরণায় 'ব্রহ্মা' রজোগুণের অবতার 'বিষ্ণু' সত্ত্বগুণের এবং 'রুদ্র' তমোগুণের অবতার হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নয়, তাঁহারা ব্রহ্মেরই রূপান্তর, এইজন্য ঐ অবতারত্রয়কে 'অবর' ব্রহ্ম বলে। বেদকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়। 'অবর' পদের অর্থ পরবর্ত্তী, অর্থাৎ যাহা পরে (অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে) হইয়াছিল তাহাই 'অবর' পদবাচ্য।

ভক্তিযোগ কাহার সহিত হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্লোকে বলিলেন যে 'পরাবরে' 'দ্রষ্টরি', 'বিশ্বেশ্বরে' 'ব্রহ্মণি' অর্থাৎ যে ব্রহ্ম 'পর'ও বটেন এবং 'অবর' বটেন, এবং যিনি 'দ্রষ্টা' এবং যিনি কেবল তোমার বা আমারই 'ঈশ্বর' নহেন, যিনি বিশ্বের 'ঈশ্বর', এরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত ভক্তি দ্বারা যোগই ভক্তিযোগ।

দর্শনের কথার mathematical demonstration অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ আবশ্যক

উপরে আলোচিত শ্লোকে শুকদেব বিশ্বকে 'পুরুষের' 'স্থূলরূপ' বলিলেন অর্থাৎ যে ব্রহ্ম স্বয়ং চিন্ময় হইয়াও বিশ্বের অণু পরমাণুতে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া, তিনি 'পুরুষ' নামে আখ্যাত হন, শুকদেব বলিলেন যে বিশ্ব সেই চিন্ময় ব্রহ্মেরই 'স্থূলরূপ' অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য মূর্ত্তি। ব্রহ্ম স্বয়ং নামরূপ-বর্জ্জিত এবং 'চিন্ময়' হইয়াও লীলার জন্য এই বিশ্বমূর্ত্তি অর্থাৎ 'স্থূলরূপ' ধারণ করিয়াছেন, তাই বিশ্বকে ব্রহ্মের 'পুরুষাবতার' বলে। শুকদেব বলিলেন যে অপর ভাবে সাধন 'ক্রিয়ার' অবসানে সাধক যেন 'প্রযতঃ' হইয়া ঐ স্থূল রূপকেই চিন্তা করেন। প্রথমে এই 'স্থূলরূপ' কথাটীরই আলোচনা করা যাক্।

এখন যুক্তিবাদের, অর্থাৎ Rationalism এর, দিন পড়িয়াছে। বিশ্ব যে-ব্রহ্মের 'স্থূলরূপ' এই মতটী কোন শাস্ত্রে প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই আমরা অনেকে ঐ মতকে সত্য বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহি। আমরা চাই যে, বিশ্ব যে ভগবানের স্থূলরূপ, এই তত্ত্বটী এরূপ সুনিশ্চিত যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হউক যে, ঐ প্রমান যেন mathematical demonstration, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপাদিত বিষয়ের ন্যায়, সুস্পষ্ট হইয়া চিত্ত হইতে সকল সংশয় দূর করে। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের পক্ষেই (আমি নিজেও ঐ শ্রেণীভুক্ত) প্রাচীন শাস্ত্র বাক্যের সার বিষয়গুলিকে আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করিয়া তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতে না পারিলে শাস্ত্রের কথায় শ্রদ্ধা হইবে না। বিশ্ব যে সত্যই 'চিন্ময়' ব্রহ্মের 'স্থূলরূপ' এই কথাটীর উপর আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা না হইলে, শুকদেব ব্রহ্মের যে স্থূলরূপ চিন্তনের উপদেশ দিলেন, আমাদের দ্বারা সেভাবে চিন্তা কখনই সম্ভবপর হইবে না।

নিম্নে দেখাইতেছি যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই দর্শনের বাক্যে পোষকতায় সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়া শ্রদ্ধা উৎপাদনের পরম সহায় হইয়াছেন।

বিজ্ঞান দ্বারা দর্শনের বাক্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

যদি কাহারও অন্তরে বিভূর স্থূলরূপ চিন্তা করিবার জন্য যথার্থ ইচ্ছা থাকে, তাহলে সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান না থাকিলেও দার্শনিক তত্ত্বগুলি যে সত্য ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে বিঘ্ন হয় না, কিম্বা বিশ্ব যে বিভূর স্থূলরূপ, এই তত্ত্বটীর উপলক্ষেও মনে 'খটকা' লাগে না।

যাঁহারা বিবিধ বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদেরও যদি সাধনা করার জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকে তাহলে কেহ যেন আশঙ্কা না করেন যে, সাধন কার্য্যে এত সময় ব্যয় করিতে হইবে যে, বৈষয়িক কার্য্য করিতে সময় কুলাইবে না, এবং সেইজন্য অর্থাগমে বিঘ্ন হইবে।

এখন যদি কাহাকে orthodox অর্থাৎ সনাতন প্রথায় অনুসরণ করিয়া সাধনা করিতে বলা হয়, তখন কেহ কেহ বলেন যে আমার ভাষাজ্ঞান নাই, দার্শনিক তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারি না অতএব আমি শাস্ত্র পড়িতে অক্ষম, এবং শুনিলেও বুঝিতে পারি না। সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং নামজপের কথা বলিলে, কেহ কেহ বলেন যে আমার সময় নাই এবং মন্ত্রের অর্থও বুঝিতে পারি না, অতএব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমার অন্তরে ভাবের উদ্দীপন হয় না। এইরূপ কোন না কোন কারণে আমাদের অনেকে যথার্থ আগ্রহের সহিত প্রাচীন উপায় অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে পারি না। বিজ্ঞানের কৃপায় ব্রহ্মের স্থূলরূপ চিন্তা উপলক্ষে কোন বিঘ্নই হয় না।

বিদ্যা এবং সময়ের অভাব ছাড়াও সাধনা উপলক্ষে অপর একটী বিঘ্ন বাঁকী থাকে। সেইটীর নাম 'শ্রদ্ধার অভাব'—কেহ জোর করিয়া অপরের অন্তরে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে না। শ্রদ্ধার সহিত প্রেম ভক্তি প্রভৃতি মধুর ভাবের অতি

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। 'জ্ঞান' ব্যতীত শ্রদ্ধা হওয়া দুর্ঘট। অতএব বিশ্ব যে যথার্থই ব্রহ্মের স্থূলরূপ, যাহাতে এই বিষয়ে, কোন সংশয় না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাহা হইলে সাধকের অন্তরে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইতে থাকে, এবং শ্রদ্ধার প্রভাবে তিনি পুনঃ পুনঃ স্থূলরূপের চিন্তা করিতে সমর্থ হন।

বিশ্ব যে প্রকৃতই ব্রহ্মের **Infinite Energy**, অর্থাৎ অনন্ত শক্তির বিকার, এবং বিশ্বের সকল কার্য্য যে তাঁহারই শক্তি প্রভাবে সম্পাদিত হইতেছে, আমরাও যে তাঁহার ঐ শক্তির বিকার, আমাদের মন বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সকলও যে ঐ শক্তির বিকার, এবং যে 'সংস্কার' সকল আমাদের চিত্তে প্রেরণা প্রদান করে তাহারাও যে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তিরই নামান্তর, আমাদের ইন্দ্রিয় সকল যে সেই অনন্তশক্তি প্রভাবেই কার্য্য করে,—এই সকল বিষয়কে সুবিস্তৃত ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে (৩২৭ হইতে ৩৫২ পৃষ্ঠা) এবং এই পুস্তকের অপর অপর স্থানে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিপাদনের আলোকে আলোচনা করিয়াছি।

ঐ অনন্ত শক্তিকে 'ব্রহ্মই' বল; কিম্বা অপর যে কোন নামই দাও, বিশ্ব যে সেই সূক্ষ্ম শক্তির স্থূলরূপমাত্র এই বস্তুটী বিজ্ঞানের প্রতিপাদন দ্বারা অতি সুস্পষ্ট ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাইতেই বলি যে, বিজ্ঞান দ্বারা পুরাণ এবং দর্শনের বাক্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

'পরাবর', ব্রহ্ম, 'দ্রষ্টা' ও 'বিশ্বেশ্বর'.

এই অধ্যায়ের আলোচ্য, শুকদেবের মুখনিঃসৃত শ্লোকটী হইতে কতকটা digression, অর্থাৎ অবান্তর বিষয়ের আলোচনা করা হইল। এখন সেই শ্লোকটীর অভিপ্রায় কি, তাহারই বিচার করা যাক্। শুকদেব বলিলেন যে, যে ব্রহ্ম 'পর' এবং 'অবর', যিনি 'দ্রষ্টা' এবং যিনি 'বিশ্বেশ্বর', তাঁহার সহিত 'ভক্তিযোগ' যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ 'প্রযতঃ' ভাবে তাঁহার স্থূলরূপ যে এই দৃশ্যমান বিশ্ব সেই

বিশ্বকে চিন্তা করিবে। 'ভক্তিযোগঃ' বাক্যের আলোচনা পরে করিব, আপাততঃ শ্লোকে ব্যবহৃত 'পরঃ', 'অবরঃ', 'দ্রষ্টা' এবং 'বিশ্বেশ্বরঃ' এই কথা চারিটী দ্বারা কি বুঝায় তাহাই দেখা যাক্।

পরাবরে ব্রহ্মণি'—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৭৮ পৃষ্ঠায় এই বিষয়টী উপলক্ষে কতক আলোচনা করিয়াছি। গীতার একটী শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে,

> যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং অক্ষারাদপিচোত্তমঃ
> তস্মাৎ বেদে চ লোকে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নামরূপ-বর্জ্জিত হইলেও, সৃষ্টিলীলা সম্পাদনের জন্য ঐ নামরূপ-রহিত অবস্থা হইতেই তিনি বহুবিধ অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কার্য্য অর্থাৎ Function ভেদে তিনি যে সকল অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কএকটীর উল্লেখ ৪৭৮ পৃষ্ঠায় করিয়াছি। 'পর'-ব্রহ্ম পদ দ্বারা ব্রহ্মের কোন অবস্থা বুঝায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, যে নামরূপ বর্জ্জিত অবস্থায় ব্রহ্মের অনন্তশক্তি এবং অনন্ত বিভুতি লীনভাবে থাকে, 'পর' পদ দ্বারা ব্রহ্মের সেই অবস্থাই বুঝায়।

সৃষ্টিলীলা সম্পাদনের জন্য ঐ 'পর'=প্রকৃষ্ট, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম, অবস্থা হইতে ব্রহ্মের বিবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত অবস্থার প্রকটন হয়। ঐশ্বর্য্যময় অবস্থায় তিনি কখন 'পুরুষ', কখন বা 'বাসুদেব', কখন 'বিষ্ণু', এবং কখন বা 'মহেশ্বর', ইত্যাদি নামে আখ্যাত হন। ইঁহারাও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন। ইঁহাদিগকে 'অবর' ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্মের এই 'পর' এবং 'অবর' নামক দ্বিবিধ অবস্থা প্রকাশের জন্য শুকদেব 'পরাবরে ব্রহ্মণি' বাক্যদ্বয়ের ব্যবহার করিয়াছেন। দুইটী কথাই ব্যবহার করার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, যখন ব্রহ্মের সহিত 'ভক্তিযোগঃ' হয়, তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া ব্রহ্মের নির্গুণ এবং গুণময় এই অবস্থা দ্বয়ের অভেদত্ব অনুভূত হয়। 'অবর' ব্রহ্ম পদ দ্বারা বেদও বুঝায়, কারণ বেদ জ্ঞানময়।

দ্রষ্টা—শ্লোকে 'দ্রষ্টরি' পদের ব্যবহার দেখা যায়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মের সেই অনন্ত জ্ঞানময় অবস্থা বুঝায়, যে অবস্থায় সৃষ্টির কোন বস্তু, কোন ঘটনা, অথবা কোন বিষয়ই ব্রহ্মের অবিদিত থাকে না। ঐ অবস্থায় তাঁহার যোগমায়া নাম্নী ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, তাঁহার কাল-শক্তি (অর্থাৎ অনন্ত শক্তি) বিক্ষোভিত হয়, এবং ঐ যোগমায়া শক্তির, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছাশক্তির, পরিচালনা দ্বারা কালশক্তি এবং মায়াশক্তি যুগপৎ কার্য্য করিয়া সৃষ্টিলীলা সম্পাদন করেন। বিশ্বের সকল ঘটনাই যে ব্রহ্মের 'ঈক্ষাচোদিতঃ' অর্থাৎ ঈক্ষার (=ইচ্ছাশক্তির) প্রেরণা দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, এই ভাবটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্লোকে 'দ্রষ্টরি' পদের ব্যবহার হইয়াছে। এই জন্যই ব্রহ্মাকে ইচ্ছাময় বলে।

মনিবের চোখের ইসারায় যেমন ভৃত্যগণ কার্য্য করে, ব্রহ্মের ইচ্ছায় তেমনি কালশক্তি এবং মায়াশক্তি কার্য্য করেন। অতএব ভাষান্তর ব্যবহার করিয়া ভাগবত বলেন যে, ব্রহ্মের 'ঈক্ষাচোদিতঃ' হইয়া, অর্থাৎ ঈক্ষায় (ইচ্ছায়) প্রেরণা দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, কালশক্তি এবং প্রকৃতির গুণত্রয় আপন আপন কার্য্য করিতেছেন।

বিশ্বেশ্বর—'ঈশ্বর' পদ দ্বারা নিয়স্তৃত্ব বুঝায়। যিনি আত্ম-শক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্বের সকল বস্তুকেই সংযত করিতে পারেন তিনিই বিশ্বেশ্বর। এই ভাব প্রকাশের জন্যই ভগবান বলিয়াছেন যে,

মদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ
বর্ষতীন্দ্র দহত্যগ্নিঃ মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ

'যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং', ব্রহ্মকে দেবগণ ত ভয় করেনই, যে মহাকালকে দেবগণও ভয় করেন তিনিও যে ব্রহ্মের ইচ্ছার অধীন সেই ব্রহ্মই 'বিশ্বেশ্বর' পদবাচ্য। এই পদটী দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত এবং অদম্য শাসন শক্তি উপলক্ষিত হইল।

একটী আপত্তি খণ্ডন—কেহ হয়ত বলিবেন যে, ভগবান যদি 'দ্রষ্টা' হইয়া সকল বস্তুর পরিচালনই করিতেছেন, তাহা হইলে তিনিই

আবার 'বিশ্বেশ্বর' রূপে নিজেরই কার্য্যকে শাসন, অর্থাৎ সংযত, করার প্রয়োজন কি? তাঁহার আপন কার্য্য ত কখনই অসংযত হইতে পারে না, তবে আর শাসনের প্রয়োজন কোথায়?

উত্তরে বলি যে,সৃষ্টিলীলা সম্পাদনের জন্য তিনি আপন ইচ্ছাতেই আপন চিত্তদ্ধ সত্ত্বের সহিত আবরক-বিক্ষেপ শক্তির সংযোগ করিয়া এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ঐ আবরক-শক্তির প্রভাবেই নানা কুৎসিৎ বস্তুর এবং কুপ্রবৃত্তির উৎপাদন হয়; এবং ঐ সকল বস্তু জন্মিলে যাহাতে গুণত্রয়ের স্বাভাবিক কার্য্য দ্বারা জীবের নির্য্যাতন এবং কদর্য্য ভাবের শোধনও হয়, সৃষ্টিতে তাহার ব্যবস্থাও আছে। নির্য্যাতনের ক্লেশভোগ করিতে করিতে জীব যাহাতে সাধনমার্গে আগমন করিয়া ক্রমশঃ স্বয়ং ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত হইয়া বিভুর সৃষ্টিলীলার অভিপ্রায় (অর্থাৎ 'বহু স্যাম' = নিজের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত হইব, এই অভিপ্রায়) পূর্ণ করিয়া ব্রহ্মের তুল্য উৎকর্ষলাভ করিতে পারে, সংসারে তাহারও সুচারু ব্যবস্থা আছে।

অতএব আপন অবিদ্যা শক্তি দ্বারা জীবকে বিপথে লইয়া যাওয়া, এবং তাহার পরে আপন কালশক্তি দ্বারা জীবকে শাসন করা,— এই উভয় কার্য্যই ব্রহ্ম দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাঁহার একই শক্তি দ্বারা এইরূপ বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠানই হইল ব্রহ্মের সৃষ্টিলীলার বৈশিষ্ঠ্য এবং মুখ্য অঙ্গ। যে 'জীবকে' তিনি যাতনা দেন, সেই জীবও তাঁহা ছাড়া নয়। 'জীব' ব্রহ্মেরই 'পরা' প্রকৃতি, অতএব তাঁহা হইতে অভিন্ন। অতএব সার কথা এই যে, 'বহু স্যাম' অর্থাৎ ব্রহ্মের নিজের তুল্য উৎকর্ষ সমন্বিত বহুমূর্ত্তির প্রকটনের জন্যই, কল্প হইতে কল্পান্তরব্যাপী অনন্ত কাল হইতে এই সংসারে হাঁসি-কান্না চলিয়া আসিতেছে।

'পুরুষস্য স্বকীয়ঃ রূপং'— যিনি 'পুরে' = সর্ব্ব বস্তুতে, 'শেতে' = শয়ন অর্থাৎ অবস্থান করেন, তাঁহাকে 'পুরুষ' বলা যায়।

তাঁহার 'স্থবীয়ঃ রূপং'—স্থূলরূপ যে এই দৃশ্যমান বিশ্ব। পুরুষ স্বয়ং চিন্ময় এবং অরূপ। তিনি অরূপ হইয়াও যে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই রূপের রহস্যকে চিন্তা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চদশ আধ্যায়ে (৩২৭—৫০ পৃষ্ঠা) দেখাইয়াছি যে, বিশ্ব যে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির বিকার, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই দার্শনিক তত্ত্ব-কথাটীকে অভ্রান্ত সত্যভাবে, প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শুকদেবের উপদেশের মর্ম্ম

শুকদেব বলিলেন যে 'ক্রিয়াবসানে', অর্থাৎ যোগসাধন, নামকীর্ত্তন ও শাস্ত্র-অধ্যয়ন এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়াই সাধনা কর না কেন, সেই কার্য্য শেষ হওয়ার পরে, 'প্রযতঃ' =চিত্তকে 'প্র' অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে 'যতঃ'=আয়ত্ত করিয়া, অর্থাৎ চিত্ত হইতে অপর সকল প্রকার চিন্তা দূর করিয়া সম্পূর্ণ একাগ্রভাবে, আপন চিত্তকে বিভুর সৃষ্টিলীলায় রহস্য চিন্তাতেই নিবদ্ধ রাখিবে।

তখন সাধকের অন্তরে কি রকম চিন্তার উদয় হইবে ? উত্তরে বলি যে, মন ত কখন চিন্তাশূন্য থাকে না, অতএব ঐ অবস্থায় বিশ্বই যে বিভুর স্থূলরূপ, তিনি কিভাবে বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং সংহার লীলা সম্পাদন করিতেছেন, সেই তত্ত্ববিষয়ক চিন্তাতে সাধকের মন নিবদ্ধ থাকিবে। 'স্মরেত' পদে 'স্মরণ' কথাটীর অভিপ্রায় এই যে, সাধক বিভুর সৃষ্টি পালন ও সংহার লীলা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের অবধারণা করিয়াছিলেন চিত্তে পুনঃ পুনঃ সেই বিষয়গুলির চিন্তা করিবেন।

পুনঃ পুনঃ এই সকল গূঢ়তত্ত্ব 'স্মরণ' অর্থাৎ চিন্তা করিলে কি উপকার হয় ; তাহাই দেখা যাক্। প্রথমতঃ ত চিন্তার ধারাবাহিকতা (continuity of thought) সুরক্ষিত হয় এবং বুদ্ধির গতির সম্প্রসারণ হইয়া বহু বিষয়ে যে সকল অবধারণা পূর্ব্বে হয়ত অস্পষ্ট ছিল তাহা সুস্পষ্ট হয়। [এই বইখানি লিখিতে লিখিতে

আমি নিজেত দেখিয়াছি যে, পূর্ব্বের অনেক অবধারণা যাহা ভুলিয়া যাইতাম, তাহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করাতে আর বিস্মৃত হই না। এবং অনেক সংশয়ও দূর হয়। অবিদ্যাই স্মৃতিলোপ করায়, এবং সুস্পষ্ট ধারণায় ব্যাঘাত করে। অতএব 'স্মরেত' শব্দটীর যে অর্থগৌরব আছে লেখক নিজেই তাহা দেখিয়াছেন]।

অকালে সাধনা পরিত্যাগের আশঙ্কা

কেহ কেহ হয়ত সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন ইহা মনে করিয়া এই চিন্তন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন। এইভাবে যাহাতে সাধনা পণ্ড না হয় সেই জন্য শুকদেব বলিলেন যে, 'যাবৎ পরাবরে বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ ন জায়েত', অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভা চিত্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া 'পর' এবং 'অবর' ব্রহ্মের স্বরূপের উপলব্ধি করিতে না হয়, এবং যতদিন সাধক তাঁহাকে বিশ্বের 'নিয়ন্তা' ভাবে উপলব্ধি না পারেন, এবং তিনিই যে 'দ্রষ্টা' ভাবে সংসারের সকল কার্য্য করাইতেছেন এই তত্ত্বটীকেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে অনুভব করিতে না পারেন ততদিন ত সৃষ্টিতত্ত্ব স্মরণ করিতেই হইবে।

কেবল এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চারই যে 'স্মরণ' কার্য্যের মুখ্য লক্ষ্য ও মুখ্য ফল হইবে তাহাই নয়, ঐ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিরও সঞ্চার হইতে থাকে এবং জ্ঞান যত বিশুদ্ধ হইতে থাকে ভক্তিও তত প্রগাঢ় হইতে থাকে। অতএব শুকদেব বলিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তি এত প্রগাঢ় না হয় সেই ভক্তি দ্বারা পরাবর ব্রহ্মের সহিত 'যোগঃ'=মিলন, অর্থাৎ অবিদ্যাসৃষ্ট ভেদভাব দূর হইয়া একীভাব না জন্মায় ততদিন 'স্মরেত' অর্থাৎ ব্রহ্মের স্থূলরূপকে চিন্তা করিবে, ততদিন সাধনা পরিত্যাগ করিবে না।

জ্ঞান এবং ভক্তির যুগপৎ সঞ্চার

'ভক্তি' কাহাকে বলে সেই বিষয়ের বিচার পরে করিতেছি।

আপাততঃ কেবল ইহাই বলি যে, 'পরাবর', 'বিশ্বেশ্বর', 'দ্রষ্ট', এই পদ-ত্রয়ের ব্যবহার দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান সঞ্চারের কথাই উপলক্ষিত হইয়াছে। পাঠক যেন মনে না করেন যে, যে অবস্থাকে 'ভক্তিযোগঃ' বলে, কেবল সেই অবস্থা উৎপাদন করার জন্যই শুকদেব এই উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ জ্ঞান এবং ভক্তি পরস্পর হইতে পৃথক বস্তু নয় এবং যতক্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধ জ্ঞান না জন্মায় ততক্ষণ 'ভক্তিযোগঃ' হয় না। তথাপি যাহাতে কেহ মনে না ভাবেন যে, কেবল ভক্তির সঞ্চারই 'স্মরণের' মুখ্য অভিপ্রায়, সেইজন্য শুকদেব উপরোক্ত কথা তিনটী শ্লোকে ব্যবহার করিয়া ঈঙ্গিত করিলেন যে, ঐ প্রকার জ্ঞানও আবশ্যক।

কিছুদিন সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে কিয়ৎপরিমাণে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রশ্মি যখন কতক পরিমানে আমাদের চিত্তের উপর পতিত হয়, তখন আমরা কতক পরিমাণে ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভব করিতে পারি। তিনিই যে নিয়ন্তা, এবং তাঁহার ইচ্ছাতে সর্ব্বকার্য্য হইতেছে এবং কিছুই তাঁহার অবিদিত নাই অতএব তিনি দ্রষ্টা, এই সকল তত্ত্বও কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারি! কিন্তু এই অবস্থায় সাধনা (অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বের 'স্মরণ') ছাড়িলে পূর্ব্বে লব্ধ জ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্বের সাধনা পণ্ড হয়।

বিঘ্ন নিবারণের জন্য শুকদেবের উপদেশ

শুকদেব যতই দূরদর্শী ছিলেন এবং আমাদের দুর্ব্বলতাও তাঁহার অবিদিত ছিল না! অতএব যাহাতে অকালে মানবের সাধনা পণ্ড না হয়, সেই জন্য শুকদেব বলিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত 'ভক্তিযোগের' (ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের সহিত 'যোগ' অর্থাৎ মিলন) না হয় ততদিন সৃষ্টিলীলাকে চিন্তা করিবে। 'যোগ' পদ দ্বারা মিলন বুঝায়, কিন্তু এই মিলন কেবল ব্রহ্মের সংস্পর্শে আসা মাত্র হয়।

যে মিলন হইলে দুইটী বস্তু যেন অভেদভাবে যোড়া লাগে,

'ভক্তিযোগ' পদ দ্বারা সেইরূপ মিলনের কথাই বলা হইতেছে। এই অবস্থায় অবিদ্যাসৃষ্ট 'ভেদভাব' ও 'অহঙ্কার' দূর হইয়া জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে এমন সুদৃঢ় একীভাব প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কোন কারণেই জীব আর ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। লেখক এই কথাগুলি আপন কল্পনা হইতে বলিতেছেন না। যে প্রেমের প্রভাবে এই মিলন হয় সেই প্রেমের এতই শক্তি আছে যে, ঐ শক্তি প্রভাবে জীবের মতি কখনই ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না, তাই ভাগবত বলেন যে,—

মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসম্বুধৌ

কেবল সৃষ্টিলীলা চিন্তনের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতম ফল লাভ হয়

কেহ বিদ্যা বা সময়ের অভাবে অথবা শ্রদ্ধা না থাকাতে যদি অপর কোন রকমের সাধনা করিতে না পারিয়া 'প্রযতঃ' ভাবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ একাগ্রতার সহিত, সৃষ্টিলীলা চিন্তা করেন, তখন বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে তিনি অনুভব করিবেন যে, বৈষয়িক কার্য্য করার সময়ও ব্রহ্মের শক্তিই তাঁহার দেহ দ্বারা সকল কার্য্য করাইতেছেন এবং তাঁহার দেহও ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির বিকার মাত্র। লোকে যখন এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন অবিদ্যা আর তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। অতএব তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যও সুশৃঙ্খল ভাবে চলে।

লীলাচিন্তা করিতে করিতে ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই তিন বস্তুই জন্মায়। অতএব যাহা সাধনার শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য, তাহা এই কার্য্য দ্বারা লব্ধ হয়। পরে দেখান হইবে যে, এই সাধনায় পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, বেশী সময় ব্যয়ও করিতে হয় না, এবং এক পয়সাও খরচ নাই এবং কোন উপকরণও সংগ্রহ করিতে হয় না। ৪১৯ ও ৪২০ পৃষ্ঠায় নাম-জপ কার্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা সুসাধ্য সাধনা বলিয়াছি,

কিন্তু ঐ কার্য্য করিতেও সময় লাগে। লীলাচিন্তনে বেশী সময়-ব্যয় করিতে হয় না। অতএব সংসারে নানা বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত লোকের পক্ষে বিভুর সৃষ্টি-লীলা চিন্তনে বিশেষ সুবিধা আছে।

লীলাচিন্তন করিতে করিতে কিরূপে ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, তাহার আলোচনা করা যাক্। 'ভক্তি' বস্তুটী জ্ঞানেরই রূপান্তর। 'ভক্তি' যে কি বস্তু, তাহা প্রথমে বিশদ করা যাক্, তারপর লীলাচিন্তা দ্বারা কিরূপে ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ভক্তি কাহাকে বলে

'ভক্তি' পদটী ভজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ধাতুটীর অর্থ সেবা করা। সেবা কার্য্যের কোন না কোন 'হেতু', অর্থাৎ motive প্রায়ই থাকে, অর্থাৎ কোন না কোন ইষ্ট বস্তুর লাভ অথবা অপর কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোকে অন্যের সেবা করে। যে ভক্তির মূলে কোন 'হেতু' থাকে, তাহাকে 'সকাম' ভক্তি বলে। কাম্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিকৃষ্টত্বের ন্যূনাধিক্য অনুসারে, সকাম ভক্তিকে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

যে ভক্তিতে কোন প্রকার ইষ্টবস্তু লাভের জন্য কামনা থাকে না, যাহা কেবল প্রেমের প্রেরণা হইতেই জন্মায়, তাহাকে 'নিষ্কাম' ভক্তি বলা যায়। যে ভক্তির মূলে কোন কামনাই নাই, ভূগর্ভ হইতে যেমন জলের ফোয়ারা উত্থিত হয়, তেমনি যে ভক্তি স্বতঃই মানবের অন্তরে উদ্ভূত হইয়া চিত্তকে যেন সুধা দ্বারা প্লাবিত করে, সেই ভক্তিকে অনিমিত্তা ভক্তি বলা যায়। এই বস্তুটী কি তাহা পরে আলোচিত হইবে।

'ভক্তি' উপলক্ষ্যে পতঞ্জলির মত

পতঞ্জলি তাঁহার প্রণীত দর্শন শাস্ত্রে বলেন যে, পরানুরক্তিরী-শ্বরে, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি 'পরা' অনুরাগকে ভক্তি বলা যায়। এই সূত্রটীতে 'পরা', 'অনুরাগ', এবং 'ঈশ্বর' এই কথা তিনটীর প্রতি কথারই অর্থগৌরব আছে। 'পরা' পদের অর্থ প্রকৃষ্টা, অর্থাৎ যাহা অপর সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; 'অনুরাগ' বাক্যটীতে 'অনু' পদের অর্থ অনুসৃত্য অর্থাৎ শরণাগত হইয়া; 'রাগ' পদটী রনজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই ধাতুটীর অর্থ রং করা। কোন বস্তুর 'বর্ণ' (অর্থাৎ রঙ্) যেমন তাহাকে চিনিবার জন্য একটী প্রধান লক্ষণ, সেইরূপ 'অনু' অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুসরণই এই ভক্তির মুখ্য লক্ষণ। এই অনুসরণ কার্য্য হইতেই প্রীতি অনুভূত হয়, কারণ যে ঈশ্বরের অনুসরণ করা যায় তিনি আনন্দময় এবং ঐ আনন্দের আকর্ষণী শক্তিও আছে।

'ঈশ্বর' পদ দ্বারা নিয়ন্তৃত্ব বুঝায়। পতঞ্জলি বলেন যে, যিনি কাল, কর্ম্ম, 'বিপাক' (= কর্ম্মফল) এবং 'আশয়' (অর্থাৎ দেহাদি আশ্রয়) দ্বারা 'অপরামৃষ্ট' অর্থাৎ influenced হন না, সেই 'পুরুষ-বিশেষকে', ঈশ্বর বলা যায়। 'কালকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ'। ঈশ্বরের এই অবস্থা সম্বন্ধে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'অনুভূতি' না হইলে তাঁহার প্রতি পরানুরক্তি হয় না।

অতএব ভক্তিতে—(ক) ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে 'জ্ঞান' অন্তর্নিহিত ভাবে থাকে, (খ) শরণাগত ভাবও থাকে, এবং (গ) শরণাগত হইয়াও আনন্দও থাকে, এবং (ঘ) সেই আনন্দ 'পর' অর্থাৎ বিষয় এবং অপর সকল বস্তু হইতে লভ্য আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু। ঐ আনন্দের তুলনায় অপর সুখ তুচ্ছ বোধ হয়, এইজন্য শ্রেষ্ঠা ভক্তি হইলে অপর কোন রকম সুখের কামনাই থাকে না। অতএব ভক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে 'বৈরাগ্যও' থাকে।

মোটের উপর দেখা গেল যে, পতঞ্জলির দ্বারা যে ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ভক্তির অভ্যন্তরে 'জ্ঞান' এবং 'বৈরাগ্য' অবস্থান

করে। অতএব ভাগবত বলেন যে, যখন কাহারও চিত্ত 'ভক্তিযোগ' দ্বারা বাসুদেবে নিবদ্ধ হয় তখন বৈরাগ্য এবং 'অহৈতুক' জ্ঞান আপনিই জন্মায়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত ঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যৎ অহৈতুকং।

'অনিমিত্তা" ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম

'অনিমিত্তা' অর্থাৎ অহৈতুকী অবস্থাই ভক্তির শ্রেষ্ঠতম স্তর। কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহুতিকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া দেওয়ার সময়, যে শ্লোক দুইটী দ্বারা অনিমিত্তা ভক্তি যে কি বস্তু তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, ঐ ভক্তি জ্ঞান হইতে অভিন্ন। সেই শ্লোক দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মণাং
সত্বে তু একমনসঃ বৃত্তিঃ স্বাভাবিকীতু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা

অন্বয়—দেবানাং [তথা] গুণলিঙ্গানাং [তথা চ] আনুশ্রবিক-কর্ম্মণাং সত্বে তু একমনসঃ [জনস্য] যা [ভক্তিঃ] তু স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ [সা ভক্তিঃ] তু অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ [সা] সিদ্ধেঃ গরীয়সী। যা [তু] আশু কোশং জরয়তি যথা অনলঃ নিগীর্ণং [জরয়তি]।

দেবানাং = ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণের, গুণলিঙ্গানাং = ইন্দ্রিয়গণের (গুণাঃ = বিষয়াঃ, লিঙ্গস্তে যৈঃ, যাহা দ্বারা বিষয় অনুভব করা যায়), আনুশ্রবিক-কর্ম্মনাং = বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদির, সত্বে = সারভূত বস্তুতে, যে বস্তু, অর্থাৎ যে ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণের সারভূত বস্তু, তিনি বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদিরও সারভূত বস্তু, (সেই ব্রহ্মকে 'যজ্ঞপুরুষ' বলে)। যখন কেহ সেই ব্রহ্মে 'একমনাঃ' হইতে পারেন, এবং এই একমনাঃ ভাবই যদি সেই মানবের 'স্বাভাবিকী'

বৃত্তিঃ হয়, তখন যে একমনাঃ ভাব মনের স্বাভাবিকী বৃত্তি হইয়াছে সেই ভাবকে 'অনমিত্তা' ভাগবতী ভক্তি বলে।

দুইটী কথার বিশেষ অর্থ-গৌরব

স্বাভাবিকী বৃত্তিঃ—যাহা স্বভাব (অর্থাৎ স্বস্য = নিজের + ভাব = constitution) হইতে উৎপন্ন, তাহাই স্বাভাবিকী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন যে এই পদটীর ভাবার্থ 'অযত্নসিদ্ধা'। অর্থাৎ যখন কাহারও চিত্তের এমন অবস্থা হয় যে, কোন ভোগ্য বস্তুর অনুসরণ অথবা যুক্তি তর্কের প্রতীক্ষা না করিয়া, মন আপনিই ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, তখনই মনের ঐ বৃত্তি স্বাভাবিকী হইয়াছে, ইহাই দেখা যায়। কপিল দেব অমৃতস্রাবী ভাষায় বলেন,

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসম্বুধৌ

যেমন সন্তানের নাম শ্রবণ মাত্র মাতার মন সন্তানের দিকে ধাবিত হয়, এবং কেহ মনের ঐ গতিকে রোধ করিতে পারেন না, গঙ্গার পূতধারা যেরূপ অবিরতভাবে মহাম্বুধির দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভগবানের কথা শ্রবণ মাত্র যদি আমাদের মন, কোন যুক্তি তর্কের প্রতীক্ষা না করিয়া, প্রবল বেগে ভগবানের দিকে ধাবিত হয়, চিত্তের সেই অবস্থাকে অনিমিত্তা ভক্তির অবস্থা বলে।

একমনসঃ—'এক' অর্থাৎ কেবল একটীমাত্র বস্তুতে (অর্থাৎ ব্রহ্মে) নিবদ্ধ হইয়াছে মন যাঁহার, তিনিই একমনাঃ। সচরাচর আমাদের মন 'অহঙ্কার' নামক বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে এবং ঐ অহঙ্কার প্রভাবে মন বহু ভোগ্যবস্তুতেও নিবদ্ধ থাকে। দার্শনিক ভাষায় এই অবস্থাকে অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট ভেদমোহের ফল বলে। যখন অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় তখন অহঙ্কারেরও নিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ তখন জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে যে কোন ভেদই নাই, এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্ফূরণ হয়। এই অবস্থায় দার্শনিক নাম একীভাব। অতএব 'একমনসঃ' পদটী

ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইল, অবিদ্যার নিবর্ত্তন দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে, চিত্তের এই অবস্থা প্রকাশ করা।

কতক পরিমাণের বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সঞ্চারও হইতে থাকে। কিন্তু তখন 'একমনাঃ' ভাব হয় না, অতএব ঐ ভক্তি, 'অনিমিত্তা' ভক্তি নয়।

অন্তরে কেবল ভক্তির সঞ্চার হইতেছে দেখিয়াই লোকে যাহাতে না ভাবেন যে তাঁহারা সিদ্ধির দশায় আসিয়াছেন, সেই জন্য আমাদিগকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে শুকদেব বলিলেন যে, ঐ ভক্তি যাহাতে স্বাভাবিকী বৃত্তি তুল্য হয়, সেই বিষয়টীই আমাদের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। যখন অবিদ্যার নিবর্ত্তন হইয়া একমনাঃ ভাব জন্মিবে, তখন জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে প্রেমের যে অমোঘ আকর্ষণীশক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবেই জীবের মতি গঙ্গার পূতধারার ন্যায় প্রেমের মহাম্বুধি ব্রহ্মের, দিকে স্বতঃই (অথাৎ স্বাভাবিকী বৃত্তির প্রভাবে) ধাবিত হইবে।

অবিদ্যা নিবর্ত্তন ও সংস্কারের ক্ষয়

জ্ঞান দ্বারা যে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া প্রাক্তন সংস্কারের অবসান হয়, এই তত্ত্বটীকে পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে শুকদেব বলিলেন যে, 'যা' = যে অনিমিত্তা ভক্তি, 'কোশং জরয়তি'— কোশ অর্থাৎ বাসনাময় লিঙ্গদেহকে, 'জরয়তি' = জীর্ণ করে (অর্থাৎ বিনষ্ট করে)। লিঙ্গদেহে সংস্কার সকল অবস্থান করে, বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার সকলও যে অলক্ষিত ভাবে বিনষ্ট হয়, এই কথাটীকে পরিস্ফুট করার জন্য শুকদেব বলিলেন যে, যেরূপ 'অনলঃ নিগীর্ণং [জরয়তি]' অর্থাৎ জঠরাগ্নি যেরূপ অলক্ষিত ভাবে এবং ধীরে ধীরে ভুক্তবস্তু সকলকে জীর্ণ করে, 'অনিমিত্তা ভক্তিও' সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে এবং ধীরে ধীরে 'কোশং' অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরকে, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রাক্তন সংস্কারকে, বিনষ্ট করে। আমাদের

চিত্তের অভ্যন্তরে যখন এই শোধন কার্য্য সম্পাদিত হইতে থাকে তখন আমরা জানিতে পারি না যে. আমাদের অধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে।

'কোশ', অর্থাৎ লিঙ্গশরীর, অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট হয়। ভক্তির সঙ্গে যেমন ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তেমনি অবিদ্যার ক্ষয়ও হইতে থাকে। যখন বিশুদ্ধ জ্ঞান পুর্ণতা লাভ করে তখন সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া জীব সংসার হইতে মুক্ত হয়, ইহাই প্রকাশ করা শ্লোকের অভিপ্রায়।

বৈরাগ্যের সঞ্চার

আমাদের ভোগবাসনা সকল লিঙ্গশরীরকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাই ঐ শরীরের অপর একটি নাম হইল 'বাসনাময়' দেহ। লিঙ্গদেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সকল ভোগবাসনার অবসান হয়, অতএব ভক্তির সঙ্গে যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয় তখন বৈরাগ্যেরও সঞ্চার হইতে থাকে।

সৃষ্টিলীলা চিন্তা দ্বারা কেন বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ভক্তি জন্মায়

Psychology, অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান, হিসাবে পাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্র একখানি অমূল্য গ্রন্থ। 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র', এই নিয়মটীর প্রয়োগ দ্বারা ইতিপূর্ব্বে নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছি। বোধ হয় ঐ নিয়মটীর কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শুকদেব সৃষ্টিলীলা চিন্তার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কেহ যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিপাদনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দর্শনের বাক্যগুলিকে আলোচনা, অর্থাৎ কথাগুলি সত্য কি ভ্রান্ত ইহা যাচাই করেন, তাহলে দেখিতে পাইবেন যে দর্শনের কথাগুলি বাজে কথা নয়, দর্শন যাহা বলিয়াছেন তাহার সারবত্তা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নির্দ্ধারণ-গুলি

সুস্পষ্টভাবে জানিলে, সাধকের অন্তরে দর্শনের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, এবং তখন তাঁহার মতিও অধিকতর সুদৃঢ় ভাবে সৃষ্টি-তত্ত্ব চিন্তন কার্য্যে নিবদ্ধ হয়।

আমাদের চিত্ত স্বভাবতঃ একখানি দর্পণের ন্যায় সচ্ছ বস্তু, 'সচ্ছং ভগবতঃ পদং'। ভাল বা মন্দ যে কোন বিষয়েই চিত্ত নিবিষ্ট হউক না কেন,সেই বিষয়ই চিত্তে প্রতিফলিত হয়। অনাদিকাল হইতে অবিদ্যার বহু সংস্কার চিত্তে অবস্থান করাতে, ঐ সচ্ছ দর্পণখানি যেন ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। অবিদ্যার যে সংস্কার সকল চিত্তে অবস্থান করে তাহারা মলিন বস্তু, অর্থাৎ তাহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত নয়, অতএব যখন আমাদের চিত্তে বহু অবিদ্যার সংস্কার থাকে, তখন চিত্তরূপ দর্পণখানি যেন ধুলি দ্বারা সমাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে।

ময়লা আরসিতে ভালরকম মুখ দেখা যায় না, কিন্তু কতক পরিমাণে দেখা যায়। যখন গোড়ায় গোড়ায় আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক চিন্তা আরম্ভ করি, তখন চিত্তে বহু পরিমাণে অবিদ্যার সংস্কার থাকাতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ঐ মলিন চিত্তে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু কতক পরিমাণে প্রতিভাত হয়; এবং জঠরাগ্নির তেজ মৃদু হইলেও তাহা যেমন কতক পরিমাণে ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করে, তেমনি ঐ অল্পমাত্রার জ্ঞানই কতক কতক সংস্কারকে বিনষ্ট করিতে থাকে।

অতএব পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা সংস্কার সকল ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী পরিমাণে বিনষ্ট হইতে থাকে। বারম্বার মাজাঘষা করিতে করিতে দর্পণের সচ্ছতা যেরূপ বাড়িতে থাকে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা চিত্তের সংস্কার সকল ক্ষয় হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতাও সেইরূপ বেশী হয়। দর্পণ নির্ম্মল হইলে তাহাতে মূর্ত্তি যেরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, নির্ম্মল চিত্তে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ জ্ঞানও সেইরূপ সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয়। অতএব পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিলীলা চিন্তনের ফল দাঁড়ায় এই যে—

(ক) চিত্ত হইতে অবিদ্যার সংস্কার সকল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে।

(খ) সংস্কার ক্ষয় হওয়াতে চিত্ত দিন দিন বেশী বেশী নির্ম্মল হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে গ্রহণ করার শক্তি বাড়িতে থাকে। জ্ঞান গ্রহণ করার শক্তি বাড়িতে বাড়িতে অনুভব করার শক্তিরও সঞ্চার হইতে থাকে।

(গ) দর্প্পণ যত বিশুদ্ধ হয় তাহাতে মূর্ত্তিও তত সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়, অতএব পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা যত চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে, তত আমরা বেশী বেশী অভ্রান্তভাবে সৃষ্টি লীলার যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে পারি। নির্ম্মল দর্পণে কোন মূর্ত্তি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইলে আর কাঁচ খানিকে দেখা যায় না, দর্পণ তখন মূর্ত্তির রূপই প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকে বলে সমানরূপতা প্রাপ্তি। সাধক যখন ব্রহ্মের সহিত সমানরূপতা লাভ করেন তখন কাঁচের ন্যায় তাঁহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ইহাকেই বলে আত্মহারা ভাব।

অতএব পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে আমাদের চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রতিভাত হইয়া ক্রমে ক্রমে যত বেশী সুস্পষ্ট হইতে থাকে, ততই চিত্ত ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে ঐ জ্ঞানের সহিত সমানরূপতা লাভ করে, এবং ঐ জ্ঞানের যে সকল attributes (অর্থাৎ বিভূতি) আছে, সেই বিভূতি সকল এবং জ্ঞানের সহিত 'নিত্যসম্বন্ধ' আনন্দ (ভক্তি এই আনন্দেরই নামান্তর) তখন বেশী বেশী মাত্রায় আমাদের চিত্তে স্ফুরিত হয়। তখন আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্থাৎ 'ভেদভাব' দূর হয়।

এই কারণেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিলীলা চিন্তা করিতে করিতে আমাদের অন্তরে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ 'জ্ঞান' এবং 'বৈরাগ্যের'ও সঞ্চার হয়।

পুনঃ পুনঃ চিন্তার কেন প্রয়োজন হয়

আমাদের চিত্তে এত ময়লা (অর্থাৎ অবিদ্যার সংস্কার) সঞ্চিত

থাকে যে, কেবল অল্পকাল মাত্র অথবা দুই দশ বার সৃষ্টি তত্ত্বের চিন্তা দ্বারা ঐ ময়লা দূর হয় না, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হয় না। বারম্বার চিন্তা করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা চিত্ত হইতে যত ঐ সকল সংস্কার বিনষ্ট হইতে থাকে, তত চিত্তরূপ দর্পনের উজ্জ্বলতা বেশী হয়। তখন জ্ঞানের সম্প্রসারণ ও পুষ্টি হয়, এবং সেই সঙ্গে ভক্তি ও বৈরাগ্যেরও সঞ্চার হয়। কারণ ঐ তিন বস্তুই এক বস্তুর, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই, ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

সেই জন্যই শুকদেব বলিলেন যে, যতদিন 'ভক্তিযোগঃ' অর্থাৎ, ভক্তির দ্বারা ভগবানের সহিত 'যোগঃ' অর্থাৎ একীভাব,না হয়,ততদিন সৃষ্টিলীলার চিন্তা করিবে। যখন 'ভক্তিযোগ' হয় তখন বিশ্ব যেন ভগবানেরই রূপ, এই প্রতীতি স্বতঃই জন্মায়। তখন চিন্তিত বস্তু (অর্থাৎ ভগবানের 'বিশ্বমূর্ত্তি') আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়।

স্বয়ং ব্যাসও সৃষ্টিতত্ত্বের চিন্তাই করিয়াছিলেন

নারদ স্বয়ং 'ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায়, ধীমহি' ইত্যাদি মন্ত্রে (মন্ত্রটী ভগবতের ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) দীক্ষিত হইয়া মন্ত্রের সাধনা দ্বারা সিদ্ধি (অর্থাৎ বিশুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য) লাভ করিয়াছিলেন। নারদ নিজে যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ব্যাসকে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ণের সামর্থ্য প্রদানের জন্য, সেই দীক্ষা-মন্ত্রে তিনি ব্যাসকেও দীক্ষিত করেন, এবং ঐ মন্ত্রের সাধনা করিয়াই ব্যাস—

ভক্তি-যোগেন মনসি সম্যক্ প্রনিহিতেহ মলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াদেবীং অপাশ্রয়াম্
× × ×
অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তি-যোগ মধোক্ষজে

মৎপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় উপরে উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত মন্ত্রটীর সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছি। সেই সকল বিষয়ের পুনরুক্তি না করিয়া, আপততঃ সংক্ষেপে বলি এই যে, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন,অনিরুদ্ধ

ও সংকর্ষণ নামে আখ্যাত শ্রীভগবানের চতুর্ব্ব্যূহ তত্ত্বের লীলা-রহস্য চিন্তা কার্য্য প্রকৃতপক্ষে বিভুর সৃষ্টিলীলার সার তত্ত্বেরই চিন্তা, কারণ ঐ চতুর্ব্ব্যূহ দ্বারাই এই লীলা সম্পাদিত হইতেছে।

এই চিন্তা করিতে করিতে ব্যাসের অন্তরে 'ভক্তিযোগঃ' [কেবল 'ভক্তি' নয়, ভক্তি দ্বারা 'যোগঃ'=ভগবানের সঙ্গে পূর্ণ মিলন, অর্থাৎ ভেদভাব দূর হইয়া 'একীভাবের' প্রতিষ্ঠা] স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানের সঞ্চার হওয়াতে 'পূর্ণপুরুষ' অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের দর্শনলাভ হইল। 'পূর্ণ' পদটীর গভীরত্ব ভাগবতের টীকায় আলোচনা করিয়াছি। এই পদ দ্বারা যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বুঝায় সেই 'চিৎ' নামক বস্তুর সহিত 'আনন্দও' সংযুক্ত থাকে। ঐ বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বিদ্যা এবং অবিদ্যা, আসক্তি এবং বাসনা, প্রভৃতির গূঢ়তত্ত্ব অনুভূত হয়।

তখন 'অনর্থোপশমং'=অবিদ্যার নিবর্ত্তক [নাই অর্থ=বাস্তবতা যাহার, তাহাকে 'অনর্থ' বলা যায়, 'অহং' ভাব এবং কাম লোভ প্রভৃতি 'অনর্থ' পদবাচ্য] 'অনর্থের' অর্থাৎ 'অহঙ্কার' প্রভৃতি অবাস্তব বস্তুর 'উপশম'=নিবর্ত্তন হয় যাহা দ্বারা, এরূপ যে 'ভক্তিযোগঃ' তাহা 'সাক্ষাৎ' ভাবে ব্যাসের 'সম্মুখে' উপস্থিত হইলেন, অর্থাৎ যে ভক্তিযোগের সঙ্গে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া বাস্তব এবং অবাস্তব বিষয়ের পার্থক্য অবধারণের সামর্থ্য প্রদান করে ব্যাস সেই ভক্তিযোগকে 'সাক্ষাৎ'=মূর্ত্তিমান ভাবে দেখিলেন। অর্থাৎ যে অনন্ত প্রেম জীব এবং ব্রহ্মকে কখনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দেন না, সেই বিশ্বপ্রেম যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যাসের জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

অতএব সৃষ্টিলীলা চিন্তনের অপার মাহাত্ম্য আছে, এবং ঐ লীলা-চিন্তা দ্বারাই জীবনের পরমার্থ লাভ করা যায়।

(ক) চতুঃশ্লোকী ভাগবতে সৃষ্টিলীলার সারতত্ত্বই আছে

ব্রহ্মা নারদের নিকট যে চতুঃশ্লোকী ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন (ভাগবত, ২য় স্কন্ধ) তাহাতে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিলীলা চিন্তনের সার তত্ত্বই প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে •

প্রাচীন প্রথায় সাধনা উপলক্ষে বিজ্ঞানের সাহায্য

যাঁহারা প্রাচীন প্রথায় সাধনার পক্ষপাতী, বিজ্ঞান তাঁহাদিগেরও বিশেষ সাহায্য করেন। যাঁহারা ভাষাজ্ঞান থাকাতে মূল দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বিজ্ঞান হইতে দর্শনের বাক্যের প্রতিপোষক প্রমাণ পাইয়া সাধনায় একনিষ্ঠ হন। যাঁহাদের অতদূর বিদ্যা নাই, তাঁহারা যদি অপরের নিকট দর্শনের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া, বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ সকল কথায় যাথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাহলে দার্শনিক তত্ত্বকথায় শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়া সাধনার সাহায্য হয়। সার কথা এই যে, বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিলে দর্শনের বাক্যে শ্রদ্ধা জন্মায় এবং শ্রদ্ধাই সাধনার জীবন।

'জ্ঞান' দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি উৎপাদন

বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভূর সৃষ্টি রহস্য চিন্তা করিলে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া সাধকের মানসিক শক্তি কত প্রবল হয়, তাহার কএকটী দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। ভাগবত বলেন যে, জ্ঞান দ্বারা সাধক 'সম্যক্-দর্শনঃ' হইতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বোধ, বা দুজ্ঞের্য় কোন বিষয়ই থাকে না। ভাগবতের এই বাক্য মোটেই মিথ্যা নয়। বাইবেলও ঐ কথা বলেন, এবং এইরূপ সম্যক-দৃষ্টির দৃষ্টান্তও বাইবেলে দেখা যায়।

আমার সৌভাগ্যক্রমে জনৈক মহিলার সহিত সুপরিচিত হইয়াছি, যাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় প্রায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বলিলেও চলে। তাঁহার সহিত শ্রীমদ্ভাগবত অথবা দর্শন শাস্ত্রের কোন কোন জটিল বিষয়ের আলোচনা করার সময় দেখিয়াছি যে, আমি দার্শনিক 'ভাষ্যের' যে গূঢ় মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারি নাই, কখন কখন তাঁহার সাহায্যে তাহা বুঝিয়াছি; এবং তিনি অনেক সময়ে স্বামী টাকা হইতে যে মধুর রস বাহির করিয়া ভাগবতকে যে ভাবে অমৃতোপম করেন, সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, আমার সে সামর্থ্য, নাই।

এই শক্তি কোথা হইতে আসে ? উত্তরে বলি যে, তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে সচ্চিদানন্দের আনন্দ স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছে ঐ মহীয়সী মহিলা যে গূঢ় তত্ত্বের অনুভব করেন এবং যে মাধুর্য্যের আস্বাদ পান, আমার চিত্ত তত নির্ম্মল না হওয়াতে আমার ঐ শক্তি নাই কাহারও চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, তখন সেই দর্পন তূল্য সচ্ছ পদার্থে ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, এই উভয় বস্তুই প্রতিভাত হয়।

আমরা পাণ্ডিত্য নামক বস্তুটী লাভের জন্যই ব্যস্ত হই। যদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হয় তাহলে শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অনুভব করার সামর্থ্য হয় না। তাই বলি যে, শুকদেবের উপদেশের অনুসরণ করিয়া বিভুর সৃষ্টিলীলা চিন্তা দ্বারা কেহ যদি আপন চিত্তকে বিশুদ্ধ করেন তাহলে শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় তাঁহার অবিদিত থাকে না।

সার কথা এই যে, যথার্থ 'জ্ঞান' (অর্থাৎ যে জ্ঞানই ব্রহ্ম, সেই বস্তুটী) লব্ধ হইলে মানবের অবিদিত কিছুই থাকে না।

যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক পরমহংসগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সগুণ ব্রহ্মের, অর্থাৎ শ্রীহরির, লীলাদির বিষয় পাঠ, শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। সৃষ্টিতত্ত্বে শ্রীহরির লীলাই দেখা যায়। ভাগবত বলেন যে,

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভুতগুণো হরিঃ

'ভক্তি' এবং 'ভক্তিযোগঃ' এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ এক নয়

পাঠকের নিকট সবিনয়ে অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন 'ভক্তি' এবং 'ভক্তিযোগ' এই কথা দুইটার ভাবার্থ একই বলিয়া মনে না করেন। 'যোগ' শব্দের অর্থ মিলন। ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করার পরে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রভাবে সাধক যখন নিজের এবং ব্রহ্মের মধ্যে অভেদত্ব অনুভব করেন, সেই অভেদত্বের, অর্থাৎ একীভাবের,

অবস্থাকে ভক্তিযোগঃ বলে। চিত্তের যে অবস্থায় কেবল 'ভক্তি'র সঞ্চার মাত্র হয়, 'ভক্তিযোগের' অবস্থা তাহা অপেক্ষা বহু উন্নত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সোজা কথায় বিপদের কারণ ও মুক্তির উপায়

শ্রীভগবান স্বয়ং অনন্ত উৎকর্ষের আধার এবং তাঁহার নিজের তুল্য উৎকর্ষ-যুক্ত বহু মুর্ত্তি প্রকটনের জন্য তিনি সৃষ্টিলীলা করিতেছেন। তাঁহার অনন্ত শক্তিই রূপান্তরিত হওয়াতে বিশ্বের প্রকাশ হইয়াছে। শক্তির ঐ রূপান্তরের নামই প্রকৃতির গুণত্রয়। ব্রহ্ম 'অবিদ্যা' নামক আবরক-বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা আপন উৎকর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া যদিও সৃষ্টিলীলা করিতেছেন, কিন্তু যাহাতে অবিদ্যাই অবিদ্যার নিবর্ত্তন করিয়া চরমে জীবকে ভগবানের তুল্য অনন্ত উৎকর্ষ প্রদান করে, তাহার ব্যবস্থাও গুণত্রয়ের শক্তির মধ্যেই আছে।

অবিদ্যা যখন আপন শক্তি দ্বারা অবিদ্যার নিবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন গুণত্রয়ের মধ্যে সংঘর্ষণ চলে, ঐ সময়ে আমাদের অন্তরে যে চাঞ্চল্য এবং যাতনা হয় তাহা অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট 'অহঙ্কার' নামক বস্তু হইতে উৎপন্ন মোহেরই কার্য্য। এই যাতনা নিবৃত্তির জন্য অনেকে সাধনা করেন এবং সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের পুষ্টি দ্বারা আমাদের হিতসাধন হইতে থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতির সময়ে বিপদের তেজ বাড়িতে থাকে এবং সেই সঙ্গে যাতনার তীব্রতাও বাড়ে। তীব্র যাতনা হইতে সাধনায় দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা জন্মায় ও তদ্দারা চিত্তশুদ্ধি (অর্থাৎ অবিদ্যার মালিন্য নাশ) হইতে থাকে।

চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ অর্থাৎ অবিদ্যার সংশ্রব রহিত হয়, জীব তখন 'সংসার' অর্থাৎ ভূরাদি লোকত্রয় অতিক্রম করিয়া উচ্চ-লোকে গমন করেন। তথায় অবিদ্যা নাই, কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই তথায় বিরাজ করেন, সুতরাং সেখানে বিপদ হয় না। অতএব সংসার

অতিক্রম করিলে বিপদ হইতে চিরমুক্তি লব্ধ হয়। অতএব সাধনাই কেবল বিপদ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

কিভাবে সাধনা করিতে হয় তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টাদশ এবং উনবিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির বিদ্যা নাই, শ্রদ্ধা নাই এবং শাস্ত্র নির্দ্ধারিত উপায়ে সাধনার জন্য অবসরও নাই, তাঁহারা শাস্ত্র নির্দ্ধারিত উপায়ে যতটুকু সাধনা করিতে পারেন তাহা করার পরে, যদি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতিপাদন গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভুর 'স্থূলরূপ' চিন্তা করেন,অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করার পরে, তিনি কি অপূর্ব্ব কৌশলে বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং সংহার লীলা সম্পাদন করিতে-ছেন,—এই সকল বিষয়ের চিন্তা করেন, তাহলে তাঁহার নিকট বিজ্ঞান দ্বারাই দর্শনের কথায় যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়।

ঐ প্রতিপাদন দ্বারা শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। এবং সাধক যদি পুনঃ পুনঃ একাগ্রভাবে বিভুর সৃষ্টিলীলার গূঢ়তত্ত্ব চিন্তা করেন, তখন তাঁহার মতি ঐ সকল তত্ত্বে নিবদ্ধ হওয়াতে, যে বিশুদ্ধ 'চিৎ' এবং 'আনন্দ'ই ব্রহ্মের স্বরূপ তাহা সাধকের চিত্তরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার করে। ক্রমশঃ ভক্তি সুদৃঢ়া হইয়া সাধক এবং ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ ভাবের উৎপাদন করে। এই অভেদভাবের নামই 'ভক্তিযোগঃ'। 'ভক্তিযোগের', অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবের, শুভশক্তি দ্বারা সাধক সংসার হইতে এবং বিপদ হইতে চিরমুক্তি লাভ করেন।

উপসংহার।

প্রায় তিন বৎসর চেষ্টা এবং পরিশ্রমের পরে 'বিপদ-রহস্য' পুস্তকের রচনা এবং ছাপান শেষ হইল। পাঠককে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণের সময় দুটো কথা বলিয়া যাই।

প্রথম কথা এই যে, বইখানি নিজের জন্যই লিখিয়াছি। নিজের বিপদসঙ্কুল জীবনে ১৭ বছর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল বিপদ এ পর্য্যন্ত নানা ভাবে চলিতেছে, তাহাদের কারণ কি, এবং তাহাদের দ্বারা আমার কি উপকার অথবা অপকার হইয়াছে, এই চিন্তা বহুকাল যাবৎ করিতেছি। গত ২০ বছর বিপদও তীব্র হইয়াছে, আমার চিন্তাও বেশী প্রগাঢ় হইয়াছে। বহুদিন কোন মীমাংসাই করিতে পারি নাই, প্রভূর আশ্রয় লইয়া ভাগবতের সাহায্যে যাহা অবধারণ করিয়াছি, এই পুস্তকে তাহাই লিখিলাম।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বিপদ দ্বারা লোকে যেন ভীত না হন। যাঁহাদের চিত্ত সত্তবহুল, তাঁহাদের অন্তরে সত্ত্বগুণের আরও বেশী পুষ্টিসাধনের জন্য বিদ্যা এবং অবিদ্যার মধ্যে প্রবল সংঘর্ষণ হয়, সেইজন্য ঘোর বিপদ হয়। বিপদ লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতিরই লক্ষণ, এবং উন্নতি বৃদ্ধির সঙ্গে বিপদের তেজও বেশী হয়। অবশেষে যখন সত্ত্বগুণ (অর্থাৎ 'মিশ্রসত্ত্ব') এত বেশী হয় যে, তমোগুণ তখন না থাকার তূল্য হইয়া দাঁড়ায়, তখনও বিদ্যা এবং অবিদ্যার মধ্যে সংঘর্ষণ চলে, কিন্তু অবিদ্যার পরিমাণ নগণ্য হওয়াতে আঘাতের **Momentum** অল্প হয়, তাইতে আমরা আঘাত বুঝিতে পারি না। একখানা বড় জাহাজের গায়ে যদি একখানা ডিঙ্গি নৌকায় ধাক্কা লাগে তখন জাহাজে চাঞ্চল্য হয় না, জীবের অত্যধিক উন্নতির অবস্থায়ও বিপদ হয়, কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্য হয় না।

তমোগুণের হ্রাস হইতে হইতে যখন কেবল 'মিশ্রসত্ত্ব মাত্র' অবশিষ্ট থাকে, জীব তখন দেবযোনিতে গমন করেন। ভূলোকে থাকার সময় যদি তমোগুণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তাহলে দেবযোনিতে গমন না করিয়াও, জীব ভুলোক হইতেই কোন উচ্চলোকে গমন করেন।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিপদ আমাদের 'মমত্ব' ভাবের উপরই প্রচণ্ড আঘাত করে। ক্রমশঃ মানব যখন সাধনায় পরিপাক দশায় উপনীত হন, অর্থাৎ সেই সমুন্নত দশায় উপনীত হন যে অবস্থায়

'অহং' ভাবের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়িলে সাধক ঐ 'অহং' নামক বস্তুটীর অলীকত্ব 'অনুভব' করিতে সমর্থ হইবেন, তখন 'অহং' ভাবের উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে।

ঐ সময়ে এমন কতকগুলি ঘটনা হয়, যাহা দ্বারা সাধকের চিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের রশ্মি পতিত হয়, এবং সেই সঙ্গে পুনঃ পুনঃ 'অহং' এর উপর প্রচণ্ড আঘাতও পড়ে। সাধক তখন ক্রমশঃ অনুভব করেন যে, অবিদ্যাসৃষ্ট 'অহঙ্কার' নামক বস্তুটী অবাস্তব। 'অহং'এর উপর আঘাতেই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করায়। এক আধবারের আঘাত দ্বারা এই শোধন কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না। অভাবনীয় ভাবে বিপদের সৃষ্টি হইয়া দেড় মাসের মধ্যে 'অহং' এর উপর সাতবার আঘাত পড়িতেও দেখিয়াছি। সাধনা দ্বারা মানব যখন অতি উচ্চ দশায় উন্নত হন, তখনই 'অহং' ভাবের উপর direct ভাবে এবং পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। তাহার পূর্ব্বে 'মমত্ব' ভাবের উপরই আঘাত পড়ে।

বিপদ কখনই দুর্ভাগ্য নয়। আমরা ভোগসুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া আছি, তাই বিপদকে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। গত তিন বৎসর এই তত্ত্ববিষক চিন্তায় নিরত থাকিয়া বিপদের করালরূপের মধ্যেও এখন যে প্রায়ই শ্রীহরির মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাইতে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, পাঠকও যেন আপন আপন বিপদের মধ্যে ঐ মধুর মূর্ত্তি দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এই কথা কয়টী বলিয়া পাঠকের নিকট বিদায় লইতেছি। আমার নানা ত্রুটী আছে, সেগুলি কৃপার চক্ষে দেখিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি ২৩এ জুন, ১৯৩০

ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়।